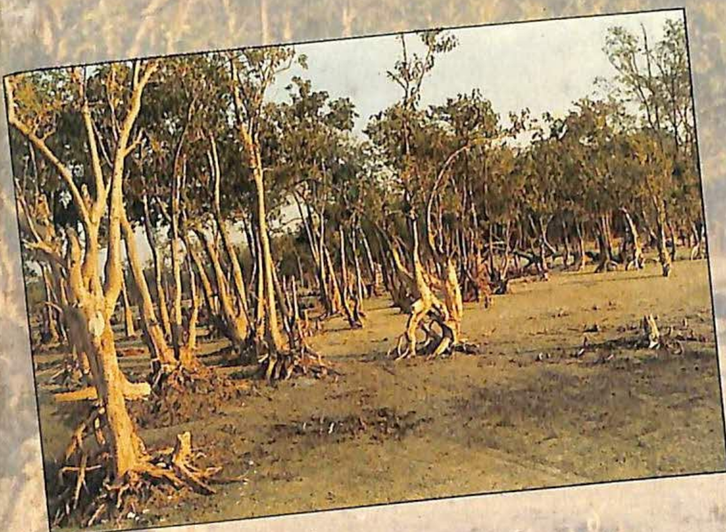
পরিবেশ ও দূষণ













গৌতম পাল

পরিবেশ ও দূষণ

গৌতম পাল

লেকচারার, পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিপার্টমেন্ট
অব্ ফিজিওলজি ; হুগলী মহসিন কলেজ

দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
কলকাতা

PARIBESH O DUSHAN
(ENVIRONMENT AND POLLUTION)
BY GOUTAM PAUL

প্রকাশক :
অরবিন্দ দাশগুপ্ত
দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড
53/3 কলেজ স্ট্রিট
কলকাতা-700073

প্রথম প্রকাশ :
জানুয়ারি, 1999

অক্ষর-বিন্যাস :
ভারবি
13/1 বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট
কলকাতা-700 073

প্রচ্ছদ-বিন্যাস :
গৌতম নন্দী

মুদ্রক :
অরুণিমা প্রিন্টিং ওয়ার্কস
81 সিমলা স্ট্রিট
কলকাতা-700 006

মূল্য : Rs. 200.00

আমার স্ত্রী
শোভা কে

বিষয়সূচি

মুখবন্ধ

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার ও ক্রমবিনাশ, জীব-বৈচিত্র্যের সরলীকরণ, জীবাশ্ম জ্বালানির সীমায়ন, শক্তির সংকট, শীর্ষ মৃত্তিকার ক্ষয়, কীটনাশকের অপপ্রয়োগ, খাদ্য ও অন্যান্য ব্যবহারোপযোগী সামগ্রীতে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের সংক্রমণ, পানীয় জলের ক্রমসংকোচন, পরিবেশ দূষণ প্রভৃতি কারণে গণচেতনা সৃষ্টির প্রয়াসে অধুনা পরিবেশ শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে! প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত পরিবেশ শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পরিবেশ সম্পর্কিত জনপ্রিয় এবং বিশেষজ্ঞ প্রকাশনা প্রমশ বাড়ছে।

সম্প্রতি কলকাতা, বর্ধমান, বিদ্যাসাগর, ত্রিপুরা এবং অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ত্রিবার্ষিক স্নাতক পাঠক্রমে (বিজ্ঞান, বাণিজ্য ও কলা) 'পরিবেশ বিজ্ঞান' অবশ্যপাঠ্য করা হয়েছে। বর্তমানে পরিবেশ বিজ্ঞানের উপর বিচ্ছিন্ন কিছু জনপ্রিয় এবং বিশেষজ্ঞ প্রকাশনা থাকলেও সম্পূর্ণ বিষয়সূচির উপর লেখা কোন পাঠ্যবই নেই। সে কারণে এই পাঠ্যবই লেখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছি। মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে বইটি বাংলা ভাষায় রচনা করেছি। আশা রাখি বইটি পরিবেশ সম্পর্কিত জনপ্রিয় এবং বিশেষজ্ঞ প্রকাশনার মধ্যে সেতুবন্ধন করতে সাহায্য করবে। এছাড়া বইটি পাঠকদের পরিবেশ সম্পর্কিত জটিল বিষয় এবং সমস্যার পুঙ্খানুপুঙ্খ সমাধানে মৌলিক ধারণা জ্ঞাপন করবে।

পরিবেশ বিজ্ঞানের বিষয়সূচির উপর লেখা 'পরিবেশ ও দূষণ' বইটি ত্রিবার্ষিক স্নাতক পাঠক্রমে (পাশ ও অনার্স) পরিবেশ বিজ্ঞান এবং পরিবেশ শিক্ষার পাঠ্যবই হিসেবে বিবেচিত হতে পারবে। এছাড়া স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরের পরিবেশ জীববিজ্ঞান এবং পরিবেশ রসায়নের পাঠক্রমেও বইটি পাঠ্যবই হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। পরিবেশ বিজ্ঞানের সম্পর্কযুক্ত শাখা পরিবেশ ব্যবস্থাপনে এই বইটি তথ্যাদি পাঠ্যবই হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

বইটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। বইটিতে মোট তেরোটি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে পরিবেশ বিজ্ঞানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এই গ্রহবাড়ীর পরিবেশ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কি? কি কি পরিবেশ সম্পর্কিত সমস্যা রয়েছে? কি করা উচিত? পরিবেশ সংরক্ষণে ভারতের দায়বদ্ধতা ও জনগণের সাংবিধানিক দায়িত্ব, পরিবেশ সম্পর্কিত কয়েকটি পরিচিত দুর্ঘটনা ও তার কারণ প্রথম অধ্যায়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। পরিবেশ বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় দ্বিতীয় থেকে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। প্রতিটি

অধ্যায়ের প্রথমে বিষয়সূচি, পরে মূল বিষয় এবং শেষে মূল বিষয়ের সারাংশ দেওয়া হয়েছে। **পরিবেশ সম্পর্কিত মূল বিষয়ের বিশেষ অংশ এবং তার ব্যাখ্যা বক্সের মধ্যে দৃষ্টিগোচর করা হয়েছে।** ছাত্রদের সুবিধার্থে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে **অনুশীলনী** দেওয়া হয়েছে।

প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশ ; পরিবেশের অজীব ও সজীব উপাদান ; বায়ুমণ্ডল, অশ্মমণ্ডল, জীবমণ্ডল এবং এদের মিথোস্ক্রিয়া ; বাস্তুসংস্থান ; মৃত্তিকা ; আধুনিক মানুষের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, জনসংখ্যা ; প্রচলিত এবং অপ্রচলিত শক্তি উৎস ; এবং বিষ-বিজ্ঞান দ্বিতীয় থেকে সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। অষ্টম অধ্যায় থেকে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে **পরিবেশ দূষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ (বায়ুদূষণ, জলদূষণ, মৃত্তিকা দূষণ, তেজস্ক্রিয় দূষণ, শব্দ দূষণ)** পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় আর্সেনিক দূষণের প্রাবল্য দেখা দিয়েছে। এই পরিবেশ সমস্যার কথা মাথায় রেখে **'আর্সেনিক ও পরিবেশ দূষণ'** শিরোনামে একটি পৃথক অধ্যায় এই বইটিতে রয়েছে। আর্সেনিক দূষণের সম্ভাব্য কারণ, মানুষের শরীরে আর্সেনিক সংক্রমণের উপায় এবং মানব স্বাস্থ্যের উপর আর্সেনিকের ক্ষতিকর প্রভাব এই অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া পরিবেশ সম্পর্কিত বহুল আলোচ্য বিষয় যথা—**ওজোন স্তরের ক্ষয় ও অ্যান্টার্কটিক ওজোন হোল, গ্রীণহাউস প্রভাব ঃ গ্লোবাল ওয়ার্মিং, আসিড বৃষ্টি এবং আলোক-রাসায়নিক দূষণ** এ বইটিতে অনুপুঙ্খ বর্ণনা করা হয়েছে।

আশারাখি এ-বইটি পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ প্রতিরোধে সার্বিক গণচেতনা গড়ে তুলতে সাহায্য করবে এবং ছাত্র, শিক্ষক, পরিবেশপ্রেমী মানুষ, পরিবেশ বিজ্ঞানী, পরিবেশ আধিকারিক এবং অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের মানুষের আগ্রহ ও পোষকতা লাভ করবে। আসুন আমরা এই পৃথিবী বাসস্থানকে আগামী প্রজন্মের কাছে বাসযোগ্য করে যাবার অঙ্গীকার নিই।

কৃতজ্ঞতা

এ-বইটি প্রকাশনার ব্যাপারে আমি অনেকের সহযোগিতা পেয়েছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসার ডঃ রথীন্দ্রনারায়ণ বসু এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য প্রফেসার ডঃ মোহিত ভট্টাচার্য স্নাতক পাঠক্রমের উপযোগী বাংলাভাষায় পরিবেশ বিজ্ঞানের বিষয়সূচির উপর একটি পাঠ্যবই লেখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁদের আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রফেসার ডঃ পীযূষ কান্তি গাঙ্গুলী (বর্তমানে DPI), প্রফেসার ডঃ তিমির বরণ ঝা (বর্তমানে DDPI [A]) এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা বিভাগের প্রফেসার ডঃ জীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং শারীরবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসার দেবজ্যোতি দাশের কাছে যে উৎসাহ ও কর্মপ্রেরণা পেয়েছি তা কোনদিন বিস্মৃত হবো না। তাঁদের আমার শ্রদ্ধা জানাই।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ (মিসেস) প্রতিমা চ্যাটার্জী, প্রফেসার ডঃ এস. পি. চ্যাটার্জীকে শারীরবিজ্ঞানের এবং প্রফেসার ডঃ তারকমোহন দাস, প্রফেসার ডঃ নরেশ চন্দ্র দত্ত, প্রফেসার ডঃ জগৎজীবন ঘোষ, প্রফেসার ডঃ দিলীপ কুমার বসু (বর্তমানে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) ও ডঃ সুদীপ ব্যানার্জীকে পরিবেশ বিজ্ঞানের শিক্ষক হিসাবে পেয়েছি। তাঁরা আমাকে নানাভাবে পরামর্শ ও সাহায্য করেছেন, তাঁদের আমার শ্রদ্ধা জানাই। বই লেখার সময় আমি অসংখ্য পরিবেশ বিজ্ঞান সম্পর্কিত জনপ্রিয় এবং বিশেষজ্ঞ পুস্তক, পুস্তিকা এবং পত্র-পত্রিকার সাহায্য নিয়েছি। সংশ্লিষ্ট সকল গ্রন্থকার এবং প্রকাশকদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হতো না 'দাশগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড'এর ডিরেক্টর শ্রী অরবিন্দ দাশগুপ্তের সক্রিয় উদ্যোগ এবং সাহায্য ছাড়া। শ্রী দাশগুপ্ত বইটি প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য আধিকারিক এবং কর্মীদের কাছেও কৃতজ্ঞ রইলাম। অক্ষর বিন্যাসে 'ভারবি'র গোরা সিংহরায় এবং রবীন্দ্রনাথ মাইতি আমাকে নানাপ্রকারে সাহায্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ মাইতি এবং মানিক সরকার বইটির সমস্ত ছবি এঁকেছেন। শিল্পী গৌতম নন্দী এবং বনফুল প্রকাশনীর কৃষ্ণেন্দু মৈত্র প্রচ্ছদ-বিন্যাসে সাহায্য করেছেন। তাঁদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

জানুয়ারি, 1999

গৌতম পাল

চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি—
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

—সুকান্ত ভট্টাচার্য

1 পরিবেশ প্রসঙ্গে

1.1. ভূমিকা (Introduction) ঃ

পৃথিবী সৌর-পরিবারের একটি গ্রহ। জীবের **উৎপত্তি, বৃদ্ধি** এবং **বংশবিস্তারের** অর্থাৎ **জীব প্রতিপালনের** অনুকূল পরিবেশ কেবল এই গ্রহেরই রয়েছে। তাই মানুষ সহ অন্যান্য জীবের (আণুবীক্ষণিক জীব, উদ্ভিদ এবং প্রাণী) অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র—এই পৃথিবী। কিন্তু পৃথিবীর বর্তমান প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল জীব-প্রতিপালনের পক্ষে নিরাপদ নয়। কারণ মানুষের সঙ্গে প্রাকৃতিক পরিবেশের অবিরাম সংঘাত ঘটছে, মানুষের অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপের ফলে পরিবেশ এবং সঙ্কটপূর্ণ সম্পদের অসংশোধনযোগ্য ক্ষতি হচ্ছে। পরিবেশের উপর মানুষের এরূপ অসংশোধনযোগ্য ক্রিয়াকলাপ বন্ধ না হলে শুধু মানবপ্রজাতি নয়, সমগ্র জীবগোষ্ঠী পরিবেশ সমস্যায় বিপন্ন হবে এবং এই মুহূর্তে সচেতন না হলে পৃথিবীর বুক থেকে প্রকৃতির বিস্ময় সৃষ্টি—'জীব' সুদূর ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে এই **'পৃথিবী-বাসস্থান'** সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের মত প্রাণহীন হয়ে পড়বে। উল্লেখ্য উন্নত, উন্নয়ণশীল এবং দরিদ্র—সকল রাষ্ট্রের মানুষ একই পরিবেশের উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ সকলের জন্য একটিই **জীবণতরী**। পৃথিবীর পরিবেশ বিপন্ন হলে কোন একটি উন্নত রাষ্ট্র পৃথিবীর সকল জীবের অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারবে না। এছাড়া একটি রাষ্ট্রের পরিবেশ ধ্বংসাত্মক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ পরোক্ষে সকল রাষ্ট্রকেই বিপদগ্রস্থ করে তোলে।

তাই, আমাদের পরিবেশসম্পর্কীয় ভাবনা সামগ্রিক বা বিশ্বব্যাপী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। মনুষ্যপ্রজাতির অগ্রগতির এই সন্ধিক্ষণে পরিবেশ সচেতনতার গুরুত্ব—অনস্বীকার্য।

1.2. পরিবেশ সমস্যা (Environmental Problem) ঃ

আমাদের পরিবেশ সমস্যা মূলত ত্রিমাত্রিক ঃ

a) **পরিবেশ দূষণ** (Environmental Pollution)

b) **বাস্তুসংস্থানগত ক্ষয় (বা বিনাশ)** (Ecological Decay or Destruction)

এবং c) **সম্পদ হ্রাস** (Resource Depletion)।

পরিবেশের উপরিউক্ত সমস্যাজনিত পরিবর্তন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপুনর্নবীকরণযোগ্য অর্থাৎ অসংশোধনাতীত। পরিবেশ সমস্যার বিভিন্ন আঙ্গিক এবং সংক্ষিপ্ত খসড়া (outline) উল্লেখ করা হল।

1.2.1. বায়ুমণ্ডল (Atmosphere) ঃ

a) **ওজোনস্তরের ক্ষয় (Ozone Layer Depletion)** ঃ স্ট্র্যাটোস্ফেরিক 'ওজোন স্তর' পৃথিবীপৃষ্ঠের **'প্রাকৃতিক সৌরপর্দা'** (natural sunscreen) হিসেবে কাজ করে। কারণ ওজোন স্তর সৌর-বিকিরণের প্রাণবিনাশক উপাদান—**'অতিবেগ্নী রশ্মি'** (UV-B, UV-C) কে শোষণ করতে পারে। ফলে অতিবেগ্নী রশ্মি পৃথিবীর অশ্ম এবং বারিমণ্ডলে প্রতি-পালিত জীবজগতের উপর মারণ-থাবা বসাতে পারে না। কিন্তু মানুষের অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপের ফলে পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী সকল জীবের সম্মুখে অধুনা ওজোনস্তরের ক্ষয়জনিত বিপদ সৃষ্টি হয়েছে। রেফ্রিজারেশান শিল্পে ; এরোসল (যথা পারফিউম) ও ফোম উৎপাদনে ; এবং ইলেকট্রনিক্স শিল্পে **'ফ্রেয়ন (Freon) গ্যাস'** বা **ক্লোরোফ্লুরোকার্বনের** (CFC) ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে **'ফ্রেয়ন গ্যাস'** অনবরত বাতাসে সংক্রমিত হচ্ছে। ফলে, বায়ুতে সংক্রমিত ফ্রেয়ন গ্যাস 'স্ট্র্যাটোস্ফেরিক' বায়ু-স্তরে ঢুকে পড়ে ওজোন স্তরকে পাতলা করে দিচ্ছে। পৃথিবীব্যাপী ওজোনস্তরের এই ক্ষয় পৃথিবীর বুকে বসবাসকারী জীবগোষ্ঠীর সম্মুখে একটি অনিবার্য বিপদের পূর্বাভাস।

b) **অ্যাসিড বৃষ্টি (Acid Rain)** ঃ অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ন, জনসংখ্যার বৃদ্ধি, এবং জীবাশ্ম জ্বালানীর (কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি) বাধাহীন অপচয়ে বায়ুমণ্ডলে সালফার এবং নাইট্রোজেন-এর অক্সাইড (SO_x, NO_x,) ঘটিত দূষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই দূষণ জনিত কারণে বৃষ্টির জলে অনভিপ্রেত সালফিউরিক অ্যাসিড এবং নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদিত হচ্ছে। উৎপন্ন অ্যাসিড বৃষ্টির মাধ্যমে স্থল এবং জলের পরিবেশ কে দূষিত করছে। এই ঘটনাই **'অ্যাসিড বৃষ্টি'** নামে পরিচিত। অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে, কারণ অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে অরণ্য, শস্য এবং অন্যান্য মনুষ্যকৃত সম্পদের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে।

c) **গ্রীণহাউস প্রভাব (Green-house Effect)** ঃ পরিবেশ সঙ্কটের একটি অন্যতম

প্রধান কারণ হচ্ছে—বিশ্বব্যাপী জলবায়ুঘটিত পরিবর্তন। এই জলবায়ুঘটিত পরিবর্তনের পিছনে রয়েছে—বায়ুমণ্ডলের দূষণ। মানুষের অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপ্ যথা—অরণ্য নিধন (deforestation) এবং জীবাশ্ম-জ্বালানীর বাধাহীন ব্যবহারের ফলে বাতাসে কার্বনডাই-অক্সাইড (CO_2) গ্যাসের ঘনত্ব ক্রমশ বাড়ছে। এছাড়া দূষণ জনিত কারণে মিথেন, জলীয় বাষ্প, এবং ওজোন প্রভৃতি গ্যাসের ঘনত্বও বৃদ্ধি পাচ্ছে। কার্বন-ডাই অক্সাইড, মিথেন, জলীয়বাষ্প এবং ওজোন প্রভৃতি গ্যাসকে সামগ্রিক ভাবে '**গ্রীণহাউস গ্যাস**' বলা হয়। বায়ুমণ্ডলে গ্রীণহাউস গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীর গড় স্বাভাবিক তাপমাত্রা অদূর ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পেতে পারে (যদিও মতানৈক্য রয়েছে)। পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে সামুদ্রিক জলের আয়তন প্রসারণ ঘটবে, মেরুঅঞ্চল এবং হিমালয়ে সঞ্চিত বরফ গলতে শুরু করবে। ফলে সামগ্রিকভাবে সামুদ্রিক জলের পরিমাণ এবং জলের পৃষ্ঠতলের উচ্চতা বাড়বে (অর্থাৎ সমুদ্র আরোও বিস্তৃত হবে)। ফলস্বরূপ পৃথিবীর সমুদ্র উপকূলবর্তী সমস্ত অঞ্চল সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে যাবে (যথাঃ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল, বাংলাদেশ প্রভৃতি)। দূষণজনিত কারণে বিশ্বের গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধি সম্পর্কে অনিশ্চয়তা থাকলেও বাতাসে ক্ষতিকারক গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধির ফলে জীবজগতের বিপদাশঙ্কা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকা উচিত নয়।

1.2.2. জলসম্পদ (Water Resource) ঃ

ভূগর্ভস্থ এবং বহির্ভাগ-পৃষ্ঠীয় মিষ্টি জলের (ground and surface sweet water) সঞ্চয় খুব সীমিত (মোট পরিমাণের প্রায় 3 শতাংশ)। শস্যের উৎপাদন এবং মানুষের শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়া এই মিষ্টি জলের উপরই নির্ভরশীল। কিন্তু ভূ-গর্ভস্থ মিষ্টি জলের বাধাহীন অপচয় বর্তমানে শসের‍্য উৎপাদন এবং মানুষের জীবন প্রণালীকে বিপন্ন করে তুলেছে। পৃথবীর 80টি দেশে যেখানে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার 40 শতাংশ লোক বসবাস করে, সেইসব দেশে বহির্ভাগ-পৃষ্ঠীয় মিষ্টি জলের অত্যধিক চাহিদার কারণে বহির্ভাগ-পৃষ্ঠীয় জলের (নদী, হ্রদ, এবং পুকুরের) মোট পরিমাণ সঙ্কটজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। উপরন্তু, বহির্ভাগ-পৃষ্ঠীয় এবং ভূগর্ভস্থ জলের দূষণ মিষ্টি জলের যোগানকে পুনরায় সংকুচিত করেছে।

1.2.3. সমুদ্র (Oceans) ঃ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র আজ বিপন্ন। বিশেষ করে উপকূলবর্তী সমুদ্রের অংশ যেখানে মানুষের খাদ্যোপযোগী বেশীরভাগ মাছ উৎপন্ন হয়। সমুদ্রের স্বাভাবিক পরিবেশ বা মাছের স্বাভাবিক সংখ্যা বজায় রাখার জন্য যতসংখ্যক মাছ শিকার করা উচিত তার চেয়ে অধিক সংখ্যক মাছ শিকারের কারণে পৃথিবীর কয়েকটি সমুদ্র ইতঃপূর্বে মাছ শূন্য বা বন্ধ্যা (collapse) হয়ে গেছে। এছাড়া সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র ধ্বংসের পৃথক একটি কারণ হচ্ছে সামুদ্রিক দূষণ। নদীর মাধ্যমে পরিবাহিত ক্ষয়ে যাওয়া মৃত্তিকা (eroted soil) ; পৌরপ্রতিষ্ঠান, কৃষিক্ষেত, এবং গৃহপালিত পশুর বর্জ্য পদার্থ এসে সমুদ্রে মিশছে। এইসব

বর্জ্য পদার্থের অধিকাংশই সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্রের সজীব উপাদান যথা ঃ মাছ এবং অন্যান্য জীবের প্রাণ-প্রক্রিয়ার পক্ষে অতিশয় বিষাক্ত (toxic)।

1.2.4. **মৃত্তিকা** (Soil) ঃ

i) জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়াস শুরু হয়েছে। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক অবাধে ব্যবহৃত হচ্ছে। রাসায়নিক সার এবং কীটনাশকের ক্রমবর্ধমান ও অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার এবং প্রাণী-চাষের কারণে মৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে, ফলে কৃষিযোগ্য জমির পতিত জমিতে রূপান্তর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ii) কৃষিযোগ্য জমির আয়তন হ্রাসের অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে—মৃত্তিকার ক্ষয় (soil erosion)। শিল্প স্থাপন ও প্রসারণ, এবং চাষের জমি বাড়ানোর তাগিদে বাধাহীনভাবে বন-জঙ্গল ধ্বংস হয়ে চলেছে। ফলে বৃষ্টির জলে অরণ্য-অনাচ্ছাদিত জমি'র মৃত্তিকা ব্যাপকহারে ক্ষয়ে যাচ্ছে। **1945 সালের পর বিশ্বের চাষযোগ্য জমির 11 শতাংশ ক্ষয়ে গেছে। ভারত এবং চীনকে যোগ করে যে আয়তন পাওয়া যাবে ক্ষয়ে যাওয়া জমির আয়তন তার চেয়ে অনেক বেশি।** উল্লেখ্য তৃতীয় বিশ্বে প্রতি বছর 11 মিলিয়ন হেক্টর জমি অরণ্য-ধ্বংসজনিত কারণে ক্ষয়ে যাচ্ছে। চাষযোগ্য জমির আয়তন হ্রাসের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাথাপিছু খাদ্য-উৎপাদনের পরিমাণও হ্রাস পাচ্ছে।

ii) ক্ষয়ে যাওয়া মৃত্তিকা এসে নদীগর্ভে পড়ছে, ফলে নদীগুলির গভীরতা হ্রাস পাচ্ছে। বৃষ্টিকালে অগভীর নদীগুলি প্রয়োজনীয় জল ধরে রাখতে না পারায় প্রতি বছর ভয়াবহ বন্যা দেখা দিচ্ছে। বন্যার ফলে সম্পদ, শস্য এবং মানুষের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে।

1.2.5. **অরণ্য** (Forests) ঃ

গ্রীষ্ম মণ্ডলের বৃষ্টি-অরণ্য (Tropical Rain Forests), গ্রীষ্ম-মণ্ডল এবং নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের শুষ্ক অরণ্য (Dry Forests) খুব দ্রুত ধ্বংস হচ্ছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে আগামী কয়েকবছরের মধ্যে পৃথিবীর বেশ কয়েকটি সঙ্কটপূর্ণ অরণ্য বিলুপ্ত হবে এবং একবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সবকটি গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বৃষ্টি-অরণ্য নিঃশেষিত হবে। অরণ্য বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রজাতি পৃথিবী থেকে চিরতরে হারিয়ে যাবে।

1.2.6. **সজীব প্রজাতি** (Living Species) ঃ

পরিবেশ সঙ্কটের দরুন পৃথিবী থেকে কোন প্রজাতির বিলুপ্তি বাস্তুতন্ত্রের একটি অসংশোধনযোগ্য পরিবর্তন, বহু চেষ্টা করেও ঐ বিলুপ্ত প্রজাতিকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। পরিবেশ সমস্যার কারণে যে হারে প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটছে এভাবে চলতে থাকলে বর্তমানে পৃথিবীতে যতসংখ্যক প্রজাতির অস্তিত্ব আছে একবিংশ শতাব্দীতে তার একতৃতীয়াংশ টিকে থাকবে। এই ঘটনা কি আমাদের ভাবনার পক্ষে যথেষ্ট নয়? এছাড়া যেসব উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে ভেষজগুণ আছে এবং যেসব উদ্ভিদ প্রজাতির নিহিত জিন-

বৈচিত্র্য সমগ্র জীব-সম্প্রদায়কে শক্তসামর্থ্য, স্থিতিশীল এবং পৃথিবীকে বিস্ময়কর সুন্দর করেছে, সেই সব উদ্ভিদ প্রজাতি চিরতরে হারিয়ে যাবে।

প্রকৃতির পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রাণজালিকায় অবৈধ হস্তক্ষেপ, বা অনধিকার পরিবর্তন ; অরণ্য ধ্বংস ; প্রজাতির বিলুপ্তি এবং জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিকতা বিপন্ন হবে এবং ভবিষ্যৎবাণী করার পূর্বে সকল সঙ্কটপূর্ণ প্রজাতি পৃথিবী থেকে অদূর ভবিষ্যতে বিলুপ্ত হয়ে যেতে পারে। ফলে বিলুপ্ত জীবের আন্তঃক্রিয়া এবং গতিবিজ্ঞান (dynamics) অজানাই থেকে যাবে।

1.3. জনসংখ্যা (Population) ঃ

আমাদের পৃথিবী সসীম (finite)। এই গ্রহবাড়ীর ক্ষতিকর এবং বিষাক্ত বর্জ্য শোষণ করার সামর্থ্য, খাদ্য ও শক্তি সরবরাহ করার সামর্থ্য এবং মানুষ প্রতিপালন করার সামর্থ্য সসীম। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় যে আমরা অতিদ্রুত উপরিউক্ত সীমারেখার কাছে পৌঁছে গেছি। বর্তমানের অর্থনৈতিক কর্মপদ্ধতিতে উন্নত এবং উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের পরিবেশের যে ক্ষতি হচ্ছে, তার ফলে বিপদাশঙ্কা থাকছেই। কারণ, পরিবেশ সমস্যার ফলে পৃথিবীতে জীবনের বিকাশমূলক পদ্ধতির যে ক্ষতি হচ্ছে তার সংশোধন বা মেরামত সম্ভব নয়।

বিশ্বের বর্তমান মানব-জনসংখ্যা প্রায় 5.4 বিলিয়ন। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অপরিবর্তনীয় নয়। আশঙ্কার বিষয় যে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা বীজগাণিতিক হারে বেড়ে চলেছে। এই মুহূর্ত থেকেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করতে না পারলে অচিরেই পৃথিবীর ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা সন্দেহাতীত। বিশ্বব্যাঙ্কের সমীক্ষা অনুসারে 12.4 বিলিয়নের কমে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার স্থিরতা দেখা যাবে না। যদিও জাতিপুঞ্জের (UNO) গণনা অনুসারে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা 14 বিলিয়নে পৌঁছাবে, যা বর্তমান মোট জনসংখ্যার প্রায় তিনগুণ। উল্লেখ করা যেতে পারে যে—বর্তমান জনসংখ্যায় প্রতি পাঁচ জন মানুষের একজন যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্যের অভাবে চরম দারিদ্র সীমার নীচে দিনাতিপাত করে এবং প্রতি দশজন মানুষের একজন অপুষ্টিজনিত রোগের শিকার হয়।

1.4. মানবজাতির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীদের সতর্কতা (Warning to Humanity by World Scientists) ঃ

পৃথিবীর বুকে মানুষ পরোক্ষে নিজেদেরই বিপদ ডেকে আনছে। মানুষ নিজের প্রয়োজনে পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলেছে। এই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থার হাত থেকে বিশ্ব-পরিবেশকে বাঁচানোর তাগিদে সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞানী সম্প্রদায় একযোগে এগিয়ে এসেছেন। এই প্রসঙ্গে **'উদ্বিগ্ন-বিজ্ঞানী সংঘ'** (Union of Concerned Scientists) গঠিত হয়েছে। এই 'বিজ্ঞানী সংঘ' থেকে **"মানবজাতির উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীদের পরিবেশগত সতর্কতা"** শীর্ষক যে দলিল প্রকাশিত হয়েছে, তাতে বিজ্ঞানী সম্প্রদায় সমগ্র মানবজাতিকে সতর্ক

করেছেন যে—মানুষের দুর্দশা এড়াতে এই মুহূর্তেই এই বিশাল 'গ্রহবাড়ীর' অসংশোধনাতীত অঙ্গহানি থেকে বিরত হওয়া প্রয়োজন।

1.5. পৃথিবীব্যাপী পরিবেশ সচেতনতা (Worldscale Environmental Awareness) ঃ

পৃথিবীব্যাপী পরিবেশ সচেতনতা জাগ্রত করা এবং বিস্তৃত করার জন্য '**ইউনাইটেড নেশানস্ এনভিরনমেন্ট প্রোগ্রাম**" আয়োজিত '**স্টকহোমে**' 1972 সালে সর্বপ্রথম মানব পরিবেশের উপর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে যে প্রোটোকল বা খসড়া গৃহীত হয় ভারত তার সক্রিয় সদস্য এবং স্বাক্ষরকারী। পরিবেশ সংরক্ষণে ভারতের দায়বদ্ধতার প্রতিফলন হিসেবে—সংবিধানে 48A এবং 51 বিধি বা ধারা (article) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পরিবেশের উপর সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়াসে 'ইউনাইটেড নেশানস্' আহুত পরিবেশ এবং বিকাশের উপর ব্রাজিলের **রিও-ডি-জেনেরোতে** (Reo-de-Janero) 1992 সালের জুনমাসে (3-14 জুন) শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পৃথিবীব্যাপী **জীব-বৈচিত্র্যের** (bio-diversity) সংরক্ষণ এবং উন্নতিবিধানের জন্য ঐ সম্মেলন থেকে যে 'শ্বেতপত্র' প্রকাশিত হয় তাতে প্রতিটি রাষ্ট্রের শীর্ষ নেতৃত্ব স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির মূল উদ্দেশ্য বৈচিত্র্য-বিনষ্টের আশঙ্কাগুলি সম্পর্কে অবহিত করা। ভারতও এই চুক্তির শরিক। 1993 সালের 29শে ডিসেম্বর ভারতে এই চুক্তি কার্যকরী হয়েছে।

- **ধারা-48A (48A Article) ঃ** প্রতিটি রাজ্য পরিবেশের সংরক্ষণ এবং উন্নতিবিধানের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবে এবং দেশের অরণ্য ও বন্যপ্রাণীদের নিরাপদ রাখবে।
- **ধারা-51 (51 Article) ঃ** ভারতের পরিবেশ যথাঃ অরণ্য, হ্রদ ও নদী এবং বন্যপ্রাণীদের সংরক্ষণ এবং উন্নতিবিধানে সাহায্য করা এবং সকল জীবের প্রতি করুণা প্রদর্শন করা।

1.6. আমরা কি কি অবশ্যই করতে পারি ঃ

পরিবেশ দূষণ, বাস্তুসংস্থানগত ক্ষয় এবং সম্পদ হ্রাস প্রভৃতি পরিবেশ সম্পর্কীয় সমস্যার হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ (বা পন্থা) আমরা গ্রহণ করতে পারি।

- প্রাকৃতিক পরিবেশের যে সম্পূর্ণতার উপর আমরা বেঁচে আছি তার সংরক্ষণ এবং পুনরুদ্ধারের জন্য পরিবেশ ধ্বংসকারী ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

  উদাহরণ—গ্রীণহাউস গ্যাস এবং বায়ুদূষণকারী অন্যান্য গ্যাসের উৎস 'জীবাশ্ম জ্বালানির' ব্যবহার হ্রাস করে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি-উৎস ব্যবহার করা যেতে পারে।

- অরণ্য ধ্বংস, কৃষিযোগ্য জমির ক্ষয় এবং জীব-প্রজাতির (উদ্ভিদ এবং প্রাণী) বিলুপ্তি হ্রাস করতে পারি।
- মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত অত্যাবশ্যক সাধারণ সম্পদগুলির (Common Resources) সদ্ব্যবহার করতে পারি, বিশেষকরে শক্তি'র উৎস সম্পদ (কয়লা, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস), জল এবং অন্যান্য মৌল সম্পদ। আমরা সম্পদের সংরক্ষণ এবং পুনরাবর্তন করতে পারি।
- ইউনাইটেড নেশানস্ এর বিভিন্ন অঙ্গ-সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিবার-পরিকল্পনা এবং বিয়ের বয়স বৃদ্ধির মাধ্যমে জনসংখ্যা-বৃদ্ধি রোধ করতে পারি। লিঙ্গ-বৈষম্যের অবসান এবং মহিলাদের নিজস্ব জনন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাতে পারি।
- উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে দূরত্ব হ্রাস করে দারিদ্র দূরীকরণ (বা হ্রাস) করতে পারি।
- জনসংখ্যাবৃদ্ধি এবং সম্পদ ব্যবহারের মধ্যে একটা সুষম ভারসাম্য আনতে পারি।
- উন্নয়নশীল দেশের মানুষকে পরিবেশ এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করার জন্য প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত **'পরিবেশ-শিক্ষার'** উপর গুরুত্ব আরোপ করতে পারি।
- প্রতিরক্ষা-ব্যয় হ্রাস করে উদ্বৃত্ত অর্থ দারিদ্র দূরীকরণ এবং শিক্ষার প্রসারে ব্যবহার করতে পারি। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক **প্রতিরক্ষা বরাদ্দ প্রায় এক-ট্রিলিয়ন ডলার**। এই বিপুল অর্থের বেশীরভাগ যদি উন্নয়ণশীল এবং তৃতীয় বিশ্বের উন্নতির জন্য ব্যয় করা হয় তাহলে সমগ্র বিশ্বের চেহারাটাই বদলে যাবে। অথচ আমেরিকা সহ উন্নত বিশ্বের আর্থ-সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ফলে সৃষ্ট দূষণজনিত প্রভাবের ভাগীদার এই তৃতীয় বিশ্ব। **বিশ্বের মোট জনসংখ্যার 5 শতাংশ আমেরিকার কিন্তু বিশ্বের মোট শক্তি-সম্পদের 25 শতাংশ ভোগ করে আমেরিকা। বিপরীতক্রমে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার 16 শতাংশ ভারতের, কিন্তু বিশ্বের মোট ব্যবহৃত শক্তির 3 শতাংশ ভোগ করে ভারত।**

1.7. পরিবেশের সংরক্ষণে এবং উন্নতিসাধনে যাদের সাহায্য অত্যাবশ্যক ঃ

এই বিশাল গ্রহবাড়ীর বিপন্ন জীবজগতের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য **'পরিবেশের সংরক্ষণ'** এবং **'উন্নতি'** অত্যন্ত জরুরী। এই উদ্দেশ্যে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের মানুষের একই ছাদের তলায় আসা উচিত। পরিবেশের সংরক্ষণ এবং উন্নতির জন্য—

a) বিশ্বের প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিজ্ঞানী সম্প্রদায়,
b) বিশ্বের সকল ব্যবসায়িক এবং শিল্পসংক্রান্ত নেতা,
c) বিশ্বের সকল ধর্মীয় নেতা, এবং

d) বিশ্বের সর্বস্তরের সকল মানুষের সাহায্য প্রয়োজন।

1.8. মানুষের অসতর্ক উন্নতিমূলক ক্রিয়াকলাপের ফলে পরিবেশগত দুর্ঘটনা ঃ

মানুষের অসতর্ক এবং অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপের ফলে যে সব পরিবেশগত দুর্ঘটনা ঘটেছে তাদের মধ্যে সমধিক পরিচিত কয়েকটি দুর্ঘটনা উল্লেখ করা হল।

1.8.1. চের্ণোবিল দুর্ঘটনা (Chernobyl Accident) ঃ

মানব সভ্যতার ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানোর তাগিদে প্রথমেই প্রচলিত শক্তি উৎস থেকে সংগৃহীত বিদ্যুৎ (তাপ এবং জলবিদ্যুৎ) শক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হত। কিন্তু জীবাশ্ম জ্বালানী—'কয়লার' স্বল্প সঞ্চয়ের কথা মাথায় রেখেই প্রচলিত শক্তি-উৎসের সমান্তরালে অপ্রচলিত শক্তি উৎস (non-conventional energy source) থেকে বিদ্যুৎ শক্তি আহরণের প্রচেষ্টা শুরু হয়। অপ্রচলিত বিদ্যুৎ-শক্তির উৎস হিসেবে **'পারমাণবিক শক্তি'** (Atomic energy) বা **নিউক্লিয়ার শক্তি** (Nuclear energy) প্রথম ব্যবহৃত হয়। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া (চের্ণোবিল বিদ্যুৎ কেন্দ্র) এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বের প্রথম-পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়। পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে তেজস্ক্রিয় মৌলের বিভিন্ন সমস্থানিকের (যথা—**'ইউরেনিয়াম'** এবং **'প্লুটোনিয়াম'**) পরমাণুস্থিত অস্থির নিউক্লিয়াসের **বিভাজন** (ফিশান, fission) বা **সংযোজনের** (ফিউশান, fusion) **ফলে** উৎপন্ন শক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি আহরণ করা হয়। এই অংশে চের্ণোবিল দুর্ঘটনা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

a) চের্ণোবিল দুর্ঘটনা কি?

চের্ণোবিল-কেন্দ্রে ইউরেনিয়াম জ্বালানী ($^{235}_{92}U$ এবং $^{238}_{92}U$) থেকে বিভাজন প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হত। দুর্ঘটনার ঠিক আগে পারমাণবিক চুল্লীর নিরাপদ ব্যবস্থা ছিন্ন করে বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছিল। কিন্তু নিরাপদ ব্যবস্থার অনুপস্থিতির প্রথম সুযোগেই পারমাণবিক চুল্লী হঠাৎ বিস্ফারিত হয়। পারমাণবিক চুল্লীর বিস্ফোরণে কেন্দ্রে কর্মরত শ্রমজীবী মানুষ এবং বিজ্ঞানী এবং কেন্দ্র সন্নিহিত 30 কিমি ব্যাসার্ধ অঞ্চলের বসবাসকারী সাধারণ মানুষের উপর যে মারণ-ক্রিয়া সংঘটিত হয়েছিল সেই অবিস্মরণীয় দুর্ঘটনা—**'চের্ণোবিল দুর্ঘটনা'** নামে পরিচিত।

b) চের্ণোবিল দুর্ঘটনা কেন ঘটেছিল?

চের্ণোবিল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে চারটি পারমাণবিক চুল্লী বা রিঅ্যাকটর (reactor) ছিল। পারমাণবিক চুল্লীর দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য চুল্লীর সঙ্গে বিভিন্ন নিরাপদ-ব্যবস্থা (safety system) যেমন—মডারেটর, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, শীতল করার ব্যবস্থা (coolant), প্রতিরোধক (shield), প্রতিফলক এবং নিউট্রন ডিটেক্টর যুক্ত ছিল।

দুর্ঘটনার রাত্রে চের্ণোবিল পারমাণবিক কেন্দ্রে চারটি পারমাণবিক চুল্লীর নিরাপদ ব্যবস্থা ছিন্ন করে বিভাজন প্রক্রিয়ায় ইউরেনিয়াম জ্বালানীদণ্ড থেকে বিদ্যুৎ-উৎপাদন

সংক্রান্ত পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। নিরাপদ ব্যবস্থার অনুপস্থিতির প্রথম সুযোগেই পারমাণবিক চুল্লী হঠাৎ অস্থির হয়ে উঠে এবং ইউরেনিয়াম জ্বালানী দণ্ড অতি উত্তপ্ত হয়ে ফেটে যায়, ফলে পারমাণবিক চুল্লী বিস্ফারিত হয়। **পারমাণবিক চুল্লীর বিস্ফোরণ জনিত কারণই** চের্ণোবিল দুর্ঘটনা সৃষ্টির জন্য দায়ী।

c) চের্ণোবিল দুর্ঘটনার পরিবেশগত প্রভাব ঃ

অতি-উত্তপ্ত ইউরেনিয়াম জ্বালানী দণ্ডের সক্রিয়তায় 1000 টন ওজনের পারমাণবিক চুল্লীর উপরের অংশ অধিক তাপে বিস্ফারিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। ফলে নিমেষেই রাশিরাশি অতি উত্তপ্ত স্টীম, দাহ্য গ্যাস, ধোঁয়া, এবং অতিশয় ক্ষতিকারক তেজস্ক্রিয় রশ্মি (আলফা, বিটা, গামা প্রভৃতি) দুর্ঘটনাস্থলের 30 কিমি ব্যাসার্ধ অঞ্চলের বায়ুমণ্ডল কে ঢেকে ফেলে। এই দুর্ঘটনার কবলে প্রথম কয়েকমাসের মধ্যে 31 জন মানুষ মারা যায় এবং প্রায় 1 লক্ষ হাজার মানুষকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। এছাড়া সমগ্র ইউরোপ মহাদেশের অসংখ্য মানুষ তেজস্ক্রিয়তার কবলে আক্রান্ত হয়।

> •• চের্ণোবিল দুর্ঘটনার ফলে মানুষের উপর তেজস্ক্রিয়তার ভয়াবহতা প্রত্যক্ষ করার মধ্য দিয়ে মানুষ পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ঝুঁকি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়। এই বিপদাশঙ্কার কারণে পারমাণবিক শক্তি 'অপ্রচলিত' হওয়া সত্ত্বেও পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পূর্বে পরিবেশগত সমস্যা নিয়ে অনুপুংখ্য বিবেচনা জরুরী।

1.8.2. ভূপাল ট্র্যাজেডী (Bhopal Tragedy) ঃ

a) ভূপাল ট্র্যাজেডী কি?

কীটনাশকের (Pesticides) ক্রমবর্ধমান চাহিদার কথা মাথায় রেখে ভূপালের জনগণের চাকুরী ও আর্থিক উপার্জন এবং দেশের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় ঠেকানোর জন্য বিদেশী কোম্পানী **'ইউনিয়ন কার্বাইড'** (Union Carbide) কে ভূপালে কীটনাশক উৎপাদনের কারখানা স্থাপন করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। স্থাপিত কারখানার মিক্ প্লান্ট (Mic-Plant) থেকে **কার্বারিল (সেভিন)** নামক কীটনাশক উৎপাদিত হত। কিন্তু উৎপাদনের প্রারম্ভ থেকেই দুর্ঘটনা ঘটা অবধি মিক্ প্লান্টে হাল্কা এবং ভারী প্রকৃতির কিছু গলদ ছিল। 1984 সালের 3রা ডিসেম্বর রাতে এই শতাব্দীর ভয়াবহতম কারখানাজনিত দুর্ঘটনা ঘটে ইউনিয়ন কার্বাইডের **'মিক্'** কারখানায়। কারখানা নিঃসৃত মিক্ গ্যাস এবং অন্যান্য গ্যাসের বায়ুসংক্রমণে কারখানা সংলগ্ন অধিবাসীদের উপর যে ক্ষণস্থায়ী (অ্যাকিউট) এবং দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) মারণক্রিয়া ঘটেছিল (এবং এখনও বর্তমান) তাকেই 'ভূপাল ট্র্যাজেডী' বলা হয়।

b) 'মিক্' বলতে কি বোঝায়?

মিথাইল আইসোসায়ানেট (Methyl isocyanate) নামক রাসায়নিক পদার্থ কে সংক্ষেপে মিক্ (MIC) বলা হয়। মিক্—একটি অতিশয় বিষাক্ত, উদ্বায়ী এবং দাহ্য

রাসায়নিক পদার্থ। বিশুদ্ধ মিথাইল আইসোসায়ানেট (মিক্) নিজের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়ায় প্রচুর তাপ উৎপন্ন করতে পারে। তাই মিথাইল আইসোসায়ানেট বিস্ফোরকও বটে। বিস্ফোরক ধর্মের জন্য মিক্ পদার্থ কে স্টেনলেস স্টীলের ট্যাঙ্কে 0° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় (রেফ্রিজারেটেড কক্ষে) সঞ্চিত রাখা হয়। **'কার্বারিল'** (Carbaryl) বা **'সেভিন'** (Sevin) কীটনাশকের উৎস পদার্থ হচ্ছে এই **'মিক্'**।

c) ইউনিয়ন কার্বাইডের মিক্ কারখানায় দুর্ঘটনা কেন ঘটেছিল?

ভূপাল দুর্ঘটনার সঠিক কারণ আধিকারিকভাবে জানা না গেলেও প্রেস রিপোর্ট অনুসারে অসতর্কতাই এই ঘটনার প্রধান কারণ ছিল। প্রেস রিপোর্টের বর্ণনা অনুযায়ী প্লান্টের মধ্যে 610, 611 এবং 619 কোড নাম্বারের দ্বি-স্তর বিশিষ্ট স্টেনলেস স্টীলের ট্যাঙ্কে মিক্ সঞ্চিত ছিল। ট্যাঙ্কগুলি রেফ্রিজারেটেড কক্ষে 0°C তাপমাত্রায় রাখা ছিল। দুর্ঘটনার রাত্রে কিছু সময় রেফ্রিজারেটার বিকল হয়ে যাওয়ার ফলে 610 নং ট্যাঙ্কে মিক্ তরলের চাপ হঠাৎ বেড়ে যায়। 610 নং ট্যাঙ্কে মিক্ তরলের চাপ বৃদ্ধির ঘটনা কারখানার এক কর্মী প্রথম প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু কিছু নিরাপদ ব্যবস্থা নেওয়ার পূর্বে ট্যাঙ্ক থেকে মিক্ বেরুতে শুরু করে। UCC-এর রিপোর্ট অনুসারে দুর্ঘটনার সময় 610 নং ট্যাঙ্কে 40 টন মিক্ ছিল, কিন্তু দুর্ঘটনা শুরু হওয়ার দু-ঘন্টার মধ্যে 20 টন মিক্ গ্যাসীয় এবং তরল আকারে বাইরে বেরিয়ে আসে। মিক্ গ্যাসের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ **ফসজিন, হাইড্রোজেন সায়ানাইড** এবং **কার্বনডাই অক্সাইড** গ্যাস বাতাসে সংক্রমিত হয়। শীতকালের রাতে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে **মিক গ্যাস, ফসজিন, হাইড্রোজেন সায়ানাইড** এবং **কার্বনডাই অক্সাইড** ঘণীভূত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলে নেমে আসে এবং মারণক্রিয়া শুরু করে।

d) মিক্ বিক্রিয়ার ভয়াবহতার পিছনে কি কারণ ছিল?

মিক্ গ্যাস যে কোন রাসায়নিক পদার্থ এমন কি নিজের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিক্রিয়া করে প্রচুর পরিমাণ তাপ এবং কার্বনডাই অক্সাইড উৎপন্ন করতে পারে। ট্যাঙ্কে মিক্ পদার্থের দীর্ঘদিন সঞ্চয়ে পার্শ্বক্রিয়া এবং বিস্ফোরণের সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে যায়। ইউনিয়ন কার্বাইডের মিক্ কারখানায় বিজ্ঞানীদের এই সচেতনতা থাকা সত্ত্বেও ভূ-পাল প্লান্টে 1983 সালের অক্টোবর মাস থেকে তিনটি ট্যাঙ্কে মিক্ সঞ্চিত ছিল। বিক্রিয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা না গেলেও ভারত সরকারের তরফে তদন্তে নিযুক্ত ডঃ এস. ভরদ্বাজের মতে কোন কারণে খুব অল্প পরিমাণ জল (দুই বা তিন লিটার) মিক্ ট্যাঙ্কের ফসজিন গ্যাসের সংস্পর্শে চলে আসে (মিক্ গ্যাসকে সুস্থির রাখার জন্য ফসজিন ব্যবহার করা হয়), ফলে জল এবং ফসজিনের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, তাপ এবং কার্বনডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন তাপ এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড **'মিক্ পলিমেরাইজেশানে'** (MIC Polymerization) সাহায্য করায় মিক্ বিক্রিয়া অতি-দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

e) ভূপাল দুর্ঘটনায় কতজন মানুষ আক্রান্ত হয়?

মিক্ প্লান্টের পার্শ্ববর্তী এলাকার কতজন নিরীহ মানুষ মিক্ দুর্ঘটনার কবলে মারা গেছে তার সঠিক হিসাব এখনও জানা সম্ভব হয় নি। তবুও রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে 1985 সালের জানুয়ারী মাসের শেষ পর্যন্ত 2500 মানুষ মারা যায় এবং দু লক্ষ মানুষ পঙ্গু হয়। কিন্তু UNICEF আধিকারিকের গোপন রিপোর্টের তথ্য অনুসারে দুর্ঘটনা ঘটার এক সপ্তাহের মধ্যে দশ হাজারেরও বেশী মানুষ মারা যায়।

•• ভূপাল দুর্ঘটনার ফলে যে সব প্রশ্ন আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে ঃ

i) ভূপালে মিক্ প্লান্টের সন্নিহিত অঞ্চলে এত জনবসতি কেন ছিল? মিক্ গ্যাসের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনগণকে কেন সচেতন করা হয়নি?

ii) ক্ষতিকারক কারখানা স্থাপনের জন্য কিরূপে নীতি নির্ধারিত হয়?

iii) বহুজাতিক কোম্পানী গুলি কি নিজেদের দেশের তুলনায় তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রে স্থাপিত কারখানায় (বা প্লান্টে) অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত নিরাপদ ব্যবস্থা চালু রাখে?

iv) পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলিতে অধিকাংশ ক্ষতিকারক—'কীটনাশক' এবং 'ড্রাগের' উৎপাদন এবং ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও জ্ঞাতসারে ঐ সব কীটনাশক এবং ড্রাগ ভারতে আমদানী বা উৎপন্ন করা হয় কেন? উল্লেখ করা যেতে পারে যে—কীটনাশক উৎপন্ন করার জন্য প্রচুর পরিমাণ PCB (Polychlorinated biphenyl) এখনও ভারতে আমদানী করা হয়।

v) ফ্রান্সে মিক্ উৎপাদন নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ইউনিয়ন কার্বাইড কে ভারতে মিক্ উৎপাদন এবং ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হল কেন? যদিও ইউনিয়ন কার্বাইড ব্যতিরেকে কয়েকটি কোম্পানী মিক্ পদার্থ ব্যবহার না করেও কার্বারিল কীটনাশক উৎপাদন করতে সক্ষম।

vi) ইউনিয়ন কার্বাইডের মত বহু বিদেশী কোম্পানী নিষিদ্ধ কীটনাশক এবং ড্রাগ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে কেন অবাধে রপ্তানী করে চলেছে? যদিও ঐ সকল কীটনাশক এবং ড্রাগ উৎপাদনের কারখানা তৃতীয় বিশ্বে রয়েছে।

1.8.3. মিনামাটা বিপর্যয় (Minamata Catastrophe) ঃ

a) মিনামাটা বিপর্যয় কি?

1955 সালে জাপানের মিনামাটা সমুদ্রের উপকূলবর্তী গ্রামের অসংখ্য মানুষ হঠাৎ একশ্রেণীর অপরিচিত রোগের প্রকোপে মারা যায়। রোগের কারণ উদ্ভবজনিত সমীক্ষায় সর্বপ্রথম জানা যায় মিনামাটা সমুদ্রে পারদের (মারকারির) সংক্রমণজনিত বিষক্রিয়ায় এই রোগ সংঘটিত হয়েছে। পারদের বিষক্রিয়ায় সৃষ্ট রোগ 'মিনামাটা রোগ' (বা মিনামাটা ব্যাধি) (Minamata disease) নামে পরিচিত। 1955 সালে মিনামাটা সমুদ্রের উপকূলবর্তী

রাসায়নিক পদার্থ। বিশুদ্ধ মিথাইল আইসোসায়ানেট (মিক্) নিজের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়ায় প্রচুর তাপ উৎপন্ন করতে পারে। তাই মিথাইল আইসোসায়ানেট বিস্ফোরকও বটে। বিস্ফোরক ধর্মের জন্য মিক্ পদার্থ কে স্টেনলেস স্টীলের ট্যাঙ্কে 0° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় (রেফ্রিজারেটেড কক্ষে) সঞ্চিত রাখা হয়। **'কার্বারিল'** (Carbaryl) বা **'সেভিন'** (Sevin) কীটনাশকের উৎস পদার্থ হচ্ছে এই **'মিক্'**।

c) ইউনিয়ন কার্বাইডের মিক্ কারখানায় দুর্ঘটনা কেন ঘটেছিল?

ভূপাল দুর্ঘটনার সঠিক কারণ আধিকারিকভাবে জানা না গেলেও প্রেস রিপোর্ট অনুসারে অসতর্কতাই এই ঘটনার প্রধান কারণ ছিল। প্রেস রিপোর্টের বর্ণনা অনুযায়ী প্লান্টের মধ্যে 610, 611 এবং 619 কোড নাম্বারের দ্বি-স্তর বিশিষ্ট স্টেনলেস স্টীলের ট্যাঙ্কে মিক্ সঞ্চিত ছিল। ট্যাঙ্কগুলি রেফ্রিজারেটেড কক্ষে 0°C তাপমাত্রায় রাখা ছিল। দুর্ঘটনার রাত্রে কিছু সময় রেফ্রিজারেটার বিকল হয়ে যাওয়ার ফলে 610 নং ট্যাঙ্কে মিক্ তরলের চাপ হঠাৎ বেড়ে যায়। 610 নং ট্যাঙ্কে মিক্ তরলের চাপ বৃদ্ধির ঘটনা কারখানার এক কর্মী প্রথম প্রত্যক্ষ করেন। কিন্তু কিছু নিরাপদ ব্যবস্থা নেওয়ার পূর্বে ট্যাঙ্ক থেকে মিক্ বেরুতে শুরু করে। UCC-এর রিপোর্ট অনুসারে দুর্ঘটনার সময় 610 নং ট্যাঙ্কে 40 টন মিক্ ছিল, কিন্তু দুর্ঘটনা শুরু হওয়ার দু-ঘন্টার মধ্যে 20 টন মিক্ গ্যাসীয় এবং তরল আকারে বাইরে বেরিয়ে আসে। মিক্ গ্যাসের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ **ফসজিন, হাইড্রোজেন সায়ানাইড** এবং **কার্বনডাই অক্সাইড** গ্যাস বাতাসে সংক্রমিত হয়। শীতকালের রাতে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে **মিক গ্যাস, ফসজিন, হাইড্রোজেন সায়ানাইড** এবং **কার্বনডাই অক্সাইড** ঘণীভূত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলে নেমে আসে এবং মারণক্রিয়া শুরু করে।

d) মিক্ বিক্রিয়ার ভয়াবহতার পিছনে কি কারণ ছিল?

মিক্ গ্যাস যে কোন রাসায়নিক পদার্থ এমন কি নিজের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিক্রিয়া করে প্রচুর পরিমাণ তাপ এবং কার্বনডাই অক্সাইড উৎপন্ন করতে পারে। ট্যাঙ্কে মিক্ পদার্থের দীর্ঘদিন সঞ্চয়ে পার্শ্বক্রিয়া এবং বিস্ফোরণের সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে যায়। ইউনিয়ন কার্বাইডের মিক্ কারখানায় বিজ্ঞানীদের এই সচেতনতা থাকা সত্ত্বেও ভূ-পাল প্লান্টে 1983 সালের অক্টোবর মাস থেকে তিনটি ট্যাঙ্কে মিক্ সঞ্চিত ছিল। বিক্রিয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা না গেলেও ভারত সরকারের তরফে তদন্তে নিযুক্ত ডঃ এস. ভরদ্বাজের মতে কোন কারণে খুব অল্প পরিমাণ জল (দুই বা তিন লিটার) মিক্ ট্যাঙ্কের ফসজিন গ্যাসের সংস্পর্শে চলে আসে (মিক্ গ্যাসকে সুস্থির রাখার জন্য ফসজিন ব্যবহার করা হয়), ফলে জল এবং ফসজিনের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, তাপ এবং কার্বনডাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন তাপ এবং হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড **'মিক্ পলিমেরাইজেশানে'** (MIC Polymerization) সাহায্য করায় মিক্ বিক্রিয়া অতি-দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।

e) ভূপাল দুর্ঘটনায় কতজন মানুষ আক্রান্ত হয়?

মিক্ প্লান্টের পার্শ্ববর্তী এলাকার কতজন নিরীহ মানুষ মিক্ দুর্ঘটনার কবলে মারা গেছে তার সঠিক হিসাব এখনও জানা সম্ভব হয় নি। তবুও রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্য অনুসারে 1985 সালের জানুয়ারী মাসের শেষ পর্যন্ত 2500 মানুষ মারা যায় এবং দু লক্ষ মানুষ পঙ্গু হয়। কিন্তু UNICEF আধিকারিকের গোপন রিপোর্টের তথ্য অনুসারে দুর্ঘটনা ঘটার এক সপ্তাহের মধ্যে দশ হাজারেরও বেশী মানুষ মারা যায়।

•• ভূপাল দুর্ঘটনার ফলে যে সব প্রশ্ন আমাদের ভাবিয়ে তুলেছে ঃ

i) ভূপালে মিক্ প্লান্টের সন্নিহিত অঞ্চলে এত জনবসতি কেন ছিল? মিক্ গ্যাসের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনগণকে কেন সচেতন করা হয়নি?

ii) ক্ষতিকারক কারখানা স্থাপনের জন্য কিরূপে নীতি নির্ধারিত হয়?

iii) বহুজাতিক কোম্পানী গুলি কি নিজেদের দেশের তুলনায় তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রে স্থাপিত কারখানায় (বা প্লান্টে) অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশগত নিরাপদ ব্যবস্থা চালু রাখে?

iv) পৃথিবীর উন্নত রাষ্ট্রগুলিতে অধিকাংশ ক্ষতিকারক—'কীটনাশক' এবং 'ড্রাগের' উৎপাদন এবং ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও জ্ঞাতসারে ঐ সব কীটনাশক এবং ড্রাগ ভারতে আমদানী বা উৎপন্ন করা হয় কেন? উল্লেখ করা যেতে পারে যে—কীটনাশক উৎপন্ন করার জন্য প্রচুর পরিমাণ PCB (Polychlorinated biphenyl) এখনও ভারতে আমদানী করা হয়।

v) ফ্রান্সে মিক্ উৎপাদন নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও ইউনিয়ন কার্বাইড কে ভারতে মিক্ উৎপাদন এবং ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হল কেন? যদিও ইউনিয়ন কার্বাইড ব্যতিরেকে কয়েকটি কোম্পানী মিক্ পদার্থ ব্যবহার না করেও কার্বারিল কীটনাশক উৎপাদন করতে সক্ষম।

vi) ইউনিয়ন কার্বাইডের মত বহু বিদেশী কোম্পানী নিষিদ্ধ কীটনাশক এবং ড্রাগ তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে কেন অবাধে রপ্তানী করে চলেছে? যদিও ঐ সকল কীটনাশক এবং ড্রাগ উৎপাদনের কারখানা তৃতীয় বিশ্বে রয়েছে।

1.8.3. মিনামাটা বিপর্যয় (Minamata Catastrophe) ঃ

a) মিনামাটা বিপর্যয় কি?

1955 সালে জাপানের মিনামাটা সমুদ্রের উপকূলবর্তী গ্রামের অসংখ্য মানুষ হঠাৎ একশ্রেণীর অপরিচিত রোগের প্রকোপে মারা যায়। রোগের কারণ উদ্ভবজনিত সমীক্ষায় সর্বপ্রথম জানা যায় মিনামাটা সমুদ্রে পারদের (মারকারির) সংক্রমণজনিত বিষক্রিয়ায় এই রোগ সংঘটিত হয়েছে। পারদের বিষক্রিয়ায় সৃষ্ট রোগ 'মিনামাটা রোগ' (বা মিনামাটা ব্যাধি) (Minamata disease) নামে পরিচিত। 1955 সালে মিনামাটা সমুদ্রের উপকূলবর্তী

পরিবেশ' (natural environment)। প্রাকৃতিক পরিবেশের উদাহরণ হিসেবে পৃথিবীর ভূখণ্ডে স্থলভাগের, জলের, মরুভূমির, এবং হিমালয়ের প্রাকৃতিক পরিবেশ উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রতিটির প্রাকৃতিক পরিবেশ অন্যের থেকে পৃথক, কারণ প্রতিটি পরিবেশের মৃত্তিকার গঠন, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা এবং জীবগোষ্ঠীর প্রভাব স্বতন্ত্র। প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান সমূহকে দুভাগে ভাগ করা হয়—**'সজীব উপাদান বা বায়োটিক কম্পোনেন্ট'** (living or biotic component) এবং **অজীব** (বা জড়) **উপাদান বা অ্যাবায়োটিক কম্পোনেন্ট'** (non-living or abiotic component)।

2.2.1 পরিবেশের সংজ্ঞা (Definition of Environment) ঃ

একটি জীবের পরিবেষ্টক এবং প্রভাব বিস্তারকারী সজীব এবং জড় উপাদানের মোট সমষ্টি বা যোগফলকে ঐ জীবের পরিবেশ বলা হয়[1]।

2.2.2 জীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা (Interdependency of Organism) ঃ

কোন একটি জীব পরিবেশে একক ভাবে বাঁচতে পারে না। ঐ জীবকে পরিবেশের অঙ্গ হিসেবে অপর জীবের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হয়। অর্থাৎ পরিবেশের আনুকূল্য এবং সেইসঙ্গে অন্যান্য জীবের সাহায্য ব্যতীত কোন জীব বাঁচতে পারে না। এই ঘটনাকে **জীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা** বলা হয়।

উদ্ভিদ এবং প্রাণীর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা উল্লেখ করা যেতে পারে। উদ্ভিদ এবং প্রাণী, একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। কোন উদ্ভিদগোষ্ঠী পরিবেশের আনুকূল্য এবং অন্যান্য উদ্ভিদ এবং প্রাণীছাড়া বাঁচতে পারে না। ঠিক একইভাবে কোন প্রাণিগোষ্ঠীও অন্যান্য প্রাণী, উদ্ভিদ এবং পরিবেশের আনুকূল্য ব্যতিরেকে বাঁচতে পারে না। প্রাণী প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। উদ্ভিদ প্রাণীকে খাদ্য জোগায়, আশ্রয় দেয় এবং অক্সিজেন জোগায়। উদ্ভিদও প্রাণিগোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল কারণ সবুজ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের জন্য প্রয়োজনীয় কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রাণিগোষ্ঠীই যোগান দেয়। তদুপরি পরাগরেণুর মিলন, বীজ বা ফলের বিস্তারে প্রাণী উদ্ভিদকে সাহায্য করে।

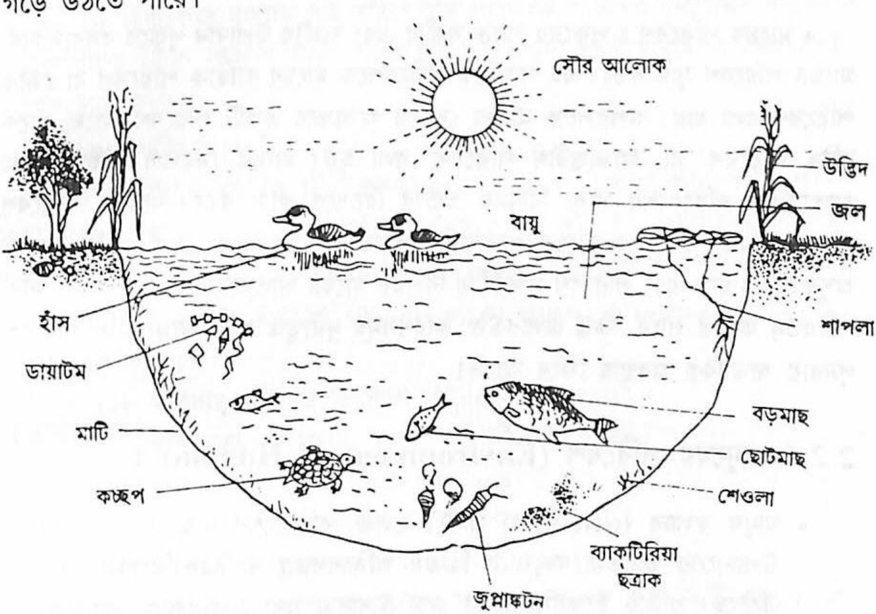
2.2.3 পরিবেশের উদাহরণ (Example of Environment) ঃ

একটি পুকুরের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান এবং পুকুরের কোন একটি প্রাণীর উপর

---

1. Environment is the sum total of living and nonliving components ; influences and events surrounding an organism.

সজীব এবং জড় উপাদানের প্রভাব পর্যালোচনা করলেই পরিবেশ সম্বন্ধে একটি ধারণা গড়ে উঠতে পারে।



চিত্র 2.1 : একটি পুষ্করিণী বাস্তুতন্ত্রের অজীব এবং সজীব উপাদান দেখানো হয়েছে।

একটি পুকুরের পরিবেশ প্রধানত দুধরনের উপাদান দ্বারা গঠিত—সজীব এবং জড়।

সজীব উপাদান ঃ (a) উদ্ভিদ ঃ—ফাইটোপ্লাঙ্কটন, জলে আংশিক নিমজ্জিত উদ্ভিদ, পাড়ের উদ্ভিদ।

(b) প্রাণী ঃ—জুপ্লাঙ্কটন, পতঙ্গ, কৃমি, মলাস্কাপর্বভুক্ত প্রাণী, ব্যাঙাচি, ব্যাঙ, হাঁস, অন্যান্য পাখি, এবং বিভিন্ন প্রজাতির ছোট-বড় মাছ।

(c) ব্যাক্‌টিরিয়া

(d) ছত্রাক

জড় উপাদান ঃ আলো, তাপমাত্রা, জল, জলে দ্রবীভূত পুষ্টি পদার্থ, জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন, কার্বনডাই-অক্সাইড এবং অন্যান্য গ্যাস, জৈব পদার্থ ইত্যাদি।

সব পুকুরের পরিবেশ চরিত্র কিন্তু সমান নয়। কারণ জড় বা অজীব উপাদানের তারতম্য পুকুরের ভিন্ন চরিত্রের জন্য দায়ী। যেমন সূর্যালোক ; তাপমাত্রা ; উচ্চতার মাত্রা

এবং পরিমাণ ; জলের গভীরতা ; এবং জলে নিমজ্জিত পাথরের প্রকৃতি পুকুরের পরিবেশ চরিত্র নির্ণয় করে।

• **মাছের পরিবেশ ঃ** পুকুরের সমস্ত সজীব এবং অজীব উপাদান পুকুরে বসবাসকারী মাছের পরিবেশ সৃষ্টি করে। এই সামগ্রিক পরিবেশকে মাছের **বাহ্যিক পরিবেশ** বা **ভৌত পরিবেশ** বলা যায়। অপরপক্ষে মাছের দেহের অভ্যন্তরে একটি পরিবেশ আছে, যাকে '**জীব পরিবেশ**' বা '**আভ্যন্তরীণ পরিবেশ**' বলা হয়। মাছের দেহতল বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ পরিবেশের মধ্যে বিনিময় প্রাচীর হিসেবে কাজ করে। বাহ্যিক পরিবেশ সামান্য পরিবর্তিত হলেও মাছের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ আপাতভাবে অপরিবর্তিত থাকে। অসুস্থতা, আঘাত এবং পরিবেশ সম্পর্কীয় বিপর্যয় মাছের আভ্যন্তরীণ পরিবেশকে সামান্য পরিবর্তন করতে পারে, কিন্তু উপরিউক্ত কারণসমূহ দূরীভূত হলে আভ্যন্তরীণ পরিবেশ পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে।

2.2.4 মানুষের পরিবেশ (Environment of Human) ঃ

- মানুষ স্থলচর (terrestrial) প্রাণী। স্থলজ পরিবেশের জড় এবং সজীব উপাদানের তারতম্য অনুসারে বিভিন্ন **পরিবেশতন্ত্র** বা **ইকোসিস্টেম** গড়ে উঠেছে। প্রতিটি ইকোসিস্টেমের জড় উপাদান যথা ঃ আলোক, বায়ুচাপ, বায়ব গ্যাসের ঘনত্ব, ভূচৌম্বকত্ব, মাধ্যাকর্ষণ, মৃত্তিকা, জল এবং সজীব উপাদান যথা ঃ উদ্ভিদ ও প্রাণী মানুষের পারিপার্শ্বিক বা বাহ্যিক পরিবেশ তৈরি করেছে। এই বাহ্যিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ '**শক্তি এবং বস্তুর প্রবাহ**' দ্বারা সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ মানুষ এবং পরিবেশ ওতোপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত।

- **মানুষের আভ্যন্তরীণ পরিবেশ ঃ** মানুষের শারীর পরিবেশকে **আভ্যন্তরীণ পরিবেশ** বলে। অজীব মৌল উপাদান—কার্বন, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সালফার, ফসফরাস এবং অন্যান্য মৌলিক উপাদানের দ্বারা দেহ গঠিত। বিভিন্ন গঠনমূলক একক যথা—কোষ, কলা, তন্ত্র এবং অঙ্গের সমন্বয়ে দেহ গঠিত। **বিভিন্ন তন্ত্রের সমন্বয়পূর্ণ প্রাণপ্রক্রিয়াই মানুষের শরীর বা আভ্যন্তরীণ পরিবেশ**। বিভিন্ন তন্ত্র যথা ঃ নার্ভতন্ত্র, দৃষ্টিতন্ত্র, পাচনতন্ত্র, পেশী তন্ত্র এবং হরমোন তন্ত্র প্রভৃতির সমন্বয়পূর্ণ ক্রিয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট আভ্যন্তরীণ পরিবেশ যেমন নির্দিষ্ট তাপমাত্রা, অম্লক্ষার ঘনত্ব, রক্তের অক্সিজেন এবং কার্বনডাই অক্সাইড ঘনত্ব নিয়ন্ত্রিত থাকে। অসুস্থতা বা অস্বাভাবিকতা ব্যতিরেকে বাহ্যিক পরিবেশের পরিবর্তনে মানুষের আভ্যন্তরীণ পরিবেশের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

2.3 প্রাকৃতিক পরিবেশ (Natural Environment) ঃ

প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে সৃষ্ট পরিবেশকে প্রাকৃতিক পরিবেশ বলা হয়। মিথস্ক্রিয়া বা পারস্পরিক ক্রিয়া সংঘটন কারী কতকগুলি উপাদানের মোট সমষ্টি বা যোগফলই পরিবেশ সৃষ্টি করে।

(1) প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান ঃ

প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রধানত দুটি উপাদান নিয়ে গঠিত ঃ (i) সমগ্র জীবগোষ্ঠী (সকল প্রকার প্রাণময় বস্তু) এবং (ii) জীবগোষ্ঠীর পরিপার্শ্বস্থ জড় পরিবেশ। সমগ্র জীবগোষ্ঠীকে পরিবেশের **'সজীব উপাদান'** (Biotic or living component) এবং অবশিষ্ট সকল প্রকার জড় উপাদান কে **'অজীব উপাদান'** (Nonliving or abiotic component) বলা হয়।

(i) জড় উপাদান ঃ

(a) **জলবায়ু সংক্রান্ত উপাদান** (Climatic factors) ঃ
তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ, জলস্রোত, বৃষ্টিপাত প্রভৃতি।

(b) **ভৌত উপাদান** (Physical factors) ঃ
বায়ুচাপ, ভূচৌম্বকশক্তি, সৌর-বিকিরণ ইত্যাদি।

(c) **রাসায়নিক উপাদান** (Chemical factors) ঃ
অক্সিজেন, কার্বনডাইঅক্সাইড, অম্লত্ব, ক্ষারকত্ব, জল, মাটি এবং মৌল উপাদান—আয়রণ, ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, সালফার ইত্যাদি।

(ii) সজীব উপাদান ঃ

সকলপ্রকার জীব সজীব উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নলিখিত জীবগোষ্ঠী সজীব উপাদানের অন্তর্ভুক্ত ঃ

(a) মাইক্রোবস্ (b) উদ্ভিদ
(c) মনুষ্যেতর প্রাণী এবং (d) মানুষ

(2) প্রাকৃতিক পরিবেশের শ্রেণীবিভাগ ঃ পৃথিবীর অশ্মমণ্ডল (lithosphere), বারিমণ্ডল (hydrosphere) এবং বায়ুমণ্ডলের (atmosphere) সর্বত্র জীবের অস্তিত্ব দেখা যায় না। ভূপৃষ্ঠের খুব নীচে এবং খুব উপরে জীব বাস করে না। ভূপৃষ্ঠের ত্বকীয় অঞ্চলেই সমস্ত জীবের বসবাস। জীবের বসবাসের উপযোগী পৃথিবীর ভূত্বক অঞ্চলকে **'জীবমণ্ডল'** (bio-sphere) বলা হয়। অর্থাৎ পৃথিবীর 'অশ্মমণ্ডল', 'বারিমণ্ডল' এবং 'বায়ুমণ্ডলের' যে অংশে জীব প্রতিপালিত হয় সেই অঞ্চলটি **'জীবমণ্ডল'** নামে পরিচিত। চারটি প্রধান পরিবেশ-শ্রেণী জীবমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত।

(a) সামুদ্রিক পরিবেশ (Marine environment)
(b) মোহানার পরিবেশ (Estuarine environment)

(c) স্বচ্ছ বা মিষ্টি জলের পরিবেশ (Fresh water environment)

এবং (d) স্থলজ পরিবেশ (Terrestrial environment)



চিত্র 2.2 : বায়ু, বারি এবং অশ্মমণ্ডলের প্রতিচ্ছেদ অংশে প্রাথমিকভাবে জীবের আবির্ভাব দেখানো হয়েছে (বায়োস্ফিয়্যার)।

(3) **'ইকোসিস্টেম'— বায়োস্ফিয়্যারের প্রাকৃতিক একক ঃ** জীবমণ্ডলের উপরিউক্ত প্রতিটি পরিবেশ শ্রেণী পুনরায় কয়েকটি উপ-পরিবেশ শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রতিটি উপপরিবেশ শ্রেণীর স্বতন্ত্র ভৌত এবং জীব-পরিবেশগত বৈশিষ্ট্য থাকায় প্রতিটির ইকোসিস্টেমও স্বতন্ত্র (বা পৃথক)। তাই ইকোসিস্টেম হচ্ছে জীবমণ্ডলের প্রাকৃতিক একক। ইকোসিস্টেমের সজীব এবং জড় উপাদানের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ফলে জীবমণ্ডলের প্রাণপ্রবাহ বজায় থাকে।

2.4. মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশ (Man-made Environment) ঃ

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের হাতে প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তিত হয়। মানুষ নিজের সুবিধার জন্য পরিকল্পনামাফিক প্রাকৃতিক পরিবেশের রূপান্তর ঘটাতে থাকে, ফলে সৃষ্টি হয় কৃত্রিম পরিবেশ। এইভাবে মানুষের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সৃষ্ট কৃত্রিম পরিবেশকে **'মনুষ্য সৃষ্ট পরিবেশ'** বলা হয়। প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং মানুষের তৈরী পরিবেশের সমষ্টি বা যোগফলই হচ্ছে সামগ্রিক পরিবেশ। **নগর, শস্যক্ষেত্র** এবং শিল্পাঞ্চল প্রভৃতি মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

2.4.1. নগর এবং পরিবেশ (City and Environment) ঃ

কৃষি এবং শিল্প বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নগরায়ন বিস্তৃত হয় এবং নতুন শহর ও নগর গড়ে উঠে। নগরায়নের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তে গড়ে উঠে কৃত্রিম পরিবেশ।

A) নগর পরিবেশের বৈশিষ্ট্য ঃ

(a) মানুষের সুযোগ-সুবিধার জন্য নগরায়নের অঙ্গ হিসেবে গড়ে উঠে পাকাবাড়ী, গগনচুম্বী অট্টালিকা (Sky scrapers) ; তৈরী হয় সড়ক পথ, রেলপথ, জল সরবরাহের পাইপ লাইন, দূরসংযোগের কেবল পথ, পয়ঃপ্রণালী এবং অন্যান্য আন্তঃপরিকাঠামো। অর্থাৎ প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন অংশ যথা—অরণ্য, জলাশয় এবং উর্বর কৃষিক্ষেত্র প্রভৃতি মানুষের সুবিধার জন্য নগর-পরিকাঠামোয় রূপান্তরিত হয়।

(b) যেহেতু শহর বা নগরের পরিবেশ মানুষের তৈরি, তাই মানুষের পানীয় জল সরাসরি জলের উৎস থেকে সরবরাহ করা হয় না। উৎস থেকে সংগ্রহ করা জল পরিশ্রুত এবং জীবাণুমুক্ত করার পর মানুষের ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয়।

(c) মানুষের বাসস্থান মৃত্তিকার পরিবর্তে ইঁট এবং সিমেন্টের তৈরি পাকাবাড়ি।

(d) বর্জ্য পদার্থ এবং শহরের আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ বা স্তূপীকৃত করার জন্য নগর থেকে দূরবর্তী কোন স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।

(e) নগর এবং শহরের বায়ুমণ্ডল গ্রামাঞ্চলের বায়ুমণ্ডলের তুলনায় অনেক বেশি দূষিত। বিভিন্ন কারখানা, তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চিমনি, এবং যানবাহন নিঃসৃত ধোঁয়া, ক্ষতিকারক গ্যাস এবং অন্যান্য দূষক পদার্থই বায়ুদূষণের অন্যতম প্রধান কারণ।

(f) খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয় গ্রামে। তাই নগর এবং শহরের মানুষের প্রয়োজনীয় খাদ্য শস্য গ্রাম থেকেই আসে।

(g) শহরাঞ্চলে গগনচুম্বী বহুতলের উপস্থিতির ফলে বায়ুপ্রবাহ, রৌদ্রপাত, বৃষ্টি প্রভৃতি প্রাকৃতিক শর্তগুলির স্বাভাবিক প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়।

• **কেন গ্রামের মানুষ আজ নগর এবং শহরমুখী?**

বেঁচে থাকার জন্য মানুষের যেসব ন্যূনতম শর্ত প্রয়োজন তা হল ঃ আশ্রয়, পানীয় জল, খাদ্য, স্বাস্থ্যব্যবস্থা (Sanitation), শক্তিসম্পদ, পরিবহন, যোগাযোগ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য। এগুলির মধ্যে বাসস্থান, খাদ্য, পানীয় জল এবং স্বাস্থ্যব্যবস্থাই হচ্ছে প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। গ্রামের মানুষ এখনও এইসব ন্যূনতম সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ভারতে 1981 সালের গণনা অনুসারে গ্রামাঞ্চলের 40 শতাংশেরও বেশী মানুষ দারিদ্র সীমার নীচে বাস করে। এছাড়া ভারতে মাথাপিছু

জমির পরিমাণ (মানুষ এবং জমির অনুপাত) (Man land ratio) পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে কম। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গ্রামের মানুষ উপার্জনের আশায়, জীবনধারণের মান বৃদ্ধি করার তাগিদে গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসছে। কারণ শহরে স্বাস্থ্য, পানীয় জল, শিক্ষা, পরিবহন, যোগাযোগ ব্যবস্থার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু নগরের পরিবেশ আজ জনসংখ্যার চাপে বিপন্ন। অধিকাংশ মানুষ আশ্রয়ের অভাবে ফুটপাথবাসী।

B) **উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত রাষ্ট্রে মানুষের উপর নগর পরিবেশের প্রভাব ঃ**

a) মানুষের তৈরি নগর পরিবেশের নিট ফল হচ্ছে মানুষের অধিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শক্তির অত্যধিক অপচয়। উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের তুলনায় উন্নত রাষ্ট্রের নগর পরিবেশের খুব দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। উল্লেখ্য উন্নত রাষ্ট্রের একজন মধ্যবিত্ত মানুষ উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত রাষ্ট্রের একজন ধনী মানুষের থেকে অনেক অনেক বেশি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে।

b) উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের নগর সভ্যতার সুযোগ-সুবিধা থেকে শহরের অধিকাংশ মানুষ বঞ্চিত। সুযোগ-সুবিধাগুলি কতিপয় ধনী মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। কিন্তু শহর বা নগরের প্রত্যেক মানুষ শব্দদূষণ, পরিবেশ দূষণ এবং দৈহিক পীড়নের ভাগীদার। যদি কোন কারণে নগর পরিবেশের উপাদান—জল, স্থল এবং বায়ুর ভৌত, রাসায়নিক বা জৈবিক ধর্মের অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটে, তাহলে মানুষের উপর এই পরিবর্তনের ক্ষতিকারক প্রভাব অবশ্যই পড়বে। শহরের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকেও শহরের গরীব মানুষ পরিবেশের ক্ষতিকারক প্রভাবের শিকার হবে।

2) **কৃষিক্ষেত্র এবং পরিবেশ ঃ** ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান রাষ্ট্র, তাই বিপুল জনসংখ্যার খাদ্য শস্যের চাহিদা মেটানোর জন্য কৃষির উপর গুরুত্ব স্বাভাবিকভাবে বেড়েই চলেছে। এছাড়া কৃষিযোগ্য জমির মোট পরিমাণও নির্দিষ্ট। এই অবস্থায় কৃষির উৎপাদন বাড়ানোই খাদ্যসমস্যা সমাধানের অন্যতম উপায়। এই কারণে শস্যক্ষেত্রে রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক অবাধে ব্যবহৃত হচ্ছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকা ও জলের দূষণ ঘটছে ; মৃত্তিকার লবনাক্ততা বেড়ে যাচ্ছে ; ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস পাচ্ছে এবং পতিত জমির আয়তন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। জমি পতিত থাকার ফলে বৃষ্টির জলে মৃত্তিকা ক্ষয়ে যাচ্ছে, ফলে নদীর দূষণ বাড়ছে এবং নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে। যেহেতু কৃষিক্ষেত্রের পরিবেশ মানুষের তৈরি, তাই কৃষিক্ষেত্রের উপর মানুষের নির্মম অত্যাচার পরোক্ষে সমগ্র মানব সভ্যতার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। উল্লেখ্য সিন্ধু, মধ্যপ্রাচ্য, অ্যাবিসিনিয়া, মধ্য আমেরিকা প্রভৃতির কৃষিভিত্তিক সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মূল কারণ কিন্তু কৃষি জমির উর্বরতা হ্রাস এবং কৃষিজমির মরুভূমিতে রূপান্তর।

• কৃষিজমির স্বাভাবিক উৎপাদনশীলতা কিভাবে রক্ষা করা যেতে পারে?

কৃষি উৎপাদন স্বাভাবিক রাখার জন্য কয়েকটি শর্ত মেনে চলা আবশ্যক ঃ (1) জৈবসার এবং রাসায়নিক সারের সুষম ব্যবহারে কৃষি জমির উর্বরতা বাড়াতে হবে। (2) উচ্চ ফলনশীল এবং রোগ প্রতিরোধক প্রজাতির শস্যের চাষ বাড়াতে হবে। (3) মিশ্র শস্য-উৎপাদন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। (4) সেচের কাজে জলের অপচয় হ্রাস করতে হবে। (5) বিভিন্ন প্রজাতির শস্যের জার্মপ্লাজম উপযুক্ত ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে এবং (6) মৃত্তিকার ক্ষয়ে যাওয়া এবং পুষ্টি পদার্থের অপচয় হ্রাসে বছরের বেশীরভাগ সময় জমির উদ্ভিদ আচ্ছাদন বজায় রাখতে হবে।

2.5 সামাজিক পরিবেশ (Social Environment) ঃ

2.5.1. সামাজিক পরিবেশ বলতে কি বোঝায়?

সমাজ হচ্ছে মানুষের বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানের একটি জটিল গঠন। সমাজের বিভিন্ন বিভাগ বা গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানের যে সুষম আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের জীবন প্রণালীর অবস্থা সম্পর্কে ধারণা জন্মায় তাকে "**সামাজিক পরিবেশ**" বলা হয়। সাংস্কৃতিক রীতিনীতি এবং মূল্যবোধ সামাজিক পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিও সামাজিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ অংশ, কারণ এগুলির মাধ্যমে পরিবেশের সম্পদ ব্যবহার সম্পর্কে মানুষের সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়।

2.5.2. সামাজিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Social Environment) ঃ

সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় থাকলে সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত পরিবেশকে 'সামাজিক পরিবেশ' বলা হয়।

a) **পরিবার এবং সমাজ** (Family and Society) ঃ

পরিবার ঃ সামাজিক সংগঠনের একটি মূল প্রতিষ্ঠান হচ্ছে '**পরিবার**'। মানুষের বংশবিস্তার, শিশুদের সামাজিকতা সংক্রান্ত রীতি বা শিক্ষা, পুরুষানুক্রমিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিস্তার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ পরিবারের দ্বারা সম্পন্ন হয়। পরিবারকৃত কাজগুলি আবার বিভিন্ন সমাজের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। একটি সমাজের প্রকৃতি, রীতি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস বা প্রচলিত ধারণা এবং নৈতিকতার উপর ঐ সমাজ অন্তর্ভুক্ত কোন পরিবারের কাজ নির্ভর করে।

সমাজ ঃ কয়েকটি পরিবার নিয়ে পরিবার-গোষ্ঠী গঠিত হয়। এরূপ কতকগুলি পরিবার গোষ্ঠী যখন কোন স্থানে কোন সময়ে মিলেমিশে বাস করে তখন তাদের একত্রকে '**সম্প্রদায়**' (Community) বলা হয়। পেশা, ধর্মবিশ্বাস, দেশ ইত্যাদি শর্ত

অনুসারেও সম্প্রদায়কে আবার বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। একটি ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে কতকগুলি সম্প্রদায় একত্রে বসবাস করলে তাদের সমষ্টিকে 'সমাজ' (Society) বলা হয়। অতএব **একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী, সহযোগিতার ভিত্তিতে সংগঠিত, একই সংস্কৃতি সম্পন্ন এবং পরস্পরের মধ্যে আন্তঃক্রিয়াকারী মানুষের একটি গোষ্ঠী হচ্ছে 'সমাজ'।**

b) **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (Educational Institution) ঃ**

সমাজ পরিকাঠামোয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একটি তাৎপর্যপূর্ণ অংশ। পরিবারের শিশুরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাহায্যে সামাজিক দায়িত্ব সচেতন নাগরিক হিসেবে প্রতিপালিত হওয়ার সুযোগ পায়। অর্থাৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সাহায্যে আদর্শ ভারসাম্যযুক্ত পরিবারের বিকাশ সম্ভব হয়।

(c) **অর্থনৈতিক কাঠামো (Economic Structure) ঃ**

উৎপন্ন দ্রব্যাদির বন্টনসংক্রান্ত একটি অর্থনৈতিক পরিকাঠামো সমাজে থাকে। তার ফলে দ্রব্যের উৎপাদন এবং বন্টনের সঙ্গে সমাজে বসবাসকারী মানুষের আন্তঃক্রিয়া সহজতর হয়।

(d) **সামাজিক যোগাযোগ (Social Communication) ঃ**

মানুষের ভাষার মাধ্যমে প্রথমে সামাজিক যোগসূত্র স্থাপিত হয়। কোন একটি সমাজে মানুষের ভাষা ঐ সমাজের সংস্কৃতির উপর নির্ভর করে। সভ্যতার উষালগ্নে কেবল ভাষাই ছিল সমাজের যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যম। কিন্তু সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণ প্রযুক্তি সামাজিক যোগাযোগ স্থাপনকে সুদৃঢ় করে। বর্তমানে বিভিন্ন উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন মাধ্যম, মুদ্রণ এবং ইলেকট্রনিক পদ্ধতি দ্রুত যোগাযোগ স্থাপনের সামাজিক হাতিয়ার। অর্থাৎ সমাজ পরিকাঠামোয় যোগাযোগ ব্যবস্থা সামাজিক বার্তা প্রেরণে এবং সামাজিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

(e) **অধিকার এবং ক্ষমতা** (Authority and Power) ঃ

মানুষের আইনসম্মত অধিকার এবং ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক ব্যবস্থা জরুরী। বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান মানুষের সামাজিক অধিকার এবং ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তাই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমাজ পরিবেশের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

(f) **আচারানুষ্ঠান সংক্রান্ত ব্যবস্থা (Ritual System) ঃ**

সমাজ কাঠামোয় আচারানুষ্ঠান সংক্রান্ত ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। সামাজিক যোগসূত্র নিয়ন্ত্রণে বা সামাজিক বন্ধন বৃদ্ধি করতে আচারানুষ্ঠান ব্যবস্থা সাহায্য করে। বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যুর প্রতি সামাজিক স্বীকৃতি প্রদর্শনেও এই ব্যবস্থা অংশগ্রহন করে।

(g) **সংস্কৃতি (Culture) ঃ**

সংস্কৃতি হল মানব-সৃষ্ট পরিবেশের একটি অংশ, যার দ্বারা সামাজিক পরিবেশ এবং

সামাজিক ক্রিয়া নির্ধারিত হয়। ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী টেলরের (Edward Taylor) মতে মানুষ সমাজের সদস্য হিসেবে যে জ্ঞান, ধারণা, নৈতিকতা, শিল্প, আইন, রীতি এবং অন্যান্য অভ্যাস রপ্ত করে তাদের জটিল সমষ্টিই হচ্ছে সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিই একজন মানুষকে তার বংশানুক্রমিক গৃহীত চারিত্রিক গুণাবলীর নির্বাচনে সাহায্য করে। তাই সংস্কৃতি প্রভাবিত সামাজিক পরিবেশ কে **সাংস্কৃতিক পরিবেশ** (Cultural environment) বলা হয়। সামাজিক আইনকানুন, অর্থনীতি, রাজনীতি এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সাংস্কৃতিক পরিবেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সাংস্কৃতিক পরিবেশ অর্থনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিভাবে একটি সমাজ প্রাকৃতিক সম্পদকে আহরণ করবে বা ব্যয় করবে তা অর্থনীতির দ্বারাই নির্ধারিত হয়। অপরপক্ষে বিচারব্যবস্থা নাগরিকদের অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সংরক্ষণ আইন (conservation law) অনুসারে কি পরিমাণ কৃষিজমি শিল্পায়ন বা নগরায়নের কাজে ব্যবহার করা যায় ; কোন্ জীব প্রজাতি লুপ্তপ্রায় এবং সংরক্ষণ জরুরী, কিভাবে নাগরিকদের মধ্যে জমির সমবন্টন ঘটানো যায় এবং পরিবেশের সংরক্ষণ ও উন্নতি বিধানে মানুষের কর্তব্য ইত্যাদি সম্বন্ধে মানুষের দায়িত্ব এবং কর্তব্য বিচার ব্যবস্থা দ্বারা সুদৃঢ় হয়।

2.6. সারাংশ ঃ

- একটি জীবের পরিবেষ্টক এবং প্রভাববিস্তারকারী সজীব এবং জড় উপাদানের মোট সমষ্টি বা যোগফলকে ঐ জীবের **পরিবেশ** বলা হয়।
- প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রধানত দু-ধরনের উপদান দ্বারা গঠিত (a) **সজীব উপাদান** (সমস্ত প্রকার সজীব বস্তু অর্থাৎ জীবগোষ্ঠী) এবং (b) **অজীব উপাদান** (যথা-পরিবেশের ভৌত, রাসায়নিক এবং জলবায়ু সংক্রান্ত উপাদান)।
- পরিবেশের অজীব উপাদানের সঙ্গে সজীব উপাদানের মিথষ্ক্রিয়া এবং সজীব উপাদানসমূহের পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়ায় পরিবেশের প্রাণপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ এবং বজায় থাকে।
- মানুষের হস্তক্ষেপে রূপান্তরিত প্রাকৃতিক পরিবেশকে মনুষ্য সৃষ্ট পরিবেশ বলা হয়। শহর বা নগর, শস্যক্ষেত্র, শিল্পাঞ্চল প্রভৃতি মনুষ্য-সৃষ্ট পরিবেশের উদাহরণ।
- সমাজ হচ্ছে মানুষের বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানের একটি জটিল সংগঠন। সামাজিক পরিবেশ বলতে সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং প্রতিষ্ঠানের সুষম আন্তঃক্রিয়ার দ্বারা মানুষের জীবনপ্রণালীকে বোঝায়।

• অনুশীলনী •

A. রচনাভিত্তিক বা দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. পরিবেশ কাকে বলে? পরিবেশের উপাদান বর্ণনা কর।
2. জীবের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বলতে কি বোঝ?
3. মানুষের পরিবেশ বলতে কি বোঝায়?
4. প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদান এবং শ্রেণীবিভাগ আলোচনা কর।
5. সামাজিক পরিবেশ বলতে কি বোঝায়? সামাজিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।
6. উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত রাষ্ট্রে মানুষের উপর নগর পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা কর।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. পরিবেশ কি? উদাহরণ দাও।
2. পরিবেশের সজীব এবং অজীব উপাদান বলতে কি বোঝ?
3. প্রাকৃতিক পরিবেশ কাকে বলে? প্রাকৃতিক পরিবেশের সজীব এবং অজীব উপাদানগুলি কি কি?
4. সামাজিক পরিবেশ বলতে কি বোঝ?
5. জীবমণ্ডল কি? জীবমণ্ডলের চারটি পরিবেশ-উপাদান উল্লেখ কর।

3 বাস্তুসংস্থান

3.1. ভূমিকা (Introduction) ঃ

পরিবেশ ব্যতিরেকে কোন জীব বাঁচতে পারে না। প্রতিটি জীবের (উদ্ভিদ বা প্রাণীর) সঙ্গে পরিবেশের অন্যান্য জীব (উদ্ভিদ, প্রাণী, মাইক্রোবস্ ইত্যাদি) এবং জড় উপাদানের অবিরাম মিথস্ক্রিয়া (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ) ঘটে। জীবগোষ্ঠীর পারস্পরিক এবং পরিপার্শ্বের সঙ্গে জীবগোষ্ঠীর সম্পর্ক অধ্যয়নই হচ্ছে **'বাস্তুসংস্থান বা ইকোলজি'** (ecology)। বিজ্ঞানী কাজন্স (Cousins) এর মতে বাস্তুসংস্থান এমন একটি বিজ্ঞান যার থেকে আমরা অনেক কিছু আশা করতে পারি (New Scientist, 4 July, 1985)। বাস্তুসংস্থানের অধীত জ্ঞানের সাহায্যে কৃষি, বনপালনবিদ্যা এবং মৎসচাষ সম্পর্কে বোধশক্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া জীবগোষ্ঠীর উপর পরিবেশ দূষণ থেকে শুরু করে বাঁধ নির্মাণের ক্ষতিকারক প্রভাবও বাস্তুসংস্থানের আধীত জ্ঞানের সাহায্যে ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়।

3.2. 'ইকোলজি' শব্দের অর্থ কি (What do you mean by the term ecology) ঃ

1869 খ্রীষ্টাব্দে জার্মান জীববিজ্ঞানী হেকেল (Ernest Haeckel) ইকোলজি শব্দ বা পদ প্রথম ব্যবহার করেন। গ্রীক শব্দ **'ওইকোস'** (oikos) এবং **'লোগোস'**

(logos) থেকে ইকোলজি উদ্ভূত হয়েছে। ওইকোস কথার অর্থ 'ঘর' (house) বা বসতিস্থান (living place) এবং 'লোগোস' এর অর্থ বিজ্ঞান (science) বা অধ্যয়ন (Study)। আক্ষরিক অর্থে ইকোলজি হচ্ছে পৃথিবী বাসগৃহের তত্ত্বাবধায়ক বিজ্ঞান। কিন্তু ইকোলজি শব্দটি বৃহৎ অর্থে (holistic view) ব্যবহৃত হয়। প্রকৃত অর্থে **বাস্তুসংস্থান হচ্ছে পৃথিবী বাসগৃহের প্রতিপালিত জীবগোষ্ঠীর সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক বা সম্বন্ধ সমন্বিত বিজ্ঞান।**

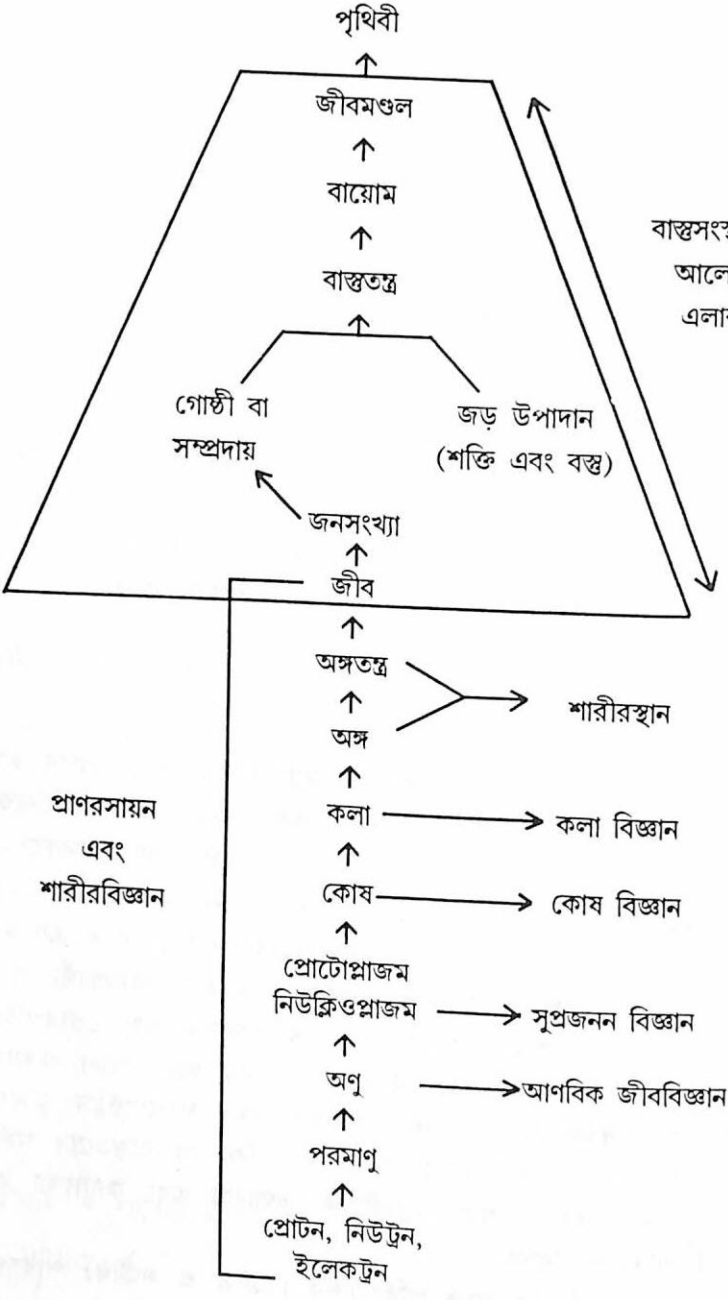
3.3. বাস্তুসংস্থানের সঙ্গে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক ঃ

'প্রাকৃতিক ইতিহাসে' বাস্তুসংস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। 1900 খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভকাল থেকেই বাস্তুসংস্থান, শারীরবিজ্ঞান, সুপ্রজনন বিজ্ঞান প্রভৃতি জীববিজ্ঞানের শাখাবিজ্ঞান হিসেবে স্বীকৃত। 1950 খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকেই বাস্তুসংস্থানের গুরুত্ব এবং সুযোগ ভীষণভাবে বিস্তৃত হয়। আধুনিক বাস্তুসংস্থান একটি **আন্তরশাখা বিজ্ঞান** (interdisciplinary science), কারণ বিজ্ঞানের এই শাখার সঙ্গে বিভিন্ন শাখাবিজ্ঞান, যথা—ভৌতবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, এবং সমাজ-বিজ্ঞানের নিবিড় সংযোগ রয়েছে।

3.4. বাস্তুসংস্থান কাকে বলে?

জীবকে সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ে অধ্যয়ন করা যায়। কোষ হচ্ছে জীবের গঠনের মূল একক। কোষ থেকে কলা, কলা থেকে অঙ্গ, অঙ্গ থেকে তন্ত্র এবং তন্ত্রের সহযোগে জীবদেহ গঠিত। একই প্রজাতির জীবগোষ্ঠীর বসবাসের ফলে সৃষ্টি হয় জনসংখ্যা (মানুষের ক্ষেত্রে) বা মোট সংখ্যা (মনুষ্যেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে)। আবার বিভিন্ন প্রজাতির জীব যখন পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে একত্রে বাস ক'রে একটি শ্রেণী সৃষ্টি ক'রে তখন তাকে বলা হয় **জীবগোষ্ঠী বা 'সম্প্রদায়'** (community)। কোন জীবগোষ্ঠী বা জীব সম্প্রদায় এবং ভৌতপরিবেশ একত্রে বাস্তুসংস্থানের একক (ecological unit) হিসেবে কাজ করে। বাস্তুসংস্থানের এই একককে **'বাস্তুতন্ত্র'** (ecosystem) বলা হয়। সমগ্র জীবগোষ্ঠীকে বাস্তুতন্ত্রের সজীব উপাদান এবং ভৌতপরিবেশের 'বস্তু' এবং 'শক্তি' কে বাস্তুতন্ত্রের অজীব বা জড় উপাদান বলা হয়। **বাস্তুতন্ত্র, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় এবং জনসংখ্যা বাস্তুসংস্থানের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।**

সংজ্ঞা ঃ জীবের সঙ্গে পরিবেশের (ভৌত ও সজীব) পারস্পরিক-ক্রিয়া সম্পর্কীয় প্রাকৃতিক বিজ্ঞানকে 'বাস্তুসংস্থান' বলা হয়।



চিত্র 3.1 : জীবের সংগঠন একক, বাস্তুসংস্থানের এলাকা, এবং জীববিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে বাস্তুসংস্থানের ক্রমসংযোগ দেখানো হয়েছে।

সংজ্ঞা (Definitions) ঃ

1) **জনসংখ্যা বা মোটসংখ্যা** (Population) ঃ একটি প্রজাতির জীবগোষ্ঠী যখন কোন একটি সময়ে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে এবং অন্যান্য সদৃশ্য জীবগোষ্ঠী থেকে কিছুটা পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখে, তখন সেই জীবগোষ্ঠীকে জনসংখ্যা বা পপ্যুলেশান বলা হয়।

2) **গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়** (Community) ঃ বিভিন্ন প্রজাতির জীবের কোন গোষ্ঠী যখন একই অঞ্চলে একত্রে বাস করে এবং ট্রফিক সম্পর্কের দ্বারা মিথষ্ক্রিয়া করে, তখন তাকে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বলে।

3) **বাস্তুতন্ত্র** (Ecosystem) ঃ একটি জীবসম্প্রদায় এবং তাদের ভৌতপরিবেশের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ায় উৎপন্ন বাস্তুবিদ্যার একককে **'বাস্তুতন্ত্র'** বলা হয়।

3.5. বাস্তুমণ্ডল বা জীবমণ্ডল (Ecosphere or Biosphere) ঃ

পৃথিবীর সর্বত্র জীব বাস করে না। পৃথিবীপৃষ্ঠ এবং বায়ুমণ্ডলের একটি সীমিত অঞ্চলে জীব প্রতিপালিত হয়। পৃথিবী মণ্ডলে জীব প্রতিপালনের উপযোগী অঞ্চলসমূহকে একত্রে **'বাস্তুমণ্ডল'** বা **'জীবমণ্ডল'** বলা হয়। জীবগোষ্ঠী এবং ভৌতপরিবেশের মিথষ্ক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্র, আবার বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্র একত্রিত হয়ে তৈরী করে বাস্তুমণ্ডল বা জীবমণ্ডল। জীবমণ্ডলের তিনটি অংশ ঃ

3.5. 1) বারি-জীবমণ্ডল (Hydrobiosphere) ঃ

সমুদ্রের উপরের অংশ (উপরিতল থেকে 11,000 মিটার গভীরতা পর্যন্ত অর্থাৎ যতদূর পর্যন্ত সূর্যের আলোক পৌঁছাতে পারে), জলাশয়, নদী এবং হ্রদের বাস্তুতন্ত্রের দ্বারা বারি-জীবমণ্ডল (Hydrobiosphere) গঠিত হয়।

3.5. 2) অশ্ম-জীবমণ্ডল (Lithobiosphere) ঃ

পৃথিবী পৃষ্ঠে মৃত্তিকা স্তরের সর্বত্র বাস্তুতন্ত্রের অস্তিত্ব দেখা যায় না। ভূত্বক থেকে কয়েক মিটার গভীরতা পর্যন্ত যে সমস্ত বাস্তুতন্ত্র দেখা যায় তাদের মিলনেই অশ্ম-জীবমণ্ডল গঠিত হয়। হিমালয়ের 9000 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সবুজ উদ্ভিদ দেখা যায়। কিন্তু তার বেশী উচ্চতায় এবং বরফ খণ্ডে জীবের অস্তিত্ব দেখা যায় না।

3.5. 3) বায়ু-জীবমণ্ডল (Atmosbiosphere) ঃ

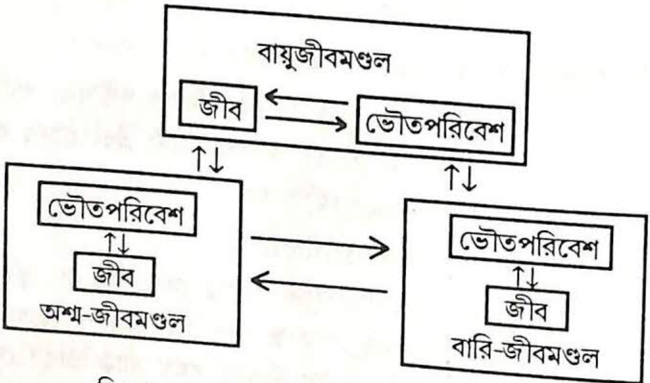
ভূপৃষ্ঠ থেকে 25 কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলে অর্থাৎ ট্রপোস্ফিয়্যার এবং নিম্ন স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যার অঞ্চলে জীব বাস করে। এই অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্রের দ্বারা 'বায়ুজীবমণ্ডল' গঠিত হয়।

- আধিক্য অঞ্চল (Zone of abundance) ঃ জীব মণ্ডলের আধিক্য অঞ্চল হচ্ছে

একটি সংকীর্ণ স্তর। সমুদ্রের 200 মিটার গভীরতা থেকে ভূ-পৃষ্ঠের 6000 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত আধিক্য অঞ্চল বিস্তৃত।

3.5. 4) জীবমণ্ডলের আন্তঃসংযোগ ঃ

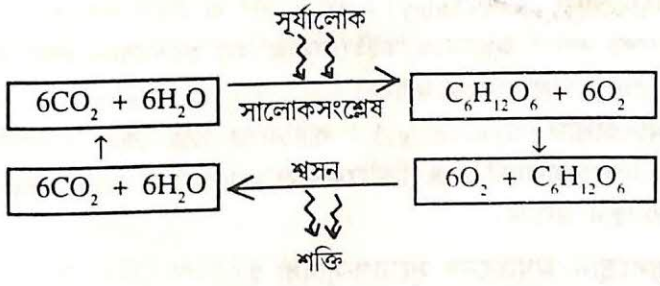
a) জীবমণ্ডলের সজীব-উপাদান জীবগোষ্ঠীর সঙ্গে ভৌত পরিবেশের (বারিমণ্ডল, অশ্ম-মণ্ডল এবং বায়ুমণ্ডলের বস্তু এবং শক্তি) অবিরাম মিথষ্ক্রিয়া ঘটে। এক্ষেত্রে জীব কেবল বারিমণ্ডল বা অশ্মমণ্ডল বা বায়ুমণ্ডলের ভৌতপরিবেশের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া করে বাঁচতে পারে না। জীবের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সমগ্র জীবমণ্ডলের ভৌতপরিবেশের সঙ্গে জীবের আন্তঃক্রিয়া জরুরী এবং প্রতিটি জীবমণ্ডল পরস্পরের পরিপূরক; যেমন উদ্ভিদ মৃত্তিকা থেকে পুষ্টি পদার্থ—সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন, ক্যালসিয়াম ; বারিমণ্ডল থেকে জল ; এবং বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন-ডাইঅক্সাইড, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি বৃদ্ধি এবং বংশবিস্তারের জন্য সংগ্রহ করে। অনুরূপভাবে মানুষ বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ; বারিমণ্ডলের জল এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অশ্ম-মণ্ডলের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ জীবের বাঁচার জন্য বারি, বায়ু এবং অশ্ম-জীবমণ্ডলের আন্তক্রিয়া বা আন্তঃসংযোগ জরুরী। এককথায় বলা যায় যে, জীবজগৎ ভূস্তর বা মৃত্তিকা (লিথোস্ফিয়্যার), বায়ু (আটমসফিয়্যার) এবং জল (হাইড্রোস্ফিয়্যার) এর প্রতিচ্ছেদ অংশে (intersected area) বসবাস করে।



চিত্র 3.2 ঃ জীবমণ্ডলের আন্তঃসংযোগ দেখানো হয়েছে।

b) সালোকসংশ্লেষ (উদ্ভিদ) এবং শ্বসন (উদ্ভিদ এবং প্রাণী) পদ্ধতি জীবমণ্ডলের আন্তঃসংযোগের দুটি প্রধান উপায়। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে সূর্যালোকের উপস্থিতিতে কার্বনডাইঅক্সাইড এবং জল সহযোগে গ্লুকোজ এবং অক্সিজেন উৎপন্ন করে। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন অক্সিজেন উদ্ভিদ এবং প্রাণীর শ্বসন প্রক্রিয়ায় শক্তি উৎপাদনে কাজে লাগে। প্রাণীর শ্বসন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বনডাইঅক্সাইড উদ্ভিদের

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় পুনরায় ব্যবহৃত হয়। এরূপে সালোকসংশ্লেষ এবং শ্বসন প্রক্রিয়া জীবমণ্ডলের আন্তঃসংযোগে সাহায্য করে।



চিত্র 3.3 ঃ সালোকসংশ্লেষ-শ্বসন চক্র দেখানো হয়েছে।

3.5.5. বায়োম (Biome) ঃ

অশ্ম-জীবমণ্ডল (জীবমণ্ডলের স্থলজ অংশ) জলবায়ুর ভিত্তিতে বিভিন্ন বায়োমে বিভক্ত। বায়োম অঞ্চলের জলবায়ুর প্রকৃতিই ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী উদ্ভিদ এবং প্রাণিগোষ্ঠীর প্রজাতি বিন্যাস নির্ধারণ করে।

একটি নির্দিষ্ট বায়োমের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জীবের অভিযোজনও নির্ধারিত হয় জলবায়ুর শর্তসমূহের দ্বারা। এই প্রসঙ্গে জলবায়ুর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দুটি শর্ত হল বৃষ্টিপাত এবং তাপমাত্রা। পৃথিবীতে বারোটি বিভিন্ন বায়োমের উপস্থিতি দেখা যায় (বক্স)।

1. ক্রান্তীয় বৃষ্টি অরণ্য (Tropical rain forest)
2. ক্রান্তীয় পর্ণমোচী অরণ্য (Tropical deciduous forest)
3. ক্রান্তীয় কণ্টক অরণ্য (Tropical thorn forest)
4. সাভানা (Savana)
5. মরুভূমি (Desert)
6. চাপার‍্যালি (Chaparally)
7. নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের তৃণভূমি (Temperate grass land)
8. নাতিশীতোষ্ণমণ্ডলের অরণ্য (Temperate forest)
9. জলাভূমিময় পাইন অরণ্য বা টাইগা (Taiga)
10. তুন্দ্রা অঞ্চল (Tundra)
11. হিমালয় (Mountain)
12. মেরুঅঞ্চলের বরফে ঢাকা অঞ্চল (Polar ice cap)

3.6. বাস্তুসংস্থান বা ইকোলজির প্রকারভেদ ঃ

বাস্তুসংস্থানগত অধ্যয়ন দুপ্রকারের—

a) **অট্‌ইকোলজি** (Autecology) ঃ একটি জীব বা একটি প্রজাতির জনসংখ্যার সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক অধ্যয়নকে **'অট্‌ইকোলজি'** বলা হয়। যেমন একটি রুইমাছের বা রুইমাছ প্রজাতির বাস্তুসংস্থান অধ্যয়ন।

b) **সিন্‌ইকোলজি** (Synecology) ঃ পরিবেশের সঙ্গে কোন জীবসম্প্রদায় বা জীবগোষ্ঠীর সম্পর্ক অধ্যয়নই হচ্ছে **'সিন্‌ইকোলজি'**। যেমন মিষ্টি জলের সমস্ত প্রজাতির মাছের বাস্তুসংস্থান অধ্যয়ন।

3.7. বাস্তুসংস্থান অধ্যয়নের সুযোগ-সুবিধা ঃ

a) মানবসমাজের সঙ্গে পরিবেশের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক থাকায় বাস্তুসংস্থান বা ইকোলজি সম্বন্ধে জনসাধারণের সচেতনতা দিন দিন বাড়ছে। আমেরিকা, ব্রিটেন সহ উন্নত দেশ এমনকি ভারতেও নতুন কোন শিল্প স্থাপন বা প্রকল্প চালু করার পূর্বে পরিবেশের উপর ঐ শিল্পের বা প্রকল্পের প্রভাব কতটা পড়বে, তা খতিয়ে দেখা হয়। অর্থাৎ শিল্প স্থাপন বা প্রকল্প শুরু করার জন্য সরকারের পরিবেশ সম্পর্কীয় ছাড়পত্রের প্রয়োজন হয়। উন্নত দেশগুলিতে পরিবেশ বিজ্ঞানীদের (Ecologists) নিয়ে একটি স্থায়ী কমিটি থাকে যারা সরকারকে পরিবেশগত সমস্যায় উপদেশ দেয়। ব্রিটেনে এই রকম একটি স্থায়ী কমিটি হচ্ছে **'রয়্যাল কমিশন অন্ এনভিরনমেন্টাল পল্যুশান'** (RCEP)। ভারত সরকারের পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অধীনেও অনুরূপ একটি কমিটি আছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারেরও পরিবেশ বিজ্ঞানী, পরিবেশ-আইনজীবীদের নিয়ে গঠিত **'দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষৎ'** (Pollution Control Board) রয়েছে। (I) জনমানসে পরিবেশ-সচেতনতা গড়ে তোলা এবং প্রসার ঘটানো; (II) কোন চালু শিল্প কাঠামো পরিবেশ দূষিত করছে কিনা তদারকি করা এবং সরকারকে এই ব্যাপারে উপদেশ দেওয়া; (III) কোন নতুন প্রকল্প বা শিল্প স্থাপিত হলে পরিবেশের উপর কিরূপ প্রভাব পড়বে সে সম্বন্ধে সরকারকে অবহিত করা এবং (IV) শিল্প স্থাপনের আগে দূষণ ছাড়পত্র অনুমোদন করা 'দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষৎ' এর কাজ। **এই কমিটিগুলিতে ইকোলজিস্ট বা পরিবেশ বিজ্ঞানীদের চাকরির সুযোগ রয়েছে।**

b) ইটালির সিভেসো, পূর্বতন সোভিয়েত রাশিয়ার 'চের্ণোবিল' এবং ভারতের ভুপাল শিল্প দুর্ঘটনার পর শিল্পের ব্যাপারে বাস্তুসংস্থানের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সাধারণ এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বহুগুণ বেড়েছে। বিগত দুদশকে উন্নত দেশগুলিতে অসংখ্য পরিবেশ-উপদেষ্টা সংস্থার বিকাশ ঘটেছে। শিল্প স্থাপনে এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণে শিল্প সংস্থা ও অন্যান্য আগ্রহী পার্টিকে উপদেশ দেওয়াই এই সংস্থাগুলির অন্যতম কাজ এই পরিবেশ উপদেষ্টা কমিটিগুলি ইকোলজিস্টদের নিয়ে গঠিত। কিন্তু ভারতে ইকোলজিষ্টদের চাকরির সুযোগ-সুবিধা আজও তেমনভাবে বিস্তৃত হয়নি। **খবরের**

কাগজে বা টিভিতে কোন চাকরির বিজ্ঞাপনে বাস্তুসংস্থানের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন কি চোখে পড়ে? যদিও প্রতিটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একটি বিশেষ উপযোগী বিজ্ঞান হচ্ছে **'বাস্তুবিজ্ঞান'** (ই. পি. ওডাম, 1971)।

3.8. বাস্তুসংস্থান অধ্যয়নের উপায় বা প্রবেশ পথ (Approaches to Ecology) ঃ

বাস্তুসংস্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সামগ্রিক উপায় (holistic approach)। বাস্তুসংস্থান পাঁচটি উপায়ে অধ্যয়ন করা হয়। বাস্তুসংস্থানের গবেষণায় ইকোলজিস্ট এই পাঁচটি পথের যে কোন একটিকে বেছে নেন। পাঁচটি বাস্তুসংস্থানগত প্রবেশপথ হচ্ছে—

1. বাস্তুতন্ত্র বাস্তুসংস্থান
2. সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী বাস্তুসংস্থান
3. জনসংখ্যা বা পপ্যুলেশান বাস্তুসংস্থান
4. জীবের স্বাভাবিক আবাস বাস্তুসংস্থান এবং
5. বিবর্তনমূলক ও ঐতিহাসিক বাস্তুসংস্থান।

3.8. 1) বাস্তুতন্ত্র বাস্তুসংস্থান (Ecosystem Ecology) ঃ

বিজ্ঞানী ট্যানস্লে (Tansley) সর্বপ্রথম জীবজগৎ এবং তাদের স্বাভাবিক আবাসকে 'বাস্তুতন্ত্র' নামে অভিহিত করেন (1935)। দুভাবে বাস্তুতন্ত্রের বিজ্ঞান আলোচনা করা হয় ঃ

(a) **জীবমণ্ডল বা ইকোস্ফিয়ারে সজীব এবং জড় উপাদানের মধ্যে 'শক্তির প্রবাহ'** (Flow of energy) এবং **'বস্তু/পদার্থের আবর্তন বা চক্রের দ্বারা'** (Cycling of matter) ঃ তন্ত্রীয় বাস্তুসংস্থানগত আলোচনায় জীবগোষ্ঠীর পারস্পরিক এবং জীবগোষ্ঠী ও পরিবেশের মধ্যে কার্যগত সম্পর্কের বিষয়ে আলোচনা করা হয় (যেমন খাদ্য-খাদক সম্পর্ক)। বাস্তুতন্ত্রের আলোচনায় কখনোই জীবগোষ্ঠীর প্রজাতি-উপাদান (composition) এবং প্রজাতির চিহ্নিতকরণ বা বিশেষ প্রকরণ (varieties) সম্পর্কে আলোচনা করা হয় না।

(b) **শক্তির প্রবাহ এবং বস্তুর চক্র আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তুতন্ত্রে সজীব উপাদান বা জীবগোষ্ঠীর স্বনিয়ন্ত্রণ বা হোমিওস্ট্যাসিস (Self regulation বা Homeostasis)** আলোচনার মাধ্যমে ঃ প্রত্যাবর্তী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সজীবতন্ত্রের স্বনিয়ন্ত্রণ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিঘ্নিত হলে (উদাহরণ ঃ দূষণের মাধ্যমে) যে জৈবিক গরমিল দেখা দিতে পারে সেই সম্বন্ধে বাস্তুতন্ত্রের আলোচনা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

3.8. (2) জীবগোষ্ঠী বা সম্প্রদায় বাস্তুসংস্থান (Community Ecology) ঃ

জীবগোষ্ঠীগত বাস্তুসংস্থান আলোচনায় বাস্তুতন্ত্রের সজীব উপাদানের উপর মূলত আলোচনা করা হয়। এরূপ আলোচনায় যে কোন একটি স্বীকৃত সজীব-একক যথা ঃ একটি তৃণক্ষেত্র বা অরণ্যের উদ্ভিদগোষ্ঠী, প্রাণিগোষ্ঠী এবং আণুবীক্ষণিক জীবগোষ্ঠীর

উপর পর্যালোচনা করা হয়। ভৌতপরিবেশ সম্পর্কে আলোচনা না করা হলেও বিভিন্ন নিয়ন্ত্রক শর্তকে চিহ্নিত করা হয় এই আলোচনায়।

3.8. 3) জনসংখ্যা বাস্তুসংস্থান (Population Ecology) ঃ

জনসংখ্যা বাস্তুসংস্থানে কোন প্রজাতির সংখ্যাবৃদ্ধি, সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সংখ্যা হ্রাসের গাণিতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা যায়। তার ফলে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন জন্মহার (Natality), যোগ্যতমের উদ্বর্তন বা বেঁচে থাকা (Survivorship) এবং মৃত্যুহার (Mortality) এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়। কৃষি এবং চিকিৎসায় পেস্ট (Pests) এর প্রাদুর্ভাব, পেস্ট এর জৈব-নিয়ন্ত্রণের সম্ভাব্যতা এবং যে কোন প্রজাতির নিরবচ্ছিন্ন উদ্বর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় সঙ্কটপূর্ণ জীবের সংখ্যা প্রভৃতি বিষয় বোধগম্যের জন্য তাত্ত্বিক যুক্তি 'সংখ্যা বাস্তুসংস্থান' থেকেই পাওয়া যায়।

3.8. 4) স্বাভাবিক আবাস বাস্তুসংস্থান (Habitat Ecology) ঃ

বাস্তুসংস্থানগত অধ্যয়নের এই স্তরে কোন নির্দিষ্ট জীবের, জনসংখ্যার, জীব গোষ্ঠীর বা বাস্তুতন্ত্রের স্বাভাবিক পরিবেশ সম্বন্ধে ধারণা পাওয়া যায়। পৃথিবীর স্বাভাবিক আবাস প্রধানত চার প্রকার—সমুদ্রের, মোহনার, মিষ্টিজলের এবং স্থলের। প্রতিটি আবাসের আবার বিশেষ ভৌত শর্ত বা নিয়ন্ত্রক শর্ত যেমন তাপমাত্রা, লবণাক্ততা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। কোন আবাসে জীবনের উপস্থিতি ও উদ্বর্তন (বেঁচে থাকা) এবং বিস্তার নির্ভর করে ঐ আবাসে পরিবেশের নিয়ন্ত্রক শর্ত বা ভৌতশর্তের প্রকৃতি এবং মাত্রার উপর। ভৌতশর্তের সঙ্গে অভিযোজন করে আবাসে যে কোন জীবকে টিকে থাকতে হয়।

• বাস্তুসংস্থানগত নিচ্ (Ecological Niche) ঃ

কোন জীবের আবাস বা হ্যাবিটেট বলতে শুধুমাত্র ভৌত শর্তকে বোঝায় না, পরিবেশের পরিবর্তন বা অন্যান্য জীবদ্বারা প্রাথমিক পরিবেশের স্থিরিকৃতিও স্বাভাবিক আবাসের মধ্যে পড়ে। আবাসের সঙ্গে কোন জীবের কার্যকরী সম্পর্ক কে 'বাস্তুসংস্থানগত নিচ্' বলা হয়। জীবের কার্যকরী সম্পর্ক বলতে ঐ জীবের খাদ্যরীতি (feeding activities) এবং আবাসে বসবাসকারী অন্যান্য জীবের সঙ্গে আন্তঃক্রিয়া বা মিথষ্ক্রিয়াকে (interaction) বোঝায়। সুতরাং কোন জীবের নিচ্ বলতে কোন নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা বাস্তুতন্ত্রে ঐ জীবের অবস্থান (location) এবং কাজ (Function) [অর্থাৎ ঠিকানা এবং পেশা (address and profession]কে বোঝায়।

•• একই রকমের আবাসে এক ধরনের বাস্তুসংস্থানগত নিচ্ দেখতে পাওয়া যায় (পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বহিরাকৃতিতে সাদৃশ্যযুক্ত কিন্তু শ্রেণীগতভাবে অসম উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রজাতি দেখা যায়)। যদি কোন কারণে দুটি ভিন্ন প্রজাতি একই নিচ্-এ বসবাস করে তাহলে প্রজাতিদ্বয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলে যতক্ষণ না পর্যন্ত ঐ নিচ্ থেকে কোন একটি প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে। এক্ষেত্রে যোগ্যতম প্রজাতিরই উদ্বর্তন ঘটে।

3.8. 5) বিবর্তনমূলক এবং ঐতিহাসিক বাস্তুসংস্থান (Evolutionary and Historical Ecology) ঃ

a) বিবর্তনমূলক বাস্তুসংস্থানে জীবনের উৎপত্তিকাল থেকেই জীব এবং ভৌতপরিবেশের পরিবর্তন সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। পরিবেশের উপর মানুষের প্রভাব বিস্তৃত হওয়ার পূর্বে জীবমণ্ডলের প্রকৃতি সম্পর্কে বিবর্তনমূলক বাস্তুসংস্থানের মাধ্যমে ধারণালাভ করা সম্ভবপর হয়।

b) ঐতিহাসিক বাস্তুসংস্থানে মানবপ্রজাতির উন্নত প্রযুক্তি কৌশল এবং সংস্কৃতির মাধ্যমে বাস্তুসংস্থানগত তন্ত্রের উপর মানুষের প্রভাব বিস্তারের ঊষা লগ্ন থেকেই বাস্তুসংস্থানের পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আনুমানিক 5000 B.P. (Before Present) তে নতুনপ্রস্তর যুগে (new stone age or neolithic times) প্রযুক্তি এবং সংস্কৃতির অগ্রগতির ফলে ব্রিটেন এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশে অরণ্যধ্বংসের সূত্রপাত ঘটে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য পরাগরেণুর বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এই আলোচনার প্রধান প্রমাণ। এছাড়া প্রাচীন দলিল, মানচিত্র এবং উদ্ভিদের বলয় (tree ring) তথ্যাদি ঐতিহাসিক বাস্তুসংস্থানের অতিরিক্ত প্রামাণ্য হিসেবে কাজ করে।

3.9. বাস্তুতন্ত্র (Ecosystem) ঃ

3.9. 1) বাস্তুতন্ত্র কাকে বলে? (What is Ecosystem?) ঃ

বাস্তুতন্ত্র **'ইকোসিস্টেম'** শব্দের বাংলা পরিভাষা। 'ইকোসিস্টেম' শব্দটি 'ইকোলজিক্যাল সিস্টেমের (ecological system) সংক্ষিপ্ত আকার। সেই অর্থে 'বাস্তুতন্ত্র' শব্দটি 'বাস্তুসংস্থানগত তন্ত্রের' সংক্ষিপ্ত রূপ। **একটি নির্দিষ্ট স্থানে বসবাসকারী জীবগোষ্ঠী, তাদের পরিবেশ এবং জীবগোষ্ঠী ও পরিবেশের মধ্যে আন্তঃক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন 'জালিকাকার গঠন'কেই বাস্তুতন্ত্র বলা হয়।** বিজ্ঞানী ট্যানস্‌লে 1935 খ্রীষ্টাব্দে 'ইকোসিস্টেম' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। ট্যানস্‌লের বর্ণনা অনুযায়ী একটি জীবগোষ্ঠী এবং তাদের ভৌতপরিবেশ যখন আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে একটি বাস্তুসংস্থানগত একক হিসেবে কাজকরে, তখন তাকে বাস্তুতন্ত্র বা ইকোসিস্টেম বলা হয়। খুব সরলভাবে বলা যায় যে 'জীব জগৎ এবং তাদের স্বাভাবিক আবাসই হচ্ছে 'ইকোসিস্টেম। পরবর্তী সময়ে 'লিন্ডেম্যান এবং ওডাম ট্যানস্‌লে বর্ণিত উপরিউক্ত সংজ্ঞাকে উন্নত এবং বিস্তৃত করেছেন। লিণ্ডেম্যান এবং ওডাম বর্ণিত সংজ্ঞা নীচে উল্লেখ করা হল।

- **লিণ্ডেম্যান (Lindeman 1942)** ঃ বাস্তুতন্ত্র হচ্ছে পরস্পরের অধীন (interdependent) এবং গতিশীল (dynamic) জৈবিক, ভৌত এবং রাসায়নিক তন্ত্র।
- **ওডাম (Odum, 1963)** ঃ প্রকৃতির দুটি মূল কার্যকরী একক-জীবগোষ্ঠী এবং

তাদের জড় পরিবেশ যখন পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া করে এবং একে অন্যের ধর্মকে প্রভাবিত করে, তখন তাকে বাস্তুতন্ত্র বলে। পারস্পরিক আন্তঃক্রিয়া এবং প্রভাব উভয়ই বাস্তুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ এবং বিকাশের পক্ষে অত্যন্ত জরুরী।

3.9. 2) বাস্তুতন্ত্রের সর্বাঙ্গীণ গঠন (Overall Structure of Ecosystems) :

বাস্তুতন্ত্র দুটি প্রধান উপাদান দ্বারা গঠিত—সজীব (living) এবং জড় (non living)। সজীব উপাদান 'বায়োটিক' এবং জড় উপাদান 'অ্যাবায়োটিক' উপাদান হিসেবে পরিচিত।

• **বাস্তুতন্ত্রের বায়োটিক উপাদান :** বাস্তুতন্ত্রের সমস্ত সজীব বস্তু যথা ছত্রাক, সবুজ উদ্ভিদ, প্রাণী এবং আণুবীক্ষণিক জীব বায়োটিক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত। বায়োটিক উপাদান সমূহকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয়।

a) **স্বভোজী জীব** (Autotrophic Organisms) : শৈবাল, সবুজ উদ্ভিদ এবং কয়েকশ্রেণীর ব্যাক্‌টিরিয়া সরল অজৈব অণু থেকে নিজেদের জৈব খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে।

b) **পরভোজী জীব** (Heterotrophic Organism) **:** সমস্ত প্রাণিগোষ্ঠী, ছত্রাক এবং কিছু ব্যাক্‌টিরিয়া নিজেরা খাদ্য তৈরি করতে পারে না। তাই এই সমস্ত জীব বাঁচার জন্য স্বভোজী জীবের উৎপাদিত খাদ্যের মাধ্যমে শক্তি আহরণ করে। অর্থাৎ পরভোজী জীবের অস্তিত্ব স্বভোজী জীবের উপর নির্ভরশীল। সকল পরভোজী জীব আবার প্রত্যক্ষভাবে স্বভোজী উদ্ভিদের উপর নর্ভরশীল নয়। কিছু পরভোজীজীব পরোক্ষভাবে স্বভোজী উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। তাই পরভোজী জীবদের মধ্যে 'খাদক-খাদ্য' (Predator prey) আন্তঃক্রিয়া ঘটে। উদা: রবিন পাখি যখন খাদ্যের জন্য কেঁচোকে হত্যা করে, তখন পাখি 'খাদক' এবং কেঁচো 'খাদ্য' সম্পর্কজনিত।

• **বাস্তুতন্ত্রের অ্যাবায়োটিক উপাদান :**

বাস্তুতন্ত্রের ভৌত এবং রাসায়নিক উপাদানসমূহকে অজীব বা জড় বা আবায়োটিক উপাদান বলা হয়।

(a) **রাসায়নিক উপাদান :** মৃত্তিকা (soil), জল (water), মৃত্তিকা এবং জলে দ্রবীভূত জৈব এবং অজৈব পুষ্টিপদার্থ।

(b) **ভৌত উপাদান :** জলবায়ুর বিভিন্ন পরিবেশীয় শর্ত যেমন তাপমাত্রা (temperature), বৃষ্টিপাত (rainfall) এবং সূর্যালোক (sunlight) ইত্যাদি। তাছাড়া জলজ বাস্তুতন্ত্রে লবণাক্ততা (salinity) একটি বিশেষ ভৌত উপাদান।

উদাহরণ : জলজ এবং স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের প্রধান গঠন এবং তুলনা উল্লেখ করা হল।

• **জলজ বাস্তুতন্ত্র** (সমুদ্রের বা মিষ্টিজলের) : অ্যাবায়োটিক উপাদান—অজৈব এবং জৈব যৌগ ; উৎপাদক—ফাইটোপ্লাঙ্কটন ; প্রাণী-জুপ্লাঙ্কটন ; পরোক্ষ গ্রাহক (ডেট্রিটাস)—

জলের নীচে বাসকারী অমেরুদণ্ডী প্রাণী ; উচ্চ মাংসাশী প্রাণী—বড় মাছ ; ডিকম্পোজারস'—ব্যাক্টিরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি। এক্ষেত্রে 'প্রাণী' এবং 'ডিকম্পোজারস' উভয়েই গ্রাহক।

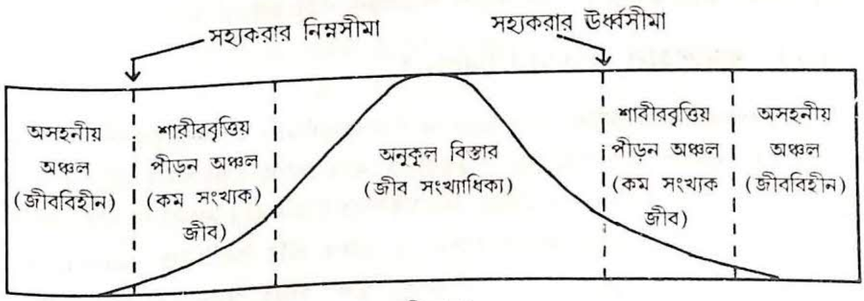
• **স্থলজ বাস্তুতন্ত্র** ঃ অ্যাবায়োটিক উপাদান—জৈব এবং অজৈবযৌগ ; উৎপাদক—স্থলের গাছপালা ; প্রাণী—প্রত্যক্ষ তৃণভোজী যথা : পতঙ্গ, ইঁদুর, ছাগল, হরিণ ইত্যাদি; পরোক্ষ গ্রাহক—স্থলের অমেরুদণ্ডী প্রাণী (ডেট্রিটাস ফিডিং) ; উচ্চ মাংসাশী প্রাণী—বাজপাখী, মানুষ ; ডিকম্পোজার—ছত্রাক এবং ব্যাক্টিরিয়া।

3.9. 3) বাস্তুতন্ত্রের সহ্য করার বিস্তার (Range of Tolerance in Ecosystem) ঃ

পৃথিবীর প্রতিটি জীব পরিবেশের সঙ্গে সূক্ষ্মভাবে অভিযোজিত এবং ভৌত ও রাসায়নিক শর্তের একটি বিস্তারের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত। ভৌত এবং রাসায়নিক শর্তের যে বিস্তারের মধ্যে জীব বেঁচে থাকতে পারে, তাকে বাস্তুতন্ত্রের **'সহ্য করার বিস্তার'** বলা হয়। এই বিস্তার প্রধানত দু-ভাগে বিভক্ত—**'সর্বাপেক্ষা অনুকূল বিস্তার'** এবং **'শারীরবৃত্তিয় পীড়ন অঞ্চল'**।

(a) **সর্বাপেক্ষা অনুকূল বিস্তার** (Optimum Range) ঃ ভৌত এবং রাসায়নিক উপাদানের যে বিস্তারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী সংখ্যক জীব স্বাচ্ছন্দ্যে বেঁচে থাকতে পারে, তাকে 'সর্বাপেক্ষা অনুকূল বিস্তার' বলে।

(b) **শারীরবৃত্তিয় পীড়ন অঞ্চল** (Zone of Physiological Stress) ঃ ভৌত ও রাসায়নিক উপাদানের পরিমাণ এই অঞ্চলে জীবের বাঁচার পক্ষে অনুকূল নয়। এই অঞ্চলে জীবকে পরিবেশের সঙ্গে কঠিন সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হয় অর্থাৎ এই অঞ্চলে বেঁচে থাকা সম্ভব কিন্তু দুরূহ। অনুকূল বিস্তারের উর্ধ্ব এবং নিম্ন সীমার বাইরেই শারীরবৃত্তিয় পীড়ন অঞ্চল অবস্থিত (চিত্র 3.4)।



চিত্র 3.4 ঃ বাস্তুতন্ত্রে জীবের অ্যাবায়োটিক শর্ত সহ্য করার বিস্তার দেখানো হয়েছে।

শারীরবৃত্তিয় পীড়ন অঞ্চলের বাইরে 'অসহনীয় অঞ্চল (Zone of intolerance) অবস্থিত। এই অঞ্চলে কোন জীব বেঁচে থাকতে পারে না। যেমন—মাছ জলের একটি 'সংকীর্ণ তাপমাত্রা—বিস্তারের' মধ্যে বেঁচে থাকে, কিন্তু কোন কারণে জলের তাপমাত্রা 'তাপমাত্রা-বিস্তারের' নিম্নসীমার মানের কম হলে (খুব কম তাপমাত্রা) বা ঊর্ধ্ব সীমামানের বেশি হলে (খুব বেশি তাপমাত্রা) মাছ মরে যায় বা ঐ তাপমাত্রা-অঞ্চল ত্যাগ করে।

• **বাস্তুতন্ত্রের সীমা নির্ধারক শর্ত** (Limiting Factors of Ecosystem) ঃ

যেসব ভৌত ও রাসায়নিক শর্ত জীবের বৃদ্ধি এবং বংশবিস্তারকে প্রভাবিত করে এবং সেইসব শর্তের যে কোন একটির অনুপস্থিতি বা অভাবে বৃদ্ধি এবং বংশবিস্তার ব্যাহত হয়, তাদেরকে বাস্তুতন্ত্রের 'সীমা নির্ধারক' শর্ত বলা হয় (Liebig—1840)। এই সীমানির্ধারক শর্ত হচ্ছে কোন একটি বাস্তুতন্ত্রের প্রাথমিক নির্ধারক। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়—**'ফসফরাস'** (phosphorus) হচ্ছে জলজ বাস্তুতন্ত্রের একটি প্রধান সীমা নির্ধারক শর্ত। ফসফরাসের অভাবে শৈবালের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের প্রধান সীমা-নির্ধারক শর্ত হচ্ছে বৃষ্টিপাত (rainfall)। বৃষ্টিপাতের পরিমাণের দ্বারাই নির্ধারিত হয় কোন ভূখণ্ডের বাস্তুতন্ত্রের প্রকৃতি যথা—অরণ্য, তৃণক্ষেত্র বা মরুভূমি ইত্যাদি। বার্ষিক বৃষ্টিপাত 70-80 সেমির (27-31 ইঞ্চি) বেশী হলে ভূখণ্ডে অরণ্য সৃষ্টি হয়। তুলনামূলকভাবে একটু কম বৃষ্টিপাত হলে ভূখণ্ড তৃণভূমি (grass land) দ্বারা আচ্ছাদিত হয় ; কিন্তু বৃষ্টিপাত খুবই কম হলে অর্থাৎ শুষ্ক আবহাওয়া থাকলে মরুভূমির সৃষ্টি ঘটে।

3.10. বাস্তুতন্ত্র কিভাবে কাজ করে? (How do Ecosystems Work?)

'বাস্তুতন্ত্র কি প্রক্রিয়ায় কাজ করে', একটি বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদক (স্বভোজী জীব) কীভাবে খাদক বা খাদ্য গ্রাহকের (পরভোজী জীব) সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং জীবমণ্ডলের মধ্য দিয়ে কি উপায়ে 'শক্তি' (energy) এবং 'রাসায়নিক পুষ্টি পদার্থ' (nutrients) বা 'পরিপোষক' প্রবাহিত হয় তা এই অংশে আলোচনা করা হল।

3.10.1. খাদ্যশৃঙ্খল (Food-Chain) ঃ

(a) **উৎপাদক বা অটোট্রফ** (Producer or Autotrophs) ঃ জীবমণ্ডলের জীবসমূহকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—'উৎপাদক' এবং 'খাদক'। **উৎপাদক** জীব যথা ঃ- শৈবাল, উদ্ভিদ এবং সায়ানো-ব্যাক্‌টিরিয়া সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় নিজেদের খাদ্য (শক্তি সমৃদ্ধ জৈব পদার্থ) উৎপাদন করতে সক্ষম। উৎপাদক জীব **'অটোট্রফ'** (autotroph) নামে পরিচিত (গ্রীক **'অটো'** কথার অর্থ নিজ: **'ট্রফ'** কথার অর্থ—যে খাদ্য যোগান দেয়)। আক্ষরিক অর্থে যে সমস্ত জীব নিজেদের খাদ্য যোগান দিতে সক্ষম তাদের অটোট্রফ বলা হয়।

b) **খাদক** (Consumers) ঃ খাদক জীব উৎপাদক উদ্ভিদ এবং অন্যান্য জীবকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে, কারণ এইসকল জীব স্ব-খাদ্য উৎপাদনে অক্ষম। খাদক জীব অন্যান্য স্বভোজী জীব এবং স্বভোজী জীবের উপর নির্ভরশীল জীবকে খেয়ে বেঁচে থাকে তাই এদেরকে **'পরভোজী জীব'** (Heterotroph) বলা হয়। A) **খাদক প্রাণীদের তিন ভাগে ভাগ করা যায়—**

i) **তৃণভোজী** (Herbivores) ঃ যে সকল খাদক প্রাণী একমাত্র উদ্ভিদ বা উদ্ভিদউপাংশ (যথা—লতা-পাতা) খেয়ে বেঁচে থাকে, সেই সকল প্রাণী 'তৃণভোজী প্রাণী' হিসেবে পরিচিত।

উদাহরণ ঃ হরিণ, গরু, ভেড়া এবং এলক্ ইত্যাদি।

ii) **মাংসাশী-স্তন্যপায়ী** (Carnivores) ঃ যে সমস্ত স্তন্যপায়ী খাদক প্রাণী কেবল অন্যান্য প্রাণী খেয়ে বেঁচে থাকে, তাদের স্তন্যপায়ী-মাংসাশী প্রাণী বা 'কার্ণিভোর' বলা হয়।

উদাহরণ ঃ সিংহ, বাঘ ইত্যাদি।

iii) **সর্বভুক** (Omnivores) ঃ যে সমস্ত খাদক প্রাণী উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়ই খেয়ে বেঁচে থাকে, তাদের সর্বভুক্ বা ওমনিভোরস বলা হয়।

উদাহরণ ঃ মানুষ, ভল্লুক প্রভৃতি।

• **বাস্তুসংস্থানগতভাবে খাদকের শ্রেণীবিভাগ ঃ**

উৎপাদক উদ্ভিদ এবং খাদক প্রাণিগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্য-সম্পর্কের অনুক্রম অনুসারে বাস্তুবিজ্ঞানীরা খাদক প্রাণিদের নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করেছেন ঃ

i) **'প্রথম খাদক'** (Primary Consumer) ঃ

উৎপাদক উদ্ভিদের উপর খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল খাদক প্রাণী **'প্রথম খাদক'** নামে পরিচিত। সমস্ত তৃণভোজী প্রাণীরাই প্রথম খাদক। উদাঃ হরিন, ফড়িং, ইঁদুর প্রভৃতি স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের এবং নীল মাছি, শামুক, মাছ, ঝিনুক, গলদাচিংড়ি প্রভৃতি জলজ বাস্তুতন্ত্রের 'প্রথম খাদক'।

ii) **দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত খাদক** (Secondary Consumers) ঃ

যে সমস্ত খাদক তৃণভোজী প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে খায় তাদের 'দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত খাদক' বলা হয়। এই ধরনের খাদক মাংসাশী-স্তন্যপায়ী। উদাঃ বাঘ, ভল্লুক, মানুষ প্রভৃতি স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের এবং **'বড় মাছ'**, **'ক্যাডিসমাছির লার্ভা'**, **'হেরিং মাছ'** ইত্যাদি জলজ বাস্তুতন্ত্রের দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত খাদক।

iii) **তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত খাদক** (Tertiary Consumer) ঃ যে সমস্ত খাদক দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত খাদক প্রাণীদের খাদ্য হিসেবে খায় তাদের 'তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত খাদক' বলে। আবার যে সমস্ত খাদকপ্রাণী তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত খাদক প্রাণীদের খায় তাদের **চতুর্থ পর্যায়ভুক্ত খাদক** প্রাণী বলে। উদাহরণ ঃ বাজ, মানুষ, হায়না প্রভৃতি প্রাণী।

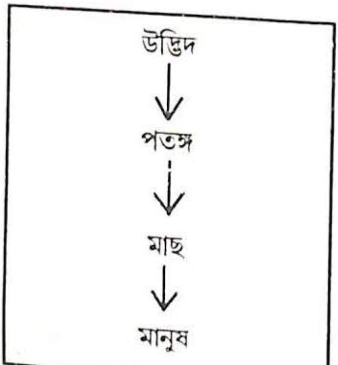
c) **খাদ্যশৃঙ্খল কাকে বলে?**

সবুজ উদ্ভিদ (উৎপাদক) জল, কার্বনডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং

ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি রাসায়নিক পুষ্টিপদার্থের সাহায্যে যে জৈব খাদ্য-অণু সংশ্লেষ করে, সেই খাদ্যস্থিত বন্ডের মধ্যে সৌরশক্তি রাসায়নিক বা স্থিতিশক্তিরূপে নিহিত থাকে। অর্থাৎ সবুজ উদ্ভিদের উৎপাদিত 'খাদ্য' হচ্ছে শক্তি এবং পুষ্টিপদার্থের আধার বা উৎস। 'প্রথম খাদক' যখন 'উদ্ভিদ-খাদ্য' গ্রহণ করে, তখন শক্তি ও পুষ্টি পদার্থের কিছু অংশ প্রথম খাদকে প্রবাহিত হয়। আবার দ্বিতীয়-পর্যায়ভুক্ত খাদক যখন প্রথম খাদককে খাদ্য হিসেবে খায়, তখন প্রথম খাদকের শক্তি এবং পুষ্টি পদার্থের কিছু অংশ দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত খাদকে প্রবাহিত হয়। এইভাবে শক্তি ও পুষ্টি পদার্থ অনুক্রমিকভাবে তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত খাদক এবং চতুর্থ পর্যায়ভুক্ত খাদক শ্রেণীতে প্রবাহিত হয়।

• সংজ্ঞা ঃ **যে অনুক্রমিক জীবসমূহের** (sequence of organisms) **মাধ্যমে বাস্তুতন্ত্রে শক্তি এবং পুষ্টিপদার্থ প্রবাহিত হয়, সেই জীব-অনুক্রমকে 'খাদ্য শৃঙ্খল'** (Food Chain) **বলা হয়।** [অর্থাৎ খাদ্যশৃঙ্খল হচ্ছে বাস্তুতন্ত্রে পুষ্টিপদার্থ এবং শক্তি পরিবহনের নালী (Conduits)]। এই শৃঙ্খলে পুষ্টিপদার্থ এবং শক্তি উৎপাদক জীব থেকে খাদক জীবে প্রবাহিত হয় এবং প্রতিটি খাদক-জীব শৃঙ্খলে অবস্থিত পূর্বের জীবকে খাদ্য হিসেবে খায়।

• উদাহরণ ঃ মিষ্টিজলের বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক উদ্ভিদ (শৈবাল, ফাইটোপ্লাঙ্কটন ইত্যাদি) কে পতঙ্গ, অমেরুদণ্ডী প্রাণী খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। ব্যাঙ 'পতঙ্গ' এবং অমেরুদণ্ডী প্রাণীকে খায়, আবার মাছ ব্যাঙকে খায় এবং অবশেষে মানুষ মাছকে খায়। এক্ষেত্রে



চিত্র 3.5 ঃ মিষ্টিজলের খাদ্যশৃঙ্খল দেখানো হয়েছে।

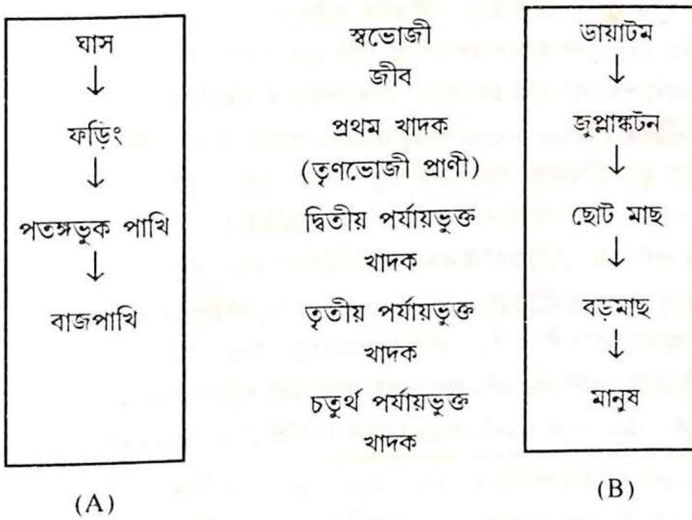
'উৎপাদক' এবং 'খাদকের' মধ্যে 'খাদ্য-খাদক' আন্তঃসংযোগে যে খাদ্য-শৃঙ্খল গড়ে ওঠে [উদ্ভিদ → পতঙ্গ → মাছ → মানুষ] তা দেখান হয়েছে (চিত্র 3.5)।

d) **খাদ্য শৃঙ্খলের প্রকারভেদ ঃ**

জীব মণ্ডলে মূলত দু-ধরনের খাদ্য-শৃঙ্খল দেখা যায়—1) **গ্রেজার খাদ্য শৃঙ্খল**

(Grazer Food Chain) এবং 2) **ডিকম্পোজার বা ডেট্রিটাস খাদ্য শৃঙ্খল** (Decomposer or Detritus Food Chain)

1) **গ্রেজার খাদ্য শৃঙ্খল ঃ** 'গ্রেজার' (grazer) কথার অর্থ যে পশু-চারণভূমিতে চরে খায়, কিন্তু এখানে গ্রেজার কথাটি বৃহৎ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। **যে সমস্ত খাদক প্রাণী উৎপাদক-উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ-উপাংশ খেয়ে বেঁচে থাকে তাদের 'গ্রেজার' বলা হয়।** গ্রেজার খাদ্য শৃঙ্খল শুরু হয়—'উদ্ভিদ' এবং 'তৃণভোজী-গ্রেজার প্রাণী' (herbivore-grazer) থেকে অর্থাৎ গ্রেজার খাদ্য শৃঙ্খলের ভিত্তি তৈরী হয় স্বভোজী উদ্ভিদ দ্বারা এবং এই জাতীয় খাদ্য শৃঙ্খলের প্রথম খাদক হচ্ছে—তৃণভোজী প্রাণী। নীচে স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের এবং জলজ বাস্তুতন্ত্রের একটি করে গ্রেজার খাদ্য শৃঙ্খল উল্লেখ করা হল ঃ



চিত্র 3.6 ঃ গ্রেজার খাদ্য-শৃঙ্খল দেখানো হয়েছে—
(A) স্থলজ এবং (B) জলজ বাস্তুতন্ত্রের।

2) **ডিকম্পোজার বা ডেট্রিটাস খাদ্য-শৃঙ্খল ঃ**

বাস্তুতন্ত্রে পদার্থের প্রবাহ চক্রাকার (cyclic)। মৃত উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ উপাংশ, প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ মল, মূত্র এবং মৃতদেহ (শব) প্রভৃতি জৈব পদার্থে যে শক্তি এবং পুষ্টিপদার্থ সঞ্চিত থাকে তা ডিকম্পোজার এবং ডেট্রিভোর প্রাণীর দ্বারা পুনরায় সরলীকৃত অবস্থায় পরিবেশে ফিরে আসে। উদ্ভূত শক্তি পুনরায় স্বভোজী উৎপাদক উদ্ভিদ কর্তৃক গৃহীত হয় না (এনট্রপি), কিন্তু রাসায়নিক পুষ্টি পদার্থ পুনরায় পরিবেশ থেকে উদ্ভিদদেহে গৃহীত হয়; তাই পদার্থের প্রবাহ চক্রাকার। পদার্থ এবং শক্তির এই প্রবাহে মৃতজীবী ছত্রাক এবং ব্যাক্টিরিয়া গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

D.— এই তরঙ্গের গঠন প্রকৃতি জটিল, কিন্তু তরঙ্গের পুনরাবৃত্তি নিয়মিত। 'সুরযুক্ত' শব্দের এরূপ তরঙ্গরূপ দেখা যায়।

E.— এই শব্দ তরঙ্গের পুনরাবৃত্তি অনিয়মিত। 'সুরবর্জিত' শব্দের এরূপ তরঙ্গরূপ দেখা যায়।

12.3. শব্দ-দূষণ কি?

মানুষ এবং অন্যান্য উন্নত প্রাণীর শ্রবণ ক্রিয়ায় শব্দের তীব্রতা (প্রাবল্য) এবং তীক্ষ্ণতার পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে—সুস্থ বা স্বাভাবিক শ্রবণ ক্রিয়ায় তীব্রতা এবং তীক্ষ্ণতা পরিবর্তনের মান শ্রুতি-সীমার মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। সুরযুক্ত বা সুরবর্জিত শব্দের উচ্চ-শ্রুতিসীমার অধিক তীব্রতা এবং তীক্ষ্ণতায় স্বাভাবিক শ্রবণ ক্রিয়ায় বাধা, বা শ্রবণ ক্ষমতার হ্রাস, বা কর্ণের শ্রুতি-গ্রাহক কোষের অস্থায়ী বা স্থায়ী অনভিপ্রেত পরিবর্তন বা ক্ষতি হতে পারে। এছাড়া শব্দের অসহনীয় অধিক তীব্রতা এবং তীক্ষ্ণতায় অন্যান্য শারীরবৃত্তিয় ক্ষতি হয়। **ভৌত পরিবেশে (বিশেষত বায়ু মাধ্যমে) শ্রুতিসীমা বা সহনক্ষমতা বহির্ভূত অপেক্ষাকৃত উচ্চ-তীব্রতা বা তীক্ষ্ণতা সম্পন্ন শব্দের (বিশেষ করে সুরবর্জিত শব্দ বা নয়েজ) উপস্থিতিতে জীব-পরিবেশ তথা মানুষের উপর যে অসংশোধনযোগ্য ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি হয়, সেই পরিবেশ-সংক্রান্ত ঘটনাকে শব্দ দূষণ বলা হয়।** আতশবাজি পোড়ানোর ফলে সৃষ্ট অনিয়মিত ও তীব্রতা যুক্ত শব্দ; বাস, লরি, কার এবং ট্রেনের হর্নের শব্দ; চালু মেশিনের শব্দ; বিমান উড়বার সময় উৎপন্ন শব্দ; মাইক ও অন্যান্য বিবর্ধকের শব্দ ইত্যাদি সুরবর্জিত শব্দ শব্দ-দূষণের জন্য প্রধানত দায়ী।

12.4. শব্দ-দূষণের উৎস ঃ

শব্দ দূষণের জন্য মনুষ্যসৃষ্ট কারণই প্রধানত দায়ী। যদিও দু-একটি ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক কারণে শব্দদূষণ সৃষ্টি হয়। শব্দদূষণের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট উৎস তালিকায় (12.1) দেওয়া হল ঃ

শ্রেণী	প্রকৃতি
1. প্রাকৃতিক উৎস ঃ	বজ্র বা বাজপড়ার শব্দ, মেঘের গর্জন
2. মনুষ্য সৃষ্ট উৎস ঃ	মানুষের উচ্চস্বরে কথা বলার শব্দ, গাড়ির হর্ন, ট্রেনের হুইসল্, পপমিউজিক বা মাইকের শব্দ, বিমান উড়বার সময় সৃষ্ট শব্দ, কংকর্ডের শব্দ, সাইরেন, অক্সিজেন টর্চ, জেনারেটার চলার শব্দ, কারখানার মেশিন চলার শব্দ, নিউজ পেপার প্রেসের শব্দ, আতশবাজির শব্দ প্রভৃতি।

তালিকা 12.1 ঃ শব্দদূষণের প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট উৎস উল্লেখ করা হয়েছে।

12.5 সুরবর্জিত শব্দ (নয়েজ) ঃ প্রধান শব্দদূষক

শব্দ-দূষণে সুরযুক্ত এবং সুরবর্জিত উভয় শব্দ দায়ী হলেও সুরবর্জিত শব্দই প্রধানত দায়ী, অর্থাৎ সুরবর্জিত শব্দই হল প্রধান শব্দ-দূষক। সুরবর্জিত শব্দের কোন নিয়মিত তীব্রতা ও কম্পাঙ্ক না থাকায় মানুষের শ্রবণ-সম্পর্কীয় প্রতিরক্ষামূলক কোন প্রতিবর্ত সঠিকভাবে অভিযোজিত হতে পারে না, ফলে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি হয়।

12.6. শব্দ-দূষণের কারণ ঃ

মানুষের অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপই শব্দদূষণের প্রধান কারণ। অরণ্যধ্বংস ও নগরায়ন, শিল্পের প্রসার, প্রযুক্তির প্রগতি, পরিবহনের প্রসার এবং মানুষের জীবন প্রণালীতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনই সুরবর্জিত শব্দ দূষণের কারণ। আধুনিক মানব সভ্যতার উপজাত হিসেবে শব্দ-দূষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বর্তমানে প্রধান পরিবেশ দূষক হিসেবে দেখা দিয়েছে। বর্তমান বিশ্ব তথা ভারতের বিভিন্ন কর্মব্যস্ত নগর, শহর এবং কারখানা ব্যতিরেকে গ্রামে, মফঃস্বল শহরে, নির্মাণ স্থলে, হাসপাতালে, অফিস ও আদালতে এবং শিক্ষায়তনে শব্দ-দূষণ লাগামহীনভাবে বেড়ে চলেছে। শব্দ-দূষণের বিভিন্ন কারণ অতি-সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

i) **পরিবহন ঃ** শব্দ-দূষণের প্রধান উৎস পরিবহন। পরিবহনজনিত শব্দ-দূষণের কারণ যানবাহনের অত্যধিক সংখ্যা বৃদ্ধি, বিশেষ করে ডিজেল ইঞ্জিনযুক্ত যানবাহনের। বাস, লরি, কার, মোটরসাইকেল প্রভৃতির চলাচলের শব্দ এবং অনিয়ন্ত্রিত ভাবে উচ্চ-তীব্রতাযুক্ত বৈদ্যুতিক হর্নের ব্যবহারের ফলে রাস্তায়, শহরের ট্র্যাফিক অঞ্চলে, হাসপাতাল সংলগ্ন রাস্তায়, শিক্ষায়তন এবং অন্যান্য নীরব কর্মব্যস্ত স্থানে শব্দ-দূষণ সৃষ্টি হয়। এছাড়া ট্রেনের বৈদ্যুতিক হুইসল্ প্লাটফর্ম এবং সন্নিহিত স্থানের মানুষের উপর শব্দ-দূষণজনিত প্রভাব সৃষ্টি করে। এই-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ট্রেনের হুইসল্ এর তীব্রতা প্রায় 90 dB (ডেসিবেল), যা শ্রুতিসীমার সাপেক্ষে অতিশয় তীব্র।

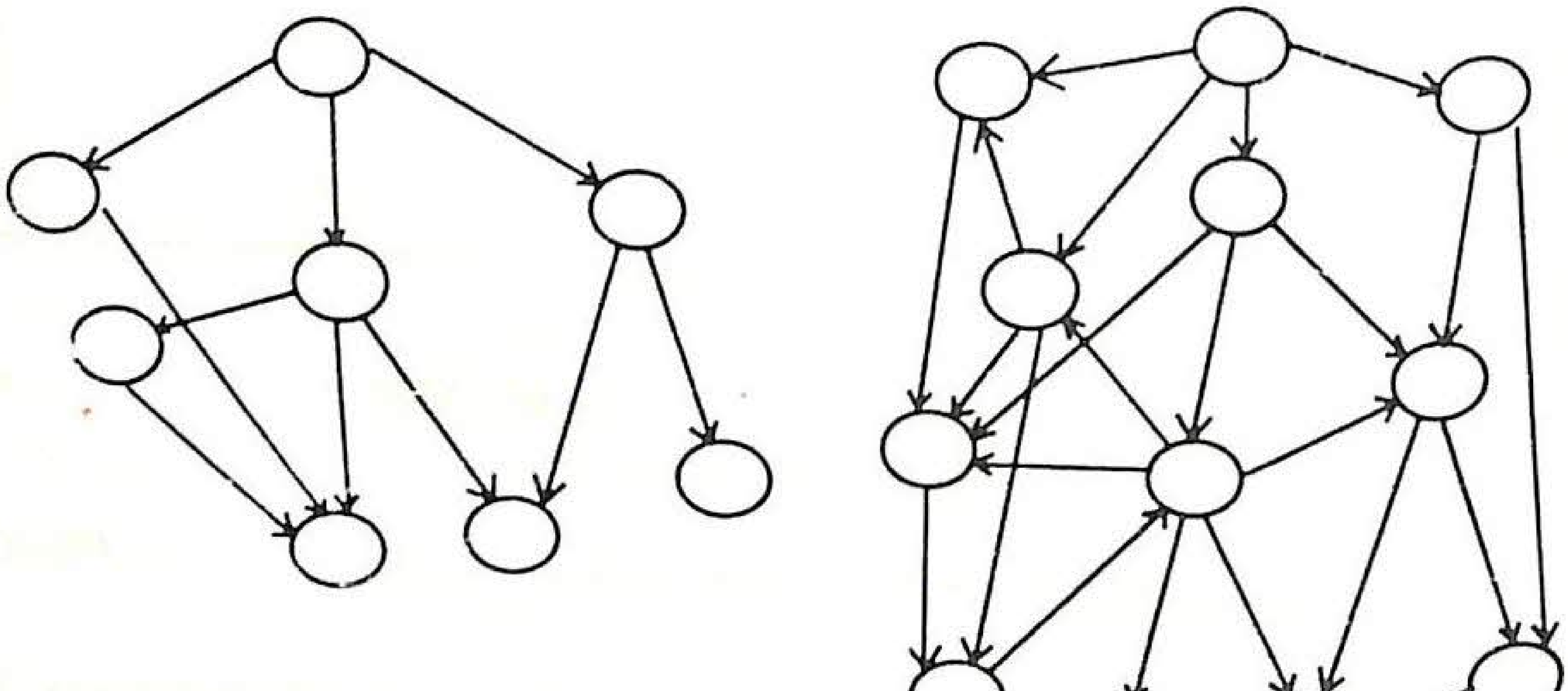
ii) **শিল্প-প্রক্রিয়া ঃ** বিভিন্ন শিল্পসংস্থায় প্রক্রিয়াকরণের সময় যান্ত্রিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন শব্দ শিল্পসংস্থায় কর্মরত শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মী এবং পার্শ্বস্থ অঞ্চলের জনবসতির উপর শব্দ-দূষণজনিত প্রভাব সৃষ্টি করে। যেমন নিউজপেপার প্রেস (100 dB), টেক্সটাইল লুম এবং চাবি পাঞ্চিং মেশিন (80 dB) এর প্রক্রিয়াকরণের ফলে শব্দ-দূষণ সৃষ্টি হয়। এছাড়া বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় সিফটিং এর কাজে ব্যবহৃত **সাইরেন** (140 dB) যন্ত্রণাদায়ক তীব্র শব্দের সৃষ্টি করে।

iii) **যান্ত্রিক ক্রিয়া ঃ** অফিস, দোকান, স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য সামাজিক কাজে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে ডিজেল চালিত জেনারেটর ব্যবহৃত হয় সেইসব জেনারেটরের ক্রিয়ায় শব্দ (একঝসট্ গ্যাসের বেগযুক্ত নির্গমনের ফলে শব্দ উৎপন্ন হয়) এবং বায়ুদূষণ সৃষ্টি হয়।

3.10.2. খাদ্য-জালিকা (Food-Web) ঃ

a) খাদ্য-জালিকা কি? (What is foodweb?)

আমাদের বাস্তুতন্ত্র অসংখ্য আন্তঃসম্পর্কযুক্ত খাদ্যশৃঙ্খল দ্বারা গঠিত। বাস্তুতন্ত্রের শক্তি এবং বস্তু কেবলমাত্র একটি খাদ্য-শৃঙ্খলের মাধ্যমে প্রবাহিত হয় না, অসংখ্য আন্তঃসম্পর্কযুক্ত খাদ্য-শৃঙ্খলের মাধ্যমে প্রবাহিত হয়। একটি খাদ্যশৃঙ্খল কথার অর্থ খাদ্যসম্পর্কযুক্ত কতকগুলি অনুক্রমিক জীবের মাধ্যমে শক্তি এবং বস্তুর প্রবাহের একটি অংশমাত্র। সুতরাং **জীবগোষ্ঠীর মধ্যে অসম খাদ্য-সম্পর্কের** (feeding relationship) **ফলে একটি বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন খাদ্য-শৃঙ্খলের আন্তঃসংযোগে যে জালিকাকার গঠন সৃষ্টি হয় তাকে 'খাদ্যজালিকা'** (food web) বলা হয় (চিত্র 3.9)।



(A)

(B)

চিত্র 3.9 ঃ (A) একটি সরল বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যজালিকার অনুচিত্র গঠন এবং (B) একটি জটিল বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যজালিকার অনুচিত্র গঠন দেখানো হয়েছে। এই চিত্রে প্রতিটি বলয় একটি জীবকে সূচিত করছে।

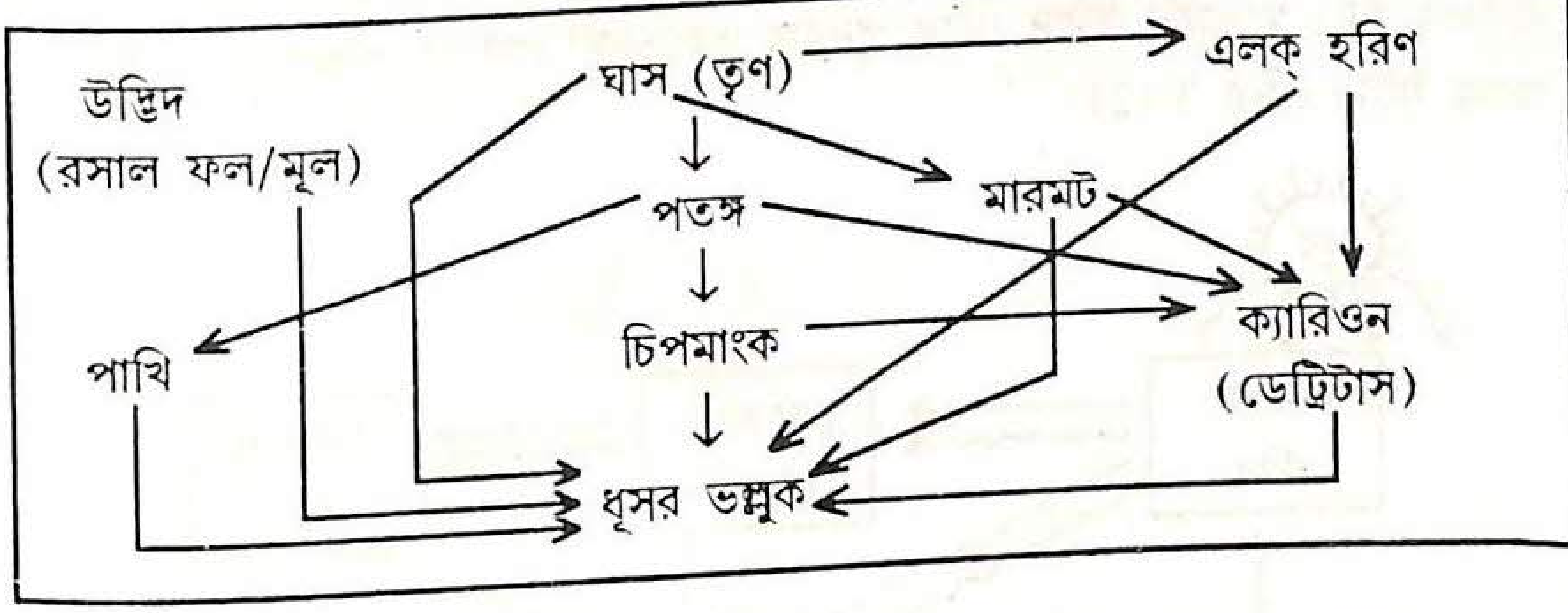
b) খাদ্য-জালিকা কি কারণে সৃষ্টি হয়?

খাদ্য-জালিকা সৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে খাদ্যশৃঙ্খলের সদস্য প্রাণীর খাদ্যাভ্যাসগত বৈশিষ্ট্য। কিছু প্রাণী যখন একই ধরনের খাদ্য খায়, তখন তারা একটি খাদ্যশৃঙ্খলের সদস্য হয়। বিপরীত ক্রমে কিছু প্রাণী যখন অসংখ্য ভিন্ন প্রকৃতির খাদ্য খায়, তখন তারা কেবল ভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খলের সদস্য হয় না, তাদের সংরক্ষিত ট্রফিক লেভেলও বিভিন্ন খাদ্য-শৃঙ্খলের ক্ষেত্রে ভিন্ন হয়। অর্থাৎ কোন একটি প্রাণী কোন খাদ্য শৃঙ্খলের প্রথম খাদক (তৃণভোজী) হলেও পৃথক একটি খাদ্যশৃঙ্খলের দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত বা তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত খাদক হতে পারে। বাস্তবে, বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য-খাদক

সম্পর্ক খুবই জটিল, যেহেতু একই খাদ্যশৃঙ্খলের যে কোন খাদক প্রাণীর একাধিক জীব খাদ্য হতে পারে।

c) **খাদ্য-জালিকার উদাহরণ ঃ**

আমেরিকায় প্রাপ্ত ধূসরবর্ণের ভল্লুক (grizzly bear) বিভিন্ন প্রজাতির জীবকে খাদ্য হিসেবে আহরণ করে। ধূসর ভল্লুক যখন রসাল ফলমূল খায়, তখন ভল্লুক খাদ্য শৃঙ্খলের প্রাথমিক খাদক এবং ঐ শৃঙ্খলের দ্বিতীয় ট্রফিক লেভেলে অবস্থান করে। উক্ত খাদ্যশৃঙ্খলের সঙ্গে ভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খলের আন্তঃসংযোগ ঘটে (যেহেতু ধূসর ভল্লুক বিভিন্ন ধরনের খাদ্য খায়)। ভল্লুক—রসাল ফলমূল ছাড়া তৃণভোজী কাঠবিড়াল জাতীয় প্রাণী 'মারমট'কে খায়, উক্ত খাদ্যশৃঙ্খলে মারমট প্রথম খাদক এবং ভল্লুক দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত খাদক (তৃতীয় ট্রফিক লেভেল)। আবার ডোরাকাটা **'চিপমাংক'** (chipmunk) 'কাঠবিড়াল' ধূসর ভল্লুকের খাদ্য। এক্ষেত্রে ভল্লুক তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত খাদক (চতুর্থ ট্রফিক লেভেল) কারণ, চিপমাংক-কাঠবিড়ালী (দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত খাদক) পতঙ্গভুক (প্রথম খাদক) এবং পতঙ্গ হচ্ছে তৃণভোজী। তাছাড়া ধূসর ভল্লুক মৃতপ্রাণীর অর্দ্ধ-গলিত দেহ বা শব (carrion) খায়; শেষোক্ত ক্ষেত্রে ভল্লুক ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। (চিত্র 3.10)।



চিত্র 3.10 ঃ খাদ্য-জালিকা দেখানো হয়েছে।

ট্রফিক লেভেল	গ্রেজার খাদ্যশৃঙ্খল (1)	(2)	(3)	ডিকম্পোজার খাদ্য শৃঙ্খল
প্রথম	ঘাস, রসাল ফল এবং মূল	ঘাস	ঘাস	'ক্যারিওন' (ডেট্রিটাস)
দ্বিতীয়	↓ ধূসর ভল্লুক	↓ এলক্ হরিণ, মারমট	↓ পতঙ্গ	↓ ধূসর ভল্লুক
তৃতীয়		↓ ধূসর ভল্লুক	↓ চিপমাংক	
চতুর্থ			↓ ধূসর ভল্লুক	

চিত্র 3.11 ঃ বিভিন্ন খাদ্যশৃঙ্খলে ধূসর ভল্লুকের ট্রফিক লেভেল এবং খাদ্য-সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

3.10.3. বাস্তুতন্ত্রে শক্তি এবং পদার্থের প্রবাহ (Flow of Energy and Matter Through Ecosystems) ঃ

ভূমিকা ঃ সূর্য পৃথিবীর সকল শক্তির মূল উৎস। সৌরশক্তিকে সরাসরি আবদ্ধ (trapp) করতে পারে একমাত্র সবুজ উদ্ভিদ এবং অন্যান্য সালোকসংশ্লেষকারী জীব। সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় অজৈব পরিপোষক (nutrients) সহযোগে গঠিত খাদ্য অণুর মধ্যে সৌরশক্তি 'স্থিতিশক্তি' বা 'রাসায়নিক শক্তি' (potential energy/chemical energy) রূপে সঞ্চিত থাকে। সবুজ উদ্ভিদ থেকে শক্তি এবং পুষ্টিদায়ক পদার্থ খাদ্যের মাধ্যমে খাদ্যশৃঙ্খলের তৃণভোজী এবং মাংসাশী প্রাণীতে প্রবাহিত হয়।

বাস্তুতন্ত্রে শক্তির এই প্রবাহ **একমুখী বা অনাবর্তনশীল**। কারণ উৎপাদক উদ্ভিদ, তৃণভোজী প্রাণী, মাংসাশী প্রাণী এবং ডিকম্পোজার জীবগোষ্ঠী থেকে যোগান সৌরশক্তির প্রত্যাবর্তন ঘটে না। বিপরীতক্রমে বাস্তুতন্ত্রে পুষ্টিপদার্থের প্রবাহ আবর্তনশীল (cyclic)। মৃত উদ্ভিদ (বা উপাংশ), প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ এবং মৃতদেহের জৈব যৌগ ডিকম্পোজার জীবগোষ্ঠীর দ্বারা সরলীকৃত অজৈব পরিপোষক উপাদানে বিশ্লেষিত হয়ে পরিবেশে ফিরে যায় এবং ঐ সকল পরিপোষক উপাদান পুনরায় স্বভোজী উদ্ভিদের খাদ্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। স্বভোজী উদ্ভিদ থেকে পুনরায় পরভোজী প্রাণীতে পরিপোষক উপাদানের প্রবাহ ঘটে। (চিত্র 3.12)।



চিত্র 3.12 ঃ বাস্তুতন্ত্রে শক্তি'র অনাবর্তনশীল প্রবাহ (⤳) এবং পরিপোষক পদার্থের (→) আবর্তনশীল প্রবাহের অনুচিত্র দেখানো হয়েছে।

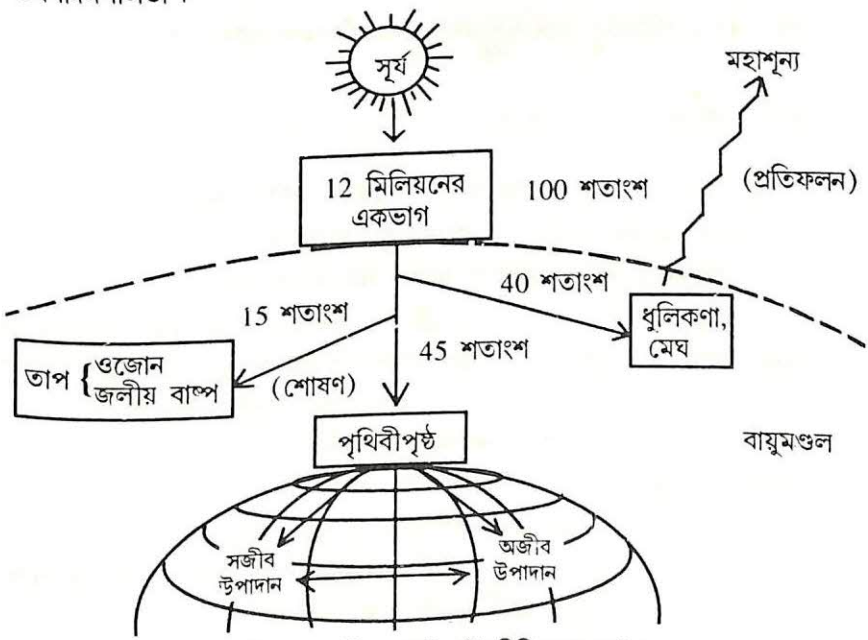
1) শক্তি'র প্রবাহ (Flow of energy) ঃ

a) শক্তি'র উৎস সূর্য (Sun as a Source of Energy) ঃ

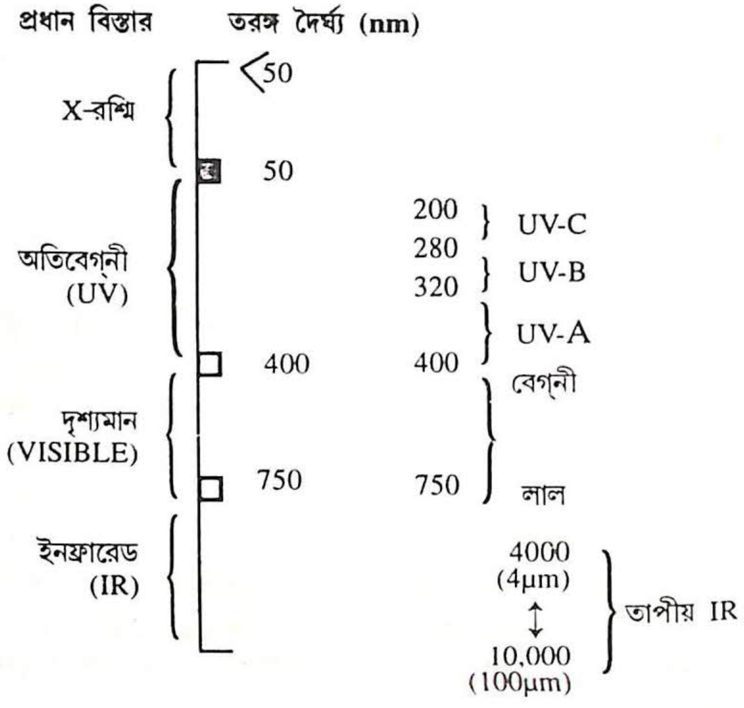
বাস্তুতন্ত্রে শক্তির মূল উৎস হচ্ছে 'সূর্য'। 'সূর্য' থেকে অবিরাম সীমাহীন শক্তি মহাশূন্যে (বা আকাশে) (space) নিঃসৃত হচ্ছে। তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ রূপে (electromagnetic waves) শূন্যে বিস্তৃত এই শক্তির অতি নগণ্য পরিমাণ (12 মিলিয়নের একভাগ, যার

পরিমাণ $10.8 \times 10^6 KJm^{-2}yr^{-1}$) পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। পৃথিবীতে আবদ্ধ এই মোট সৌরশক্তির 40 শতাংশ কোন প্রকার তাপীয় প্রভাব সৃষ্টি না করে পৃথিবীর উপরিপৃষ্ঠ, বায়ুমণ্ডলের ধূলিকণা এবং মেঘের দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে ফিরে যায়। পৃথিবীতে প্রবিষ্ট 15 শতাংশ সৌরশক্তি বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যার (stratosphere) স্তরে ওজোন গ্যাস ও জলীয় বাষ্পের দ্বারা শোষিত হয়ে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং অবশিষ্ট 45 শতাংশ সৌরশক্তি পৃথিবীর পৃষ্ঠতলে পৌঁছায় ($5 \times 10^6 kJm^{-2}yr^{-1}$) [40+15+45=100] (চিত্র 3.13)।

পৃথিবীতে আপতিত মোট সৌরবিকিরণের 50 শতাংশ দৃশ্যে সাহায্যকারী আলোক-তরঙ্গ, যারা উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষে সাহায্য করে (Photosynthetically Active Range, PAR)। সর্বাধিক অনুকূল অবস্থায় পৃথিবীতে আপতিত মোট সৌরশক্তির 5 শতাংশ উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় '**মোট প্রাথমিক উৎপাদনশীলতায়**' রূপান্তরিত হতে পারে (Goss Primary Production, GPP) (আদর্শ অবস্থায় উদ্ভিদ কর্তৃক গৃহীত মোট সৌরশক্তির পরিমাণ 1-2 শতাংশ এবং বাস্তুতন্ত্রে তার গড় মান 0.2 শতাংশ)। মোট প্রাথমিক উৎপাদনশীলতায় সঞ্চিত শক্তির কিছু পরিমাণ উদ্ভিদের শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ সঞ্চিত থাকে। শেষোক্ত পরিমাণকে '**নীট্ উৎপাদনশীলতা**' বলা হয়। মোট প্রাথমিক উৎপাদনশীলতার 50-80 শতাংশ হচ্ছে '**নীট্ উৎপাদনশীলতা**'।



চিত্র 3.13 ঃ পৃথিবীতে আপতিত মোট সৌরবিকিরণের বণ্টন দেখানো হয়েছে।



চিত্র 3.14 ঃ পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সৌরবিকিরণের বর্ণালী দেখানো হয়েছে।

b) 'শক্তি' কাকে বলে? (What is Energy ?)

পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায়—**কাজ করার সামর্থ্যকে 'শক্তি' বলা হয়।** কিন্তু সজীব জীবদেহে কাজ (work) বলতে আমরা কি বুঝি? সজীব জীবের প্রত্যেকটি কোষে নানাবিধ শারীরবৃত্তিয় ক্রিয়া অবিরাম চলে। এই সমস্ত শারীরবৃত্তিয় ক্রিয়া শক্তি ব্যতিরেকে ঘটতে পারে না। সেইহেতু **কোষের যেকোন শক্তি-ব্যয়িত শারীরবৃত্তিয় ক্রিয়াকেই 'কাজ' বলা হয়।** কোষঝিল্লির তড়িৎ-নতিমাত্রা নিয়ন্ত্রণ এবং প্রোটিনসংশ্লেষ পদ্ধতি কোষীয় স্তরে কাজের উদাহরণ এবং বৃদ্ধি, বিকাশ, ক্ষত-সংরোহন এবং বংশবিস্তার ইত্যাদি সমগ্র জীবের কাজের উদাহরণ।

প্রকৃতিতে বিভিন্ন উৎস থেকে আমরা শক্তি পেতে পারি, অর্থাৎ শক্তির বিভিন্ন রূপ আছে। সমধিক পরিচিত শক্তির বিভিন্ন রূপগুলি যথাক্রমে—আলোক, তাপ, শব্দ, বিদ্যুৎ, কয়লা, তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, যান্ত্রিক শক্তি, ভূ-তাপীয় শক্তি, বায়ু, পারমাণবিক শক্তি, জলবিদ্যুৎ শক্তি এবং চৌম্বক শক্তি প্রভৃতি। উপরিউক্ত প্রত্যেক প্রকার শক্তির কাজ করার সামর্থ্য রয়েছে। শক্তিকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—

• স্থিতিশক্তি (Potential Energy) ঃ কোন কিছুর মধ্যে সঞ্চিত রাসায়নিক শক্তিই হচ্ছে স্থিতিশক্তি। উদাহরণ ঃ কয়লা, তেল, বা খাদ্যবস্তুর মধ্যে সঞ্চিত শক্তি।

• গতিশক্তি (Kinetic Energy) ঃ গতিশীল অবস্থায় থাকা বস্তুর মধ্যে নিহিত শক্তিকে গতিশক্তি বলা হয়। তড়িৎশক্তি, আলোকশক্তি এবং তাপশক্তি গতিশক্তির উদাহরণ।

(c) শক্তির একক (Units of Energy) ঃ

শক্তির 'প্রামাণ্য আন্তর্জাতিক' (Standard International, SI) একক **'জুল'** (joule)। যদিও ঐতিহ্যিক একক 'ক্যালরি' এখনও ব্যবহার করা হয়। শক্তির এককের সংজ্ঞা নীচে দেওয়া হল ঃ

1. **ক্যালরি বা গ্রামক্যালরি (Cal)** ঃ এক গ্রাম জলের তাপমাত্রা I°C (14.5°C–15.5°C) বৃদ্ধি করতে যত পরিমাণ তাপ বা শক্তির প্রয়োজন তাকে ক্যালরি বা গ্রামক্যালরি বলা হয়।

2. **কিলোক্যালরি (kcal/Cal)** ঃ এক কিলোক্যালরি =1000 ক্যালরি। অর্থাৎ এককিলোক্যালরি তাপ (বা শক্তি) এক কিলোগ্রাম জলের তাপমাত্রা I°C বৃদ্ধি করতে সক্ষম।

3. জুল (J) ঃ

10^7 আর্গ কাজ করার জন্য যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তাকে 'জুল' বলা হয়। এক নিউটন (N) বল একমিটার দূরত্ব অতিক্রম করার ফলে কৃতকার্যের পরিমাণকে এক আর্গ (one erg) বলা হয়।

বা এক গ্রাম ভার (বা ওজন)কে অভিকর্ষজ টানের বিরুদ্ধে এক সেমি উচ্চতায় তুললে যে কাজ করা হয় তার পরিমাণ 981 আর্গ এবং এই পরিমাণ কাজের জন্য ব্যবহৃত শক্তি হল 'জুল'।

(4) কিলোজুল (kJ) ঃ এককিলোজুল = 1000 J

উল্লেখ্য 1J=0.239 ক্যালরি এবং এক ক্যালরি = 4.186 J

d) **খাদ্যবস্তুর অভ্যন্তরস্থ শক্তির গড় মান** (Average Energy Content of Foods) ঃ বিভিন্ন খাদ্যবস্তুর শক্তির গড় মান তালিকায় দেওয়া হল।

খাদ্যের প্রকৃতি	জুলপ্রতিগ্রাম শুষ্কভর
• কার্বোহাইড্রেট	16.7
• প্রোটিন	20.9
• লিপিড	38.5
• স্থলজ উদ্ভিদ	18.8
• মেরুদণ্ডীপ্রাণী	23.4

তালিকা 3.1 ঃ খাদ্যবস্তুর অভ্যন্তরস্থ শক্তির গড় মান দেওয়া হয়েছে।

প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য প্রতিদিন যে শক্তির প্রয়োজন হয় তা খাদ্য-বস্তু থেকে সংগৃহীত হয়। প্রতিদিন খাদ্যের মাধ্যমে যে পরিমাণ শক্তি সংগৃহীত হয় তা নীচের তালিকায় উল্লেখ করা হল।

জীব	kJ/Kg দৈহিক ওজন
• মানুষ	167 (অতএব 70 কেজি ওজন সম্পন্ন মানুষের প্রতিদিন 12500 kJ শক্তির প্রয়োজন)
• স্তন্যপায়ী বা ছোট পাখি	4186
• পতঙ্গ	2093

তালিকা 3.2 ঃ মানুষ, স্তন্যপায়ী এবং পতঙ্গ কর্তৃক প্রতিদিনের খাদ্যবস্তু থেকে সংগৃহীত শক্তির পরিমাণ দেওয়া হয়েছে।

(e) বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ একমুখী কেন?

পরিপোষক উপাদানের মত বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ আবর্তনশীল (চক্রাকার) নয়। বাস্তুতন্ত্রের সজীব উপাদানের মাধ্যমে শক্তির প্রবাহ সর্বদাই একমুখী। কারণ, শক্তির বিভিন্ন আন্তঃপরিবর্তনশীল (interconvertible) রূপ আছে এবং শক্তির রূপান্তর (transformation of energy) তাপগতিবিদ্যার (thermodynamics) সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাপগতিবিদ্যার সূত্রের ব্যাখ্যা থেকেই বাস্তুতন্ত্রে শক্তির একমুখীপ্রবাহের উত্তর পাওয়া যায়।

1. **তাপগতিবিদ্যার সূত্র ঃ**

• **প্রথম সূত্র** (First Law of Thermodynamics) ঃ তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র 'শক্তির অক্ষয় সূত্র' (Law of Conservation of Mass) নামে পরিচিত। এই সূত্র অনুসারে **'শক্তিকে একরূপ থেকে অন্যরূপে রূপান্তরিত করা যায়, কিন্তু সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না'।**

ব্যাখ্যা ঃ কয়লার মধ্যে সঞ্চিত শক্তি হচ্ছে একপ্রকার স্থিতিশক্তি। এই স্থিতিশক্তিকে গতিশক্তি যথা— তাপশক্তি, বিদ্যুৎ-শক্তি এবং আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। জীবদেহেও শক্তির রূপান্তর ঘটে। উৎপাদক উদ্ভিদ সৌরশক্তিকে খাদ্যস্থিত রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। উদ্ভিদের শ্বসন প্রক্রিয়ায় খাদ্যের জারণে তাপশক্তি উৎপন্ন হয় অর্থাৎ রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আবার তৃণভোজী প্রাণী উদ্ভিদ খাদ্যের মাধ্যমে রাসায়নিক শক্তি আহরণ করে এবং শ্বসনের দ্বারা তাপশক্তিতে রূপান্তরিত করে। এইভাবে শক্তির কেবল রূপান্তর ঘটে কিন্তু সৃষ্টি বা ধ্বংস হয় না।

• **দ্বিতীয় সূত্র** (Second Law of Thermodynamics) ঃ ভাগগতিবিদ্যার দ্বিতীয়সূত্র অনুসারে **"শক্তি যখন একরূপ থেকে অন্যরূপে রূপান্তরিত হয় তখন শক্তির হ্রাস বা হানি ঘটে"।** অন্যভাবে বলা যায় 'নিখিলসৃষ্টি (universe) বা পৃথিবী বিশৃঙ্খলা (disorder) বা এনট্রপির (enpropy) দিকে এগিয়ে চলে।

ব্যাখ্যা ঃ শক্তির রূপান্তরের ঘটনায় শক্তির গুণমানের কি ধরনের পরিবর্তন ঘটে তা তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্রের ব্যাখ্যা থেকে সহজেই বোঝা যায়। এই সূত্র থেকেই জানা যায় 'কাজে' ব্যবহৃত শক্তির শতকরা 100 ভাগ কার্যকারিতা দেখা যায় না। কাজ করার জন্য ব্যবহৃত শক্তির কিছু পরিমাণ কাজ করতে সাহায্য করে অর্থাৎ পুনর্বার ব্যবহারযোগ্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং অবশিষ্ট পরিমাণ শক্তি অব্যবহারযোগ্য **'তাপশক্তিতে'** রূপান্তরিত হয়।

• • এনট্রপি (Entropy) কি?

বিশ্বসৃষ্টি হচ্ছে ক্রমশ ক্ষয়িত একটি তন্ত্র (a system of decay))। কারণ, এইতন্ত্রে উচ্চমানের সমস্ত প্রকার শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং শক্তির এই রূপান্তরের সঙ্গে পদার্থের পরিবর্তনও ঘটে। উদাহরণ হিসেবে কয়লার দহনজনিত ঘটনা উল্লেখ করা যেতে পারে। দহনের পূর্বে কয়লার অণুগুলি অতি সুশৃঙ্খল অবস্থায় সজ্জিত থাকে কিন্তু দহনের সময় অণুগুলি পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, ফলে কার্বনডাইঅক্সাইড এবং তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন কার্বনডাইঅক্সাইড এলোমেলোভাবে (randomly) বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়ে এবং তাপ এলোমেলোভাবে শূন্যে বিলীন হয়। অর্থাৎ কয়লার দহনের ফলে বিশৃঙ্খলার (disorder) সৃষ্টি হয়। এই বিশৃঙ্খলা (disorder) বা **এলোমেলো অবস্থাকেই (randomness) 'এনট্রপি' বলা হয়।**

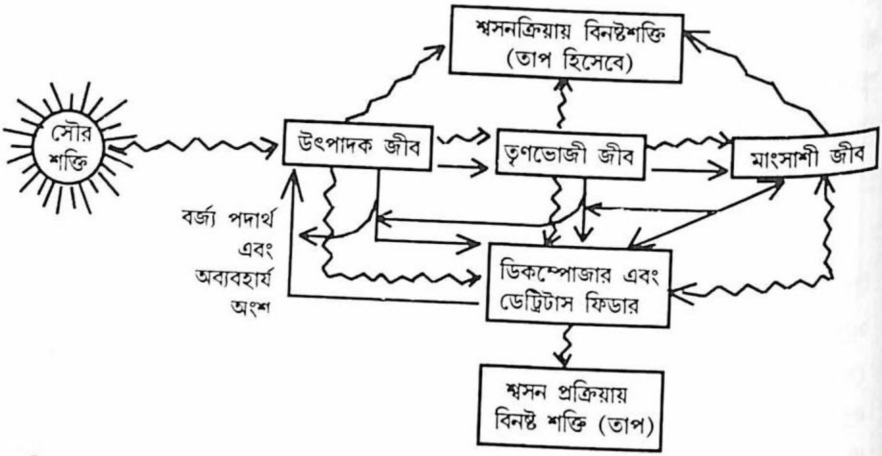
• • জীব কি 'এনট্রপিকে বাধা দিতে পারে?

জীবই কেবল ক্রমবর্ধমান এনট্রপিকে সীমিত সামর্থের মধ্যে বাধা দিতে পারে। বিভিন্ন প্রাণপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে এনট্রপি পশ্চাদমুখী হয়। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া একটি 'অ্যান্টি-এনট্রপিমূলক' ক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় এনট্রপি বর্ধনকারী এবং বায়ুমণ্ডলে এলোমেলোভাবে ঘুরে বেড়ানো কার্বনডাই অক্সাইড অণু নির্দিষ্টভাবে বিন্যস্ত হয়ে জৈব-খাদ্যে রূপান্তরিত হয়। কার্বনডাই অক্সাইডের এই রূপান্তরে যে শক্তির প্রয়োজন তা সূর্যালোক থেকে গৃহীত হয়। প্রোটিন সংশ্লেষ, বৃদ্ধি এবং বংশবিস্তার 'অ্যান্টি এনট্রপিমূলক ক্রিয়ার উদাহরণ।

2. বাস্তুতন্ত্রে শক্তির একমুখীপ্রবাহ :

বাস্তুতন্ত্রের সজীব উপাদান জীব শক্তির রূপান্তরের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে এবং প্রতিটি শক্তিরূপান্তরের ঘটনায় কিছু পরিমাণ শক্তি 'তাপশক্তি রূপে বিনষ্ট হয় (কারণ উৎপন্ন তাপশক্তি জীবদেহে কাজ করতে সাহায্য করে না)। তাই উৎপাদক জীবের মাধ্যমে সূর্যালোক থেকে গৃহীত শক্তি খাদ্যশৃঙ্খলের সদস্য তৃণভোজী জীব, মাংসাশীজীব এবং ডিকম্পোজার জীবের শ্বসন প্রক্রিয়ায় 'তাপ' হিসেবে বিনষ্ট হয়। একজীব থেকে অন্যজীবে শক্তির প্রবাহের পদ্ধতিগত ত্রুটির ফলে এবং প্রতিটি সদস্য জীবের শক্তিরূপান্তরের ঘটনায় উৎপাদক জীব কর্তৃক গৃহীত সৌরশক্তির সবটাই 'তাপ' হিসেবে বিনষ্ট হয়।

অর্থাৎ যোগান শক্তির কোনভাবেই পুনরায় কাজে সাহায্যকারী শক্তিতে প্রত্যাবর্তন ঘটে না (চিত্র 3.15)।



চিত্র 3.15 ঃ বাস্তুতন্ত্রে শক্তির একমুখী এবং পদার্থের চক্রাকার প্রবাহ দেখানো হয়েছে (⤳ শক্তির প্রবাহ, → পদার্থের প্রবাহ)।

3.11. জীবভর এবং বাস্তুসংস্থানগত পিরামিড ঃ (Biomass and Ecological Pyramids)

3.11.1 জীবভর (Biomass) ঃ

(a) 'জীবভর বা 'বায়োমাস' বলতে কি বোঝায়?

উদ্ভিদ এবং অন্যান্য সালোকসংশ্লেষকারী জীবের দ্বারা উৎপন্ন এবং খাদ্যশৃঙ্খলের উপরের ট্রফিক লেভেলের দিকে প্রবাহিত জৈব পদার্থই হচ্ছে জীবভর বা বায়োমাস। যেহেতু বিভিন্ন জীবের জলের পরিমাণ ভিন্ন তাই বায়োমাস নির্ণয়ে জীবের জলীয় উপাদানকে বাদ দেওয়া হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে-বিভিন্ন ট্রফিক লেভেলের জীবদের বায়োমাস একসঙ্গে নির্ণয় করা হয় না, প্রতিটি ট্রফিক লেভেলের বায়োমাস পৃথকভাবে নির্ণয় করা হয়। অর্থাৎ 'বায়োমাস' বলতে যে কোন একটি ট্রফিক লেভেলের বায়োমাস কে বোঝায়।

সংজ্ঞা : **যে কোন একটি ট্রফিক লেভেলের সজীব বস্তুর শুষ্ক ভরকে (dry mass) 'জীবভর' বা 'বায়োমাস' বলা হয়।**

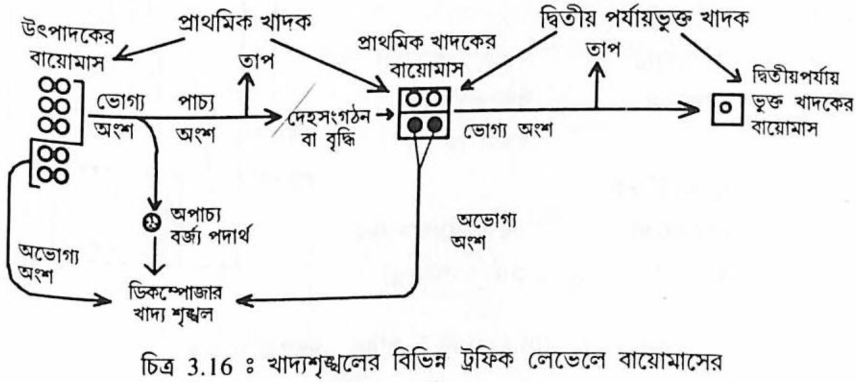
উদাহরণ : 'উদ্ভিদের' বায়োমাস নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি উল্লেখ করা হল। একবর্গমিটার এলাকায় উৎপন্ন মূলসহ গাছপালা সংগ্রহ করার পর তাদের শুকিয়ে ওজন করা হয়। ঐ সময় উদ্ভিদের শুষ্ক ওজন হচ্ছে একবর্গমিটার অঞ্চলের উদ্ভিদের বায়োমাস।

(b) কোন একটি ট্রফিক লেভেলের বায়োমাস পরবর্তী ট্রফিক লেভেলে হ্রাস পায় কেন?

প্রথম ট্রফিক লেভেলের বায়োমাস প্রচুর পরিমাণ স্থিতিশক্তি (রাসায়নিক শক্তি) এবং দ্বিতীয় ট্রফিক লেভেলের কলা-সংগঠক (tissue-building) উপাদান দ্বারা গঠিত। বাস্তুসংস্থানমূলক পরীক্ষায় প্রমাণিত যে- প্রথম ট্রফিক লেভেলের বায়োমাসের পুরোটাই দ্বিতীয় ট্রফিক লেভেলের বায়োমাসে পরিবর্তিত হয় না। অর্থাৎ উদ্ভিদ উপাদানের সবটাই প্রাণী উপাদানে পরিবর্তিত হয় না। সেই কারণে দ্বিতীয় ট্রফিক লেভেলের বায়োমাস প্রথম ট্রফিক লেভেল অপেক্ষা অনেক কম হয়। কিন্তু কারণগুলি কি কি? বায়োমাস হ্রাসের কারণগুলি নিম্নলিখিত ঃ

- প্রথম ঃ যে কোন বাস্তুতন্ত্রে উদ্ভিজ পদার্থের একটি ক্ষুদ্র অংশ পরবর্তী উচ্চ ট্রফিক লেভেলের জীব কতৃক খাদ্য হিসেবে গৃহীত হয়।
- দ্বিতীয় ঃ তৃণভোজী এবং অন্যান্য খাদক জীবের দ্বারা যে পরিমাণ উদ্ভিজ বায়োমাস খাদ্য হিসেবে গৃহীত হয় তার সবটুকুই পাচিত হয় না। কিছু পরিমাণ বায়োমাস অপাচ্য (undigested) বর্জ্য পদার্থ হিসেবে নিষ্কাশিত হয়।
- তৃতীয় ঃ পাচিত বায়োমাসের বেশীর ভাগ অংশ জারিত হয়ে কার্বনডাইঅক্সাইড, জল এবং শক্তি উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন শক্তির কিছু অংশ কাজে ব্যবহৃত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ দৈহিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। উৎপন্ন তাপশক্তির পুরোটাই বিনষ্ট হয় (চিত্র 3.16)।

উপরিউক্ত কারণে দ্বিতীয় ট্রফিকলেভেলের বায়োমাস অত্যধিকরূপে হ্রাস পায়।



চিত্র 3.16 ঃ খাদ্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন ট্রফিক লেভেলে বায়োমাসের চিত্রানুপাতিক হ্রাসপ্রাপ্তি দেখানো হয়েছে।

3.11.2 বাস্তুসংস্থানগত পিরামিড (Ecological Pyramid) ঃ

বাস্তুসংস্থানগত পিরামিড তিন প্রকার—

(a) বায়োমাস বা জীবভরের পিরামিড

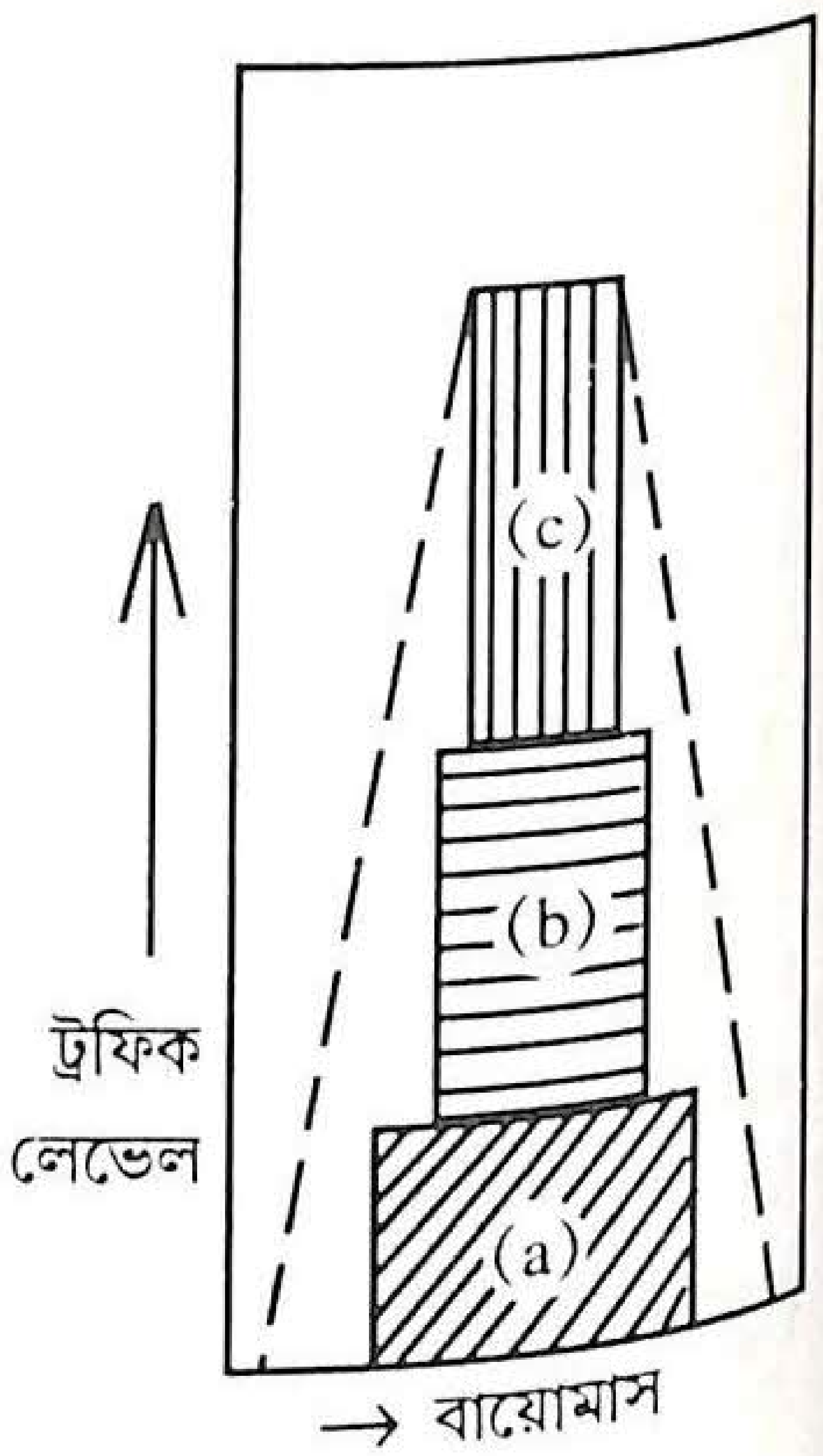
(b) শক্তি'র পিরামিড এবং

(c) সংখ্যা'র পিরামিড

(a) বায়োমাস বা জীবভরের পিরামিড (Pyramid of Biomass)

খাদ্য শৃঙ্খলের প্রথম ট্রফিক লেভেল থেকে উপরের ট্রফিকলেভেলের দিকে বায়োমাসের ক্রমশ হ্রাস ঘটে। **বাস্তুবিজ্ঞানীদের মতে যেকোন ট্রফিক লেভেলে শতকরা দশ ভাগ বায়োমাস পরবর্তী ট্রফিক লেভেলে স্থানান্তরিত হয়। এই ঘটনা 'দশ শতাংশ নীতি' (ten percent rule) নামে পরিচিত।** যদিও পরবর্তী সময়ে গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে বিভিন্ন খাদ্য শৃঙ্খলের ক্ষেত্রে 5 থেকে 20 শতাংশ বায়োমাস কোন একটি ট্রফিক লেভেল থেকে পরবর্তী ট্রফিক লেভেলে স্থানান্তরিত হয়। যে কোন একটি খাদ্যশৃঙ্খলের পর্যায়ক্রমিক ট্রফিক লেভেলের বায়োমাস কে 'X' অক্ষে এবং ট্রফিক লেভেলকে 'Y' অক্ষে স্থাপন করে যে পিরামিডাকৃতি লেখচিত্র পাওয়া যায়, তাকে 'বায়োমাসের পিরামিড' বলা হয় (চিত্র 3.17)।

খাদ্যশৃঙ্খল	ট্রফিকলেভেল এবং বায়োমাস		
দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত খাদক →	তৃতীয় ট্রফিক লেভেলের বায়োমাস	=	সমস্ত মাংসাশী খাদকের শুষ্ক ওজন (c)
↑			
প্রাথমিক খাদক →	দ্বিতীয় ট্রফিক লেভেলের বায়োমাস	=	সমস্ত তৃণভোজী খাদকের শুষ্ক ওজন (b)
↑			
উৎপাদক →	প্রথম ট্রফিক লেভেলের বায়োমাস	=	সমস্ত উৎপাদকের শুষ্ক ওজন (a)



চিত্র 3.17 ঃ 'বায়োমাসের পিরামিড' দেখানো হয়েছে।

(b) শক্তি'র পিরামিড (Pyramid of Energy) ঃ

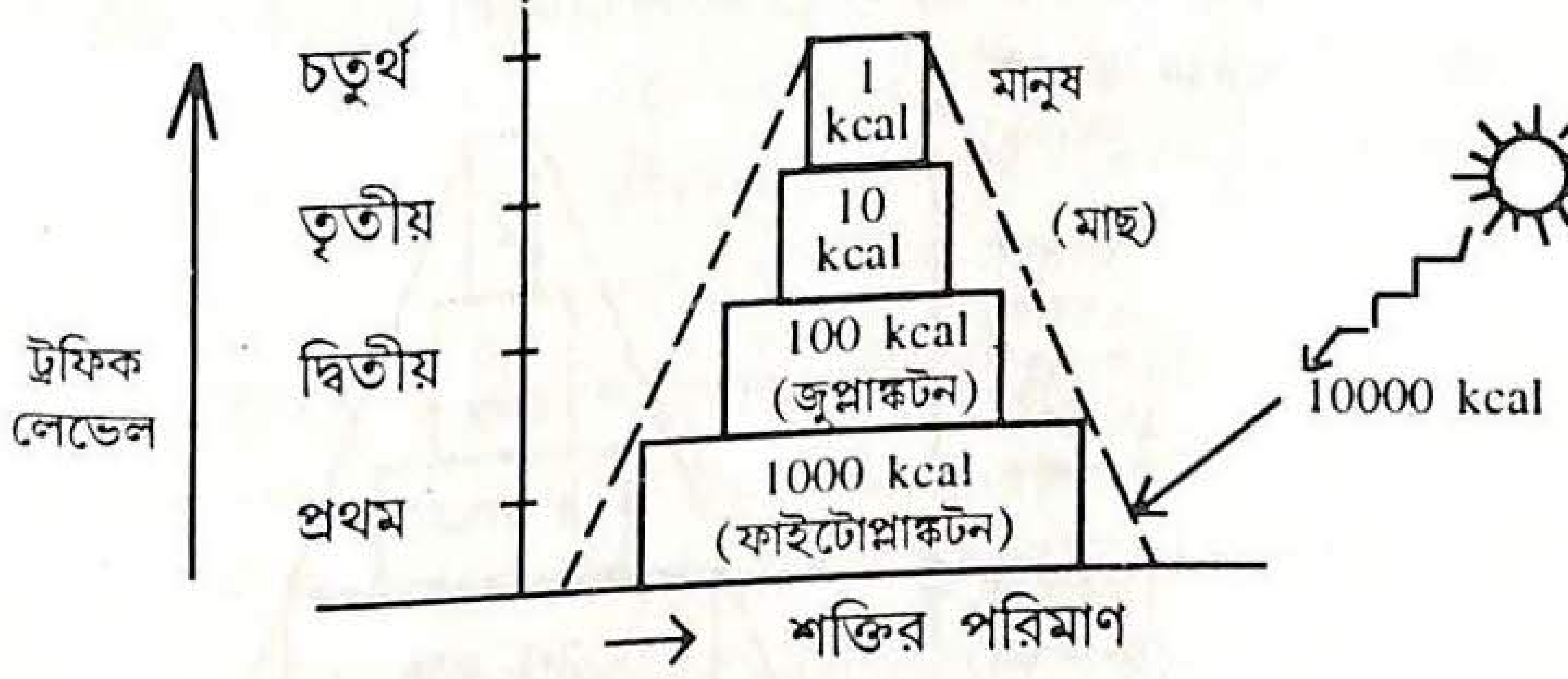
সজীব বস্তুর 'বায়োমাস' গঠনকারী জৈব যৌগের রাসায়নিক বন্ধনী বা বণ্ডে প্রচুর পরিমাণ রাসায়নিক শক্তি সঞ্চিত থাকে। জৈবযৌগের দহনে বা উদ্ভিদ, প্রাণী এবং আণুবীক্ষণিক জীবের কোষে অপচিতিমূলক বিপাকীয় প্রক্রিয়ায় জৈব যৌগের জারণের ফলে সঞ্চিত শক্তির মুক্তি ঘটে। একটি খাদ্য শৃঙ্খলের প্রথম ট্রফিক লেভেল থেকে উপরের দিকে যতই অগ্রসর হওয়া যায় ততই সঞ্চিত শক্তির (বা স্থিতিশক্তির) হ্রাস

ঘটে। ঘটনাক্রম অনুযায়ী দ্বিতীয় ট্রফিক লেভেলের স্থিতিশক্তি প্রথম ট্রফিক লেভেল অপেক্ষা অনেক কম, আবার তৃতীয় ট্রফিক লেভেলের স্থিতিশক্তি দ্বিতীয় ট্রফিক লেভেলের চেয়ে কম। খাদ্যশৃঙ্খলের শক্তি হ্রাসের ঘটনা শেষ ট্রফিক লেভেল পর্যন্ত চলতে থাকে। একটি খাদ্যশৃঙ্খলের পর্যায়ক্রমিক ট্রফিক লেভেল এবং বায়োমাস অন্তর্গত স্থিতিশক্তিকে লেখ'র মাধ্যমে প্রকাশ করলে যে লেখচিত্র পাওয়া যায় তাকে **'শক্তির পিরামিড'** বা **পিরামিড অব এনার্জি** বলা হয়। প্রাপ্ত লেখচিত্রের আকৃতি অনেকটা পিরামিডের মত তাই লেখচিত্রের নামকরণ করা হয় 'পিরামিড অব্ এনার্জি'।

• খাদ্য শৃঙ্খলের উপরের দিকে শক্তির হ্রাস ঘটে কেন?

প্রথম ট্রফিক লেভেলের উৎপাদক জীব সৌরশক্তি থেকে যে পরিমাণ শক্তি জৈবখাদ্যে আবদ্ধ করে তার কিছু পরিমাণ শ্বসনে তাপশক্তি রূপে বিনষ্ট হয়, কিছু পরিমাণ শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়ায় কাজে লাগে এবং অবশিষ্ট পরিমাণ শক্তি বায়োমাসের রাসায়নিক বন্ধনীতে সঞ্চিত থাকে। তাপগতি বিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি যে শক্তি যখন একরূপ থেকে অন্যরূপে রূপান্তরিত হয় তখন কিছু পরিমাণ শক্তি বিনষ্ট হয়। সেই কারণে উৎপাদক জীবের শক্তি রূপান্তরের ঘটনায় আবদ্ধ সৌরশক্তির সবটাই বায়োমাসে সঞ্চিত থাকে না, কিছু পরিমাণ বিনষ্ট হয়। দ্বিতীয় ট্রফিক লেভেলের প্রথম খাদক যে পরিমাণ শক্তি 'উৎপাদক বায়োমাসের' মাধ্যমে গ্রহণ করে তার কিছু পরিমাণ শ্বসন ও বর্জ্য পদার্থের মাধ্যমে তাপ শক্তিরূপে বিনষ্ট হয়, কিছু পরিমাণ শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়ায় কাজে লাগে এবং অবশিষ্ট পরিমাণ শক্তি বায়োমাসে সঞ্চিত থাকে। একই কারণে তৃতীয় ট্রফিক লেভেলের দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত খাদক এবং চতুর্থ ট্রফিক লেভেলের তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত খাদকের বায়োমাসে স্থিতিশক্তির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পায়।

উদাহরণ ঃ একটি জলজ গ্রেজিং খাদ্যশৃঙ্খলের 'পিরামিড অব্ এনার্জি, দেখান হল



চিত্র 3.18 ঃ শক্তির পিরামিড দেখানো হয়েছে।

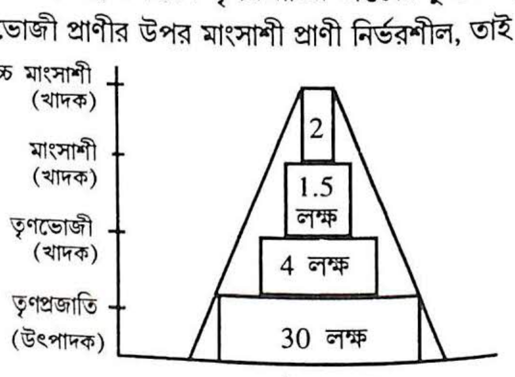
(চিত্র 3.18)। ধরা যাক উৎপাদক-'ফাইটোপ্লাঙ্কটন' 10,000 kcal সৌরশক্তি থেকে মাত্র 1000 kcal শক্তি বায়োমাসে স্থিতিশক্তিরূপে সঞ্চিত রাখে। এইক্ষেত্রে প্রথম খাদক

জুপ্লাঙ্কটনের বায়োমাসে স্থিতিশক্তির পরিমাণ নির্ধারিত হয় 100 kcal। এই 100 kcal স্থিতিশক্তি সম্পন্ন বায়োমাস যখন দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত খাদক 'মাছ' খায়, তখন মাছের বায়োমাসে সঞ্চিত স্থিতিশক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় 10 kcal। এবং চতুর্থ ট্রফিক লেভেলের তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত খাদক মানুষ যখন 10 kcal শক্তি সম্পন্ন মাছের বায়োমাস খায়, তখন মানুষের বায়োমাসে স্থিতিশক্তির পরিমাণ দাঁড়ায় মাত্র 1 kcal।

C) সংখ্যা'র পিরামিড (Pyramid of Numbers) ঃ

আমরা জানি যে বাস্তুতন্ত্রে যে কোন খাদ্য-শৃঙ্খলের সদস্য জীবের বায়োমাস উপরের ট্রফিক লেভেলগুলিতে ক্রমান্বয়ে কমে যায়। যেহেতু খাদ্যশৃঙ্খল গড়ে উঠে জীবের 'খাদক-খাদ্য' সম্পর্ক অনুযায়ী, তাই কোন ট্রফিক লেভেলে জীবের বায়োমাস পরবর্তী উচ্চ ট্রফিক লেভেলের প্রতিপালিত বা নির্ভরশীল জীবের সংখ্যা নির্ধারণ করে। সেই কারণে দ্বিতীয় ট্রফিক লেভেলের প্রথম খাদক জীবের সংখ্যা প্রথম ট্রফিক লেভেলের উৎপাদক জীবের সংখ্যা'র তুলনায় কম হয়, কারণ উৎপাদকের বায়োমাসের সবটুকু প্রথম খাদক দ্বারা গৃহীত হয় না। আবার তৃতীয় ট্রফিক লেভেলের দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত খাদকের সংখ্যা প্রথম খাদক জীবের অপেক্ষা কম হয়, কারণ, প্রথম খাদকের বায়োমাস উৎপাদক বায়োমাসের সমান নয়। বায়োমাসের ক্রমান্বয়ে হ্রাসপ্রাপ্তির কারণে তৃতীয় ট্রফিক লেভেলের জীবের সংখ্যা দ্বিতীয় ট্রফিক লেভেল অপেক্ষা এবং চতুর্থ ট্রফিক লেভেলের জীবের সংখ্যা তৃতীয় ট্রফিক লেভেল অপেক্ষা কম হয়। অতএব **যে কোন খাদ্যশৃঙ্খলের পর্যায়ক্রমিক ট্রফিক লেভেলের সদস্য জীবের মোট সংখ্যা কে সম্পর্কজনিত ট্রফিক লেভেলের বিপরীতে সংস্থাপন করে যে পিরামিডাকৃতি লেখচিত্র পাওয়া যায় তাকে 'সংখ্যার পিরামিড' বা 'পিরামিড অব্ নাম্বার' বলা হয়।**

উদাহরণ : একটি তৃণভূমি- বাস্তুতন্ত্রে উৎপাদক তৃণপ্রজাতির উদ্ভিদের তুলনায় তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যা কম হয়। তৃণভোজী প্রাণীর উপর মাংসাশী প্রাণী নির্ভরশীল, তাই মাংসাশী



চিত্র 3.19 ঃ একটি তৃণক্ষেত্রের 'পিরামিড অব্ নাম্বার' দেখানো হয়েছে।

প্রাণীর সংখ্যা তৃণভোজী প্রাণীর সংখ্যার তুলনায় অনেক কম। আবার মাংসাশী প্রাণীর উপর নির্ভরশীল সর্বোচ্চ মাংসাশী প্রাণীর সংখ্যা সর্বাপেক্ষা কম (চিত্র 3.19) হয়।

● বাস্তুসংস্থানগত দৃষ্টিকোন থেকে কি উপায়ে অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যক মানুষের খাদ্য সমস্যার সমাধান সম্ভব?

বাস্তুসংস্থানগত পিরামিডের ধারণা অনুযায়ী কোন ট্রফিক লেভেলের সদস্য প্রাণীর সংখ্যা পূর্ববর্তী ট্রফিক লেভেলের 'জীবভরের' উপর নির্ভর করে। তাই উপরের ট্রফিক লেভেলগুলিতে প্রাণীর সংখ্যা হ্রাসের মূল কারণ হচ্ছে জীবভরের ক্রমান্বয়িক হ্রাস।

মানুষ খাদ্যশৃঙ্খলের উপরের ট্রফিক লেভেলের এক সদস্য জীব। 'পিরামিড অব্ নাম্বার'এর আলোকে খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তনের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত বেশি সংখ্যক মানুষের প্রতিপালন সম্ভব। এক্ষেত্রে মানুষকে খাদ্যের ব্যাপারে পরভোজী প্রাণীর জীবভরের উপর নির্ভর না করে উদ্ভিদ-জীবভরের উপর প্রতক্ষ্যভাবে নির্ভর করতে হবে। যেহেতু উদ্ভিদ জীবভর পরভোজী প্রাণীর জীবভর অপেক্ষা বেশি, তাই উদ্ভিদ জীবভরের সাহায্যে বেশি সংখ্যক মানুষের বেঁচে থাকা সম্ভব। যেমন 20,000 কিলোক্যালরি শক্তি সমৃদ্ধ খাদ্য-শস্য থেকে 2000 কিলো ক্যালরি শক্তি সমৃদ্ধ মাংস (ছাগল) পাওয়া যেতে পারে এবং ঐ পরিমাণ মাংস একজন মানুষের একদিন বেঁচে থাকার শক্তি সরবরাহ করতে সক্ষম। অপরপক্ষে 20,000 কিলোক্যালরি শক্তি সমৃদ্ধ খাদ্য-শস্য 20 জন মানুষের একদিন বেঁচে থাকার শক্তি সরবরাহ করতে পারে যদি মানুষ প্রত্যক্ষভাবে খাদ্য-শস্যের উপর নির্ভরশীল হয়।

3.12 উৎপাদন বাস্তুসংস্থান (Production Ecology) ঃ

সবুজ উদ্ভিদের দ্বারা সৌরশক্তি জীবভরের রাসায়নিক শক্তি বা 'পোটেনশিয়াল এনার্জিতে রূপান্তরিত হয়। সালোকসংশ্লেষকারী উদ্ভিদের উৎপাদিত জীবভরের উপর হার্বিভোর, কার্নিভোর প্রভৃতি পরভোজী জীবের জীবভরের উৎপাদন নির্ভর করে। সৌরশক্তি সংরক্ষণকারী উদ্ভিদকে 'প্রাথমিক উৎপাদক' (Primary Producers) এবং উদ্ভিদের সংরক্ষিত শক্তির উপর নির্ভরশীল পরভোজী জীবকে 'গৌণ উৎপাদক' (Secondary Producer) বলা হয়। এক্ষেত্রে **জীবভর উৎপাদনের পরিমাপকে উৎপাদন** (Production) বলা হয়।

3.12.1 প্রাথমিক উৎপাদন (Primary Productivity) ঃ

যে হারে সৌরশক্তি প্রাথমিক উৎপাদক বা সবুজ উদ্ভিদের দ্বারা জীবভরের (জৈব খাদ্যবস্তু) রাসায়নিক শক্তি বা স্থিতিশক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাকে 'প্রাথমিক উৎপাদন' বলা হয়। এক বছর সময়ে প্রতিবর্গমিটার অঞ্চলে অবস্থিত উদ্ভিদের দ্বারা বায়োমাসে সংরক্ষিত শক্তির পরিমাণ হচ্ছে কোণ বাস্তুতন্ত্রের প্রাথমিক উৎপাদনের পরিমাপ [কিলোজুল (kJ)/m^2 বছর বছর]। প্রাথমিক উৎপাদনকে দু উপায়ে প্রকাশ করা হয়।

(a) মোট প্রাথমিক উৎপাদন

(b) নীট্ প্রাথমিক উৎপাদন

(a) **মোট প্রাথমিক উৎপাদন** (Gross Primary Productivity) ঃ

সৌর বিকিরণের কত শতাংশ সবুজ উদ্ভিদের ক্লোরোফিল দ্বারা শোষিত হয় এবং জৈব অণুর উৎপাদনে সাহায্য করে তার উপর নির্ভর করে মোট প্রাথমিক উৎপাদন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে একই পরিমাণ সৌরবিকিরণ এসে পৌছায় না, কারণ, পৃথিবীর কোন স্থানে কত পরিমাণ সৌরবিকিরণ এসে পৌছাবে তা নির্ভর করে ঐ স্থানে পৃষ্ঠতলের অবস্থান, উচ্চতা এবং নিরক্ষরেখা থেকে ঐ অঞ্চলের কৌণিক দূরত্ব প্রভৃতি শর্তের উপর। পৃথিবীর কোন স্থানের পৃষ্ঠতলে আপতিত সৌরবিকিরণের 95-99 শতাংশ উদ্ভিদের উপরিতল থেকে প্রতিফলন এবং প্রতিসরণের মাধ্যমে বিনষ্ট হয় এবং বাষ্পীভবনের কাজে ব্যয়িত হয়। অবশিষ্ট শতাংশ সৌরবিকিরণ ক্লোরোফিলের দ্বারা শোষিত হয়ে জৈব খাদ্য অণুতে স্থিতিশক্তিরূপে সঞ্চিত থাকে।

অতএব যে সামগ্রিক হারে উদ্ভিদের দ্বারা জৈব অণুতে রাসায়নিক শক্তির সঞ্চয় ঘটে বা জীবভর উৎপাদিত হয় তাকে '**মোট প্রাথমিক উৎপাদন**' (Gross Primary Production, GPP) বলা হয়।

(b) **নীট্ প্রাথমিক উৎপাদন** (Net Primary Production) ঃ

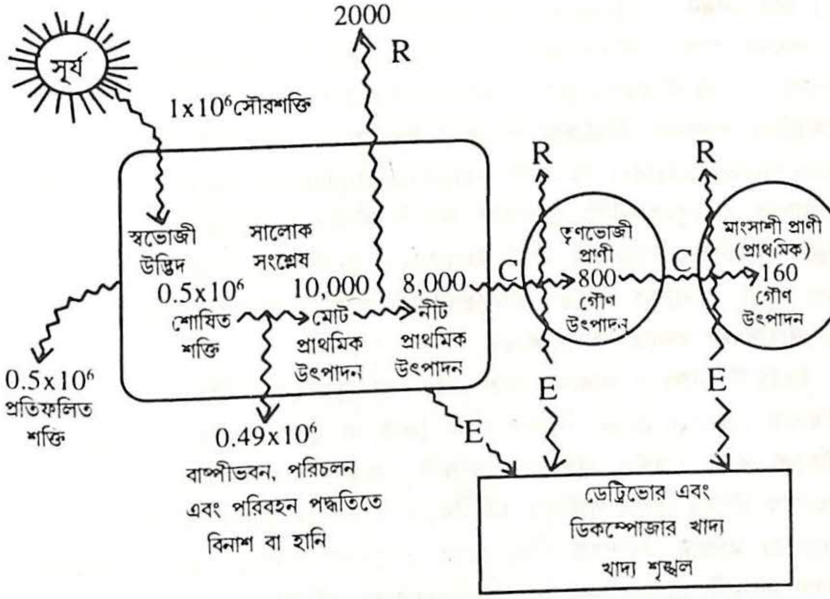
মোট প্রাথমিক উৎপাদনের কিছু অংশ উদ্ভিদের শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত হয় এবং অবশিষ্ট অব্যবহৃত অংশ সঞ্চিত থাকে। শ্বসন প্রক্রিয়ায় (R) জীবভর বা খাদ্যের জৈবঅণুর জারণের ফলে যেশক্তি উৎপন্ন হয় তা উদ্ভিদের নিজের প্রয়োজনে লাগে এবং কিছু অংশ বিনষ্ট হয়। দেখা গেছে যে মোট উৎপাদনের (GPP) 20-50 শতাংশ উদ্ভিদের নিজের প্রয়োজনে ব্যয়িত হয়। **অতএব মোট উৎপাদিত জীবভর থেকে শ্বসন এবং সালোকশ্বসন (Photorespiration) প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত জীবভর বাদ দিয়ে যে অবশিষ্ট পরিমাণ জীবভর সঞ্চিত থাকে তাকে নীট প্রাথমিক উৎপাদন** (NPP) **বলা** হয়। (NPP) কে নিম্নলিখিত সরল গাণিতিক ফর্মূলার সাহায্যে প্রকাশ করা হয়—

$$NPP = GPP - R$$

3.12.2 গৌণ উৎপাদন [Secondary Production] ঃ

হার্বিভোর এবং কার্ণিভোর (গৌণ উৎপাদক) যে পরিমাণ প্রাথমিক উৎপাদন গ্রহণ করে তার কিছু পরিমাণ শ্বসনে (R) ব্যয়িত হয় এবং অবশিষ্ট পরিমাণ সঞ্চিত থাকে। গৌণ উৎপাদক জীবে সঞ্চিত জীবভর বা রাসায়নিক শক্তি বা প্রাথমিক উৎপাদনকে '**গৌণ উৎপাদন**' (Secondary Production) বলা হয়।

> সমুদ্রের মোহানা এবং কোরাল রিফ অধ্যুষিত অঞ্চল, স্থল ভাগের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের অরণ্য, কৃষিকাজে ব্যবহৃত জমি এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলের অরণ্যের মোট প্রাথমিক উৎপাদন সর্বাপেক্ষা বেশি।



চিত্র 3.20 ঃ একটি গ্রেজিং খাদ্যশৃঙ্খলের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রাথমিক এবং গৌণ উৎপাদন দেখানো হয়েছে। R= শ্বসনের দ্বারা শক্তি হ্রাস, E= গ্রেজিং খাদ্যশৃঙ্খল থেকে ডেট্রিভোর খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে শক্তি হ্রাস এবং C= উৎপাদনের উচ্চ ট্রফিক লেভেলে প্রবাহ।

3.13 জীব-কেন্দ্রীভবন এবং জীব-বিবর্ধন (Bioconcentration and Biomagnification) ঃ

(a) **'জীবকেন্দ্রীভবন'** বা **'জীবপুঞ্জীভবন'** (Bioconcentration or Bioaccumulation)

জৈবিক প্রয়োজনে বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান বা যৌগ জীবদেহে পুঞ্জীভূত হয়। জীবদেহে রাসায়নিক পদার্থ পুঞ্জীভবনের এই স্বাভাবিক ঘটনাকে **'জীবপুঞ্জীভবন'** বা **'জীবকেন্দ্রীভবন'** বলা হয়। মানুষের থাইরয়েড গ্রন্থি কোষে 'আয়োডাইড' (Iodide) পুঞ্জীভবনের ঘটনা জীবকেন্দ্রীভবনের একটি উদাহরণ। দেখা গেছে যে রক্তের তুলনায় থাইরয়েড গ্রন্থিকোষে আয়োডাইডের ঘনত্ব প্রায় এক হাজার গুণ বেশি। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীতেও জীবকেন্দ্রীভবনের ঘটনা ঘটে। যথা—'স্ক্যালোপ' (Scallops) প্রজাতির মলাস্কা সমুদ্রের জল থেকে অতি-নির্ধারণমূলক প্রক্রিয়ায় প্রচুর পরিমাণে দস্তা (Zinc), তামা (Copper), ক্যাডমিয়াম এবং ক্রোমিয়াম পুঞ্জীভূত করে। সমুদ্রের জলের তুলনায় স্ক্যালোপ প্রাণীদেহে এই সমস্ত মৌলের ঘনত্ব প্রায় 20 হাজার গুণেরও বেশি।

(b) **জীব-বিবর্ধন** (Biological magnification or Biomagnification)

কখনো কখনো ক্ষতিকারক অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদান বা যৌগ বিশেষ উপায়ে অজান্তে জীবদেহে প্রবেশ করে এবং পুঞ্জীভূত হয়। ফলে জীবদেহে ঐ সমস্ত রাসায়নিক পদার্থের বিষক্রিয়া জনিত অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। জীবদেহে অবিনষ্ট (non-biodegradable) ডি.ডি.টি. (Dichlorodiphenyltrichloroethane) নামক কীটনাশক খাদ্যশৃঙ্খলজনিত সম্পর্কের কারণে জীবদেহে পুঞ্জীভূত হয়। ডি.ডি.টি.র পুঞ্জীভবন জীবকেন্দ্রীভবনের একটি উদাহরণ। ডি.ডি.টি. ছাড়া সীসা ও পারদের যৌগ এবং বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থও জীবকেন্দ্রীভবন প্রক্রিয়ায় জীবদেহে পুঞ্জীভূত হয়।

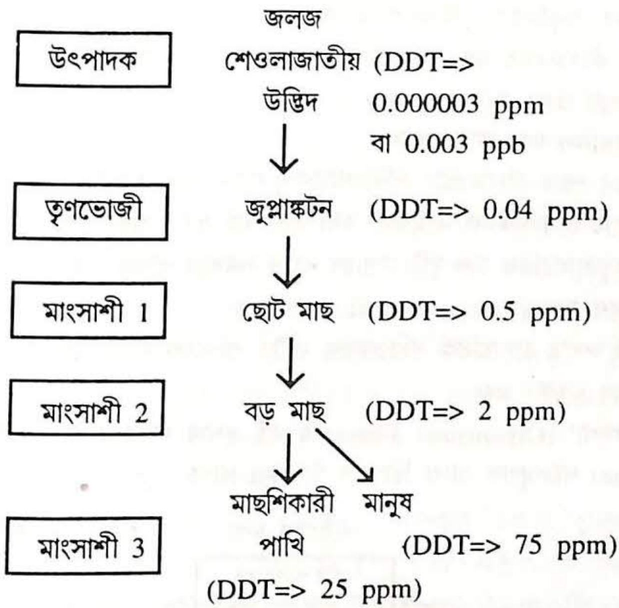
(i) **জীববিবর্ধন বলতে কি বোঝায়?**

ডি.ডি.টি, সীসা ও পারদের যৌগ এবং তেজস্ক্রিয় যৌগ জীবকোষের নির্বিষকরণ প্রক্রিয়ায় (detoxication) নিবিষকৃত বা বিনষ্ট বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না, বহুবছর ধরে অবিকৃত থাকে (অর্থাৎ জীবদেহে অবিনষ্ট থাকে)। খাদ্য-শৃঙ্খলের নীতি অনুযায়ী উৎপাদক জীবের কোষে পুঞ্জীভূত অনির্বিষকৃত ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ জীবভরের (খাদ্যের) মাধ্যমে উৎপাদক জীব থেকে তৃণভোজী প্রাণীতে এবং তৃণভোজীপ্রাণী থেকে মাংসাশী প্রাণীতে সঞ্চারিত হয়। সঞ্চারণের এই ঘটনায় খাদ্যশৃঙ্খলের উপরের ট্রফিক লেভেলের সদস্য জীবে পুঞ্জীভবনের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ে বা বিবর্ধন ঘটে। অর্থাৎ উৎপাদক জীবে সবথেকে কম, তৃণভোজী জীবে উৎপাদকজীবের তুলনায় বেশি, প্রথম পর্যায়ভুক্ত মাংসাশী জীবে তৃণভোজী জীবের তুলনায় বেশি এবং সর্বোচ্চ মাংসাশী জীবে সর্বাপেক্ষা বেশি সঞ্চিত থাকে। **খাদ্যশৃঙ্খলের পর্যায়ক্রমিক ট্রফিক লেভেলে অনির্বিষকৃত ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থের পুঞ্জীভবনের ক্রমান্বয়িক পরিমাণ বৃদ্ধির ঘটনাকে 'জীব বিবর্ধন' বা 'বায়োম্যাগ্‌নিফিকেশান' বলে।**

(ii) **বাস্তুতন্ত্রে ডি.ডি.টি.র জীববিবর্ধন** (Biomagnification of DDT in Ecosystem) :

শস্যের ক্ষতিকারক ছত্রাক, ভাইরাস, পতঙ্গ এবং ভেক্টর পতঙ্গের মারণক্রিয়ায় ডি.ডি.টি'র ভূমিকা সর্বজনবিদিত (বিভিন্ন উন্নত দেশে ডিডিটির উৎপাদন এবং ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হলেও ভারতসহ তৃতীয়বিশ্বের দেশে ডিডিটি'র উৎপাদন এবং ব্যবহার এখনও বাধাহীন)। ডিডিটি'র অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের ফলে মৃত্তিকা, জল এবং বায়ুতে ডিডিটি'র সংক্রমণ ঘটছে, ফলে স্থলজ এবং জলজ বাস্তুতন্ত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে।

উদাহরণ হিসেবে জলজ বাস্তুতন্ত্রে ডিডিটির জীববিবর্ধন উল্লেখ করা যায়। জলে সংক্রমিত ডিডিটি প্রথমে উৎপাদক উদ্ভিদ কোষে (যথা শেওলা জাতীয় উদ্ভিদে) পুঞ্জীভূত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্যশৃঙ্খলজনিত সম্পর্কের কারণে উদ্ভিদ থেকে জুপ্লাঙ্কটন, ছোট মাছ, বড় মাছ, মাছশিকারী পাখি (যথা—অসপ্রে, কিংফিশার (মাছরাঙ্গা), পেলিকান, পেরেগ্রিন প্রভৃতি) বা মানুষের শরীরে জীববিবর্ধিত হয় (চিত্র 3.21)।



চিত্র 3.21 ঃ একটি জলজ খাদ্যশৃঙ্খলে ডি.ডি.টি-র জীব বিবর্ধন দেখানো হয়েছে (ppm : parts per million, ppb : parts per billion)।

(iii) ডি.ডি.টি'র জীব বিবর্ধনজনিত প্রভাব (Effects of Biomagnified DDT) ঃ

জীবকোষে ডিডিটি'র পুঞ্জীভবনের মূল কারণ হচ্ছে—ডি.ডি.টির লিপিড দ্রাব্যতা। লিপিড দ্রাব্য হওয়ায় ডিডিটি সহজেই কোষ ঝিল্লী ভেদ করে কোষে প্রবেশ করে এবং বিশেষ করে চর্বিকোষে অবস্থানের জন্য জায়গা করে নেয়। তাছাড়া কোষীয় উৎসেচকের প্রভাবে ডিডিটি অধিকতর সক্রিয় যৌগে রূপান্তরিত হয়। এই ঘটনা **'জীবসক্রিয়তা'** (bioactivation) নামে পরিচিত। ডিডিটি'র এরূপ একটি সক্রিয় রূপ হল ডি.ডি.ই (DDE)।

সর্বাপেক্ষা উপরের কার্নিভোর জীব ডিডিটি'র দ্বারা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাছশিকারী পাখির বংশবৃদ্ধি রোধ (পাখির ডিমের খোলক নরম হওয়ায় অধিকাংশ ভ্রূণের বিকাশ সম্ভব হয় না, কারণ ডিডিটি ক্যালসিয়াম ডিপোজিশানকারী হরমোনের মাত্রার পরিবর্তন ঘটায়), মানুষের কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রে নিউরোনের অপজনন, স্নায়বিক দৌর্বল্য, পেশীর শিথিলতা এবং স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের অক্রিয়তা প্রভৃতি ডিডিটি'র দীর্ঘস্থায়ী ক্ষতিকারক প্রভাবের উদাহরণ।

3.14 জীবভূরাসায়নিক চক্র (Biogeochemical cycle) বা পরিপোষক চক্র (Nutrient cycle)

একটি দেশের অর্থনীতি যেমন মানুষের (গ্রাহক) কাছে কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্যাদির সরবরাহের উপর নির্ভর করে, ঠিক একই ভাবে জীব জগতের অর্থনীতি নির্ভর করে উদ্ভিদ (উৎপাদক) থেকে প্রাণীতে (গ্রাহক) **'জীবভর'** এবং অজৈব বস্তুর প্রবাহ বা

সরবরাহের উপর। প্রকৃতিতে পুষ্টিপদার্থ বা পরিপোষকের প্রবাহ ঘটে চক্রাকারে। ভৌত পরিবেশ থেকে জীবজগতে এবং জীবজগত থেকে পুনরায় ভৌত পরিবেশে পরিপোষক উপাদানের চিরন্তন প্রবাহ ঘটে।

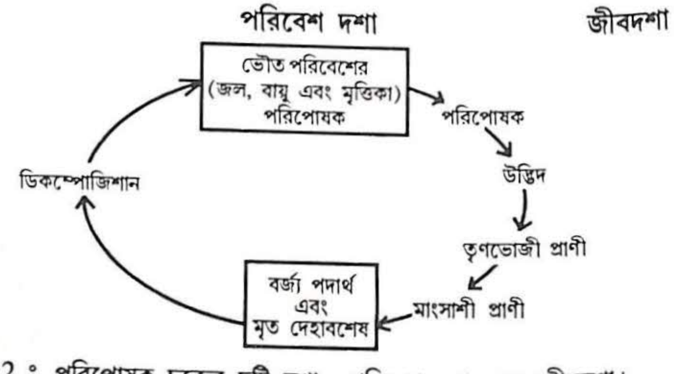
(a) **জীবভূরাসায়নিক চক্র কাকে বলে?**

যে চক্রাকার পথে জীবমণ্ডলে পরিপোষকের প্রবাহ ঘটে তাকে **'জীবভূরাসায়নিক চক্র'** বা **'বায়োজিওকেমিক্যাল সাইকল্'** বলা হয়। এই চক্র **'পরিপোষক চক্র'** নামেও পরিচিত। জীবভূরাসায়নিক চক্র দুটি সাধারণ দশার সমন্বয়ে পরিচালিত (চিত্র 3.22)—

(i) **পরিবেশ দশা** (Environmental Phase) ঃ

চক্রের এই দশায় রাসায়নিক পরিপোষক ভৌত পরিবেশ অর্থাৎ মৃত্তিকা, জল এবং বায়ুতে বিদ্যমান থাকে। এবং

(ii) **'জীবদশা'** (Organismic Phase) ঃ এই দশায় পরিপোষক জীবের সজীব কলা'র (tissue) গঠনমূলক অংশ হিসেবে উপস্থিত থাকে।



চিত্র 3.22 ঃ পরিপোষক চক্রের দুটি দশা—পরিবেশ দশা এবং জীবদশা।

(b) **ম্যাক্রোপরিপোষক** (Macronutrients) এবং **মাইক্রোপরিপোষক** (Micronutrients) ঃ

প্রকৃতিতে প্রাপ্ত 92টি মৌলিক পদার্থের মধ্যে 40টি জীবনের অস্তিত্বের জন্য অত্যাবশ্যক। উপরিউক্ত 40টি মৌলের 6টি মৌল যথা— কার্বন (C) ; হাইড্রোজেন (H); অক্সিজেন (O) ; নাইট্রোজেন (N) ; ফসফরাস (P) ; এবং সালফার (S)—উদ্ভিদ, প্রাণী এবং জীবাণুর 95 শতাংশ জীবভর সৃষ্টি করে। উপরের 6টি এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় মৌল প্রচুর পরিমাণে জীবের প্রয়োজন হয় বলে এদের **'ম্যাক্রোপরিপোষক'** বলা হয়। অপরপক্ষে কিছু মৌল যথা—লোহা (Fe), তামা (Cu), দস্তা (Zn) এবং আয়োডিন (I) প্রভৃতি খুব কম পরিমাণে প্রয়োজনে লাগে, তাই এদের **'মাইক্রোপরিপোষক'** বলা হয়।

(c) **জীবভূরাসায়নিক চক্র** ঃ আলোচ্য অধ্যায়ে চারটি পরিপোষক উপাদানের জীবভূরাসায়নিক চক্র আলোচনা করা হল।

3.14.1 কার্বন চক্র (Carbon Cycle) ঃ

(I) **কার্বনের উৎস ঃ** ভৌত পরিবেশে এবং জীব-পরিবেশে কার্বন বিভিন্ন যৌগ রূপে বিদ্যমান (বা অস্তিমান) থাকে। ভৌতপরিবেশের বায়ুমণ্ডলে গ্যাসীয় কার্বনডাইঅক্সাইড (CO_2) রূপে, সমুদ্রের জলে কার্বোনেট এবং বাইকার্বোনেট আয়নরূপে এবং মৃত্তিকাস্তরে সঞ্চিত জীবাশ্ম জ্বালানীর (কয়লা, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস) উপাদান হিসেবে কার্বন পাওয়া যায়। বায়ুমণ্ডলের ট্রপোস্ফিয়্যার স্তরেই কার্বনডাইঅক্সাইড উপস্থিত থাকে এবং এই স্তরে প্রাপ্ত কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ খুব কম (330 ppm বা আয়তনের 0.032 শতাংশ)। উল্লেখ্য, সমুদ্রের জলে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বায়ুমণ্ডলের তুলনায় প্রায় 50 গুণ বেশি থাকে। জীব পরিবেশের সদস্য উদ্ভিদ, প্রাণী এবং জীবাণু যে সমস্ত প্রোটিন, লিপিড এবং কার্বোহাইড্রেট জাতীয় বৃহৎ-অণু (macromolecules) দ্বারা গঠিত তাদের সংগঠক উপাদান হিসেবে কার্বন বর্তমান থাকে।

(II) **কার্বনচক্র বলতে কি বোঝায়?**

জীবজগতের অস্তিত্বের জন্য 'মৌল কার্বন' অত্যাবশ্যক। ভৌত পরিবেশের 'কার্বন' কার্বনডাইঅক্সাইড রূপে উদ্ভিদ কর্তৃক গৃহীত হয় এবং পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে প্রাণীদেহে প্রবাহিত হয়। উদ্ভিদ এবং প্রাণীদেহ থেকে কার্বন বিশেষ প্রক্রিয়ায় কার্বনডাই-অক্সাইড রূপে ভৌতপরিবেশে ফিরে যায় এবং ভৌতপরিবেশ থেকে পুনরায় জীবপরিবেশে গৃহীত হয়। **ভৌতপরিবেশ থেকে জীবপরিবেশে এবং জীবপরিবেশ থেকে ভৌতপরিবেশে কার্বনের চক্রাকার প্রবাহকে 'কার্বনচক্র' বলা হয়।** কার্বনের এরূপ চক্রাকার প্রবাহ এবং ভৌতপরিবেশের সঙ্গে জীবের সুষম আন্তঃক্রিয়ার ফলে পরিবেশে (বিশেষ করে বায়ুমণ্ডলে) কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ নির্দিষ্ট মাত্রায় বজায় থাকে।

(III) **কার্বনচক্রের পদ্ধতি ঃ** কার্বনচক্রের পদ্ধতি ভৌতপরিবেশ থেকে জীবপরিবেশে এবং জীবপরিবেশ থেকে ভৌতপরিবেশে অন্তর্প্রবাহ এবং বহির্প্রবাহের উপর নির্ভর করে।

(i) **ভৌতপরিবেশ থেকে জীবপরিবেশে কার্বনের প্রবাহ ঃ** ভৌতপরিবেশের বা বায়ুমণ্ডলের কার্বনডাইঅক্সাইড উদ্ভিদ এবং শৈবাল কর্তৃক গৃহীত হয় এবং সৌরশক্তির সাহায্যে জৈব খাদ্য অণুতে রূপান্তরিত হয়। উদ্ভিদ এবং শৈবাল জাতীয় উদ্ভিদে কার্বনডাইঅক্সাইড আত্মীকরণের এই পদ্ধতিকে **'সালোকসংশ্লেষ'** বলা হয়।

$$\left[\begin{array}{l} 6CO_2 + 6H_2O + E \longrightarrow C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \\ \text{কার্বনডাইঅক্সাইড + জল + সৌরশক্তি} \longrightarrow \text{গ্লুকোজ + অক্সিজেন} \end{array}\right]$$

সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন জৈব অণু অবশেষে খাদ্য জালিকার মাধ্যমে অসালোকসংশ্লেষকারী জীব তথা প্রাণীদেহে সঞ্চারিত হয়। অর্থাৎ গ্রেজিং এবং ডিকম্পোজার খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে কার্বন বায়ুমণ্ডল থেকে 'জীব দশা'য় প্রবাহিত হয়।

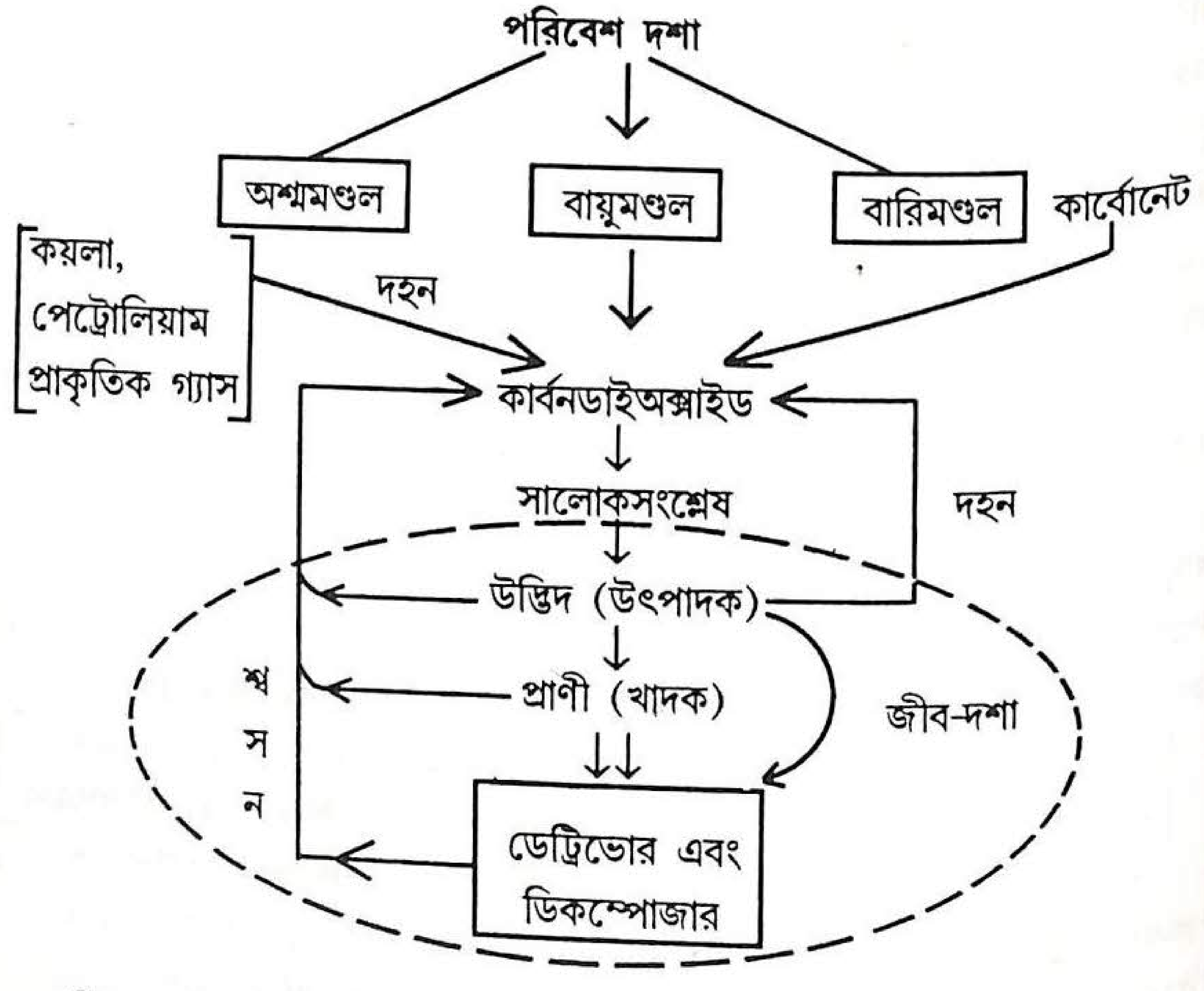
(ii) **জীবপরিবেশ থেকে ভৌতপরিবেশে কার্বনের প্রত্যাবর্তন ঃ** বিভিন্ন উপায়ে কার্বন জীবপরিবেশ থেকে ভৌতপরিবেশে ফিরে আসে। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং প্রধান পদ্ধতি

হল — উদ্ভিদ এবং প্রাণীর **'কোষীয় শ্বসন'** (Celullar respiration)। এই প্রক্রিয়ায় কার্বন সমৃদ্ধ জৈব অণু অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয় এবং শক্তি, তাপ এবং কার্বনডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় (বিপরীত সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া)। কোষীয় শ্বসনে উৎপন্ন কার্বনডাইঅক্সাইড ভৌতপরিবেশ তথা বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায় এবং পুনরায় উদ্ভিদ কর্তৃক গৃহীত হয়।

$$\left[\begin{array}{l} C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + E + h \\ \text{গ্লুকোজ} + \text{অক্সিজেন} \rightarrow \text{কার্বনডাইঅক্সাইড} + \text{জল} + \text{শক্তি} + \text{তাপ} \end{array}\right]$$

- উদ্ভিদ এবং প্রাণীর শ্বসন প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে ডেট্রিভোর এবং ডিকম্পোজার জীব (ব্যাক্‌টিরিয়া, ছত্রাক ইত্যাদি) যখন প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত দেহাবশেষ থেকে শ্বসন প্রক্রিয়ায় শক্তি আহরণ করে, তখন শ্বসনে উৎপন্ন কার্বনডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে মুক্ত হয়। প্রাকৃতিক উপায়ে (বিদ্যুৎপাতের দ্বারা) অরণ্য দহনের ফলে উদ্ভিদ জীবভরে আবদ্ধ 'কার্বন' কার্বনডাইঅক্সাইড রূপে বায়ুমণ্ডলে মুক্ত হয়।

প্রাকৃতিক পদ্ধতি ছাড়া মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলেও বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইডের মুক্তি ঘটে। কাঠ, কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পেট্রোলিয়াম দহনের ফলে প্রভূত পরিমাণে কার্বনডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে জমা হয়।



চিত্র 3.23 ঃ পরিবেশের 'কার্বনচক্র' দেখানো হয়েছে। সালোকসংশ্লেষের দ্বারা কার্বনডাইঅক্সাইড ভৌতপরিবেশ থেকে জীবপরিবেশে প্রবেশ করে এবং শ্বসন ও দহনের মাধ্যমে কার্বনডাইঅক্সাইড জীব-পরিবেশ থেকে ভৌত পরিবেশে ফিরে যায়।

• কার্বনচক্রের ভারসাম্য এবং মানুষের ভূমিকা ঃ

বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ নির্ভর করে ভৌতপরিবেশ থেকে জীবপরিবেশে কার্বনডাইঅক্সাইডের আত্মীকরণ বা যোগান (input) এবং জীবপরিবেশ থেকে ভৌতপরিবেশে কার্বনডাইঅক্সাইডের উৎপাদের (output) মধ্যে সুষম আন্তঃক্রিয়ার উপর। কিন্তু মানুষের অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপের ফলে কার্বনডাইঅক্সাইডের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ব্যবহার বা যোগান কমে যাচ্ছে। ফলে বায়ুমণ্ডলে সঞ্চিত কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়ছে (1870 খ্রীঃ থেকে 1995 খ্রীঃ পর্যন্ত পৃথিবীর মোট কার্বন ডাইঅক্সাইডের 19 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে)। বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইড-এর পরিমাণ বৃদ্ধি বায়ুদূষণের (air pollution) একটি অন্যতম প্রধান কারণ। নিম্নলিখিত মনুষ্যজনিত কারণ বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইড বৃদ্ধির জন্য দায়ী (10×10^{12} কেজি/বছর)—

(i) ভূগর্ভে সঞ্চিত কার্বন সমৃদ্ধ যৌগ — কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি **জীবাশ্ম জ্বালানীর** (Fossil fuels) ক্রমবর্ধমান ব্যবহার (কারণ জীবাশ্ম জ্বালানীর দহনে প্রচুর পরিমাণ কার্বনডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়)।

(ii) পৃথিবীর ভূখণ্ডে বাধাহীন অরণ্যনিধন (deforestation) এবং সবুজ আচ্ছাদনের অবলুপ্তি (ফলে বাতাসের কার্বনডাইঅক্সাইডের যোগান বা ব্যবহার হ্রাস পায়)।

3.14.2 **নাইট্রোজেন চক্র** (Nitrogen Cycle) ঃ

I. নাইট্রোজেনের উৎস ঃ

নাইট্রোজেন জীবনের একটি অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক উপাদান। প্রোটিন গঠনকারী অণু 'অ্যামাইনো অ্যাসিড', বংশগতির বস্তু **রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড** (RNA) ও **ডিঅক্সিরাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড** (DNA) প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় জৈব-অণুর একটি উপাদান হচ্ছে নাইট্রোজেন। ভৌতপরিবেশের বায়ুমণ্ডলে পর্যাপ্ত পরিমাণ নাইট্রোজেন—নাইট্রোজেন গ্যাস (N_2) হিসেবে বিদ্যমান থাকে (গ্যাসীয় নাইট্রোজেনের পরিমাণ বায়ুর মোট আয়তনের 79 শতাংশ)। অর্থাৎ জীবজগতে নাইট্রোজেনের উৎস হচ্ছে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন গ্যাস।

II. নাইট্রোজেন চক্র বলতে কি বোঝায়?

বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন গ্যাস পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও উদ্ভিদ বা প্রাণী গ্যাসীয় নাইট্রোজেন সংগ্রহ করতে পারে না। গ্যাসীয় নাইট্রোজেন বিশেষ পদ্ধতিতে নাইট্রেট (NO_3^-) বা অ্যামোনিয়ায় (NH_3) পরিবর্তিত হয় এবং উদ্ভিদ এই অবস্থায় নাইট্রোজেন

সংগ্রহ করে। প্রাণী উদ্ভিদ জীবভরের (খাদ্যের) মাধ্যমে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে। বিপরীতক্রমে উদ্ভিদ এবং প্রাণীদেহ থেকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন গ্যাসীয় আকারে বাতাসে মুক্ত হয় এবং বাতাসের নাইট্রোজেন পুনরায় উদ্ভিদ কর্তৃক সংগৃহীত হয়। বায়ুমণ্ডল থেকে জীবজগৎ এবং জীবজগৎ থেকে বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনের এরূপ চক্রাকার প্রবাহকে **'নাইট্রোজেন চক্র'** বলা হয়।

বায়ুমণ্ডল ⟶ জীবজগৎ
(N_2) (N_2)

III. **নাইট্রোজেন চক্রের পদ্ধতি ঃ**

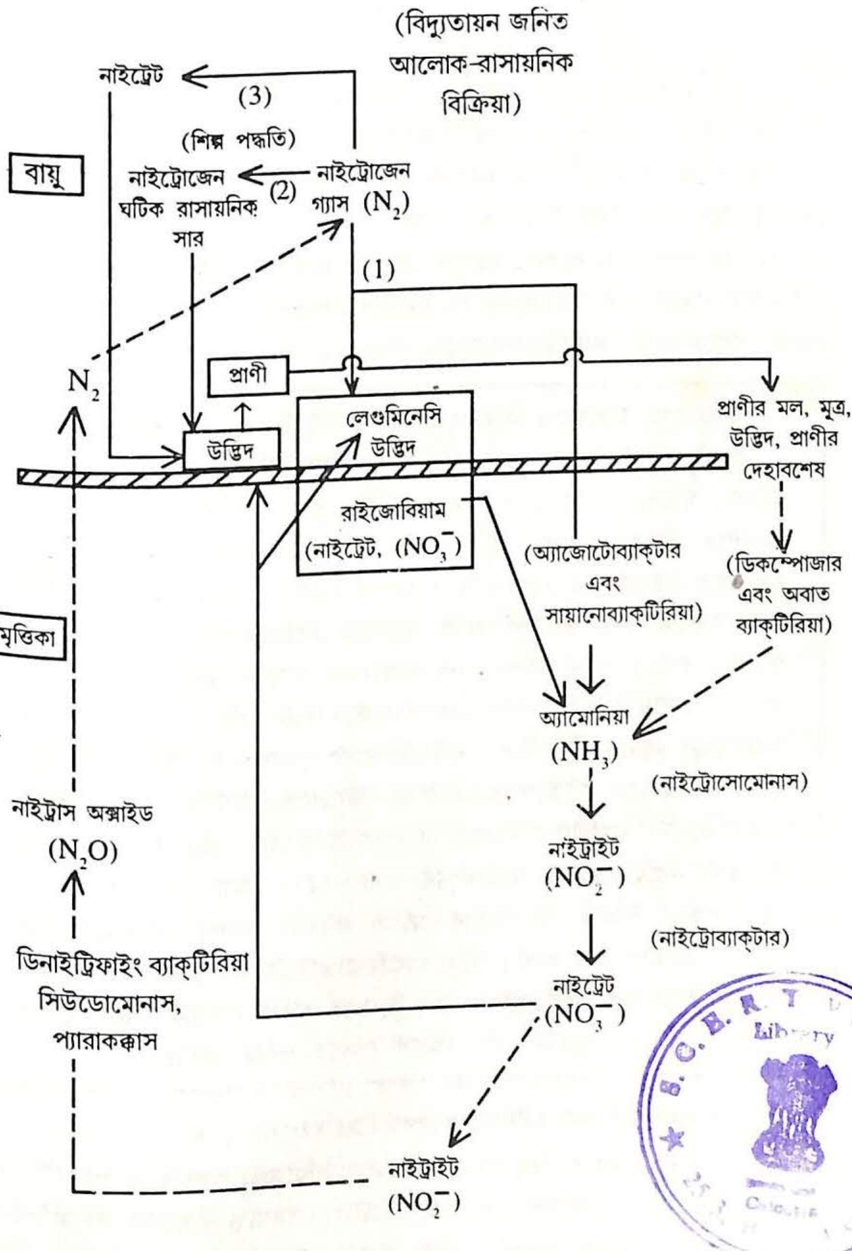
(a) বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় নাইট্রোজেনকে উদ্ভিদের ব্যবহারোপযোগী করার জন্য মৃত্তিকা এবং উদ্ভিদের মূলে বসবাসকারী ব্যাক্‌টিরিয়া নাইট্রোজেন গ্যাসকে অ্যামোনিয়া (NH_3) এবং নাইট্রেটে (NO_3^-) রূপান্তরিত করে। যে প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় নাইট্রোজেন অ্যামোনিয়া বা নাইট্রেটে রূপান্তরিত বা স্থায়ীকৃত হয়, তাকে **'নাইট্রোজেন স্থায়ীকরণ'** (Nitrogen Fixation) বলা হয়।

মটর, বিন, আলফালফা প্রভৃতি লেগুমিনেসি (Leguminasae) গোত্রীয় উদ্ভিদ মূলের **'নডিউলে'** বসবাসকারী **'রাইজোবিয়াম'** (Rhizobium) নামক ব্যাক্‌টিরিয়া গ্যাসীয় নাইট্রোজেনকে সরাসরি 'নাইট্রেটে' স্থায়ীকৃত করে। এছাড়া মৃত্তিকায় বসবাসকারী— অ্যাজোটোব্যাক্‌টার (Azotobacter), সায়ানোব্যাক্‌টিরিয়া (Cyanobacteria) এবং ক্লসট্রিডিয়াম (Clostridium) ব্যাক্‌টিরিয়া গ্যাসীয় নাইট্রোজেনকে 'অ্যামোনিয়ামে' স্থায়ীকৃত করে। উৎপন্ন অ্যামোনিয়া 'নাইট্রোসোমোনাস' (Nitrosomonas) ব্যাক্‌টিরিয়ার দ্বারা নাইট্রাইটে (NO_2^-) এবং পরে নাইট্রাইট (NO_2^-) 'নাইট্রোব্যাক্‌টার' (Nitrobacter) দ্বারা নাইট্রেটে (NO_3^-) পরিবর্তিত হয়।

(b) উদ্ভিদ নাইট্রেট যৌগের মাধ্যমে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে এবং আত্মীকৃত নাইট্রোজেনের সাহায্যে প্রোটিন, RNA এবং DNA প্রভৃতি জৈব অণু সংশ্লেষ করে। উদ্ভিদ জীবভরের মাধ্যমে উদ্ভিদ থেকে তৃণভোজী প্রাণীতে এবং তৃণভোজী প্রাণী থেকে মাংসাশী প্রাণীদেহে নাইট্রোজেন সঞ্চারিত হয়। মানুষ উদ্ভিদজাত খাদ্য এবং মাংসাশী প্রাণীর মাধ্যমে নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে।

(c) প্রাণীর নাইট্রোজেন ঘটিত মল, মূত্র এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর মৃত দেহাবশেষ থেকে বিভিন্ন সবাত ও অবাত ব্যাক্‌টিরিয়া, এবং ছত্রাকের মাধ্যমে প্রথমে অ্যামোনিয়া এবং পরবর্তীধাপে অ্যামোনিয়া থেকে নাইট্রেট উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন নাইট্রেটের কিছুঅংশ নাইট্রোজেন গ্যাস রূপে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায় এবং অবশিষ্ট অংশ উদ্ভিদ সংগ্রহ করে।

(d) মৃত্তিকা এবং সমুদ্রে স্থায়ীকৃত নাইট্রেটের কিছু অংশ 'সিউডোমোনাস' (Pseudomonas) এবং 'প্যারাকক্কাস' (Paracoccus) নামক ডিনাইট্রিফাইং ব্যাক্‌টিরিয়ার



চিত্র 3.24 ঃ নাইট্রোজেন চক্র দেখানো হয়েছে। (1) নাইট্রোজেনের জীব স্থায়ীকরণ, (2) শিল্প পদ্ধতিতে কৃত্রিম স্থায়ীকরণ এবং (3) বিদ্যুতায়নজনিত স্থায়ীকরণ।

দ্বারা প্রথমে নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O) এবং পরে নাইট্রোজেন (N_2) গ্যাসে পরিবর্তিত হয় এবং উৎপন্ন নাইট্রোজেন বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। এইভাবে নাইট্রোজেন চক্র সম্পূর্ণ হয়।

(e) জীব-স্থায়ীকরণ প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে ঝড়-ঝঞ্ঝা বা বজ্রনির্ঘোষ জনিত বিদ্যুতায়নের ফলে পর্যায়ক্রমিক আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাহায্যে নাইট্রোজেন নাইট্রেটে পরিবর্তিত হয়। বায়ুমণ্ডলে এইভাবে উৎপন্ন নাইট্রেট বৃষ্টির মাধ্যমে মৃত্তিকা এবং সমুদ্রে অধঃক্ষিপ্ত হয়। মৃত্তিকায় সঞ্চিত নাইট্রেট উদ্ভিদ সংগ্রহ করে।

(f) সর্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ বায়ুমণ্ডলীয় নাইট্রোজেন স্থায়ীকৃত হয় কৃত্রিম উপায়ে, অর্থাৎ শিল্প পদ্ধতিতে নাইট্রোজেন ঘটিত রাসায়নিক সার উৎপাদনের মাধ্যমে। রাসায়নিক সারের মাধ্যমে উদ্ভিদ নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে।

• মানুষের হস্তক্ষেপে কিভাবে প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন চক্র প্রভাবিত হয়?

প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন চক্রে নাইট্রোজেন মৌল বিভিন্ন আকারে বায়ু থেকে মৃত্তিকা, মৃত্তিকা থেকে উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদ থেকে প্রাণীতে সঞ্চারিত হয়। অবশেষে জীবজগৎ থেকে মৃত্তিকা এবং বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে। এইভাবে প্রকৃতিতে নাইট্রোজেন চক্র অবিরাম চলতে থাকে, কখনোই থেমে যায় না। কিন্তু বর্তমান কৃষি পদ্ধতির ফলে প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন চক্র ভীষণভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। যেমন কতিপয় দানাশস্য (যথা : ভুট্টা) মৃত্তিকা থেকে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন শোষণ করে থাকে, ফলে প্রতি এক বছর অন্তর (alternate year) যদি মৃত্তিকায় নাইট্রোজেনের পুনর্বাসন না করা যায়, তাহলে মৃত্তিকা বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে নাইট্রোজেন স্থায়ীকরণকারী উদ্ভিদের (লেগুমিনেসি) চাষাবাদের মাধ্যমে বা জৈবনাইট্রোজেন ঘটিত সারের মাধ্যমে মৃত্তিকার নাইট্রোজেনের অভাবপূরণ করা সম্ভব। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অপরিকল্পিত উপায়ে প্রয়োজনের অধিক নাইট্রেট সম্পন্ন রাসয়নিক সার মৃত্তিকায় প্রয়োগ করা হচ্ছে। ফলে প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন চক্র বিঘ্নিত হচ্ছে। তাছাড়া রাসায়নিক সারপ্রয়োগের ফল হিসেবে অধিক নাইট্রেট মৃত্তিকা থেকে নদী, খাল এবং পুকুরের জলে মিশে জলকে দূষিত করছে।

3.14.3 ফসফরাস চক্র (Phosphorus Cycle) :

জীবের দেহ গঠনকারী কিছু বৃহৎ-জৈব অণুর অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে ফসফেট। এই ফসফেটের একটি গঠন উপাদান 'ফসফরাস' মৌল। সেইহেতু জীবদেহে ফসফেট রূপে ফসফরাস বর্তমান থাকে। বংশগতির বস্তু—DNA এবং RNA ; অস্থি (bone) এবং কোষ-ঝিল্লির (cell-membrane) গঠনকারী উপাদান 'ফসফোলিপিডের' একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন হচ্ছে ফসফেট।

I. ফসফরাসের উৎস :

যেহেতু ফসফরাস চক্রের দুটি দশা—পরিবেশ দশা এবং জীব দশা, তাই ফসফরাস 'ভৌত' এবং 'জীব' উভয় পরিবেশেই পাওয়া যায়। ভৌত পরিবেশের মৃত্তিকা, ফসফরাস সমৃদ্ধ পাহাড় এবং জলে দ্রবীভূত অবস্থায় ফসফরাস পাওয়া যায়। জীবপরিবেশের বৃহৎ জৈবঅণুর অংশ—'ফসফেট' রূপে ফসফরাস বিদ্যমান থাকে।

II. ফসফরাস চক্র কাকে বলে?

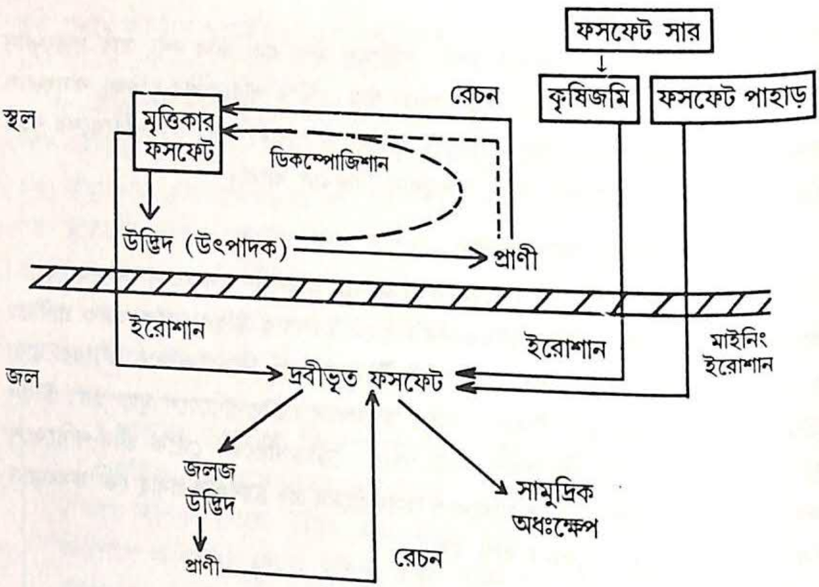
উদ্ভিদ ভৌত পরিবেশ থেকে ফসফেটের মাধ্যমে ফসফরাস সংগ্রহ করে। খাদ্যশৃঙ্খলজনিত কারণে উদ্ভিদ জীবভরের মাধ্যমে উৎপাদক উদ্ভিদ থেকে খাদক প্রাণীতে ফসফরাস প্রবাহিত হয়। শেষ পর্যায়ে ডেট্রিভোর এবং ডিকম্পোজার জীবের দ্বারা প্রাণীর মল, মূত্র এবং মৃত জীবদেহ থেকে ফসফরাস ভৌতপরিবেশে মুক্ত হয়। উদ্ভিদ পুনরায় পরিবেশ থেকে ফসফরাস সংগ্রহ করে। **ভৌতপরিবেশ থেকে জীব-পরিবেশে এবং জীবপরিবেশ থেকে ভৌত পরিবেশে ফসফরাসের এই চক্রাকার প্রবাহ কে 'ফসফরাস চক্র' (phosphorus cycle) বলা হয়।**

III. ফসফরাস চক্রের পথ ঃ

'ফসফরাস চক্র' দুটি আন্তঃসংযোগী অংশ দ্বারা গঠিত। একটি অংশ স্থলভাগে সম্পন্ন হয়, এই অংশকে **'স্থলজ দশা'** (Terrestrial Phase) বলা হয় এবং অপর অংশটি জলে ঘটে, এই অংশকে **'জলজ দশা'** (Aquatic Phase) বলা হয়।

● **ফসফরাস চক্রের জলজ দশা ঃ** নদী এবং সমুদ্রের জলে প্রচুর পরিমাণ দ্রবীভূত ফসফেট থাকার কারণ ফসফেট সমৃদ্ধ পাহাড় (phosphate rock) এবং কৃষিজমির ক্ষয় বা ইরোসান (erosion)। বরফ গলা জল এবং বৃষ্টির জলের মাধ্যমে ক্ষয়িত ফসফেট নদীতে স্থানান্তরিত হয়, এবং নদীর মাধ্যমে সমুদ্রে বাহিত হয়। নদী এবং সমুদ্রের জলজ উদ্ভিদ জলে দ্রবীভূত ফসফেট সংগ্রহ করে। জলজ প্রাণী খাদ্য শৃঙ্খলের মাধ্যমে উদ্ভিদ থেকে ফসফেট সংগ্রহ করে। মূলত দুটি-উপায়ে ফসফেট জীব-পরিবেশ থেকে পুনরায় ভৌত পরিবেশে ফিরে যায় (i) কিছু পরিমাণ ফসফেট প্রাণীর রেচন ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ফিরে যায় এবং (ii) কিছু পরিমাণ ডেট্রিটাস এবং ডিকম্পোজার খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পরিবেশে ফিরে যায়।

প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে ফসফেট স্থলভাগ থেকে ক্ষয়িত হয়ে সমুদ্রে স্থানান্তরিত হয়। সমুদ্রের জলে থাকা অধিকাংশ ফসফেট জলের নীচে অধঃক্ষিপ্ত হয়ে জমা হয়। এইভাবে সঞ্চিত ফসফেটের কিছু অংশ সামুদ্রিক জীবের প্রয়োজনে কাজে লাগে এবং অবশিষ্ট অংশ সমুদ্রের মৃত্তিকায় সমাহিত হয়ে ফসফেট পাহাড়ের সৃষ্টি করে।



চিত্র 3.25 : ফসফরাস চক্রের জলজ এবং স্থলজ দশা দেখানো হয়েছে।

• **ফসফরাস চক্রের স্থলজ দশা :**

স্থলের উদ্ভিদ (উৎপাদক) মৃত্তিকা থেকে ফসফেট সংগ্রহ করে। খাদ্যশৃঙ্খলের ফলে মানুষসহ অন্যান্য প্রাণী উৎপাদক-জীবভরের মাধ্যমে ফসফেট সংগ্রহ করে। প্রাণীর রেচন ক্রিয়া এবং মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেহাবশেষের উপর ডেট্রিভোর এবং ডিকম্পোজার জীবের পচন ক্রিয়ার মাধ্যমে জীবপরিবেশ থেকে ফসফেট পুনরায় ভৌতপরিবেশে ফিরে যায়। এইভাবে স্থলজ পরিবেশে ফসফরাস চক্র চলতে থাকে।

• **মানুষের ভূমিকা এবং ফসফরাস চক্র :**

রাসায়নিক সারের একটি প্রধান উপাদান হচ্ছে ফসফেট। বর্তমানে কৃষিজমিতে অধিক পরিমাণ ফসফেট সার প্রয়োগের ফলে বিঘ্নিত হচ্ছে প্রাকৃতিক ফসফরাস চক্র এবং সৃষ্টি হচ্ছে জলদূষণের মত ভয়াবহ ঘটনা।

3.14.4 সালফার চক্র (Sulphur Cycle) :

কতিপয় অ্যামিনো অ্যাসিড এবং বি-কমপ্লেক্স গ্রুপের ভিটামিনের একটি অত্যাবশ্যক উপাদন হচ্ছে 'সালফার'। উদ্ভিদ মৃত্তিকা এবং জল থেকে সালফেট আকারে সালফার সংগ্রহ করে এবং পরভোজী প্রাণী 'উদ্ভিদ এবং 'প্রাণী' জীবভরের মাধ্যমে সালফার সংগ্রহ করে।

I. সালফারের উৎস : বায়ুমণ্ডলের **'হাইড্রোজেন সালফাইড** (H_2S) এবং

সালফারডাইঅক্সাইড (SO_2) গ্যাস ; মৃত্তিকায় প্রাপ্ত সালফেট, সালফাইড এবং জৈব সালফারের উপাদান হিসেবে সালফার ভৌতপরিবেশে বর্তমান থাকে। উল্লেখ্য বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন সালফাইড এবং সালফারডাইঅক্সাইড গ্যাসের একমাত্র জ্ঞাত প্রাকৃতিক উৎস হচ্ছে আগ্নেয়গিরিজনিত নিঃসরণ (volcanic emission)। কিন্তু প্রাকৃতিক উৎস ছাড়া জীবাশ্ম জ্বালানীর (কয়লা, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস) দহনেও প্রচুর পরিমাণ H_2S এবং SO_2 বায়ুমণ্ডলে মুক্ত হয়। জীবপরিবেশে জৈব অণুর সংগঠক উপাদান হিসেবে সালফার উপস্থিত থাকে।

II. 'সালফার চক্র' কাকে বলে?

ভৌত পরিবেশ থেকে জীব-পরিবেশে এবং জীব-পরিবেশ থেকে পুনরায় ভৌতপরিবেশে সালফারের চক্রাকার প্রবাহকে **'সালফার চক্র'** বলা হয়। সালফার চক্রের দুটি দশা-**'পরিবেশ দশা'** এবং **'জীব-দশা'**।

III. সালফার চক্রের পদ্ধতি ঃ

স্বভোজী উদ্ভিদ জল এবং মৃত্তিকা থেকে দ্রবীভূত সালফেট সংগ্রহ করার পর সালফারকে প্রোটিন অণুতে অন্তর্ভুক্তি করে। গ্রেজিং খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে প্রাণী উদ্ভিদ থেকে সালফার সংগ্রহ করে এবং সংগৃহীত অতিরিক্ত সালফার মলে'র (faeces) মাধ্যমে পরিবেশে মুক্ত করে। তাছাড়া ডিকম্পোজার জীবের (ছত্রাক ও ব্যাক্টিরিয়া) সাহায্যে উদ্ভিদ



চিত্র 3.26 ঃ সালফার চক্র দেখানো হয়েছে।

এবং প্রাণীজ প্রোটিনের ডিকম্পোজিশানের মাধ্যমে সালফার পরিবেশে ফিরে আসে। বায়বীয় অবস্থায় 'অ্যাসপারজিলাস' (Aspergillus) ও নিউরোস্পোরা (Neurospora) ছত্রাক এবং

অবায়বীয় অবস্থায় 'ইশ্চেরিকিয়া (Escherichia) ও 'প্রোটিয়াস' (Proteus) ব্যাক্‌টিরিয়া প্রোটিন-ডিকম্পোজিশানের মাধ্যমে পরিবেশে সালফেট মুক্ত করতে সাহায্য করে।

3.15 বাস্তুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রক শর্ত (Limiting Factors of Ecosystem) ঃ

বাস্তুতন্ত্রে জীবের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য বিভিন্ন ভৌত এবং রাসায়নিক শর্ত যথা—আলো, তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহ, খাদ্যের সরবরাহ, পরিপোষক বস্তুর উপস্থিতি ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কোন জীব তখনই সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকতে পারে যখন বাস্তুতন্ত্রে উপরিউক্ত শর্তসমূহ নির্দিষ্ট পরিমাণে উপস্থিত থাকে। অত্যাবশ্যকীয় শর্তসমূহের যেকোন একটি অনুপস্থিত থাকলে জীব বেঁচে থাকতে পারে না। একটি জলজ উদ্ভিদের পরিবেশে যদি আলোক, জল, কিছু পরিপোষক উপাদান এবং স্থান (space) প্রভৃতি সর্বাধিক অনুকূল অবস্থায় (optimum level) থাকে, কিন্তু জলে দ্রবীভূত 'ফসফেট' পরিপোষক অনুপস্থিত থাকে, তাহলে ঐ পরিবেশে উদ্ভিদটি বেঁচে থাকতে পারে না। এক্ষেত্রে 'ফসফেট' জলজ উদ্ভিদের বেঁচে থাকার নিয়ন্ত্রক শর্ত হিসেবে কাজ করে।

(a) নিয়ন্ত্রক শর্ত বলতে কি বোঝায়?

যখন কোন একটি অত্যাবশ্যক ভৌত বা রাসায়নিক শর্ত পরিবেশে অনুপস্থিত থেকে বা প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম মাত্রায় বা অধিক মাত্রায় উপস্থিত থেকে ঐ পরিবেশে কোন জীবের বৃদ্ধি, বিকাশ তথা অস্তিত্ব নিয়ন্ত্রণ করে, তখন ঐ শর্ত কে ঐ জীবের সাপেক্ষে **'নিয়ন্ত্রক শর্ত'** (limiting factor) বলা হয়।

(b) পরিবেশের পরিবর্তনে জীবের প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত সূত্র ঃ

পরিবেশের পরিবর্তনে বা পরিবেশে নিয়ন্ত্রক শর্তের প্রভাবে জীবের যে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তা বোঝানোর জন্য দুটি সূত্রের উল্লেখ করা হল ঃ

(i) ন্যূনকল্প সূত্র (Law of Minimum) ঃ এই সূত্র অনুসারে পরিবেশে যদি কোন ভৌতশর্ত ন্যূনতম মাত্রায় (প্রয়োজনের তুলনায় কম) উপস্থিত না থাকে, তাহলে ঐ পরিবেশে জীবের বৃদ্ধি, বিকাশ তথা অস্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত বা সীমাবদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে জীবের অস্তিত্ব নিয়ন্ত্রণকারী ভৌত শর্তকে **'নিয়ন্ত্রক শর্ত'** বা **'লিমিটিং ফ্যাক্‌টার'** বলা হয়।

(ii) সহনশীলতার সূত্র (Law of Tolerance) ঃ

এই সূত্র অনুসারে পরিবেশের প্রতিটি ভৌত শর্তের একটি ন্যূনতম এবং সর্বোচ্চ সীমা (limit) রয়েছে, যার বাইরে কোন জীব বাঁচতে পারে না। অর্থাৎ ভৌতশর্তের ন্যূনতম সীমা এবং সর্বোচ্চ সীমার যে বিস্তারের মধ্যে জীব বেঁচে থাকতে পারে সেই বিস্তারকে **'সহ্যকরার সীমা'** বা **'সহনশীলতার সীমা'** (tolerance limit) বলে।

উদাহরণ হিসেবে মানুষ তথা স্তন্যপায়ী প্রাণীর উপর ভিটামিন-A-এর প্রভাব উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, খাদ্যে ভিটামিন-A এর অভাব হলে রাত্রান্ধতা বা রাতকানা (night blindness), আবরণী বা ঝিল্লীর শুষ্কতা (xerophthalmia) এবং জননতন্ত্রের অস্বাভাবিকতাজনিত রোগ দেখা যায়। আবার খাদ্যে ভিটামিন-A এর পরিমাণ বেশি হলে পাচননালীর অক্রিয়তা, রোমপতন, ডার্মাটাইটিস এবং অস্থির যন্ত্রণা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায় যে, মানুষ তথা অন্যান্য মনুষ্যেতর প্রাণীর সুষ্ঠু বিকাশ এবং বৃদ্ধির জন্য একটি নির্দিষ্ট সহন-সীমার মধ্যে ভিটামিন-A এর যোগান অত্যাবশ্যক। এই উদাহরণ থেকে বলা যেতে পারে যে—খাদ্য, শক্তি, তাপ, ভিটামিন, খনিজ বস্তু, জল এবং অক্সিজেন প্রভৃতি অত্যাবশ্যক ভৌতশর্তের অতি-আধিক্য (too-much) বা অতি-অনাধিক্য (too-little) কোন একটি জীব বা সমগ্র জীবপ্রজাতির অস্তিত্বের পক্ষে এক অনিবার্য বিপদের লক্ষণ।

3.16. বাস্তুতন্ত্রের সুস্থিরতা (Stability of Ecosystem) ঃ

(a) বাস্তুতন্ত্রের সুস্থিরতা বলতে কি বোঝায়?

বাস্তুতন্ত্র সর্বদা গতিশীল অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্রের অবিরাম পরিবর্তন ঘটে। বাস্তুতন্ত্রের অজীব এবং সজীব উপাদানের অনবরত পরিবর্তন ঘটলেও সামগ্রিকভাবে বাস্তুতন্ত্র যদি সময়ের সাপেক্ষে অপরিবর্তিত থাকে, **তখন বাস্তুতন্ত্রের সেই অবস্থাকে 'গতিশীল সাম্যাবস্থা' (dynamic equilibrium)** বা **'অপরিবর্তনীয় অবস্থা (steady state) বলা হয়।** গতিশীল সাম্যাবস্থায় থাকা যে কোন বাস্তুতন্ত্রই সুস্থির (stable)। সুস্থির বাস্তুতন্ত্রের নিম্নলিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

(1) বছরের পর বছর বাস্তুতন্ত্রের প্রজাতির মোট সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে।

(2) প্রতিবছর একই প্রজাতির উপস্থিতি দেখা যায়। এবং

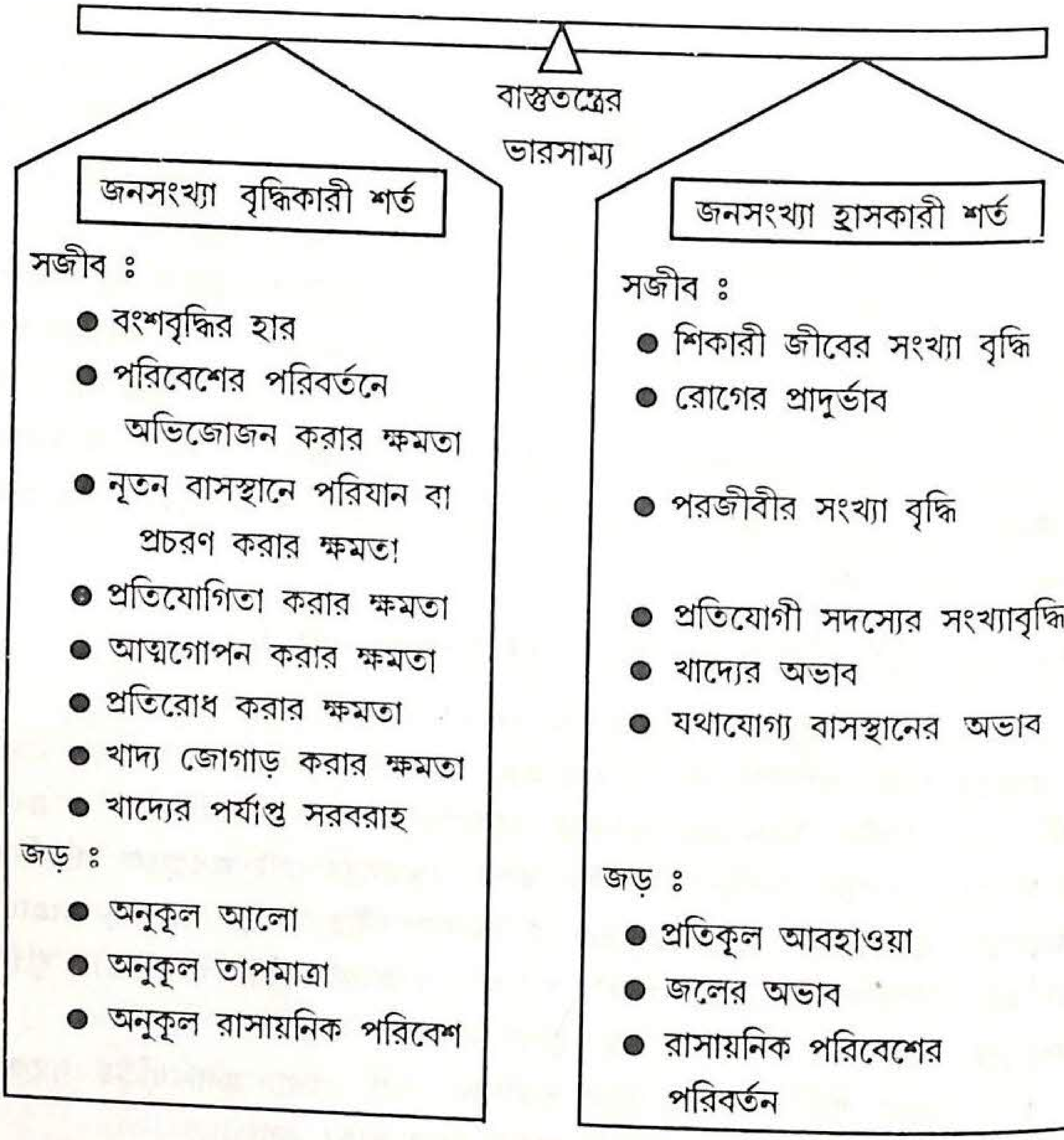
(3) বছরের পর বছর প্রতিটি জীবের প্রজাতির সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে।

(b) কিভাবে বাস্তুতন্ত্রের স্থিরতা বজায় থাকে?

কোন বাস্তুতন্ত্রের স্থিরতা নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—

(1) জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং রোধকারী ক্রিয়ার ভারসাম্য ঃ

কোন বাস্তুতন্ত্রের সুস্থিরতা নির্ভর করে ঐ বাস্তুতন্ত্রের জনসংখ্যার বৃদ্ধি সহায়ক (growth inducing) এবং জন সংখ্যার রোধক (growth reducing) ক্রিয়ার ভারসাম্যের উপর। এই দুটি বিপরীতমুখী বলের অবিরত ক্রিয়ার ফলে জনসংখ্যার আকার অপরিবর্তিত থাকে। উল্লেখ্য জনসংখ্যার বৃদ্ধি সহায়ক পদ্ধতিকে **ধনাত্মক প্রত্যাবর্তী'** (positive feedback mechanism) পদ্ধতি এবং জনসংখ্যার রোধক পদ্ধতিকে **'ঋণাত্মক প্রত্যাবর্তী পদ্ধতি** (negative feedback mechanism) বলা হয় (চিত্র 3.27)।



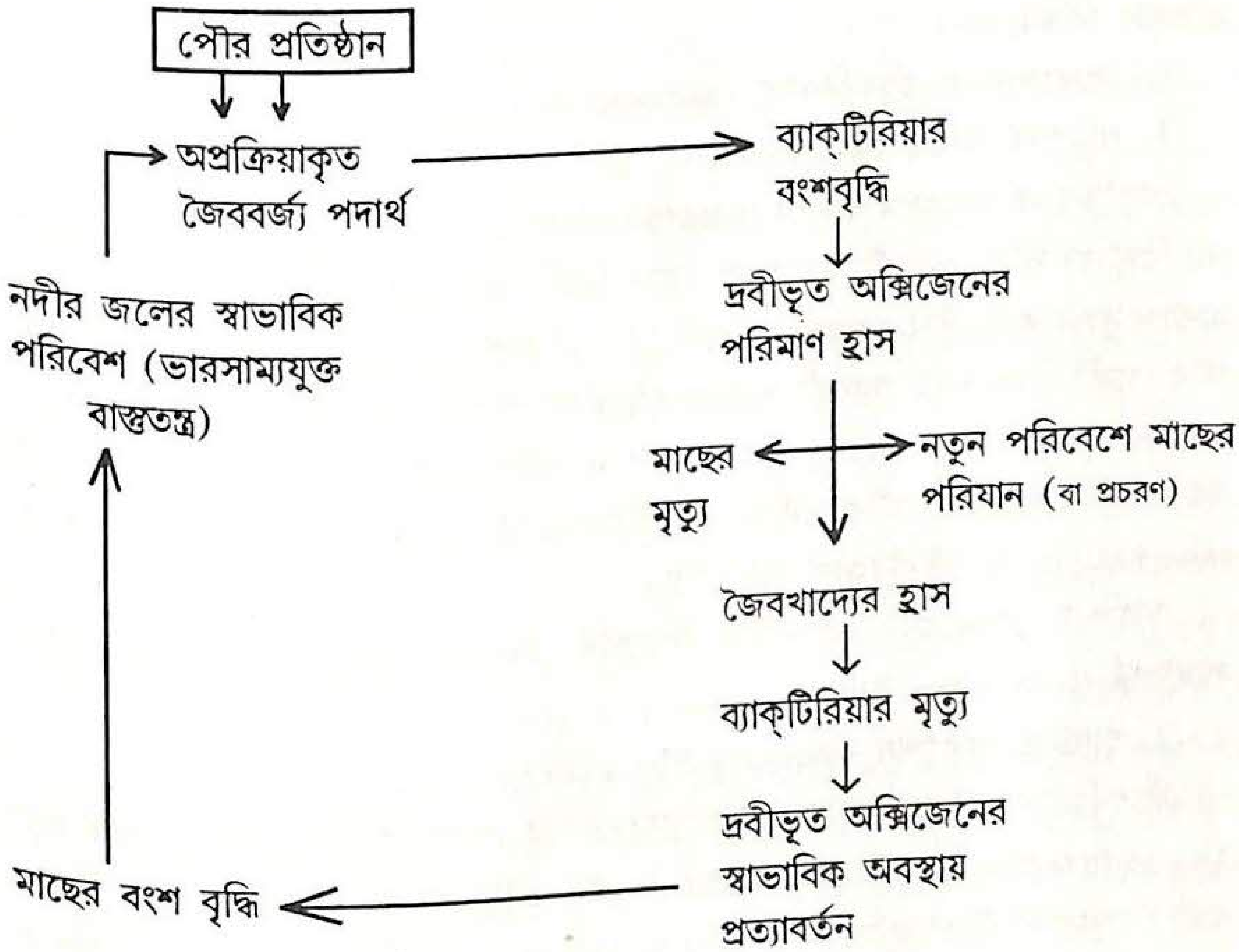
চিত্র 3.27 ঃ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণকারী (বর্ধনকারী এবং হ্রাসকারী) শর্ত দেখানো হয়েছে। উভয় শর্তই সজীব এবং জড় উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত।

(2) পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসার বা প্রত্যাবর্তনের সামর্থ্য (Power of Resilience) ঃ

জনসংখ্যা বৃদ্ধিকারী এবং হ্রাসকারী বিভিন্ন জড় এবং সজীব উপাদানের পরিবর্তনের ফলে যদি বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়, তাহলে বাস্তুতন্ত্র সহ্যসীমার বিস্তারের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার চেষ্টা করে। পরিবেশের পরিবর্তনে বাস্তুতন্ত্রের পুনরায় পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তনের সামর্থ্যের উপরই কোন বাস্তুতন্ত্রের সুস্থিতি নির্ভর করে। কোন বাস্তুতন্ত্রের স্বস্থানে প্রত্যাবর্তনের সামর্থ্য যত বেশি হবে ঐ বাস্তুতন্ত্রের স্থিতিশীলতা তত বেশি হবে।

উদাহরণ ঃ কোন পৌরপ্রতিষ্ঠান থেকে জৈব বর্জ্যপদার্থ প্রক্রিয়াকরণ না করে প্রবহমান

নদীর জলে নিষ্কাশিত করা হলে জলে ব্যাক্টিরিয়ার বংশবৃদ্ধি ঘটে, ফলে জলের দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়। দ্রবীভূত অক্সিজেন হ্রাস পাওয়ার ফলে সকল প্রজাতির মাছ মরে যায়, বা নতুন অঞ্চলে পরিযান করে। এই অবস্থায় নদীর জলে জৈব-বর্জ্য পদার্থের পুনরায় যোগান বন্ধ করা হলে অধিকাংশ ব্যাক্টিরিয়া খাদ্যের অভাবে মরে যায় এবং জলের দ্রবীভূত অক্সিজেন পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। এই অবস্থায় মাছ বাঁচতে পারে এবং নদীর বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য পুনরায় ফিরে আসে (চিত্র 3.28)।



চিত্র 3.28 ঃ পৌরপ্রতিষ্ঠান থেকে অপ্রক্রিয়াকৃত জৈব বর্জ্য পদার্থের প্রভাবে নদীর জলের বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে।

3. প্রজাতি-বৈচিত্র্য (Species Diversity) ঃ

বাস্তুতন্ত্রের সুস্থিরতা প্রজাতির বৈচিত্র্যের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। কতিপয় প্রকৃতি বিজ্ঞানীর মতে কোন বাস্তুতন্ত্রের সুস্থিরতা ঐ বাস্তুতন্ত্রের প্রজাতি বৈচিত্র্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। অর্থাৎ কোন বাস্তুতন্ত্রের প্রজাতি-বৈচিত্র্য যত বেশী ঐ বাস্তুতন্ত্র তত বেশী সুস্থির। উদাহরণ হিসেবে বৃষ্টি-অরণ্যের (rain forest) জটিল বাস্তুতন্ত্রের প্রজাতির বৈচিত্র্য উল্লেখ করা যেতে পারে। এরূপ বাস্তুতন্ত্রের প্রজাতি প্রকরণ (variations) এত বেশি এবং বিচিত্র যে কৃত্রিম উপায়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না করলে বাস্তুতন্ত্রের সুস্থিরতা

অনির্দিষ্টকালব্যাপী বজায় থাকে। অপরপক্ষে 'তুন্দ্রা' (tundra) বাস্তুতন্ত্রের প্রজাতি বৈচিত্র্য খুব কম হওয়ায় খুব সহজেই এরূপ বাস্তুতন্ত্রের সুস্থিরতা বিঘ্নিত হয়।

জটিল এবং সরল বাস্তুতন্ত্রের সুস্থিরতা এবং অস্থিরতার মূল কারণ খাদ্য-জালিকার (food webs) আপাত গঠন। জটিল বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য-জালিকার বিন্যাস জটিল হওয়ার ফলে কোন প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটলে ঐ বাস্তুতন্ত্রের উপর কোন বিশেষ প্রভাব পড়ে না, কারণ অন্যান্য বিকল্প প্রজাতি খাদ্য-উৎসের সমাধান করতে পারে। অপরপক্ষে সরল বাস্তুতন্ত্রে অপেক্ষাকৃত সরল খাদ্য-জালিকার জন্য কোন প্রজাতির বিলুপ্তিতে বাস্তুতন্ত্রের সুস্থিরতা বিঘ্নিত হয়।

(c) **পারম্পর্য বা জীব-বিকাশ** (Succession or Biotic development) ঃ

1. পারম্পর্য বলতে কি বোঝায়?

প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট কারণে বাস্তুতন্ত্রের জীবসম্প্রদায়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক বিনাশ (বা বিলুপ্তি) ঘটার পরবর্তী সময়ে বা কোন নির্জীব পরিবেশে পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তনের মাধ্যমে নূতন করে জীব-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। জীবসম্প্রদায় সৃষ্টির পদ্ধতিতে পূর্বের সৃষ্ট জীব-গোষ্ঠী ধীরে ধীরে পরবর্তী পর্যায়ে সৃষ্ট জীব-গোষ্ঠীর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। জীব-গোষ্ঠীর এরূপ উত্তরণ চলতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত চূড়ান্ত পর্যায়ের জীবগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। নির্জীব-বাস্তুতন্ত্রে জীবগোষ্ঠীর আবির্ভাবের এই ধারাবাহিক পদ্ধতিকে **পারম্পর্য** (succession) বা **'জীববিকাশ'** বলা হয়।

পারম্পর্য দুপ্রকারের— **প্রাথমিক পারম্পর্য** (Primary Succession) এবং **গৌণ পারম্পর্য** (Secondary Succession)।

2. প্রাথমিক পারম্পর্য (Primary Succession) ঃ

জীব-বিহীন পরিবেশে জীবগোষ্ঠীর পর্যায়ক্রমিক বিকাশকে **'প্রাথমিক পারম্পর্য'** বলা হয়। 15,000 বছর আগে **'মহাহিমবাহের'** বা গ্রেট গ্ল্যাসিয়ারস্‌এর গলনের ফলে যে বিস্তীর্ণ বন্ধ্যা (অনুৎপাদনশীল) জমি এবং পাহাড় অনাবৃত হয়, সেই পরিবেশে জীবগোষ্ঠীর বিকাশ পদ্ধতি **'প্রাথমিক পারম্পর্যের'** উদাহরণ। অনাবৃত জমি এবং পাহাড়ের অনুৎপাদনশীল পরিবেশে সর্বপ্রথম লাইকেন (lichen) নামক উদ্ভিদের সৃষ্টি হয়। এই লাইকেন দ্বিতীয় পর্যায়ে 'মস' (moss) জাতীয় উদ্ভিদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। তৃতীয় পর্যায়ে 'মস' জাতীয় উদ্ভিদ ফার্ণ, ঘাস এবং অপেক্ষাকৃত বড় উদ্ভিদ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় এবং সর্বশেষ বা চতুর্থ পর্যায়ে গুল্ম এবং বৃক্ষের অবির্ভাব ঘটে।

প্রাথমিক পারম্পর্যের পদ্ধতি ঃ উপরিউক্ত উদাহরণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পারম্পর্যের পদ্ধতি আলোচনা করা হল ঃ

(i) জল এবং সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন পরিপোষকের সাহায্যে দ্রুত লাইকেনের বংশবিস্তার ঘটায় খুব কম সময়ে বন্ধ্যা জমি এবং পাহাড়ের সর্বত্র লাইকেন আস্তরণের সৃষ্টি হয়। লাইকেন থেকে নিঃসৃত **'কার্বনিক অ্যাসিড'** দ্বারা পাহাড়ের উপরের স্তর

দ্রবীভূত হয়ে পরিপোষক মুক্ত হয়, ফলে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া লাইকেনের সঙ্গে সঙ্গে পতঙ্গের সৃষ্টি হয়। 'লাইকেন' এবং পতঙ্গ ঐ পরিবেশে **'প্রথম সৃষ্ট জীবগোষ্ঠী'** (pioneer community) হিসেবে স্বীকৃত হয়।

(ii) লাইকেন এবং পতঙ্গের আবির্ভাবে পরবর্তী ধাপে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে। কারণ, লাইকেনের আবির্ভাবে মৃত্তিকার সৃষ্টি ত্বরান্বিত হয়। লাইকেন এবং পতঙ্গের মৃত দেহাবশেষ, ছত্রাক এবং ব্যাক্‌টিরিয়ার মিশ্রণে উর্বর মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় মূলযুক্ত 'মসের' আবির্ভাব ঘটে। মসের প্রভাবে লাইকেন ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়। মস, ছত্রাক, ব্যাক্‌টিরিয়া এবং পতঙ্গ পুনরায় একটি নূতন জীবগোষ্ঠী হিসেবে স্বীকৃত হয়। এই জীবগোষ্ঠীর দ্বারা পরিবেশের পুনরায় পরিবর্তন ঘটে, ফলে ফার্ণ, ঘাস, ব্যাক্‌টিরিয়া এবং পতঙ্গের সমন্বয়ে পুনরায় একটি নূতন জীবগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের মস জীবগোষ্ঠীর বিলুপ্তি ঘটে।

(iii) চূড়ান্ত পর্যায়ে পরিবেশের পরিবর্তনে ফার্ণ গোষ্ঠী গুল্ম, বৃক্ষ এবং অন্যান্য প্রাণিগোষ্ঠীর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

এইভাবে প্রথম সৃষ্ট জীবগোষ্ঠীর প্রাথমিক পারম্পর্যের মাধ্যমে চূড়ান্ত জীবগোষ্ঠীতে উত্তরণ সম্ভব হয়।

3. **গৌণ পারম্পর্য** (Secondary Succession) ঃ

কোন বর্তমান জীবগোষ্ঠীর সম্পূর্ণ বা আংশিক বিনাশের পরবর্তী পর্যায়ে জীবগোষ্ঠীর পুনরায় পর্যায়ক্রমিক উৎপত্তির ঘটনাকে **'গৌণ পারম্পর্য'** বলা হয়। এক্ষেত্রে পরিবেশের **'ক্লাইম্যাক্স জীবগোষ্ঠী'** আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, বন্যা, খরা, আগ্নিকাণ্ড এবং ঝড়ঝঞ্ঝার দ্বারা আকস্মিকভাবে বিনষ্ট হয়। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে ধারাবাহিক পরিবর্তনের মাধ্যমে পুনরায় ক্লাইম্যাক্স জীবগোষ্ঠীর উৎপত্তি হয়। এই ঘটনাই সামগ্রিকভাবে গৌণ পারম্পর্য নামে পরিচিত। অধুনা মানুষের বিভিন্ন অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপ যথা কৃষিপদ্ধতির পরিবর্তন, ইচ্ছাকৃত বন্যার সৃষ্টি, এবং মাইনিং ইত্যাদির দ্বারা বহু সুস্থির জীবগোষ্ঠী ধ্বংসের আশঙ্কায় বিপন্ন বা বিপদগ্রস্ত।

3.17. পুনরানয়ন বাস্তুসংস্থান (Restoration Ecology) ঃ

'পুনরানয়ন বাস্তুসংস্থান' হচ্ছে 'বাস্তুসংস্থানের' একটি নূতন শাখা। মানুষের বিভিন্ন অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপ যথা ঃ অরণ্য ধ্বংস, কৃষিপদ্ধতির পরিবর্তন, ভূগর্ভস্থ জলের অপচয়, জীবাশ্ম জ্বালানীর অধিক ব্যবহার, প্রাকৃতিক সম্পদের বাধাহীন অপচয় এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধিজনিত কারণে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিঘ্নিত হলে যে পদ্ধতিতে বাস্তুতন্ত্রকে মেরামত করে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় তাকে **'পুনরানয়ন বাস্তুসংস্থান'** বা **'সংরক্ষণ জীববিদ্যা'** (Conservation Biology) বলা হয়। পুনরানয়ন বাস্তুসংস্থানের দ্বারা অস্থির বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং সুস্থিতি বা গতিশীল সাম্যাবস্থা (Dynamic Equilibrium) ফিরে আসে।

3.18. সারাংশ (Summary) ঃ

• জীব এবং পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক-ক্রিয়া সম্পর্কে অধ্যয়নকে বাস্তুসংস্থান বলা হয়। বাস্তুতন্ত্র, গোষ্ঠী এবং জনসংখ্যা হল বাস্তুসংস্থান আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

• পৃথিবীমণ্ডলে জীবপ্রতিপালনের উপযোগী অঞ্চল সমূহকে একত্রে জীবমণ্ডল বা বায়োস্ফিয়্যার বলা হয়। জীবমণ্ডলের প্রধান তিনটি গঠনমূলক অংশ—**অশ্ম-মণ্ডল** (lithosphere), **বায়ুমণ্ডল** (atmosphere) এবং **বারিমণ্ডল** (Hydrosphere)। জীবমণ্ডলের সর্বত্র জীবের প্রাধান্য থাকে না, শুধুমাত্র আধিক্য অঞ্চলে জীবের প্রাধান্য দেখা যায়। সমুদ্রের 200 মিটার গভীরতা থেকে ভূ-পৃষ্ঠের 6000 মিটার উচ্চতা পর্যন্ত আধিক্য অঞ্চল বিস্তৃত। অশ্ম-জীবমণ্ডল আবার জলবায়ু-শর্তের দ্বারা বিভিন্ন 'বায়োম' অঞ্চলে বিভক্ত এবং প্রতিটি বায়োমের উদ্ভিদ ও প্রাণীর প্রকৃতি স্বতন্ত্র।

• জীবগোষ্ঠী, তাদের পরিবেশ এবং জীব ও পরিবেশের মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ায় উৎপন্ন জালিকাকৃতি গঠনকে 'বাস্তুতন্ত্র' বলা হয়। বাস্তুতন্ত্র **'বায়োটিক'** (সজীব) এবং **'অ্যাবায়োটিক'** (জড়) উপাদান দ্বারা গঠিত। বাস্তুতন্ত্রের অ্যাবায়োটিক উপাদান বলতে প্রাণপ্রক্রিয়ায় অত্যাবশ্যক রাসায়নিক এবং ভৌতশর্তসমূহকে বোঝায়।

• ভৌত এবং রাসায়নিক শর্তের যে সংকীর্ণ বিস্তারের মধ্যে জীব বেঁচে থাকে তাকে **সহ্য করার বিস্তার বা রেঞ্জ অব্ টলারেন্স** বলে। এই বিস্তারের উর্দ্ধ এবং নিম্নসীমারেখার বাইরে কোন জীব বাস করে না। সমস্ত বাস্তুতন্ত্রে কোন একটি অ্যাবায়োটিক শর্ত জীবের বৃদ্ধি সীমায়িত করতে পারে, এবং ঐ সীমায়নকারী শর্তকে **'সীমা নির্ধারক শর্ত'** (limiting factor) বলা হয়।

• বাস্তুতন্ত্রের জীবগোষ্ঠী খাদ্য-শৃঙ্খল দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। বাস্তুতন্ত্রের শক্তি এবং পুষ্টিপদার্থ প্রবাহকারী জীব-অনুক্রমকে **'খাদ্যশৃঙ্খল'** বলা হয়। খাদ্য-শৃঙ্খল মূলত দু-প্রকার— **'গ্রেজার'** এবং **'ডেট্রিটাস'**। গ্রেজার খাদ্যশৃঙ্খল উদ্ভিদ থেকে শুরু হয় এবং উদ্ভিদ থেকে গ্রেজার প্রাণীতে শক্তি ও পরিপোষক প্রবাহিত হয়। কিন্তু ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খল 'ডেট্রিটাস' খাদ্য থেকে শুরু হয়।

• খাদ্যশৃঙ্খলের অনুক্রম জীবসদস্যদের যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পর্যায়ভুক্ত খাদক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। প্রথম খাদক দ্বিতীয় ট্রফিক লেভেলের সদস্য এবং গ্রেজার খাদ্যশৃঙ্খলের **উদ্ভিদ** ও ডিকম্পোজার খাদ্যশৃঙ্খলের **'ডেট্রিটাস'** এর উপর নির্ভরশীল। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত খাদক প্রথম খাদকের (হার্বিভোর) উপর নির্ভরশীল।

• খাদ্যশৃঙ্খলের অনুক্রম জীব-সদস্য দ্বারা অধিকৃত খাদ্য-তলকে **'ট্রফিক লেভেল'** বলা হয়। খাদ্য-উৎপাদক উদ্ভিদ প্রথম ট্রফিক লেভেলে অবস্থান করে এবং প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ পর্যায়ভুক্ত খাদক যথাক্রমে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম ট্রফিক লেভেলে অবস্থান করে।

• কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলা হয়। জীবের জৈব অণুর মধ্যে সঞ্চিত শক্তিকে

'রাসায়নিক' (বা স্থিতিশক্তি) এবং গতিশীল অবস্থায় থাকা বস্তুর মধ্যে নিহিত শক্তিকে 'গতিশক্তি শক্তি' বলা হয়। শক্তির রূপান্তর 'তাপগতিবিদ্যার' সূত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রথম সূত্র ঃ **শক্তিকে একরূপ থেকে অন্যরূপে রূপান্তরিত করা যায় কিন্তু সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না**; দ্বিতীয় সূত্র ঃ **শক্তি যখন একরূপ থেকে অন্যরূপে রূপান্তরিত হয় তখন শক্তির হানি ঘটে**। বাস্তুসংস্থান এবং দৈনন্দিন জীবনে তাপগতিবিদ্যার সূত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

• বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ অনাবর্তনশীল কিন্তু পরিপোষকের প্রবাহ চক্রাকার (বা আবর্তনশীল)।

• যে কোন একটি ট্রফিক লেভেলের জীবের শুষ্ক ভরকে জীবভর বা বায়োমাস বলে। খাদ্যশৃঙ্খলের প্রথম ট্রফিক লেভেল থেকে উপরের ট্রফিক লেভেলের দিকে বায়োমাস ক্রমশ হ্রাস পায়। কারণ, খাদ্যশৃঙ্খলের এক ট্রফিক লেভেল থেকে পরবর্তী ট্রফিক লেভেলে বায়োমাস প্রবাহিত হয়। যে কোন একটি খাদ্যশৃঙ্খলের প্রথম থেকে শেষ ট্রফিক লেভেল পর্যন্ত বায়োমাসকে লেখচিত্রের দ্বারা প্রকাশ করলে **'পিরামিড অব্ বায়োমাস'** পাওয়া যায়। যেহেতু বায়োমাসের মধ্যে স্থিতিশক্তি আবদ্ধ থাকে, তাই অনুক্রম ট্রফিক লেভেল বরাবর বায়োমাস হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে স্থিতিশক্তিও হ্রাস পায়। বিভিন্ন ট্রফিক লেভেলে আবদ্ধ স্থিতিশক্তিকে লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করে **'পিরামিড অব্ এনার্জী'** পাওয়া যায়। বায়োমাস এবং এনার্জী হ্রাসের ফলে পর্যায়ক্রমিক ট্রফিক লেভেলে জীবসংখ্যাও ক্রমশ হ্রাস পায় এবং জীবসংখ্যা হ্রাসের চিত্রিত প্রকাশকে **'পিরামিড অব্ নাম্বার'** বলা হয়।

• 'জীবভর' বা 'বায়োমাস' উৎপাদনের পরিমাপকে **'উৎপাদন'** বলা হয়। জীবমণ্ডলের যেসব অঞ্চলে উৎপাদন বেশি ঐ সব অঞ্চল মানুষের বেঁচে থাকার পক্ষে সবচেয়ে বেশি অনুকূল। সালোকসংশ্লেষকারী উদ্ভিদকে **'প্রাথমিক উৎপাদক'** এবং সমস্ত খাদক প্রাণীকে 'গৌণ-উৎপাদক বলা হয়।

• জীবদেহে প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদান বা যৌগের পুঞ্জীভবনের স্বাভাবিক ঘটনাকে **'জীবকেন্দ্রীভবন'** বলা হয়। ডি.ডি.টি., সীসা, এবং পারদ প্রভৃতি অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক পদার্থের জীবপুঞ্জীভবন এবং জীববিবর্ধনের ফলে জীবের বৃদ্ধি, বংশবিস্তার এবং অন্যান্য শারীরবৃত্তিয় কাজ ব্যাহত হয়।

• বিভিন্ন জৈব এবং অজৈব বস্তু **'পরিপোষক চক্রের'** দ্বারা বাস্তুতন্ত্রে প্রবাহিত হয়। এই পরিপোষক চক্রকে **বায়োজিওকেমিক্যাল সাইকল্** বলা হয়। যেমন কার্বন, নাইট্রোজেন, সালফার এবং ফসফরাস চক্র। এই ধরনের পরিপোষক চক্র জীবন প্রক্রিয়ায় অতি-আবশ্যক হলেও মানুষের বিভিন্ন অদূরদর্শী কর্মকাণ্ডের ফলে এই ধরনের পরিপোষক চক্র বাধাপ্রাপ্ত হয়।

• যখন কোন একটি অত্যাবশ্যক ভৌত বা রাসায়নিক শর্ত পরিবেশে অনুপস্থিত বা প্রয়োজনের তুলনায় কম বা অধিক মাত্রায় উপস্থিত থেকে ঐ পরিবেশে জীবের অস্তিত্ব

নিয়ন্ত্রণ করে, তখন ঐ শর্তকে নিয়ন্ত্রক শর্ত বলা হয়। নিয়ন্ত্রক শর্তের প্রভাবে জীবের প্রতিক্রিয়া ন্যূনকল্প এবং সহনশীলতার সূত্র অনুযায়ী ঘটে।

• গতিশীল সাম্যাবস্থায় থাকা যে কোন বাস্তুতন্ত্র সুস্থির, কারণ সময়ের সাপেক্ষে বাস্তুতন্ত্রের কিছু পরিবর্তন ঘটলেও বছরের পর বছর কম বা বেশি একই রকমের থাকে। বাস্তুতন্ত্রের স্থিরতা তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে—জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং রোধকারী ক্রিয়ার ভারসাম্য ; পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসার ক্ষমতা এবং বাস্তুতন্ত্রের প্রজাতি-বৈচিত্র্য।

• প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট কারণে বাস্তুতন্ত্রের জীবগোষ্ঠী সম্পূর্ণ বা আংশিক বিনাশ ঘটার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে জীবের আবির্ভাবের ধারাবাহিক পদ্ধতিকে **পারম্পর্য** বা **জীববিকাশ** বলা হয়। পারম্পর্য দুপ্রকার—**প্রাথমিক** এবং **গৌণ**।

• মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণকারী বায়োটিক এবং অ্যাবায়োটিক উপাদানের পরিবর্তন ঘটে। প্রতিযোগী, খাদক এবং রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর অন্তর্ভুক্তি বা অপসারণের ফলে কোন কোন বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য স্থায়ীভাবে বিঘ্নিত হয়।

• পুনরানয়ন বাস্তুসংস্থানের দ্বারা ক্ষয়িষ্ণু বাস্তুতন্ত্রকে পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। অধুনা মানুষের প্রচেষ্টায় ক্ষয়িষ্ণু বাস্তুতন্ত্রকে মেরামত করার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে।

• অনুশীলনী •

A. রচনাভিত্তিক বা দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. ইকোলজি শব্দের অর্থ কি? বাস্তুসংস্থানের সঙ্গে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক আলোচনা কর।
2. 'বায়োম' কি? জীবমণ্ডলের বিভিন্ন অংশ এবং আন্তঃসংযোগ বর্ণনা কর।
3. 'বাস্তু সংস্থান'গত অধ্যয়নের সুযোগসুবিধা বর্ণনা কর।
4. 'বাস্তুসংস্থান' অধ্যয়নের বিভিন্ন উপায় বর্ণনা কর। 'বাস্তুসংস্থাগত-নীচ্' বলতে কি বোঝ?
5. বাস্তুতন্ত্র কাকে বলে? এর গঠন এবং সহ্যক্ষমতার বিস্তার আলোচনা কর।
6. খাদ্য-শৃঙ্খল কাকে বলে? গ্রেজার এবং ডেট্রিটাস খাদ্য-শৃঙ্খল বর্ণনা কর।
7. ট্রফিক লেভেল কি? খাদ্যজালিকা কেন সৃষ্টি হয়?
8. বাস্তুতন্ত্রে শক্তি এবং পদার্থের প্রবাহ বর্ণনা কর।
9. জীবভর কাকে বলে? বাস্তুসংস্থানগত বিভিন্ন পিরামিড বর্ণনা কর।
10. জীব-পুঞ্জীভবন বলতে কি বোঝ? DDT-র জীববিবর্ধন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

11. জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্র কি? কার্বন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস এবং সালফার চক্র সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

12. বাস্তুতন্ত্রের নিয়ন্ত্রক শর্ত এবং পারম্পর্য বর্ণনা কর।

B. **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

1 বাস্তুসংস্থান কাকে বলে? বাস্তুসংস্থানের প্রকারভেদ আলোচনা কর।

2. জীবমণ্ডল কাকে বলে? বারি, অশ্ম এবং বায়ু জীবমণ্ডলের গঠন আলোচনা কর।

3. অট্ইকোলজি এবং সিন্ইকোলজি কি?

4. জনসংখ্যা-বাস্তুসংস্থান বলতে কি বোঝ?

5. বাস্তুতন্ত্র কাকে বলে? বাস্তুতন্ত্রের সর্বাপেক্ষা অনুকূল বিস্তার এবং শারীরবৃত্তিয় পীড়ন অঞ্চল কি?

6. খাদ্য-শৃঙ্খল কি? ডেট্রিটাস খাদ্যশৃঙ্খল বর্ণনা কর।

7. ট্রফিক লেভেল বলতে কি বোঝ? ট্রফিক লেভেলে মানুষের অবস্থান উল্লেখ কর।

8. খাদ্য-জালিকা কি? খাদ্য জালিকা কি কারণে সৃষ্টি হয়? উদাহরণ দাও।

9. শক্তি কাকে বলে? সূর্যকে কেন সকল শক্তির উৎস বলা হয়?

10. শক্তি'র একক আলোচনা কর। খাদ্যবস্তুর অভ্যন্তরস্থ শক্তির গড় মান উল্লেখ কর।

11. বাস্তুতন্ত্রে শক্তির প্রবাহ একমুখী কেন?

12. তাপগতিবিদ্যার প্রথম এবং দ্বিতীয় সূত্র উল্লেখ কর। 'এনট্রপি' কি?

13. জীবভর বলতে কি বোঝ? জীবভরের পিরামিড বর্ণনা কর।

14. প্রাথমিক এবং গৌণ উৎপাদন বলতে কি বোঝ?

15. জীবপুঞ্জীভবন এবং জীববিবর্ধন কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

16. জীবভূরাসায়নিক চক্র কাকে বলে? নাইট্রোজেন চক্র বর্ণনা কর।

17. পুনরানয়ন বাস্তুসংস্থান বলতে কি বোঝ?

18. ম্যাক্রো এবং মাইক্রো পরিপোষক কাকে বলে?

C. টীকা লেখ :

1. জীবমণ্ডল

2. খাদ্যশৃঙ্খল

3. জীবভর এবং বাস্তুসংস্থানগত পিরামিড

4. গ্রেজার খাদ্যশৃঙ্খল

4 মানুষ ও পরিবেশ

4.1. ভূমিকা (Introduction) ঃ

মানুষ জীব-পরিবেশের (Biological environment) এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। মানুষের পরিবেশ বলতে জীবজগৎ এবং ভৌত পরিবেশের সঙ্গে মানব প্রজাতির সম্পর্ককে বোঝায়। মানুষের স্থায়ী জীবনপ্রবাহ নির্ভর করে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে মানুষের আন্তঃক্রিয়ার ভারসাম্যের উপর। কিন্তু মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবে বর্তমান পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে। মানব জনসংখ্যার অতি-বৃদ্ধির ফলে কৃষি-পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটছে। বেশি পরিমাণ ফসল উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে জল এবং মৃত্তিকা দূষিত হচ্ছে, তার ফলে মানুষ তথা জীবজগৎ পরোক্ষভাবে আক্রান্ত হচ্ছে। শিল্পায়নের ফলে কৃষিজমি ও অরণ্য সংকীর্ণ হচ্ছে ; জল, মৃত্তিকা এবং বায়ুর দূষণ ঘটছে। দূষণ জনিত কারণে বাস্তুতন্ত্রের ক্ষয় এবং জীববৈচিত্র্যের সরলীকরণ ঘটছে। তাছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত কারণে জল, কয়লা, তেল প্রভৃতি অমূল্য অজৈব সম্পদ এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীজ 'জৈব সম্পদের' বাধাহীন অপচয় ঘটছে। একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য-সঙ্কট, স্থান-সঙ্কট, সাধারণ সম্পদ এবং শক্তিসম্পদের সঙ্কট দেখা দিচ্ছে ; অন্যদিকে দূষণজনিত কারণে বাস্তুতন্ত্রের ক্ষয়

পরিবেশের সুস্থিতি বিঘ্নিত করছে। প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, পৃথিবীর পরিবেশে মানুষের জীবনপ্রণালীর বিজয়-যাত্রা আর কতদিন অব্যাহত থাকবে? মানুষ কি নিজেরাই নিজেদের শত্রু নয়? ইত্যাদি।

4.2. জীব-পরিবেশে মানুষের নিয়মানুগ অবস্থান (Systematic Position of Human in Biological environment) :

জীব-পরিবেশ বলতে পৃথিবীর পরিবেশে সকল জীব এবং জীবের পারস্পরিক সম্পর্ককে বোঝায়। মানুষ এই জীবপরিবেশের এক সদস্য। প্রথাগত উপায়ে জীবজগৎকে দুভাগে ভাগ করা হয়— ; উদ্ভিদ রাজ্য এবং প্রাণিরাজ্য। এই শ্রেণীবিভাগ অনুসারে উদ্ভিদ খাদ্য সংশ্লেষ করতে পারে কিন্তু প্রাণী খাদ্যের জন্য উদ্ভিদের উপর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু ব্যাক্‌টিরিয়ার সঙ্গে এই দুটি জীবরাজ্যের কোন সম্পর্ক সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় না। তাই অধুনা উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর না করে কোষের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে (প্রোক্যারিওটিক এবং ইউক্যারিওটিক) জীবজগৎকে পাঁচটি রাজ্যে ভাগ করা হয়। একটি প্রোক্যারিওটিক রাজ্য— **মোনেরা** (Monera) এবং চারটি ইউক্যারিওটিক রাজ্য— **প্রোটিস্টা** (Protista), **ফাংগি** (Fungi), **প্লান্টি** (Plantae) এবং **অ্যানিমেলিয়া** (Animalia)।

জীবজগৎ
- মোনেরা (প্রোক্যারিওটিক)
  উদাহরণ : ব্যাক্‌টিরিয়া, সায়ানোব্যাক্‌টিরিয়া
- প্রোটিস্টা (এককোষী ইউক্যারিওটিক)
  উদাহরণ : অ্যামিবা, ইউগ্লিনা, ভলভক্স, প্যারামেসিয়াম
- ফাংগি
  উদাহরণ : ছত্রাক
- প্লান্টি
  উদাহরণ : ফার্ণ, গুল্ম, বৃক্ষ
- অ্যানিমেলিয়া
  উদাহরণ : মাছ, ব্যাঙ, কুকুর, বানর, মানুষ

(ফাংগি, প্লান্টি, অ্যানিমেলিয়া) — বহুকোষী ইউক্যারিওটিক

মানুষ 'অ্যানিমেলিয়া' রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সর্বাপেক্ষা উন্নত প্রাণী। অ্যানিমেলিয়া প্রাণিরাজ্যকে কয়েকটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি পর্ব আবার উপপর্ব, শ্রেণী, বর্গ, গোত্র, গণ এবং প্রজাতিতে বিভক্ত। 'আধুনিক মানুষ' (modern man) বা '**ক্রো-ম্যাগনন**' (cro-magnon)এর বৈজ্ঞানিক নাম—'**হোমো সেপিয়েনস্‌-সেপিয়েনস্‌**' (Homo sapiens-sapiens)। আধুনিক মানুষ **কর্ডাটা**-পর্ব, **ভার্টিব্রাটা**-উপপর্ব, **ম্যামালিয়া**-শ্রেণী,

প্রাইমেট-বর্গ, হোমিনিডি-গোত্র, হোমো-গণ, সেপিয়েনস্-প্রজাতি এবং সেপিয়েনস্ প্রকার (variety) ভুক্ত প্রাণী। আধুনিক মানুষের নিয়মানুগ অবস্থান (Systematic position) দেখানো হল ঃ

পর্ব (Phylum) ঃ কর্ডাটা (chordata)
উপপর্ব (Subphylum) ঃ ভার্টিব্রাটা (Vertebrata)
শ্রেণী (Class) ঃ ম্যামালিয়া (Mammalia)
বর্গ (Order) ঃ প্রাইমেট (Primates)
গোষ্ঠী (Group) ঃ হোমিনয়েড (Hominoids)
গোত্র (Family) ঃ হোমিনিডি (Hominidae)
গণ (Genus) ঃ হোমো (Homo)
প্রজাতি (Species) ঃ সেপিয়েনস্ (Sapiens)
প্রকার (Variety) ঃ সেপিয়েনস্ (Sapiens)

বৈজ্ঞানিক নাম (Scientific name) — **হোমো সেপিয়েনস্ সেপিয়েনস্** (Homo sapiens sapiens)

4.3 আধুনিক মানুষের উৎপত্তি (Origin of Modern Man) ঃ

আধুনিক মানুষের (cro-magnon) হঠাৎ উদ্ভব হয় নি। যুগ যুগ ধরে বিবর্তনের ফলে আধুনিক মানুষের উদ্বর্তন ঘটেছে। যথোপযুক্ত প্রমাণের অভাবে মানুষ সৃষ্টির সুস্পষ্ট অনুক্রম দশা জানা না গেলেও কিছু জীবাশ্ম, প্রাগৈতিহাসিক মানুষের দেহাবশেষ (করোটি, অস্থি, দাঁত, চোয়াল প্রভৃতি) এবং ব্যবহৃত বস্তুসামগ্রীর উপর নির্ভর করে মানব বিবর্তনের গতিপথ অনুধাবন মোটামুটি সম্ভব হয়েছে।

প্রাইমেট বর্গ তিনটি গ্রুপে বিভক্ত এবং এই বর্গভুক্ত প্রাণীরা **'অ্যানথ্রোপোয়েডস্'** (anthropoids) নামে পরিচিত; যথা স্পাইডার বানর, বেবুনস, এইপস্ বানর এবং মানুষ। এইপস্ বানর এবং মানুষের গ্রুপকে 'হোমিনয়েড বলা হয়। মানুষ এবং তাদের পূর্বপুরুষের সঙ্গে এইপস্ বানরের সম্পর্ক অন্যান্য অ্যানথ্রোপয়েড অপেক্ষা অনেক নিকট। প্রায় 250-300 লক্ষ বছর পূর্বে **'অলিগোসিন যুগে'** (oligocene period) এইপস্ বানর এবং মানুষের উৎস (stock) অন্যান্য অ্যানথ্রোপয়েড থেকে সরে আসে। পরবর্তী পর্যায়ে মধ্য-মায়োসিন যুগে (middle miocene period) অর্থাৎ পরবর্তী 50 থেকে 100 লক্ষ বছরের মধ্যে এইপস্ বানর এবং মানুষের উৎস-প্রাণীর মধ্যে পৃথকীকরণ ঘটে। এই সময় থেকে পরবর্তী পর্যায়ে পংগিডি (pongidae) গোত্র (যথা জীবাশ্ম আকার এবং বর্তমানে বেঁচে থাকা গিবন, গোরিলা, ওরাংওটাং এবং শিম্পাজী প্রজাতি) এবং হোমিনিডি গোত্রের (জীবাশ্ম আকার এবং আধুনিক মানুষ) উদ্ভব হয়েছে। অধুনা তুলনামূলক প্রাণরাসায়নিক তথ্যের দ্বারা জানা গেছে যে, 50 লক্ষ বছর পূর্বে মানুষ এবং গোরিলা, শিম্পাঞ্জিদের

পৃথকীকরণ ঘটেছে। পর্যায়ক্রমিক চারটি গন এবং ছয়টি প্রজাতির মাধ্যমে আধুনিক মানুষের সৃষ্টি ঘটেছে। মানববিবর্তনের অনুক্রম দশা দেখানো হল ঃ

1. ড্রায়োপিথেকাস (Dryopithecus)

[আবির্ভাব ঃ—250 লক্ষ বছর পূর্বে
মস্তিষ্কের আয়তন ঃ— ?]

↓

2. র‍্যামাপিথেকাস (Ramapithecus)

[আবির্ভাব ঃ—150 লক্ষ বছর পূর্বে
মস্তিষ্কের আয়তন ঃ— ?]

↓

3. অস্ট্রালোপিথেকাস আফ্রিকানস্ (Australopithecus africans)

[আবির্ভাব ঃ—25 লক্ষ বছর পূর্বে
মস্তিষ্কের আয়তন ঃ—450 cm^3]

↓

4. হোমো হ্যাবিলিস (Homo habilis)

[আবির্ভাব ঃ—20 লক্ষ বছর পূর্বে
মস্তিষ্কের আয়তন ঃ—700 cm^3]

↓

5. হোমো ইরেকটাস (Homo erectus [or Peking man])

[আবির্ভাব ঃ—15 লক্ষ বছর পূর্বে
মস্তিষ্কের আয়তন ঃ—880 cm^3]

↓

6. হোমো সেপিয়েনস্ (Homo sapiens)

(i) সোয়ানস্কম্বি (Swanscombe)

[আবির্ভাব ঃ—250 হাজার বছর পূর্বে
মস্তিষ্কের আয়তন ঃ—1200 cm^3]

↓

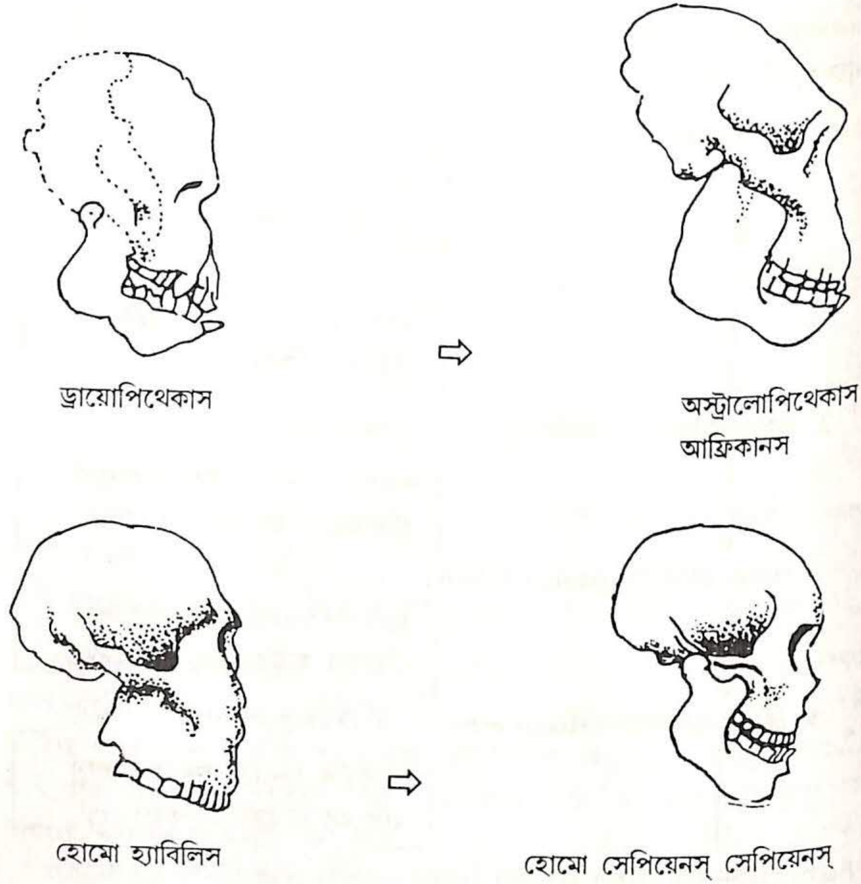
(ii) নিয়ানডারথাল (Neanderthal)

[আবির্ভাব ঃ—80 হাজার বছর পূর্বে
মস্তিষ্কের আয়তন ঃ—1500 cm^3]

↓

(iii) ক্রো-ম্যাগনন (Cro-Magnon)
বা আধুনিক মানুষ (Modern Man)

[আবির্ভাব ঃ—30 হাজার বছর পূর্বে
মস্তিষ্কের আয়তন ঃ—1400 cm^3]



চিত্র 4.1 ঃ ড্রায়োপিথেকাস থেকে আধুনিক মানুষের (হোমো-সেপিয়েনস্-সেপিয়েনস্) করোটিগত বিবর্তন দেখানো হয়েছে।

4.4 আধুনিক মানুষের বৈশিষ্ট্য (Features of Modern Man) ঃ

যেসব গঠনমূলক, শারীরবৃত্তিয় এবং সামাজিক বৈশিষ্টের কারণে আধুনিক মানুষ অন্যান্য মনুষ্যেতর এবং আদিম মানুষ অপেক্ষা স্বতন্ত্র সেগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল :

(1) সংক্ষিপ্ত করোটি (shorter skull) এবং হ্রস্ব চোয়াল। মস্তিষ্কের গড় আয়তন 1400 cm^3 এবং উপরিতল আবক্র (vaulted cranium)।

(2) গুরুমস্তিষ্ক (cerebrum) বিভিন্ন সাধারণ (তাপ, স্পর্শ, চাপ ইত্যাদি) ও বিশেষ (আঘ্রাণ, স্বাদ, দৃষ্টি এবং শ্রবণ) সজ্ঞাবহ (sensory region) এবং চেষ্টীয় অঞ্চলে (motor region) বিভেদিত। প্রতিটি অঞ্চল অতিশয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত ও সুগঠিত।

(3) উপরে এবং নীচের চোয়ালে ছোট ছোট দাঁত পাশাপাশি সজ্জিত ('আক্কেল দাঁত' (wisdomtooth) দেখা যায়)। মোট 32টি স্থায়ী দাঁত দেখা যায় (8টি কৃন্তক, 4টি ছেদক, 8টি পুরঃপেষক এবং 12টি পেষক)। মানুষের দাঁতের সংখ্যা এবং সজ্জাক্রমকে নিম্নলিখিতভাবে প্রকাশ করা হয় (দাঁতের সূত্র) ঃ

$$2\left[\ i\frac{2}{2}\ \ c\frac{1}{1}\ \ pm\frac{2}{2}\ \ m\frac{3}{3}\right]$$

i= ইনসাইজার বা কৃন্তক ; c= ক্যানাইন বা ছেদক;

pm= প্রিমোলার বা পুরঃপেষক; m= মোলার বা পেষক

(4) আধুনিক মানুষের দেহ দ্বি-পার্শ্বীয় প্রতিসম (bilateral symmetrical) এবং গড় উচ্চতা 5-6 ফুট।

(5) আধুনিক মানুষ সর্বভুক (omnivorous)। সেলুলোজ পাচনকারী উৎসেচক 'সেলুলেজ' (cellulase) মানুষের দেহে সংশ্লেষিত হয় না।

(6) লেখ্য ভাষার (written language) মাধ্যমে যোগাযোগ কেবল আধুনিক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ। লেখ্য ভাষার সৃষ্টি আধুনিক মানব বিবর্তনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। লেখ্য এবং কথ্য ভাষার (spoken language) মাধ্যমে আধুনিক মানুষ যোগাযোগ রক্ষা করে।

(7) বিবাহ, পরিবার গঠন, কমসংখ্যক সন্তান উৎপাদন, শ্রমবিভাগ, এবং পারস্পরিক সহযোগিতা প্রভৃতি আধুনিক মানুষের উল্লেখযোগ্য সামাজিক বৈশিষ্ট্য।

(8) মানুষের ভ্রূণের বিকাশ অত্যন্ত প্রলম্বিত অর্থাৎ অন্তঃজরায়ু দশা (intrauterine period) খুবই দীর্ঘ।

(9) পিতা-মাতার সহচর্যে সন্তানদের প্রতিপালন এবং বিকাশ পদ্ধতির আধিক্য বা প্রতুলতা আধুনিক মানব-সমাজের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

(10) আধুনিক মানুষের দ্বারাই কেবল শিল্প, কৃষ্টি, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির বিকাশ ও প্রগতি সম্ভব।

4.5. মানব জনসংখ্যা (Human Population) ঃ

কোন ভৌগোলিক অঞ্চলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যাকে 'মানব জনসংখ্যা' বলা হয়। জনসংখ্যা একটি গতিশীল বাস্তুসংস্থান সম্পর্কীয় বিষয়। ঘনত্ব (density), জন্মহার (natality), মৃত্যুহার (mortality), উদ্বর্তন (survivorship), বিচ্ছুরণ (dispersion), জৈবিক-ক্রিয়া (biotic potential) মানব জনসংখ্যার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ এই সমস্ত শর্তের উপরই কোন একটি সময়ে একটি স্থানের বসবাসকারী মানুষের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়। বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যা 5.4 বিলিয়ন (5400 মিলিয়ন), যা পরিবেশের মানব প্রতিপালন (বা ধারণক্ষমতার) ক্ষমতার সঙ্কট রেখার অদূরে। বর্তমান জনসংখ্যার চাপে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত, সঙ্কটজনক অপুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ

(কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি) সমাপ্তির পথে, এবং বাধাহীন ও যথেচ্ছ অপচয়ের ফলে পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদের (জল, বনসম্পদ, প্রাণিসম্পদ, শস্য ইত্যাদি) ভারসাম্য ধ্বংসের মুখে। এই কারণে বর্তমান জনসংখ্যায় প্রতি পাঁচজন মানুষের একজন চরম দারিদ্র সীমার নীচে দিনাতিপাত করে এবং প্রতিদশজনের একজন আশঙ্কাজনকভাবে অপুষ্টির শিকার। পরিবেশের উপর চাপ হ্রাস এবং মানুষের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করার জন্য জনসংখ্যা বৃদ্ধির সীমায়ন (limitation) অতি জরুরী। বিপরীতক্রমে মানব জনসংখ্যা অপ্রত্যাশিত হারে বেড়ে চলেছে। বিশ্বব্যাঙ্কের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বের জনসংখ্যা 12.4 বিলিয়নের কমে স্থিরিকৃত হবে না। যদিও 'জাতিপুঞ্জের' সিদ্ধান্ত অনুসারে বিশ্বের জনসংখ্যা সর্বোচ্চ 14 বিলিয়নে পৌঁছাবে।

4.5.1. মানব জনসংখ্যার বৃদ্ধি বলতে কি বোঝায়? (What do you mean by the growth of human population?)

মানব জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে 'বৃদ্ধির হারে'র (Rate of Growth) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। প্রতি বছর প্রতি 1000 জনসংখ্যায় যতজন মানুষের সংখ্যা বাড়ে, তাকে **'মানব জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার'** বলা হয়। উদাহরণ ঃ বৃদ্ধির হার 5 বলতে প্রতি বছরে 1000 জনসংখ্যায় 50 জন মানুষের সংখ্যাবৃদ্ধিকে (100 জনে 5 জন, প্রতি বছর) বোঝায়। প্রাথমিক ধারণায় প্রতি বছর জন্মহার এবং মৃত্যুহারের পার্থক্যকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বলা হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ধনাত্মক (জন্মহার মৃত্যুহার অপেক্ষা অধিক হলে), ঋণাত্মক (মৃত্যুহার জন্মহার অপেক্ষা বেশী হলে) বা শূন্য (মৃত্যু ও জন্মহার সমান হলে) হতে পারে।

4.5.2 মানব জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রক শর্ত (Factors Controlling Growth Rate of Human Population) ঃ

মানব জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার— (a) জন্মহার, (b) মৃত্যুহার, এবং (c) প্রচরণ প্রভৃতি শর্তের উপর নির্ভর করে।

(a) **জন্মহার** (Birth Rate or Natality) ঃ

মানুষের জন্মহার বলতে— প্রতি একহাজার মানুষে প্রতিবছর মোট জাতকের সংখ্যাকে বোঝায়। জন্মহার শূন্য বা ধনাত্মক হতে পারে, কিন্তু কখনোই ঋণাত্মক হয় না। আদর্শ পরিবেশগত অবস্থায় তত্ত্বীয় ধারণা অনুযায়ী (theoretically) প্রতি একজন মানুষ থেকে সর্বাধিক যতসংখ্যক মানুষ উৎপন্ন হতে পারে, তাকে **'শারীরবৃত্তিয় জন্মহার'** (physiological natality) বলা হয়। শারীরবৃত্তিয় জন্মহার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থাৎ কোন একটি জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট। জন্মহার নিম্নলিখিত সূত্রের দ্বারা প্রকাশ করা হয় ঃ

$$N = \frac{n\beta}{T}$$

(N= জন্মহার বা ন্যাটালিটি রেট ; $n\beta$ = নূতন জাতকের মোট সংখ্যা ; T= সময়।)

জন্মহার বৃদ্ধির ফলে মানবজনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য উন্নত দেশগুলির তুলনায় উন্নয়নশীল দেশে জন্মের হার অনেক বেশি (তালিকা)।

A.	দেশ	জন্মহার
	কেনিয়া	53
	কঙ্গো	45
	ইজিপ্ট	41
	ইরান	44
	ভারত	36
	মেক্সিকো	33
	দক্ষিণ আফ্রিকা	36
	মালয়েশিয়া	31
	জামাইকা	27
	ইজরায়েল	25
	চিলি	22
	চিন	18
	আমেরিকা	16
	কিউবা	15
	জাপান	14
	ইংল্যাণ্ড	13
	জার্মানী	12
	ইটালী	12
	সুইডেন	10

B.	মহাদেশ	জন্মহার
	এশিয়া	29
	আফ্রিকা	46
	লাতিন আমেরিকা	32
	উত্তর আমেরিকা	16
	অস্ট্রেলিয়া	16
	ইউরোপ	14

তালিকা 4.1 ঃ কয়েকটি দেশের (A) এবং মহাদেশের (B) জন্মহার দেওয়া হয়েছে।
(উৎস ঃ Biological Sci, Green, Stout and Taylor, 2nd Edn, 1995)

(b) **মৃত্যুহার** (Death Rate or Mortality) ঃ মর্ট্যালিটি বলতে মৃত্যুহারকে বোঝায়। প্রতি বছর প্রতি একহাজার মানুষে মোট মৃত মানুষের সংখ্যাকে মৃত্যুহার বা 'ডেথ রেট' বলা হয়। মৃত্যুহারের প্রভাবে মানব জনসংখ্যার হ্রাস ঘটে। মানুষের মৃত্যু বিবিধ কারণে হতে পারে— বয়সজনিত কারণ, রোগের প্রভাব বা অপুষ্টিজনিত কারণ। দেখা গেছে যে,

উন্নত দেশগুলিতে মৃত্যুর হার উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক কম। কারণ, উন্নত দেশগুলিতে খাদ্যের প্রতুলতা এবং উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থার ফলে মৃত্যুর সম্ভাব্যতা অনেক কম। ভারতে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধোত্তর সময়ে জন-বিস্ফোরণের মূল কারণ হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে বিভিন্ন খাদ্য এবং উন্নত চিকিৎসা সম্পর্কীয় সাহায্য প্রকল্পের প্রবর্তন। মৃত্যুহারকে নিম্নলিখিত সূত্রের সাহায্যে প্রকাশ করা হয় :

$$M = \frac{nD}{T}$$

(M = মৃত্যুহার [মর্ট্যালিটি] ; nD = মোট মৃত্যু সংখ্যা ; T = সময়,)

A.

দেশ	মৃত্যুহার	দেশ	মৃত্যুহার
ইথিওপিয়া	25	আমেরিকা	9
কঙ্গো	19	ইটালি	9
ভারত	15	মেক্সিকো	8
ইরান	14	মালয়েশিয়া	8
কেনিয়া	14	ইজরায়েল	7
দক্ষিণ আফ্রিকা	12	চিলি	7
জার্মানী	12	চিন	6
ইংল্যাণ্ড	12	কিউবা	6
ইজিপ্ট	11	জামাইকা	6
সুইডেন	11	জাপান	6
		কোস্টারিকা	4

B.

মহাদেশ	মৃত্যুহার	মহাদেশ	মৃত্যুহার
আফ্রিকা	17	লাতিন আমেরিকা	9
এশিয়া	11	উত্তর আমেরিকা	9
ইউরোপ	10	অস্ট্রেলিয়া	7

তালিকা 4.2 ঃ বিভিন্ন দেশের (A) এবং মহাদেশের (B) মৃত্যুহার দেখান হয়েছে।
(উৎস ঃ Biological Sci, Green, Stout & Taylor, 2nd Edn. 1995)

(c) **প্রচরণ (Migration)** ঃ খাদ্য এবং নূতন বাসস্থানের জন্য মানুষ যখন কোন দেশের ভৌগোলিক সীমারেখার ভিতরে একস্থান থেকে অন্যস্থানে বা ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে একদেশ থেকে ভিন্ন দেশে গমন করে, তখন তাকে **'প্রচরণ'** বা **'মাইগ্রেশান'** (migration) বলা হয়। প্রচরণ দু-ধরনের—

(i) **আভ্যন্তরীণ প্রচরণ** (Internal Migration) ঃ কোন দেশের ভৌগোলিক সীমা রেখার অভ্যন্তরে প্রচরণ কে আভ্যন্তরীণ প্রচরণ বলা হয়।

(ii) আন্তর্জাতিক প্রচরণ (International Migration) : ভৌগোলিক সীমারেখা অতিক্রম করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে প্রচরণ কে **'আন্তর্জাতিক প্রচরণ'** বলা হয়।

আভ্যন্তরীণ প্রচরণের ফলে কোন দেশের জনসংখ্যার কোন পরিবর্তন হয় না কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রচরণের ফলে জনসংখ্যার পরিবর্তন হয়। উদাহরণ হিসেবে আমেরিকা, আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং ভারতের জনসংখ্যার পরিবর্তনের কথা বলা যেতে পারে। প্রতি বছর প্রায় এক মিলিয়ন (দশ লক্ষ) লোক বৈধ এবং অবৈধ ভাবে অভিবাসনের জন্য আমেরিকায় প্রবেশ করে, যা ঐ দেশের মোট বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির দুই-তৃতীয়াংশ। আশির দশকে আফগানযুদ্ধের ফলে প্রায় তিনমিলিয়ন (৩০ লক্ষ) আফগান পাকিস্তানে প্রবেশ করে। এই কারণে পাকিস্থানের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আফগানিস্থানের জনসংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। এছাড়া ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে বার্ষিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি কারণ হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশ।

4.5.3 বিশ্বের জনসংখ্যার আকস্মিক বৃদ্ধি (Population Explosion of World) ঃ

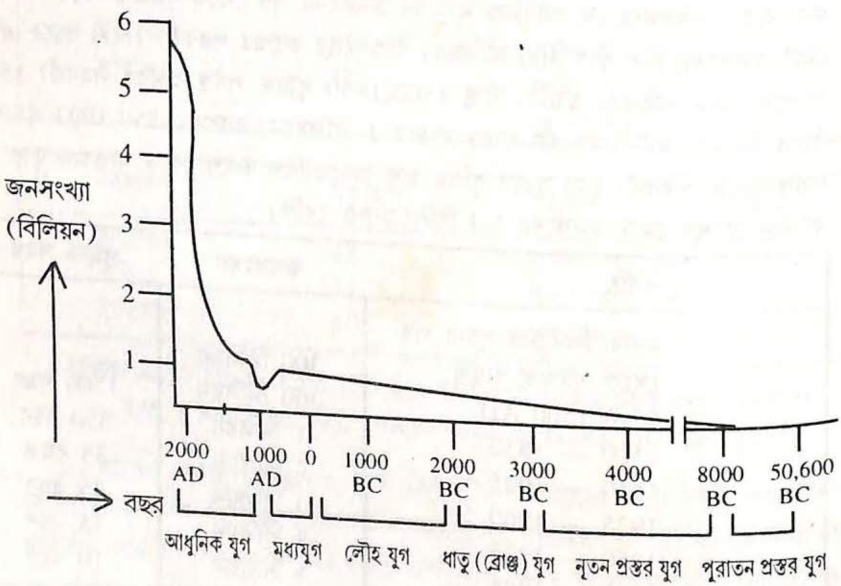
আধুনিক মানুষের উদ্বর্তনের সূচনাপর্ব থেকে আজ অবধি মানব জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সমান নয়। সাম্প্রতিক কালে বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অত্যধিক বেশি। আকস্মিক এবং নাটকীয়ভাবে বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই ঘটনাকে 'জন বিস্ফোরণ' নামে অভিহিত করা যায়। দেখাগেছে যে, আধুনিক মানুষের উদ্বর্তনের পর থেকে খৃষ্টজন্ম পর্যন্ত বিশ্বের মোট জনসংখ্যা ছিল প্রায় 300 মিলিয়ন। যীশুখৃষ্টের জন্মের পরবর্তী 1500 বছরে এই সংখ্যার কোন পরিবর্তন হয়নি। কিন্তু 1500-1850 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থবৎ পরবর্তী 350 বছরে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় 1 বিলিয়নে। আবার 1850-1993 খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ পরবর্তী 143 বছরে বৃদ্ধির হার অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যাওয়ার কারণে বর্তমান বিশ্বের মোট জনসংখ্যা 5.4 বিলিয়নেরও বেশি।

পর্যায়	জনসংখ্যা	গৃহীত সময়
মানব উদ্বর্তনের সূচনা পর্ব থেকে খৃষ্টজন্ম অবধি	300 মিলিয়ন	
0 — 1500 AD	300 মিলিয়ন	1500 বছর
1500 — 1850	1 বিলিয়ন	350 বছর
1850 — 1925	2 বিলিয়ন	35 বছর
1925 — 1960	3 বিলিয়ন	35 বছর
1960 — 1975	4 বিলিয়ন	15 বছর
1975 — 1985	5 বিলিয়ন	10 বছর

তালিকা 4.3 ঃ বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছে।

4.5 4. জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কারণ কি?

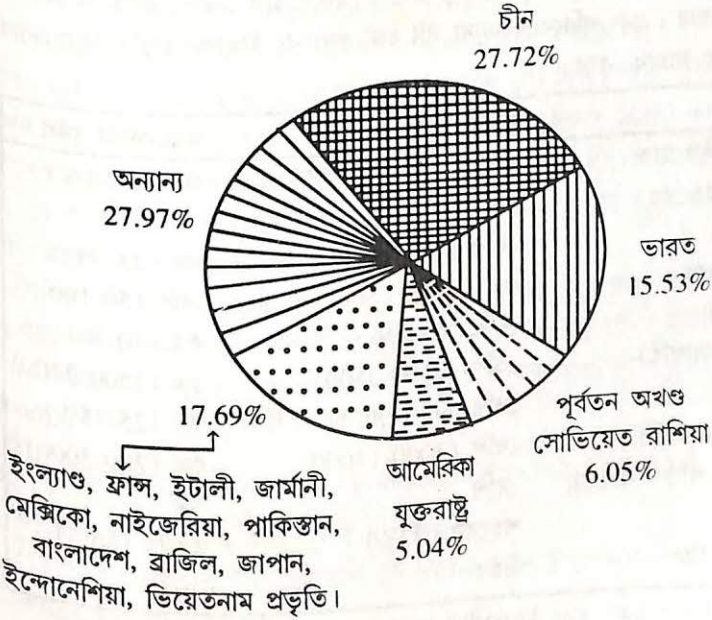
খৃষ্টজন্মের পূর্বে মানবজনসংখ্যার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। কারণ, ঐ সময় মৃত্যহার এবং জন্মহার মোটামুটি সমান ছিল। এখনকার তুলনায় ঐ সময় মৃত্যুহার বেশী ছিল কারণ, খাদ্যের অভাবে (দুর্ভিক্ষে), রোগজনিত কারণে এবং যুদ্ধের দ্বারা বহু মানুষ মারা যেত। পরিসংখ্যান এর ফলে দেখা গেছে যে, পুরাতন প্রস্তর যুগে মানুষের গড় আয়ু ছিল 17 বছর, রোমান এবং ইজিপ্টদের গড় আয়ু ছিল 30 বছর। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে মানুষের গড় আয়ু 70 বছর। গড় আয়ু বাড়ার ফলে মৃত্যুহার ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে। মৃত্যু হারের হ্রাস জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অন্যতম প্রধান কারণ। তাছাড়া মৃত্যুহার হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে জন্মহারের বৃদ্ধিও জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি প্রধান কারণ। খৃষ্টজন্ম থেকে আজ পর্যন্ত অর্থাৎ 2000 বছরের মধ্যে বিশ্বের জনসংখ্যা 300 মিলিয়ন থেকে 5.4 বিলিয়নে পৌঁছেছে, যা 'জন বিস্ফোরণের' নামান্তর। এই পর্যায়ে জনবিস্ফোরণের মূল কারণ জন্মহারের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, মৃত্যুহারের হ্রাস এবং আন্তর্জাতিক প্রচরণ। মৃত্যুহার হ্রাসের প্রধান কারণ খাদ্যের প্রাচুর্য্য, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি, এবং উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা ও অধুনা আবিষ্কৃত উন্নত ঔষধের দ্বারা জীবননাশক রোগ যথা—প্লেগ, কলেরা, টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, গুটি বসন্ত, টিউবারকিউলোসিস প্রভৃতি রোগের বিলুপ্তি।



চিত্র 4.2 ঃ মানব সভ্যতার বিভিন্ন সময়ে জনসংখ্যার পরিবর্তন (বৃদ্ধি) দেখানো হয়েছে।

4.5 5. বিশ্বের জনসংখ্যার বন্টন (Distribution of the World's Population) ঃ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সমান হয়। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার উন্নত দেশগুলির তুলনায় অনেক বেশি। যদিও কিছু উন্নত দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিবর্তে জনসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বের বর্তমান মোট জনসংখ্যা 5.4 বিলিয়ন। মোট উক্ত জনসংখ্যার 75 শতাংশ এশিয়া, আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকার উন্নয়নশীল দেশগুলিতে বাস করে। বিশ্বের জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড় হার 1.7 শতাংশ, যদিও উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যথাক্রমে 2.7 এবং 1 শতাংশ। বর্তমানে বিশ্বে প্রতি বছর 65 মিলিয়ন জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং প্রতিবছর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এই জনসংখ্যার 54 মিলিয়ন উন্নয়নশীল দেশের এবং অবশিষ্ট 11 মিলিয়ন উন্নত দেশের অবদান। প্রতি বছর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত মোট জনসংখ্যার (অর্থাৎ 54 মিলিয়নের) 15 মিলিয়ন ভারতের (1901 থেকে 1991 পর্যন্ত ভারতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি তালিকায় দেওয়া হয়েছে)। জাতিপুঞ্জের হিসাব অনুসারে 2025 সালে বিশ্বের মোট জনসংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় 8.5 বিলিয়ন। 1993 থেকে 2025 সালের মধ্যে মোট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যার 172 মিলিয়ন আসবে উন্নত দেশগুলি থেকে, বিপরীতক্রমে উন্নয়নশীল দেশগুলি থেকে আসবে 2.7 বিলিয়ন (2700 মিলিয়ন)।



চিত্র 4.3 ঃ বিশ্বের জনসংখ্যার বণ্টন পাই-চিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

গণনা বৎসর	মোট জনসংখ্যা (মিলিয়ন)
1901	238
1911	252
1921	252
1931	279
1941	319
1951	361
1961	339
1971	548
1981	685
1991	800

তালিকা 4.4 ঃ ভারতের জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে (1901-1991)

4.5.6. জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্য (Characteristic of Population) ঃ

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং আকার দ্বারা জনসংখ্যাকে শুধুমাত্র চরিত্রায়িত করা হয় না। আকার এবং বৃদ্ধির হার ব্যতীত বয়স গঠন (age structure) ; লিঙ্গ সংযুক্তি (sex composition), জন্ম, মৃত্যু এবং বংশবৃদ্ধির হার ; দেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বণ্টন ; আন্তঃ এবং আন্তর্জাতিক প্রচরণ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য জনসংখ্যার চরিত্রায়নে সাহায্য করে। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্য ব্যতিরেকে মানুষের জীবনযাত্রার মান নির্ণয়কারী বিভিন্ন শর্ত যথা ঃ গড় আয়ু ; শিশু-মৃত্যুর হার ; গড় আয় ; শিক্ষার হার ; খাদ্য, শক্তি ও অন্যান্য সম্পদের ব্যবহার ; এবং পরিবেশে মনুষ্য সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থের নিষ্কাশন প্রভৃতি জনসংখ্যার উৎকর্ষ নির্ণয়ে সাহায্য করে।

বৈশিষ্ট্য	উন্নত দেশ	উন্নয়নশীল দেশ
জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার	কম ((0.6%)	বেশি ((2.1%)
জনসংখ্যা দ্বিগুণের গৃহীত সময়	বেশি (116)	কম (33 বছর)
শিশুমৃত্যুর হার	কম (5-25)	বেশি (50-100)
আয়ু (বছর)	বেশি (69-75)	কম (40-50)
খাদ্যগ্রহণ (ক্যালরি)	বেশি (3100-3500)	কম (1500-2700)
শিক্ষার হার	বেশি (95% বা তার বেশি)	কম (25-75%)
উপার্জন (পারক্যাপিটা)	বেশি (3000-14000)	কম (200-3000)
পারক্যাপিটা শক্তির ব্যবহার	বেশি	কম
জনসংখ্যা	শহরের (72%)	গ্রামের (66%)
জীবনযাত্রার মান	উন্নত	অনুন্নত

তালিকা 4.5 ঃ উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে জনসংখ্যার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনা দেখানো হয়েছে।

4.5.7. জনসংখ্যার বয়স-সংযুতি (Age Structure of Population) ঃ

জনসংখ্যা বলতে বিভিন্ন বয়স গ্রুপের মানুষের জটিল সংমিশ্রণকে বোঝায়। 'জনন ক্ষমতা' অনুসারে জনসংখ্যাকে প্রধানত তিনটি বয়স গ্রুপে বিভক্ত করা হয় ঃ **প্রাক্-বংশবৃদ্ধিকর গ্রুপ** (pre-reproductive group), **বংশবৃদ্ধিকর গ্রুপ** (reproductive group) এবং **বংশবৃদ্ধিকোত্তর গ্রুপ** (post-reproductive group)।

(a) **প্রাক্-বংশবৃদ্ধিকর গ্রুপ** (Pre-Reproductive Group) ঃ তরুণ সদস্য (0-14 বছর বয়স) দ্বারা এই গ্রুপ গঠিত। কোন জনগোষ্ঠীর জনন ক্ষমতা প্রাকজনন গ্রুপের আকারের উপর নির্ভর করে। যেসমস্ত উন্নয়নশীল দেশে জন্মহার খুবই বেশি, ঐ সব দেশে প্রাক্-বংশবৃদ্ধিকর গ্রুপের আকার সব থেকে বড় এবং মোট জনসংখ্যার 45 শতাংশ। এই গ্রুপের আকার বড় হওয়ার জন্য উন্নয়নশীল দেশে বিদ্যালয় এবং শিক্ষকের ; মাতৃ এবং শিশুসদনের চাহিদা এবং কাজ বা চাকুরীর জন্য প্রতিযোগিতা সব থেকে বেশি।

(b) **বংশবৃদ্ধিকোত্তর গ্রুপ** (Post-Reproductive Group) ঃ অপেক্ষাকৃত বয়স্ক সদস্য (65 বছর বা তার বেশী বয়স) দ্বারা এই গ্রুপ গঠিত। যে সমস্ত উন্নত দেশে জনসংখ্যা ক্রমশ কমে যাচ্ছে, ঐ সব দেশে জনসংখ্যার বৃহৎ অংশ বংশবৃদ্ধিকোত্তর গ্রুপ দ্বারা গঠিত। উন্নত দেশে বয়স্ক গোষ্ঠীর সংখ্যাধিক্যের ফলে স্বাস্থ্য এবং তত্ত্বাবধানের জন্য বেশি ব্যয় হলেও চাকুরীর প্রতিযোগিতা অপেক্ষাকৃত কম।

(c) **বংশবৃদ্ধিকর গ্রুপ** (Reproductive Group) ঃ

বংশবৃদ্ধিকর গ্রুপ সেই সকল জনসদস্য দ্বারা গঠিত, যাদের বয়স 15 থেকে 44 বছরের মধ্যে। এই গ্রুপের আকারের উপর জনসংখ্যার বৃদ্ধি নির্ভর করে। তাই জনসংখ্যা হ্রাসের একটি মূল উপায় হচ্ছে— এই গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত সকল মহিলা এবং পুরুষের বিবাহের ন্যূনতম বয়সের সীমা বৃদ্ধি করা। উদাহরণ হিসেবে চীনের বয়সসীমা উল্লেখ করা যেতে পারে। চীনে মেয়েদের প্রথম বিবাহের গড় বয়স 22 বছর, যদিও কয়েক দশক আগে বিয়ের ন্যূনতম বয়স ছিল 17 বছর।

যে সব জনসংখ্যার বৃদ্ধিহার খুব বেশি ঐ জনসংখ্যার বৃহৎ অংশ প্রাক্‌বংশবৃদ্ধিকর গ্রুপ দ্বারা গঠিত। জনসংখ্যায় উপরিউক্ত তিনটি গ্রুপ সমানভাবে বণ্টিত হলে জনসংখ্যার আকার অপরিবর্তিত থাকে, কিন্তু জনসংখ্যায় বয়স্ক সদস্যের সংখ্যা বেশি হলে জনসংখ্যার হ্রাস ঘটে।

4.5.8. জনসংখ্যা বৃদ্ধির গ্রাফ (Population Growth Curves) ঃ

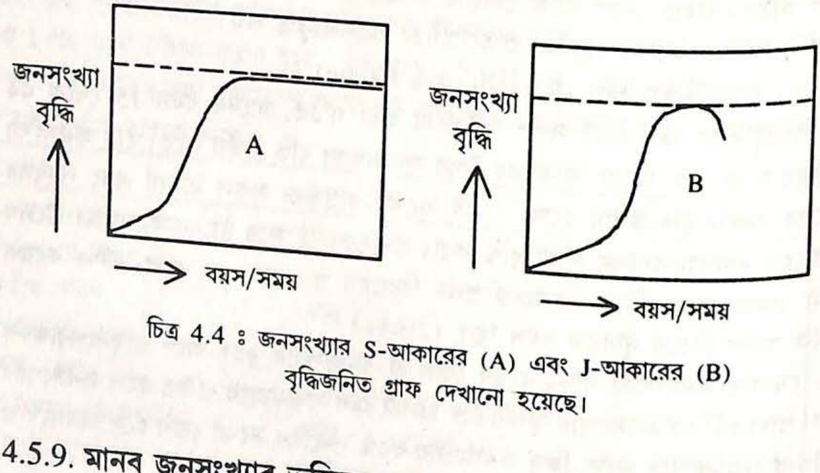
জনসংখ্যার বৃদ্ধিজনিত গ্রাফ মূলত দু-প্রকার—

(1) 'S'-আকারের বা সিগ্‌মোয়ডাল ('S'-shaped or Sigmoidal) গ্রাফ এবং (2) J-আকারের (J-shaped) গ্রাফ।

(1) **'S' আকার বা সিগ্‌মোয়ডাল গ্রাফ** ঃ আণুবীক্ষণিক জীব, উদ্ভিদ এবং মানুষ সহ

সমস্ত প্রাণীদের ক্ষেত্রে 'S'-আকারের বৃদ্ধি-গ্রাফ দেখা যায়। এই ধরনের বৃদ্ধি-গ্রাফ থেকে দেখা যায় যে— কোন একটি নূতন পরিবেশে প্রাথমিক পর্যায়ে জীবের জনসংখ্যার বৃদ্ধি খুব ধীর গতিতে ঘটে। কিন্তু জীব যখন ঐ পরিবেশে অভিযোজিত হয় এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে, তখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি অতি দ্রুতহারে বা ব্যাখ্যাপূর্ণভাবে (exponentially) ঘটে। বৃদ্ধির ঠিক পরেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পায় এবং চূড়ান্ত অবস্থায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি শূন্যতে পৌঁছায়, কারণ এই অবস্থায় **'জন্মহার'** (natality) এবং **'মৃত্যুহার'** (mortality) সমান হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য, বাসস্থান এবং অন্যান্য সম্পদের জন্য জীবের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা শুরু হয় অর্থাৎ পরিবেশ সম্পর্কীয় বাধার সৃষ্টি হয়, তার ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পায়। S-আকারের গ্রাফে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শূন্য বলতে কোন জীবের সাপেক্ষে কোন বিশেষ পরিবেশের সর্বাধিক ধারণ ক্ষমতাকে বোঝায় (চিত্র 4.4 A)।

(2) **J-আকার গ্রাফ ঃ** এই ধরনের গ্রাফ অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে জীবের সংখ্যাবৃদ্ধি খুব ধীর গতিতে ঘটে (Lag Phase), কিন্তু পরিবেশে অভিযোজনের পর জনসংখ্যা অতি দ্রুতহারে বৃদ্ধি ঘটে কিন্তু হঠাৎ পরিবেশ সম্পর্কীয় বাধার ফলে জনসংখ্যার পূর্ণবিনাশ ঘটে (final crash) (চিত্র 4.4 B)।

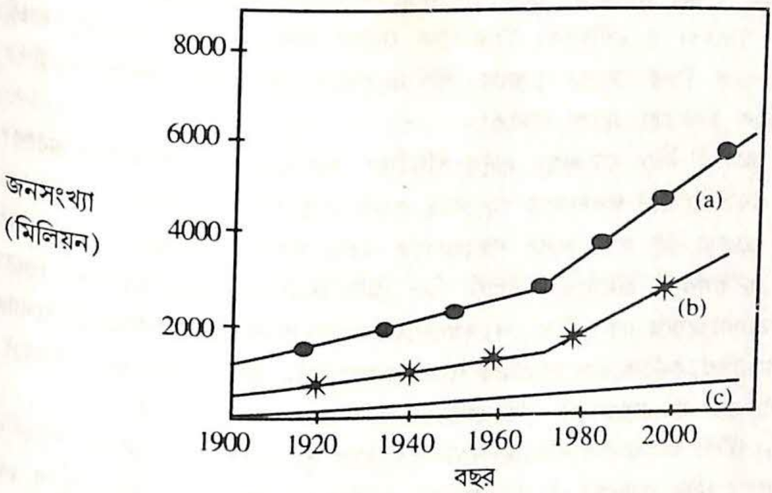


চিত্র 4.4 ঃ জনসংখ্যার S-আকারের (A) এবং J-আকারের (B) বৃদ্ধিজনিত গ্রাফ দেখানো হয়েছে।

4.5.9. মানব জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ (Future of Human Population) ঃ

1985 সালেই বিশ্বের জনসংখ্যা 5 বিলিয়ন অতিক্রম করেছে এবং এখনও 1.7 শতাংশ হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে প্রতি বছর 65 মিলিয়ন মানুষ মূল জনসংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। বিশ্বের মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ অনুন্নত দেশ সমূহে বাস করে এবং এই জনসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি এশিয়ার। বিপরীতক্রমে উন্নত দেশসমূহের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অতি-নগণ্য, মাত্র 0.6 শতাংশ। অনুন্নত দেশসমূহের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির

হার সবথেকে বেশি 'এশিয়া' এবং 'আফ্রিকায়'। তাই বিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে— 1. আমাদের পৃথিবী কি এই বিপুল জনসংখ্যাকে ধারণ করতে সক্ষম হবে? 2. পৃথিবীর বুকে কি অনিয়তভাবে জনস্ফীতি ঘটে চলবে এবং এরূপ বৃদ্ধির কি পরিণতি ঘটবে? 3. জনসংখ্যার বৃদ্ধি অনিয়তভাবে না ঘটলে কিভাবে জনসংখ্যার সীমায়ন ঘটবে? ইত্যাদি।



চিত্র 4.5 ঃ বিংশশতাব্দীতে সমগ্র বিশ্বে (a), এশিয়ায় (b) এবং ইউরোপে (c) জনসংখ্যার বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে।

• **জনসংখ্যার বৃদ্ধিজনিত প্রভাব ঃ** পৃথিবীর বুকে মানবজনসংখ্যার ভবিষ্যৎ আলোচনা করার পূর্বে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে যেসব বিরূপ প্রভাব দেখা যায় তা আলোচনা করা হল ঃ

i) উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে— ভারত, পাকিস্তান এবং শ্রীলঙ্কার মানুষের জীবনযাত্রার মান মোটামুটি একই মানের। বিগত 33 বছরে এই তিনটি দেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে। আমরা জানি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাহিদারও বৃদ্ধি ঘটে। সেই কারণে তেত্রিশ বছর আগের বিভিন্ন সুযোগসুবিধা যথা রাস্তাঘাট, বাসস্থান, ব্রিজ, পার্ক, স্কুল, শিক্ষক, ডাক্তার, নার্স, খাদ্য এবং চাকুরির সুযোগের চাহিদা দ্বিগুণভাবে বেড়েছে। জনসংখ্যা দ্বিগুণতার সঙ্গে সঙ্গে তেত্রিশ বছরের মধ্যে যদি উপরিউক্ত সুযোগসুবিধা বৃদ্ধি ঘটানো না হয় তাহলে জীবনযাত্রার মান স্বভাবতই নীচে নেমে যায়। কিন্তু এই সময় পরিসরে শুধুমাত্র ভারত, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তান নয়, কোন উন্নত দেশের পক্ষে সুযোগসুবিধা দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব

নয়। ফলে আগামী দিনে মানুষের সঙ্গী হবে দারিদ্র, হতাশা, অপুষ্টি, রোগ, অশিক্ষা এবং বেকারত্ব। এছাড়া অপুনর্নবীকরণ এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ নিঃশেষের মুখে। বিগত কয়েক বছরে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধানও ক্রমশ বেড়ে গেছে। 1960 সালে উন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের মধ্যে পার ক্যাপিটা আয়ের (per capita income) পার্থক্য ছিল মাত্র \$1240 (আমেরিকান ডলার), কিন্তু 1980 সালে এই পার্থক্য দাঁড়ায় \$5700 এবং 2000 সালে আশা করা যাচ্ছে এই পার্থক্যের পরিমাণ \$8000 এ পৌঁছাবে। উন্নয়নশীল দেশের জনসংখ্যা যতই বাড়বে, ততই ঐ সব দেশ উন্নত দেশের তুলনায় পিছিয়ে পড়বে এবং উন্নত দেশগুলির উপর অর্থনৈতিক নির্ভরতা ক্রমশ বাড়বে।

ii) আগামী দিনে যে সকল মানুষ পৃথিবীতে আসবে তারা কোথায় বাস করবে? ভারত এবং শ্রীলঙ্কায় জনসংখ্যার গড় ঘনত্ব এখনই প্রতি বর্গকিলোমিটারে 250 ছাড়িয়ে গেছে। এছাড়া এই সব দেশের শহরগুলোর অবস্থা আরোও ভয়াবহ। 1950 সালে শহরে বসবাসকারী জনসংখ্যা যেখানে ছিল মোট জনসংখ্যার এক সপ্তমাংশ, 1990 সালে তা দাঁড়িয়েছে এক তৃতীয়াংশে। দূষণজনিত সমস্যা ব্যতিরেকে অত্যধিক জনসংখ্যার চাপে মানসিক, দৈহিক এবং সামাজিক পীড়নের ফলে ড্রাগ এবং অ্যালকোহলের ব্যবহার, হিংস্রতা এবং অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে, ভবিষ্যতে আরোও বাড়বে।

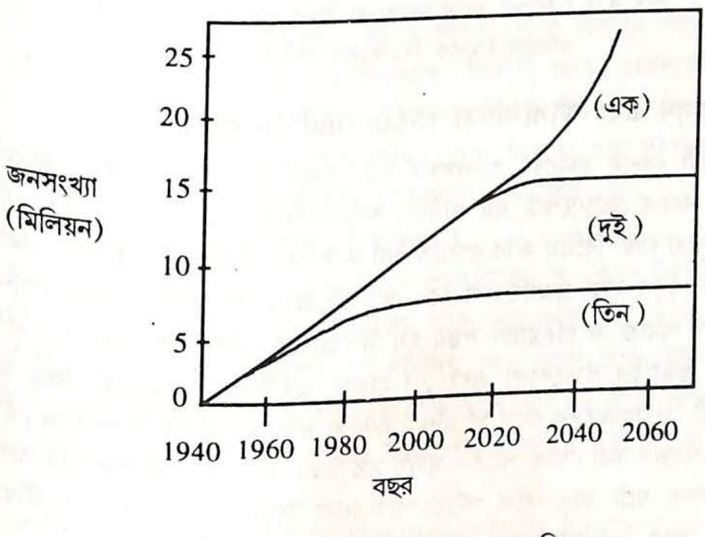
iii) অধিক জনসংখ্যার পরিণাম—অধিক পরিবেশ দূষণ। বর্তমান জনসংখ্যায় পৃথিবীর পরিবেশের সমগ্র বাস্তুতন্ত্রই পীড়নের শিকার। শুধুমাত্র বায়ু, জল এবং মৃত্তিকার দূষণ নয়, বাস্তুতন্ত্রের সজীব উপাদান উদ্ভিদ এবং প্রাণীও প্রত্যক্ষভাবে দূষণের শিকার। জনসংখ্যার বৃদ্ধি যদি বাধাহীন এবং অনিয়তভাবে চলতে থাকে তাহলে সমগ্র পৃথিবীতে সকল মানুষের স্থান সঙ্কুলান সম্ভব হবে না, হয়ত লক্ষ লক্ষ বছরের বিনিময়ে বিবর্তিত মানুষকে প্রকৃতি ভবিষ্যতে বর্জন (বা ত্যাগ) করতে বাধ্য হবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, উন্নয়নশীল দেশসমূহের জনসংখ্যা বেশি হলেও উন্নতদেশগুলি হচ্ছে জীবমণ্ডলের প্রধান দূষক এবং পৃথিবীর সাধারণ সম্পদের মুখ্য গ্রাহক।

• **মানবজনসংখ্যার ভবিষ্যৎ ঃ** বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিরীখে বলা যেতে পারে যে—বিশ্বের জনসংখ্যা ভবিষ্যতে অনিয়তভাবে বেড়ে চলবে, যদি ইচ্ছাকৃত বা প্রাকৃতিক উপায়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রিত না হয়। কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশ জনসংখ্যার বৃদ্ধি রোধে জন্মহার হ্রাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই উদ্দেশ্যে ঐ সব দেশ পরিবার পরিকল্পনা কার্যকরী করেছে। চীন এবং সিঙ্গাপুরে এই পদ্ধতিতে অভাবনীয় সাফল্য এসেছে, ভারত এবং শ্রীলঙ্কায় জন্মহার কিছুটা হ্রাস পেয়েছে, যদিও এই বিষয়ে আরোও প্রচেষ্টার প্রয়োজন। কিন্তু পাকিস্তানের সমস্যা আরো সঙ্কটজনক, কারণ এখনও পাকিস্তানের জন্মহার তৃতীয় বিশ্বের সর্বাধিক। জনসংখ্যার তিনটি সম্ভাব্যতার কথা উল্লেখ করা হল।

(এক) ঃ যদি বর্তমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বজায় থাকে তাহলে বিশ্বের জনসংখ্যা অনিয়তভাবে বেড়ে চলবে এবং 2300 সালের কাছাকাছি জনসংখ্যা এক ট্রিলিয়নে (1,000,000,000,000) পৌঁছাবে। যদিও প্রাকৃতিক বিপর্যয়, দুর্ভিক্ষ, রোগ এবং যুদ্ধ প্রভৃতি সমস্যা জনসংখ্যার বৃদ্ধিকে কিছুটা বাধা দেবে।

(দুই) ঃ জন্মহার যদি ধীরে ধীরে কমে যায় তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারও ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে। এক্ষেত্রে জনসংখ্যা 15 বিলিয়নে স্থিরিকৃত হবে, যা বর্তমান জনসংখ্যার প্রায় তিনগুণ।

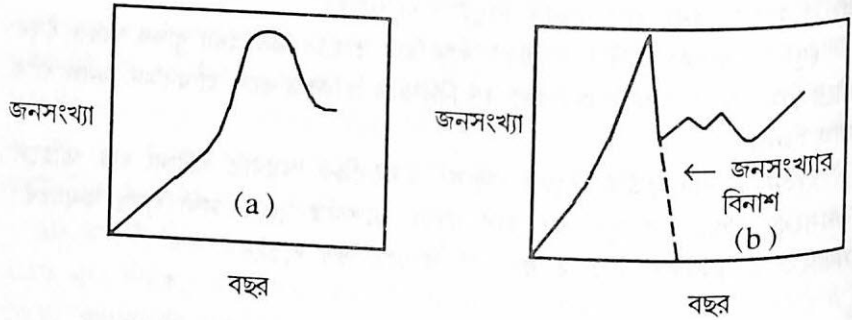
(তিন) ঃ যদি তৃতীয় বিশ্বের মানুষের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটানো যায়, তাহলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার খুব দ্রুত হ্রাস ঘটবে। এক্ষেত্রে 2030 সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা সর্বাধিক 8 বিলিয়নে পৌঁছাবে এবং এই সংখ্যায় স্থির থাকবে।



চিত্র 4.6 ঃ বিশ্বের জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ এর তিন ধরনের সম্ভাব্যতা দেখানো হয়েছে।

কতিপয় পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞের মতে জনসংখ্যার উপরিউক্ত তিনধরনের সম্ভাব্যতার কোন ভিত্তি নেই। এঁদের মতে আমরা ইতিপূর্বে জীবমণ্ডলের ভারসাম্য নষ্ট করে ফেলেছি, এই অবস্থায় যদি পুনরায় জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে তাহলে জীবমণ্ডল ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং বৃদ্ধির পরিবর্তে জনসংখ্যা হ্রাস পাবে (চিত্র 4.7a)। আবার অনেক পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞের মতে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে পরিবেশ এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত যে ভবিষ্যতে মানব জনসংখ্যার সম্পূর্ণ বা আংশিক বিনাশ ঘটবে (চিত্র 4.7b)।

অতএব উপরিউক্ত সম্ভাব্যতার দোষগুণ বা মূল্য যাই হোক না কেন এটা সঠিক যে, আমরা কি করছি, ভবিষ্যতে কি করব, এবং আজকে আমরা কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছি, তার উপর বিশ্বের জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে।



চিত্র 4.7 ঃ বিশ্বের মানব জনসংখ্যা বৃদ্ধির দুধরনের ('a' বা 'b') ভবিষ্যদ্বাণীমূলক চিত্রাঙ্কলেখ দেখানো হয়েছে।

4.6. মানুষ এবং জীববৈচিত্র্য (Man and Biodiversity) ঃ

পৃথিবী কেবল মানুষের আবাসস্থল নয়। মানুষ ছাড়া অসংখ্য প্রাণী, উদ্ভিদ এবং জীবাণুর অবাধ বিচরণক্ষেত্র এই পৃথিবী। অনুমান-ভিত্তিক হিসেবে পৃথিবীতে '50 লক্ষ' থেকে '300 লক্ষ' বিভিন্ন জীব-প্রজাতি বাস করে। এই বিপুল জীব-প্রজাতির কেবল 10 শতাংশের (15 লক্ষ প্রজাতি) সনাক্ত এবং চরিত্রায়ণ সম্ভব হয়েছে এবং অবশিষ্ট 90 শতাংশের সনাক্ত ও চরিত্রায়ণ সম্ভব হয় নি। ভাবলে অবাক হতে হয় যে—পৃথিবীতে 3 লক্ষ প্রজাতির কাঁচপোকা এবং 20 হাজার প্রজাতির মাছ রয়েছে। কিন্তু মানুষের অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপের ফলে প্রতিদিনই অসংখ্য প্রজাতি চিরতরে বিলুপ্ত হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে—মানুষ সৃষ্ট 'দূষণ' এবং অরণ্যধ্বংসের ফলে বাস্তুতন্ত্রের যে অবক্ষয় ঘটে তার ফলে পরিবেশগত এবং জৈবিক কারণে অসংখ্য জীবপ্রজাতি পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় নেয়।

4.7. বাস্তুতন্ত্রের উপর মানুষের প্রভাব (Human Impact on Ecosystems) ঃ

অধিকতর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং দীর্ঘ উদ্বর্তনের জন্য মানুষের হস্তক্ষেপে অবৈধভাবে পরিবেশের পরিবর্তন ঘটেছে। মানুষের পরিবেশ পরিবর্তনকারী ক্রিয়াকলাপের ফলে দেখা দিচ্ছে দূষণ (জল, স্থল এবং বায়ুমণ্ডলের), অ্যাসিড বৃষ্টি, শক্তির হ্রাস, এবং জনস্ফীতি। প্রধানত দু-উপায়ে জীবমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটেছে—পরিবেশের 'সজীব' এবং 'অজীব' শর্তের উপর মানুষের অবৈধ হস্তক্ষেপ।

(1) **সজীব শর্তের অবৈধ পরিবর্তন** (Tampering With Biotic Factors) ঃ

(i) **প্রতিযোগী জীবের আবির্ভাবের দ্বারা ঃ**

কোন বাস্তুতন্ত্রের সুস্থিতি নির্ভর করে ঐ বাস্তুতন্ত্রের খাদ্য-শৃঙ্খলের শিকারী-শিকার (Predator-Prey) সদস্য জীবের প্রকৃতি এবং সংখ্যার ভারসাম্যের উপর। বাস্তুতন্ত্রের সদস্য নয় এমন কোন নূতন শিকারী জীবের আবির্ভাব ঘটলে ঐ বাস্তুতন্ত্রের সমগোত্রীয় শিকারী জীবের সঙ্গে খাদ্য-আহরণের বিষয়ে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। খাদ্যের হ্রাসে পূর্বের শিকারী জীবের সংখ্যা হ্রাস ঘটে, ফলে ঐ বাস্তুতন্ত্র সামগ্রিকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়ে। উৎপাদক উদ্ভিদের প্রতিযোগী নূতন কোন উদ্ভিদের বাস্তুতন্ত্রে প্রবেশেও বাস্তুতন্ত্রের সুস্থিতি বিপন্ন হয়।

(ii) **শিকারী প্রাণীর দূরীকরণের মাধ্যমে ঃ**

আধুনিক সভ্যতার বিজয়রথের ধাক্কায় বিভিন্ন শিকারী জীব যথা ঃ ভল্লুক, ঈগল, বাজপাখি, নেকড়ে এবং সিংহ প্রভৃতি প্রাণী জীবমণ্ডল থেকে বিলুপ্তির পথে। এইসব প্রাণী বেঁচে থাকলেও আজ তারা চরম বিপদগ্রস্ত। শিকারী প্রাণীর অপসারণের ফলে শিকার প্রাণীর সংখ্যা প্রাথমিক পর্যায়ে অস্বাভাবিক হারে বেড়ে যায় কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে খাদ্যের অভাবে ক্রমশ কমে যেতে থাকে। এরূপ প্রভাবের দ্বারা সমগ্র বাস্তুতন্ত্রের সুস্থিতি বিনষ্ট হয় এবং মানব জনসংখ্যাও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়।

(iii) **রোগসৃষ্টিকারী জীবের অন্তর্ভুক্তির দ্বারা ঃ**

মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের ফলে বিভিন্ন প্যাথোজেন বা রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু অনিচ্ছাকৃতভাবে নূতন কোন পরিবেশে ঢুকে পড়ে, যে পরিবেশে প্যাথোজেন—নিয়ন্ত্রণকারী কোন জীব নেই (উল্লেখ্য, প্যাথোজেনও কোন কোন বাস্তুতন্ত্রের প্রাকৃতিক উপাদান)। এরূপ পরিবেশে রোগজীবাণু অতি দ্রুত হারে বংশবৃদ্ধি করে এবং অন্যান্য জীবের উপর মারণক্রিয়া শুরু করে। ফলে ট্রফিক-গঠন বিপর্যস্ত হয় এবং বাস্তুতন্ত্রের সুস্থিতি নষ্ট হয়।

2. **অজীব শর্তের অবৈধ পরিবর্তন** (Tampering With Abiotic Factors) ঃ

মানুষের অবৈধ হস্তক্ষেপের ফলে অজীব-শর্তেরও পরিবর্তন ঘটেছে। অজীব শর্তের পরিবর্তনগুলির মধ্যে বায়ু, স্থল ও জলের দূষণ এবং সাধারণ সম্পদের সঞ্চয় হ্রাস (যথা-জল) অন্যতম।

i) **দূষণ** (Pollution) ঃ

বারি, বায়ু এবং অশ্মমণ্ডলের দূষণের ফলে যে অস্বাভাবিক বা প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয় তার প্রভাবে জীবজগৎ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়। **'বর্জ্যপদার্থ মিশ্রিত জলের প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট'** থেকে যেসব ক্লোরিনযৌগ নদীর জলে মেশে তার প্রভাবে নদীর ঐ অঞ্চলের সমস্ত মাছ মারা যায় বা ঐ স্থান থেকে পরিযান করে। নদী,

হ্রদ এবং সমুদ্রপথে তেলপরিবহনকারী ট্যাঙ্কার থেকে পড়ে যাওয়া তেলের প্রভাবে (oil spilling) মাছ, সরীসৃপ প্রজাতির প্রাণী এবং বিভিন্ন পাখি মারা যায়। 'পেস্টিসাইড' পুঞ্জীভূত পতঙ্গ এবং মাছ খাদক পাখির (যথা—মাছরাঙ্গা, অসপ্রে, পেরেগ্রিন) বিলুপ্তিও পরিবেশ দূষণের শিকার। বিভিন্ন 'পাওয়ার প্লান্ট' থেকে উষ্ণ জল নদীতে পড়ার ফলে যে **'তাপীয় দূষণের'** সৃষ্টি হয়, তার প্রভাবে মাছ এবং মাছের খাদ্য-জীবের মৃত্যু ঘটে। বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইড, মিথেন প্রভৃতি গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে—পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটতে পারে। ফলে অসংখ্য উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটতে পারে। উপরিউক্ত এবং অন্যান্য মানব ক্রিয়াকলাপের জন্য যে প্রতিকূল পরিবেশের সৃষ্টি হয়, তার প্রভাবে বিভিন্ন প্রজাতির হ্রাস বা বিলুপ্তি ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশগত ভারসাম্যও বিঘ্নিত হয়।

(ii) **সম্পদ হ্রাস** (Resource Depletion) ঃ

মানুষের প্রয়োজনে অজীব এবং সজীব সম্পদের বাধাহীন অপচয়ের ফলে প্রাকৃতিক সম্পদের হ্রাস ঘটছে। এছাড়া অন্যান্য প্রজাতির ব্যবহার্য সম্পদও শুধু মানুষের প্রয়োজনে ব্যয় করা হচ্ছে। যেমন পাহাড়ে জলের উৎস পাহাড়ী ঝরণার বা জলপ্রবাহের গতিপথ পরিবর্তন করে নগরায়নের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, ফলে প্রাকৃতিক জলাধারগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে। এই কারণে জলের অভাবে ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন উদ্ভিদ এবং প্রাণী-প্রজাতি জীবমণ্ডল থেকে চিরতরে বিদায় নিচ্ছে।

3. **বাস্তুতন্ত্রের সরলীকরণ** (Simplification of Ecosystems) ঃ

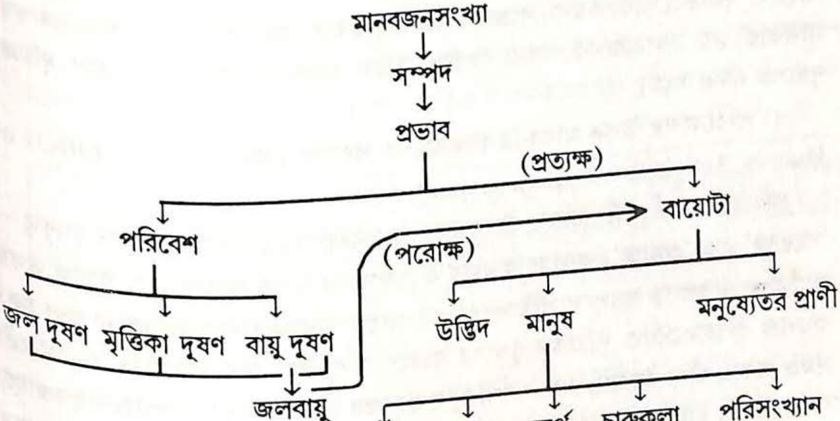
অজীব এবং সজীব শর্তের অবৈধ পরিবর্তনের ফলে প্রজাতির সংখ্যা হ্রাস পায়। এই ঘটনাকে বাস্তুতন্ত্রের সরলীকরণ বলা হয়। আমরা জানি যে, বাস্তুতন্ত্রের প্রজাতি বৈচিত্র্য যত বেশি সেই বাস্তুতন্ত্র তত বেশি সুস্থির। তাই বাস্তুতন্ত্রের সরলীকরণে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বা সুস্থিতি বিনষ্ট হয় এবং কালক্রমে বাস্তুতন্ত্রের বিনাশ ঘটে।

উদাহরণ ঃ তৃণক্ষেত্রকে কৃষিজমিতে রূপান্তরিত করলে তৃণক্ষেত্রের বাস্তুতন্ত্র সরলীকৃত হয়। সেক্ষেত্রে তৃণক্ষেত্রে বাসকারী বিভিন্ন প্রাণী এবং উদ্ভিদ প্রজাতি কৃষিক্ষেতের উপযোগী উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রজাতির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। যেহেতু কৃষিক্ষেতে বিশেষ একটি শস্যের চাষ করা হয় (monoculture), তাই কৃষিক্ষেতে বাস্তুতন্ত্রের প্রজাতির সংখ্যা হ্রাস পায় এবং বাস্তুতন্ত্র অতি সহজেই পতঙ্গ, প্যাথোজেন (ভাইরাস, ব্যাক্টিরিয়া, ছত্রাক), খরা, বায়ুপ্রবাহ এবং খারাপ আবহাওয়ার দ্বারা আক্রান্ত হয়। কৃষিকাজে বাস্তুতন্ত্রের সরলীকরণের পৃথক একটি কারণ হচ্ছে পেস্টিসাইড বা কীটনাশকের **'জীব-কেন্দ্রীভবন'** এবং **'জীব-বিবর্ধন'**। কেন্দ্রীভূত কীটনাশক খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে এক ট্রফিক লেভেল থেকে পরবর্তী ট্রফিক লেভেলে প্রবাহিত হয়। এক্ষেত্রে উপরের ট্রফিক লেভেলের সদস্য জীব কীটনাশকের দ্বারা অপেক্ষাকৃত বেশি আক্রান্ত হয় ; কারণ উপরের ট্রফিক লেভেলে পুঞ্জীভূত কীটনাশকের পরিমাণ বেশি হয়। ডি.ডি.টি.র জীব-কেন্দ্রীভবন এবং

বিবর্ধনের ফলে মাছ শিকারী পাখি যথা অসপ্রে, পেরেগ্রিন প্রভৃতির বিলুপ্তি (কারণ ডি.ডি.টি.'র প্রভাবে পাখির ভ্রূণের বিকাশ ব্যাহত হয়) ঘটে। কৃষিতে ডি. ডি. টি' ব্যবহারের কারণে বাস্তুতন্ত্রের সরলীকরণ ঘটে।

4.8. পরিবেশের উপর মানব-ক্রিয়াকলাপের প্রভাব (Impact of Human Activities on Environment) ঃ

মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশের সুস্থিতি আজ বিপন্ন। প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি এবং ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে পরিবেশের গঠন (বা কাঠামো) এক নিশ্চিত সঙ্কটের মুখে। পরিবেশের উপর মানব ক্রিয়াকলাপের প্রভাব— অজীব এবং সজীব—উভয় উপাদানের উপর ক্রিয়া করে। বায়ু, জল এবং মৃত্তিকা প্রভৃতি অজীব উপাদান এবং পরিবেশের সজীব উপাদান বা বায়োটা যথা ঃ উদ্ভিদ, প্রাণী এবং আণুবীক্ষণিক জীব মানুষের দ্বারা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয় চিত্র 4.8)।



চিত্র 4.8 ঃ 'প্রভাব বিশ্লেষক মডেলের' সাহায্যে মানুষের দ্বারা পরিবেশের উপর 'প্রভাব-বিস্তার' দেখানো হয়েছে।

কয়লার ব্যবহারজনিত প্রভাব (The Impact of Coal Use) ঃ 'শক্তি' হচ্ছে আধুনিক মানবসভ্যতার চালক। শক্তি উৎপাদনে যে জীবাশ্ম জ্বালানি সবথেকে বেশি ব্যবহৃত হয় তার নাম 'কয়লা' (coal)। মানুষের প্রয়োজনে ভূগর্ভ থেকে কয়লা সংগ্রহ (mining) এবং তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লার দহনের ফলে যে পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি হয় তার মধ্যে জল, মত্তিকা এবং বায়ুদূষণের ঘটনা অন্যতম।

• **বায়ু দূষণ** (Air Pollution) ঃ খনি থেকে কয়লা সংগ্রহ করার সময় বা খনি

সংলগ্ন স্থানে লরির সাহায্যে কয়লা পরিবহনের সময় প্রচুর পরিমাণ কয়লার কণা বায়ুতে মিশে যায় এবং তার ফলে বায়ুর দূষণ ঘটে। এছাড়া তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লার দহনের ফলে প্রচুর পরিমাণ বায়ুদূষণকারী ধোঁয়া, ছাই এবং ক্ষতিকারক গ্যাস বাতাসে মুক্ত হয়। দেখা গেছে যে 1000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন প্লান্ট থেকে প্রতিবছর 1500 থেকে 30,000 মেট্রিকটন 'পার্টিকুলেট' (ধোঁয়া এবং ছাই) এবং 11000 থেকে 110,000 মেট্রিক টন সালফারডাইঅক্সাইড (SO_2) গ্যাস বায়ুতে মুক্ত হয়।

• **জল দূষণ** (Water Pollution) :

কোল-মাইনিং এর ফলে নদী, হ্রদ প্রভৃতির জল মারাত্মকরূপে দূষিত হয়। ভূগর্ভস্থ কয়লা খনিতে প্রাপ্ত বিশেষ প্রকৃতির সালফার সমৃদ্ধ খনিজ পদার্থ অক্সিজেন এবং জলের সঙ্গে বিক্রিয়ায় তীব্র **'সালফিউরিক অ্যাসিড'** উৎপন্ন করে। এই অ্যাসিড খনি থেকে নিষ্কাশিত হয়ে নদী বা হ্রদের জলকে দূষিত করে।

• **মৃত্তিকা দূষণ** (Land Pollution) :

খনি থেকে কয়লা সংগ্রহের কারণে মৃত্তিকার দূষণ ঘটে। সারফেস মাইনিং এর সাহায্যে ভূগর্ভ থেকে কয়লা সংগ্রহের জন্য মৃত্তিকার স্তর অপসারণের প্রয়োজন হয়। মৃত্তিকার স্তর অপসারণের কাজে বিস্তীর্ণ উদ্ভিদ আচ্ছাদন বিনষ্ট হয়, ফলে মৃত্তিকা দূষণের ঘটনা ঘটে।

a) **পরিবেশের উপর মানব-ক্রিয়াকলাপের পরোক্ষ প্রভাব** (Indirect Effects of Human Activities on Environment) :

পরিবেশের সজীব উপাদানের উপর মানব ক্রিয়াকলাপের বিরূপ প্রভাব মূলত দুপ্রকার— **'পরোক্ষ'** এবং **'প্রত্যক্ষ'**। কয়লার ব্যবহার জীবজগতের উপর পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ উভয় ভাবেই পরিবেশগত সমস্যার সৃষ্টি করে। এই অংশে পরোক্ষ সমস্যা আলোচনা করা হল। কয়লার ব্যবহারজনিত পরিবেশ দূষণের কারণে জল, স্থল এবং অন্তরীক্ষে বসবাসকারী সমস্ত প্রকার জীব আক্রান্ত হয়। তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চিমনি নিঃসৃত সালফারডাইঅক্সাইড গ্যাস (SO_2) বায়ুমণ্ডলে সালফিউরিক অ্যাসিডে (H_2SO_4) রূপান্তরিত হয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুকণারূপে বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ায়। বায়ুমণ্ডলে উৎপন্ন অ্যাসিড বায়ুপ্রবাহের দ্বারা উৎপত্তিস্থল থেকে দূরবর্তী স্থানে ছড়িয়ে পড়ে এবং অনুকূল আবহাওয়ায় বৃষ্টি (অ্যাসিড বৃষ্টি) বা তুষারপাতের মাধ্যমে আকাশ থেকে মৃত্তিকায় এবং জলে অধঃক্ষিপ্ত হয়। অ্যাসিড বৃষ্টির প্রভাবে স্থলজ এবং জলজ বাস্তুতন্ত্রের উদ্ভিদ এবং প্রাণী বিনষ্ট হয়। অ্যাসিড বৃষ্টির প্রভাবে শুধু জীবজগৎ আক্রান্ত হয় না, অজীব সম্পদেরও হানি ঘটে। যেমন সেতু, রণতরী (বা প্রমোদতরী), পাম্প এবং বিভিন্ন ধাতব গঠন অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে ক্ষয়ে যায়। এই সমস্ত ক্ষয়ে যাওয়া সম্পদের মেরামত এবং প্রতিস্থাপনের জন্য প্রতি বছর বিপুল অর্থের অপচয় হয়। এইভাবে কয়লার মাইনিং এবং দহনজনিত পরিবেশ দূষণের ঘটনায় মানুষ এবং সমগ্র জীবজগৎ পরোক্ষভাবে আক্রান্ত হয়।

b) **পরিবেশের উপর মানব ক্রিয়াকলাপের প্রত্যক্ষ প্রভাব** (Direct Effects Of Human Activities On Environment) ঃ

মানব ক্রিয়াকলাপ প্রত্যক্ষভাবে বায়োটা বা জীবজগতের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। যেমন সারফেস মাইনিং এর ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভূমির অবক্ষয় হওয়ায় ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী তৃণভোজী এবং অন্যান্য জীবজন্তুর বাসস্থান সংকুচিত হয়। ভূমিক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ আচ্ছাদন (vegetation) অপসারিত হয়, ফলে খাদ্য-উৎসের যোগান কমে যায়। এইভাবে বাস্তুতন্ত্র এক চরম সংকটের সম্মুখীন হয়। এছাড়া সারফেস মাইনিং জনিত ভূমিক্ষয়ের ফলে ভূগর্ভে সঞ্চিত জলভাণ্ডার সংকুচিত হয়, ফলে ঐ অঞ্চলের সমস্ত কূপ ক্রিয়াশক্তি হারায়। মানুষ এবং প্রাণী প্রতিপালনের প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের জন্য পুনরায় কূপ খননের প্রয়োজন পড়ে।

মানুষের সামাজিক পরিবেশের উপরও কোল মাইনিং এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে। কয়লাখনি কেন্দ্রিক শহর এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জনসংখ্যা অত্যধিক হারে বেড়ে যায় (পরিসংখ্যানগত পরিবর্তন বা demographic change)। জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে বাসস্থান, স্কুল, হাসপাতাল, পয়ঃপ্রণালী, জলসরবরাহ এবং পুনঃসৃষ্টিমূলক সুবিধার অভাব দেখা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র, হতাশা এবং অপরাধপ্রবণতার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় কয়লাখনি সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের সামাজিক পরিবেশের সুস্থিতি বিঘ্নিত হয় এবং সামাজিক পরিকাঠামো হঠাৎ ভেঙ্গে পড়ে।

• রাস্তা নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ, পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন, গর্ত খুঁড়ে নুড়ি তোলার কারখানা স্থাপন এবং অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়িত করার আগে পরিবেশের উপর ঐ সব প্রকল্পগুলির সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব সম্পর্কে অনুধাবন এবং অনুপুঙ্খ বিবেচনা জরুরী।

4.9. সারাংশ (Summary) ঃ

• আধুনিক মানুষ (cro-magnon) প্রাইমেট বর্গ, হোমিনিডি গোত্র, হোমো গন, সেপিয়েনস্ প্রজাতি এবং সেপিয়েনস্ প্রকার ভুক্ত সর্বাপেক্ষা উন্নত প্রাণী। আধুনিক মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম 'হোমো সেপিয়েনস্ সেপিয়েনস্'।

• আধুনিক মানুষই মানববিবর্তনের শেষতম সৃষ্টি। আধুনিক মানুষের উৎপত্তি 30 হাজার বছর পূর্বে নিয়ানডারথাল মানুষ থেকে।

• আধুনিক মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে সংক্ষিপ্ত করোটি, হ্রস্ব চোয়াল, আবক্র উপরিতল সম্পন্ন মস্তিষ্ক ($1400cm^3$) এবং লেখ্য ভাষার মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন।

• কোন সময়ে কোন একটি ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যাকে 'মানব জনসংখ্যা' বলে। প্রতিবছর প্রতি 1000 জনসংখ্যায় যতজন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়,—তাকে মানব জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার বলা হয়। মানব জনসংখ্যা—জন্মহার, মৃত্যুহার, প্রচরণ প্রভৃতি শর্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

• বর্তমান বিশ্বের মোট জনসংখ্যা হচ্ছে 5.4 বিলিয়ন। উন্নত দেশগুলির তুলনায় উন্নয়নশীল দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার অনেক বেশি।

• জনসংখ্যা হচ্ছে বিভিন্ন বয়স গ্রুপের মানুষের একটি জটিল সংমিশ্রণ। জনসংখ্যা— তিনটি বয়সগ্রুপ নিয়ে গঠিত— **প্রাক্ বংশবৃদ্ধিকর গ্রুপ, বংশবৃদ্ধিকর গ্রুপ** এবং **বংশবৃদ্ধিকোত্তর গ্রুপ**।

• জনসংখ্যার বৃদ্ধিজনিত গ্রাফ মূলত দুপ্রকার— **'সিগ্‌মোয়ডাল'** বা **'S'** আকারের এবং **'J'** আকারের।

• মানবজনসংখ্যার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে ভবিষ্যতে জনসংখ্যার বৃদ্ধি বা হ্রাসের উপর।

• মানুষের অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপ এবং অবৈধ হস্তক্ষেপের ফলে পরিবেশের অজীব এবং সজীব উপাদানের যে পরিবর্তন ঘটছে, তার ফলে দূষণ, শক্তি সঙ্কট, জনস্ফীতি এবং অ্যাসিড বৃষ্টি প্রভৃতি পরিবেশ বিপন্নকারী সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই প্রাকৃতিক পরিবেশের সুস্থিতি এবং ভারসাম্য নির্ভর করছে মানুষের বর্তমান কর্মপদ্ধতি এবং সিদ্ধান্তের উপর।

• অনুশীলনী •

A. রচনাভিত্তিক বা দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

1. জীবপরিবেশে মানুষের নিয়মানুগ অবস্থান বর্ণনা কর।
2. আধুনিক মানুষের উৎপত্তির ধাপগুলি আলোচনা কর।
3. মানব জনসংখ্যার বৃদ্ধি বলতে কি বোঝায়? মানব জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিয়ন্ত্রক শর্তগুলি আলোচনা কর।
4. জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কারণ কি? বিশ্বে জনসংখ্যার বণ্টন বিবৃত কর।
5. মানব জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ পর্যালোচনা কর।
6. বাস্তুতন্ত্রের উপর মানুষের প্রভাব বর্ণনা কর।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

1. মানুষের বৈজ্ঞানিক নাম কি? আধুনিক মানুষের নিয়মানুগ অবস্থান উল্লেখ কর।
2. আধুনিক মানুষের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?
3. মানবজনসংখ্যার বৃদ্ধি কাকে বলে? কোন্ কোন্ শর্তের উপর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নির্ভর করে?
4. জন্মহার, মৃত্যুহার এবং প্রচরণ বলতে কি বোঝায়?
5. ভারতে এবং বিশ্বে বর্তমান জনসংখ্যা কত? জনসংখ্যা বিস্ফোরণের কারণ কি?
6. জীববৈচিত্র্য বলতে কি বোঝ? জীব বৈচিত্র্য বিলুপ্তির পিছনে মানুষের ভূমিকা কি?
7. পরিবেশের উপর মানব ক্রিয়াকলাপের প্রভাব উল্লেখ কর।
8. পরিবেশ দূষণ এবং প্রাকৃতিক সম্পদ হ্রাসে মানুষের ভূমিকা কি?

5 পরিবেশের অজীব উপাদান

5.1. ভূমিকা (Introduction) :

পরিবেশের প্রধান তিনটি অজীব উপাদান হচ্ছে— বায়ু (air), স্থল (land) এবং জল (water)। জীবমণ্ডলের তিনটি অংশ— বায়ুমণ্ডল, অশ্মমণ্ডল এবং বারিমণ্ডল যথাক্রমে বায়ু, মৃত্তিকা এবং জলের সঙ্গে সজীব উপাদানের আন্তঃক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়। জীবনের জন্য যে 16টি মৌলের প্রয়োজন তা কেবল এই পৃথিবীর ভূ-ত্বকে (crust) এবং বায়ুমণ্ডলে পাওয়া যায়। পরিবেশে প্রাপ্ত জীবের চারটি প্রধান সর্বজনীন মৌল হচ্ছে **হাইড্রোজেন, কার্বন, অক্সিজেন** এবং **নাইট্রোজেন**। জীবভরের 99 শতাংশ এই চারটি মৌলের দ্বারা গঠিত। সেইহেতু জীব-অত্যাবশ্যক মৌলের প্রাপ্তিস্থান-পরিবেশের অজীব উপাদানত্রয়— বায়ু, স্থল এবং জলের গুরুত্ব অপরিসীম।

জৈব অণুর প্রধান মৌল		আয়ন		আংশিক প্রয়োজনীয় মৌল			
হাইড্রোজেন	H	সোডিয়াম	Na^{+}	ম্যাঙ্গানিজ	Mn	বোরন	B
কার্বন	C	ম্যাগনেসিয়াম	Mg^{++}	আয়রন	Fe	অ্যালুমিনিয়াম	Al
নাইট্রোজেন	N	ক্লোরিন	Cl^{-}	কোবাল্ট	Co	সিলিকন	Si
অক্সিজেন	O	পটাশিয়াম	K^{+}	কপার	Cu	ভ্যালাডিয়াম	V
ফসফরাস	P	ক্যালসিয়াম	Ca^{++}	জিঙ্ক	Zn	মলিবডেনাম	Mo
সালফার	S					আয়োডিন	I

তালিকা 5.1 : জীবদেহে প্রাপ্ত মৌলের নাম উল্লেখ করা হয়েছে (পারমাণবিক ভর অনুসারে সাজানো হয়েছে)। প্রথম তিনটি স্তম্ভে উল্লিখিত 16টি মৌল সর্বজনীন।

5.2. বায়ু (Air) :

5.2.1. বায়ু : বিশ্বের বিপন্ন সর্বজনীন সম্পদ (Air : The Endangered Global Common Resource) :

শুষ্ক, স্বচ্ছ এবং বিশুদ্ধ বায়ু বিশ্বপরিবেশের একটি সর্বজনীন সম্পদ। জীবজগতের শ্বসনক্রিয়ায় অপরিহার্য অক্সিজেন (O_2) এবং উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় শর্করা উৎপাদনে অপরিহার্য কার্বনডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস বায়ুর স্বাভাবিক উপাদান। বায়ু কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, সমগ্র জীবজগতের বেঁচে থাকার জন্য বায়ু অত্যাবশ্যক অর্থাৎ বায়ুর ব্যবহার সর্বজনীন। আবার বায়ুসম্পদকে রক্ষা করার দায়িত্বও কারোর একার নয়। তাই বায়ুর দূষণ খুব সহজ এবং বায়ুকে রক্ষা করা খুবই কঠিন।

5.2.2. বায়ুর উপাদান (Components of Air) ঃ

বায়ু হচ্ছে বিভিন্ন গ্যাসের সংমিশ্রণ। বিশুদ্ধ এবং শুষ্ক বায়ুর প্রধান গ্যাসীয় উপাদান —দ্বিপারমাণবিক নাইট্রোজেন (N_2, আয়তনের 78.09%), দ্বিপারমাণবিক অক্সিজেন (O_2, 20.94%); কার্বনডাইঅক্সাইড (CO_2, 0.03%) এবং বিভিন্ন নিষ্ক্রিয় গ্যাস যথা— আরগন (Ar, প্রায় 1%), হিলিয়াম (He), জেনন (Xe), এবং ক্রিপটন (Kr)। এছাড়া জলীয় বাষ্প বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণে উপস্থিত থাকে।

5.2.3. গ্যাসের পরিবেশ সম্পর্কীয় ঘনত্বের একক (Environmental Concentration Units for Gases in Air) ঃ

বায়ুর গ্যাসীয় উপাদানের পরিবেশ সম্পর্কীয় ঘনত্ব প্রকাশ করার জন্য 'মোলারিটি' (মৌলসংখ্যা/লিটার) ব্যবহার করা হয় না। গ্যাসের পরিবেশ সম্পর্কীয় ঘনত্ব প্রকাশ করা হয় **"পার্টস পার—"** ("Parts per—") তন্ত্র (বা একক) দ্বারা, যথা—**"পার্টস-পার-মিলিয়ন"** (ppm), **"পার্টস-পার-বিলিয়ন"** (ppb, 10^9) এবং **"পার্টস-পার-ট্রিলিয়ন"** (ppt, 10^{12}) ইত্যাদি। কখনো কখনো **"পার্টস-পার-হানড্রেড মিলিয়নও"** (pphm, 10^8) গ্যাসের পরিবেশ সম্পর্কীয় ঘনত্ব বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। উদাহরণ ঃ 200 অণু কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস যথাক্রমে **একমিলিয়ন** (10^6) বা **একবিলিয়ন** (10^9) বা **একট্রিলিয়ন** (10^{12}) অণু বায়ুর মধ্যে ছড়িয়ে থাকলে ঐ পরিমাণ কার্বনডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব হবে 200 ppm বা 200 ppb বা 200 ppt।

5.2.4. বায়ুমণ্ডলের অঞ্চল (Atmospheric Regions) ঃ

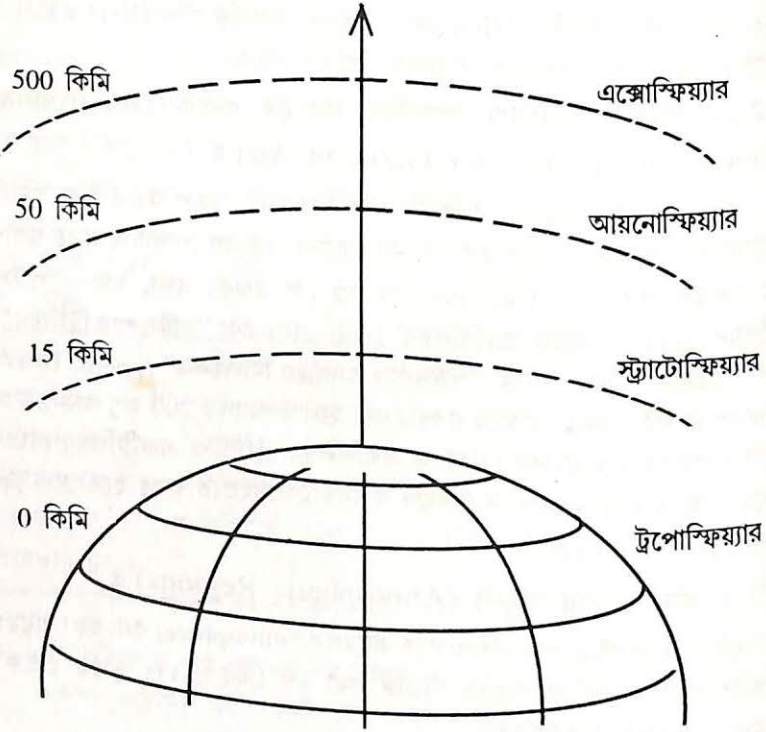
পৃথিবী পরিবেষ্টিত বায়ুরপরিমণ্ডলকে বায়ুমণ্ডল (atmosphere) বলা হয়। বায়ুমণ্ডলকে প্রধানত চারটি স্তরে বা অঞ্চলে বিভক্ত করা হয় (চিত্র 5.1)। ভূপৃষ্ঠ থেকে দূরত্ব অনুসারে স্তরগুলি নিম্নলিখিত ঃ

i) ট্রপোস্ফিয়্যার (Troposphere) ঃ ভূপৃষ্ঠ থেকে 15 কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলের স্তরকে ট্রপোস্ফিয়্যার বলা হয়। এই স্তরে বায়ুর ঘনত্ব সর্বাধিক। ট্রপোস্ফিয়্যার স্তরেই ঝড়, ঝঞ্ঝা প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনা ঘটে।

ii) **স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যার** (Stratosphere) ঃ ট্রপোস্ফিয়্যারের ঠিক উপরের বায়ু স্তরটি স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যার। 15 কিমি থেকে 50 কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলের অঞ্চলকে 'স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যার' বলে। বায়ুমণ্ডলের এই স্তরে **'ওজোন'** (ozone, O_3) গ্যাসের স্তর অবস্থান করে।

iii) **আয়নোস্ফিয়্যার** (Ionosphere) ঃ 50 কিমি থেকে 500 কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুমণ্ডলের স্তরকে 'আয়নোস্ফিয়্যার' বলা হয়। এই স্তরে বায়ুর ঘনত্ব কম থাকে। এছাড়া আয়নোস্ফিয়্যার অংশে পারমাণবিক অক্সিজেনের ঘনত্ব বেশী থাকে এবং আণবিক অক্সিজেনের ঘনত্ব কম থাকে।

iv) এক্সোস্ফিয়ার (Exosphere) ঃ আয়নোস্ফিয়্যারের শেষ উর্ধ্ব সীমানা থেকে বায়ুমণ্ডলের শেষ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত বায়ুর স্তরকে 'এক্সোস্ফিয়্যার' বলা হয় (500 কিমি এর উপরে)। এই স্তরে বায়ুর ঘনত্ব খুবই কম এবং ক্রমশ পাতলা হওয়ার পর একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় আর বায়ু থাকে না।



চিত্র 5.1 : বায়ুমণ্ডলের স্তর দেখানো হয়েছে।

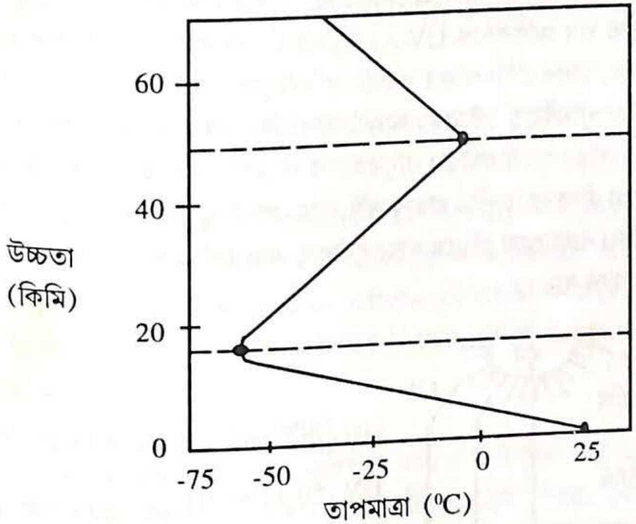
5.2.5 নিম্ন বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে বায়ুর তাপমাত্রা (Air Temperature of Various Region of the Lower Atmosphere) ঃ

a) ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ট্রপোস্ফিয়্যারের উপরের দিকে তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে অর্থাৎ উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকে। ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন ট্রপোস্ফিয়্যারের বায়ুর তাপমাত্রা থাকে 25^0C কিন্তু ট্রপোস্ফিয়্যারের সর্বোচ্চ সীমানায় অর্থাৎ 15 কিমি উচ্চতায় বায়ুর তাপমাত্রা থাকে -40^0C বা তারও কম। এই সীমানায় তাপমাত্রার পুনরায় কোন পরিবর্তন ঘটে না (চিত্র 5.2)।

b) স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যার স্তরে বায়ুর তাপমাত্রার পরিবর্তন আবার ট্রপোস্ফিয়্যার স্তরের

ঠিক বিপরীত। এই স্তরের যতই উপরের দিকে অগ্রসর হওয়া যায় ততই তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং 50 কিমি উচ্চতায় বায়ুর তাপমাত্রা বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। এই উচ্চতায় বায়ুর তাপমাত্রা -10^0C থেকে -20^0C এর মধ্যে থাকে।

c) 50 কিমির উপরে আয়নোস্ফিয়্যার স্তরে বায়ুর তাপমাত্রার পুনরায় বৃদ্ধি ঘটে না কিন্তু উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রার হ্রাস ঘটে।



চিত্র (5.2) : বায়ুমণ্ডলের উচ্চতার সঙ্গে তাপমাত্রার সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

5.2.6. **সৌর বিকিরণ এবং বায়ুমণ্ডল** (Solar-Radiation and Atmosphere) ঃ

(a) সৌর বিকিরণ চার প্রকার তড়িচ্চুম্বকীয় তরঙ্গের সমষ্টি ঃ X-রশ্মি (তরঙ্গ দৈর্ঘ্য <50 nm), অতি-বেগ্নী রশ্মি (Ultra-Violet/UV ; 50-400nm), দৃশ্যমান রশ্মি (visible, 400-750nm) এবং ইনফ্রা-রেড রশ্মি (Infra Red/IR; 750nm-100,000nm)।

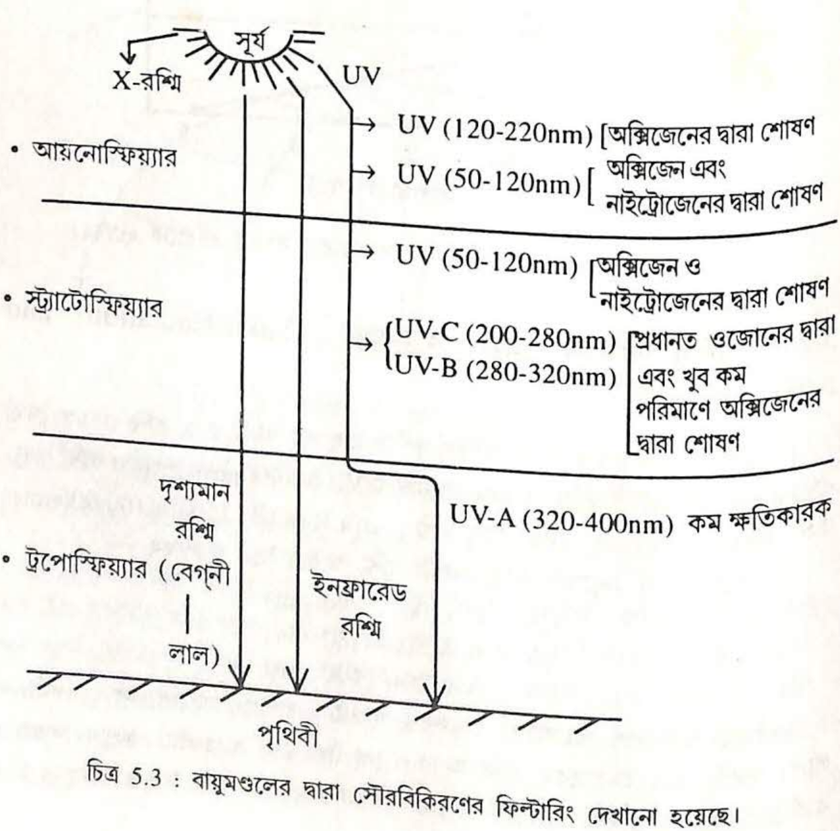
(b) তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনুসারে অতি-বেগ্নী রশ্মি আবার তিন প্রকারের —

UV - C (200 - 280 nm)
UV - B (280 - 320 nm)
UV - A (320 - 400 nm)

দৃশ্যমান আলোকও তরঙ্গদৈর্ঘ্য অনুসারে সাতটি একবর্ণের আলোকের (বেগ্নী—লাল) সমষ্টি এবং ইনফ্রারেড রশ্মি অনুরূপ তাপীয় এবং অতাপীয় অংশে বিভক্ত। তাপীয় ইনফ্রারেড রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য 4 μm থেকে 100μm পর্যন্ত বিস্তৃত (চিত্র 5.3)।

(c) X-রশ্মি এবং UV-রশ্মি (বিশেষ করে UV-C এবং UV-B) জীবজগতের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর (বা প্রাণনাশক)। কিন্তু এই সব ক্ষতিকারক রশ্মি ভূ-পৃষ্ঠে কখনোই পৌঁছাতে পারে না, ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছানোর পূর্বে বায়ুমণ্ডলে প্রাকৃতিক উপায়ে বিভিন্ন গ্যাসের দ্বারা শোষিত হয়। X-রশ্মি আয়নোস্ফিয়্যারে এবং UV-রশ্মি আয়নোস্ফিয়্যারের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস এবং স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যারের অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও ওজোন গ্যাসের দ্বারা শোষিত হয়। কেবল দৃষ্টিতে সাহায্যকারী দৃশ্যমান আলোকরশ্মি, তাপীয় রশ্মি এবং 10% অতি-বেগ্নী রশ্মি (অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকারক UV-A) বায়ুমণ্ডল ভেদ করে ভূ-পৃষ্ঠে আপতিত হয়।

(d) পৃথিবীতে আবদ্ধ সৌরশক্তির সবটাই পৃথিবীপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায় না—কেবল 45 শতাংশ সৌরশক্তি পৃথিবীতে পৌঁছায়। কারণ সৌরবিকিরণের কিছু অংশ অর্থাৎ UV, X-রশ্মি প্রভৃতি (15 শতাংশ সৌরশক্তি) বায়ুমণ্ডলের ওজোন, অক্সিজেন ও জলীয় বাষ্পের দ্বারা শোষিত হয়ে ঐ স্তরে তাপীয় প্রভাব সৃষ্টি করে এবং কিছু পরিমাণ সৌরবিকিরণ (40 শতাংশ সৌরশক্তি) বায়ুমণ্ডলে ছড়িয়ে থাকা ধূলিকণা এবং জলীয় বাষ্পের দ্বারা প্রতিফলিত হয়ে মহাশূন্যে ফিরে যায়।



চিত্র 5.3 : বায়ুমণ্ডলের দ্বারা সৌরবিকিরণের ফিল্টারিং দেখানো হয়েছে।

5.2.7. পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল একটি জারক পরিবেশ (Earth's Atmosphere Is An Oxidizing Environment) :

অক্সিজেন একটি জারণধর্মী গ্যাস। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে দ্বি-পারমাণবিক অক্সিজেন অণুর (O_2) ঘনত্ব বেশি থাকায় বায়ুমণ্ডলে জারক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। প্রাকৃতিক বা অবায়বীয় দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থ বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়। জারণের ফলে উৎপন্ন বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থ ভূ-পৃষ্ঠে অধঃক্ষিপ্ত হয়। এই ধরনের জারণ বিক্রিয়া বায়ুকে দূষণমুক্ত করতে সাহায্য করে।

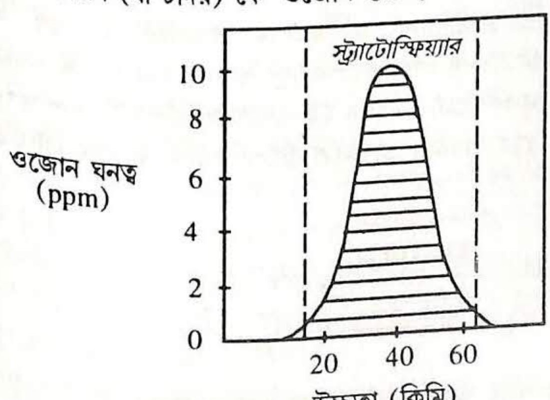
5.2.8. ওজোন স্তর (The Ozone Layer) :

I. ওজোন কি?

নীল রং-এর মৎস গন্ধযুক্ত গ্যাসীয় পদার্থই হল ওজোন। তিনটি অক্সিজেন পরমাণু নিয়ে একটি ওজোন (O_3) অণু গঠিত। তাই ওজোনকে অক্সিজেনের রূপভেদ বলা যেতে পারে। 1840 খ্রীঃ স্কোনবি (Sconbien) সর্বপ্রথম ওজোনের অস্তিত্ব প্রমাণ করেন। গ্যাসটির বিশিষ্ট গন্ধের জন্য নামকরণ করা হয় 'ওজোন' (গ্রীক ভাষায় ওজো (OZO) কথার অর্থ to smell)।

II. ওজোন স্তর বলতে কি বোঝায়?

বায়ুমণ্ডলের 'স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যার স্তরে প্রাকৃতিক কারণে অক্সিজেন অণু এবং অক্সিজেন পরমাণুর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ওজোন গ্যাস উৎপন্ন হয়, কিন্তু ট্রপোস্ফিয়্যার বা আয়নোস্ফিয়্যার স্তরে কখনোই ওজোন উৎপন্ন হয় না। আবার স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যার স্তরের সর্বত্র ওজোনের ঘনত্বও সমান নয়। স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যারের 15—35 কিমি উচ্চতার মধ্যে ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব সর্বাধিক থাকে। বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যার স্তরে সীমাবদ্ধ ওজোন গ্যাসের এই পুরু আবরণ (বা চাদর) কে **'ওজোন স্তর'** (ozone layer) বলা হয় (চিত্র5.4)।



চিত্র 5.4 : স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যার স্তরে ওজোন গ্যাসের ঘনত্বের তারতম্য দেখানো হয়েছে।

III. ওজোন স্তরকে 'প্রাকৃতিক সৌরপর্দা বলা হয় কেন?

বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরকে 'পৃথিবীর প্রাকৃতিক সৌরপর্দা (earth's natural sun-screen) বলা হয়। ছাতা যেমন রৌদ্র থেকে মানুষকে রক্ষা করে ঠিক একইভাবে 'ওজোন পর্দা' সৌরবিকিরণের ক্ষতিকারক উপাদান 'অতি-বেগ্নী' (UV-C এবং UV-B) রশ্মির হাত থেকে মানুষ এবং অন্যান্য জীবজগৎকে রক্ষা করে। অতি-বেগ্নী রশ্মি সমগ্র জীবজগতের পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক বা প্রাণসংহারক। অতি-বেগ্নী রশ্মি সৌরবিকিরণের মাধ্যমে পৃথিবীপৃষ্ঠে পৌঁছানোর পূর্বেই বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তর বা ওজোন পর্দা দ্বারা শোষিত হয়, ফলে জীবজগতের উপর নাশকতা সৃষ্টি করতে পারেনা। এই পরিপ্রেক্ষিতে ওজোন পর্দার গুরুত্ব অপরিসীম। তাই ওজোন পর্দাকে পৃথিবীর প্রাকৃতিক সৌরপর্দা বলা হয়।

IV. বায়ুমণ্ডলে ওজোনের ঘনত্ব ঃ

পৃথিবীর যে কোন স্থানে বায়ুমণ্ডলের ওজোন ঘনত্বকে 'ডবসন একক' (Dobson unit) দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এক ডবসন একক (1DU) কথার অর্থ এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপে 0.001 মিমি পুরু ওজোন ঘনত্বকে বোঝায়। নাতিশীতোষ্ণ অক্ষাংশ অঞ্চলের (temperate latitude) বায়ুমণ্ডলে ওজোনের স্বাভাবিক ঘনত্ব 350 DU। কিন্তু ক্রান্তীয় (tropics) এবং উপমেরু অঞ্চলে ওজোনের ঘনত্ব যথাক্রমে 250 এবং 450 DU। উপমেরু অঞ্চলের ওজোন ঘনত্ব ক্রান্তীয় অঞ্চল অপেক্ষা অধিক হওয়ার মূল কারণ— স্ট্র্যাটোস্ফেরিক বায়ুপ্রবাহের ফলে ক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে উপমেরু অঞ্চলে (subpolar region) ওজোন গ্যাসের পরিবহন স্থানান্তর।

V. ওজোন স্তরের সৃষ্টি ঃ

বায়ুমণ্ডলে ওজোন গ্যাস সৃষ্টি হয় দুটি অনুক্রমিক রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে। প্রথম বিক্রিয়ায় দ্বি-পারমাণবিক অক্সিজেন অণু UV-ফোটন কণার (UV-C & UV-B) দ্বারা দুটি অক্সিজেন পরমাণুতে বিয়োজিত হয়। এই বিক্রিয়াকে **'আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়া'** (Photochemical Reaction) বা **'আলোক বিয়োজন'** বলা হয়। দ্বিতীয় বিক্রিয়ায় আলোক বিয়োজনে উৎপন্ন অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে অবিয়োজিত দ্বি-পারমাণবিক অক্সিজেন অণুর সঙ্ঘর্ষের ফলে ওজোন উৎপন্ন হয়। শেষোক্ত বিক্রিয়াটি 'তাপ উৎপাদক' হওয়ায় স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যার স্তরে বায়বীয় তাপমাত্রা ট্রপোস্ফিয়্যার বা আয়নোস্ফিয়্যারের তুলনায় অনেক বেশি।

$$O_2 \xrightarrow{\text{UV-ফোটন}} 2O$$

$$2O_2 + 2O \longrightarrow 2O_3 + \text{তাপ}$$

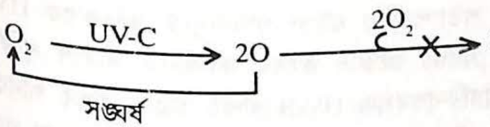
স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যারের নীচে ওজোন স্তর বিস্তৃত হয় না কেন?

বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তরের স্বাভাবিক আবাস হচ্ছে স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যার, যদিও কিছু পরিমাণ

ওজোন গ্যাস নিম্ন আয়নো-স্ফিয়্যারে উৎপন্ন হয়। কিন্তু ট্রপোস্ফিয়্যারে কখনোই ওজোন গ্যাস উৎপন্ন হয় না। এছাড়া স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যারের সর্বত্র ওজোন গ্যাসের ঘনত্ব সমান নয়, নিম্ন এবং মধ্য স্ট্র্যাটোস্ফেরিক স্তরে (15—35 কিমির মধ্যে) ওজোনের ঘনত্ব সর্বাধিক। বায়ুমণ্ডলে ওজোনের এরূপ অসম বিস্তৃতির মূল কারণ ওজোন উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তের তারতম্য।

উৎপাদিত ওজোনের পরিমাণ নির্ভর করে UV-C এবং দ্বি-পারমাণবিক অক্সিজেন অণুর ঘনত্বের উপর। সর্বাধিক ওজোন উৎপন্ন হয়—যখন **UV-C এবং অক্সিজেন অণুর ঘনত্বের গুনফল সর্বাধিক থাকে।**

(a) স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যার স্তরের উপরে অর্থাৎ আয়নোস্ফিয়্যার স্তরে বায়ু পাতলা (thin) হওয়ার কারণে অধিকাংশ বায়বীয় অক্সিজেন পারমাণবিক অবস্থায় থাকে, কারণ আণবিক অক্সিজেন UV-C ফোটন দ্বারা পারমাণবিক অক্সিজেনে বিয়োজিত হয়। অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্ঘর্ষের ফলে পুনরায় অক্সিজেন অণু উৎপন্ন হয় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই অক্সিজেন অণু UV-দ্বারা পুনরায় অক্সিজেন পরমাণুতে বিয়োজিত হয়। আয়নোস্ফিয়্যার স্তরে এরূপে অক্সিজেনের ক্রমান্বয়িক ভাঙ্গা-গড়ার ঘটনা চলতে থাকে।



(b) স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যারের উচ্চ, মধ্য এবং নিম্ন স্তরে উৎপাদিত ওজোনের পরিমাণ ভিন্ন।

● উচ্চস্তরে UV-C এর ঘনত্ব কম থাকে কারণ আয়নোস্ফিয়্যার স্তরে অক্সিজেনের বিয়োজনে বেশিরভাগ UV-C ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া এই স্তরে UV-B এর পরিমাণ বেশি থাকে। UV-C এবং UV-B রশ্মির উপস্থিতির কারণে স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যারের উচ্চস্তরে বায়ুপাতলা থাকে, ফলে অক্সিজেনের বিয়োজনে উৎপন্ন অক্সিজেন পরমাণুর ঘনত্ব বেশি থাকে এবং অবিয়োজিত আণবিক অক্সিজেনের পরিমাণ কম থাকে। আণবিক অক্সিজেনের ঘনত্ব কম হওয়ার কারণে পারমাণবিক এবং আণবিক অক্সিজেনের সঙ্ঘর্ষে উৎপন্ন **ওজোনের পরিমাণ এই স্তরে অপেক্ষাকৃত কম হয়।**

● স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যারের মধ্যস্তরে UV-C প্রায় থাকেই না, কিন্তু UV-B কম পরিমাণে থাকে। তাই এই অংশের বায়ু ঘন এবং অধিকাংশ বায়বীয় অক্সিজেন আণবিক অক্সিজেন রূপে উপস্থিত থাকে। আণবিক অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি এবং পারমাণবিক অক্সিজেনের পরিমাণ কম হওয়ার কারণে পারমাণবিক এবং আণবিক অক্সিজেনের সঙ্ঘর্ষে **উৎপন্ন ওজোনের ঘনত্ব এই স্তরে সর্বাধিক হয়।**

● আবার স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যারের নিম্নস্তরে UV-B এর পরিমাণ খুব কম থাকার ফলে খুব কমসংখ্যক আণবিক অক্সিজেন অণু বিয়োজিত হয়ে অক্সিজেন পরমাণু উৎপন্ন করে।

সর্বাধিক সংখ্যক আণবিক অক্সিজেন এবং খুব কম সংখ্যক পারমাণবিক অক্সিজেনের উপস্থিতিতে এই স্তরে উৎপন্ন **ওজোনের পরিমাণ খুব কম হয়।**

(c) উচ্চশক্তি সম্পন্ন UV-রশ্মির (UV-C এবং UV-B) সবটাই আয়নোস্ফিয়্যারে এবং স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যারে শোষিত হয়, ফলে ট্রপোস্ফিয়্যারে UV-রশ্মি অনুপস্থিত থাকে। অক্সিজেন বিয়োজনকারী উচ্চশক্তির UV-রশ্মির অনুপস্থিতির কারণে এই স্তরে অক্সিজেন পারমাণবিক অবস্থায় থাকে না, বায়বীয় অক্সিজেনের সবটাই আণবিক অবস্থায় থাকে। পারমাণবিক অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে এই স্তরে ওজোন গ্যাস উৎপন্ন হয় না। **ট্রপোস্ফিয়্যার স্তরে উচ্চশক্তি সম্পন্ন UV-রশ্মির অনুপস্থিতিই স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যার থেকে ট্রপোস্ফিয়্যারের দিকে ওজোন স্তরের অবিস্তৃতির প্রধান কারণ।**

VI. **ওজোন স্তরের গুরুত্ব** (Importance of Ozone Layer)

আমরা জানি যে **'স্ট্র্যাটোস্ফেরিক ওজোন স্তর'** পৃথিবীর জীবপরিবেশের **'প্রাকৃতিক সৌরপর্দা'** হিসেবে কাজ করে। কোন কারণে ওজোন স্তর পাতলা হয়ে গেলে বা ওজোন স্তরে ছিদ্র (ozone hole) তৈরি হলে সৌরবিকিরণের মাধ্যমে জীবপরিবেশে ক্ষতিকারক UV-B রশ্মির অনুপ্রবেশ ঘটবে। ফলে সকল জীবরে বিনাশ ঘটবে। এইপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ওজোন স্তরের এক শতাংশ ক্ষয় ঘটলে পৃথিবীপৃষ্ঠে ক্ষতিকারক UV-B রশ্মির তীব্রতা দু-শতাংশ বেড়ে যাবে। **ওজোন স্তরের ক্ষয়জনিত কারণে পৃথিবীর জীবপরিবেশে ক্ষতিকারক বা জীববিনাশমূলক UV-B রশ্মির তীব্রতা বৃদ্ধিই পরিবেশ সম্পর্কীয় উদ্বেগের প্রধান কারণ।** জীবজগতের উপর ওজোনস্তর ক্ষয়ের সম্ভাব্য প্রভাব আলোচনা করা হল ঃ

(a) **মানুষের উপর প্রভাব** (Effects on human) ঃ

মানুষের উপর UV-B রশ্মির বিনাশমূলক ক্রিয়ার মূল কারণ DNAএর দ্বারা UV-B রশ্মির শোষণ এবং সেই কারণে DNAএর অস্বাভাবিক বা ধ্বংসমূলক ক্রিয়া। মানুষের উপর UV-B এর প্রভাবগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল ঃ

(1) মানুষের ত্বক UV-B রশ্মিযুক্ত সূর্যরশ্মির সংস্পর্শে অনাবৃত হলে UV-B রশ্মির প্রভাবে মানুষের **ত্বক পুড়ে যায়** (সৌরদগ্ধ বা sunburn) এবং **ত্বক তামাটে বর্ণ ধারণ করে** (suntan)।

(2) মানুষের ত্বকের উপর UV-B রশ্মি সমন্বিত সূর্যশ্মির প্রকটে **'ত্বকের কর্কট রোগ'** বা ত্বকের ক্যানসার (skin cancer) সৃষ্টি হয়। ত্বক ক্যানসার দু-ধরনের হতে পারে—**চরম ক্ষতিকারক বা ম্যালিগ্‌নেন্ট** (malignant) এবং **অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকারক ও নিরাময়মূলক বা নন-ম্যালিগ্‌নেন্ট** (non-malignant)। যে সকল মানুষের ত্বক এবং চুলের রঙ খুব উজ্জ্বল বা খুব হালকা, এবং ত্বকে ফোঁটা ফোঁটা দাগ থাকে তাদের ত্বক খুব সহজেই UV-B রশ্মির দ্বারা পুড়ে যায়, ফলে কম বয়সে সেইসব মানুষের ম্যালিগনেন্ট ত্বক-ক্যানসারের সৃষ্টি হয়।

দেখা গেছে যে 1979 থেকে 1991 খ্রী. এর মধ্যে 45^0N অক্ষাংশ অঞ্চলে (উত্তর আমেরিকা এবং দক্ষিন কানাডা) স্ট্র্যাটোস্ফেরিক ওজোনের 6.6 শতাংশ হ্রাস ঘটায় ঐ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের 11 শতাংশ নন-ম্যালিগনেন্ট ক্যানসার (বেসাল কোষ কারসিনোমা) এবং 22 শতাংশ অন্যান্য প্রকারের ক্যানসার (স্কোয়ামাস কোষের) বৃদ্ধি পেয়েছে।

(3) পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গেছে যে অপেক্ষাকৃত কমবয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে তীব্র UV-B রশ্মির দ্বারা চোখের ছানি (eye cataracts) পড়ার ঘটনা ঘটে। UV-B রশ্মির তীব্রতা যদি 10 শতাংশ বাড়ে, তাহলে 50 বছর বা তার কাছাকাছি বয়স্ক মানুষের চোখে ছানি পড়ার সম্ভাব্যতা অতিরিক্ত 6 শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

(4) UV-B রশ্মির প্রভাবে মানুষের অনাক্রম্যতা (immunity) কমে যায়, ফলে মানুষ খুব সহজেই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়।

(b) **প্রাণীর উপর প্রভাব** (Effects on Animals) ঃ

(1) UV-B রশ্মির প্রভাবে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর বৃদ্ধি এবং বংশবিস্তার ব্যাহত হয়।

(2) পৃথিবীব্যাপী ব্যাঙ এবং অন্যান্য উভচর প্রাণীর জনসংখ্যা হ্রাসের মূল কারণ জীবপরিবেশে সূর্যরশ্মির মাধ্যমে UV-B রশ্মির অনুপ্রবেশ।

(c) **উদ্ভিদের উপর প্রভাব** (Effects on Plants) ঃ

(1) কয়েকশ্রেণীর উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া UV-B রশ্মির দ্বারা ব্যাহত হয়।

(2) UV-B রশ্মির প্রভাবে উদ্ভিদের পাতা, ফল এবং বীজের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং উৎপাদনশীলতাও কমে যায়।

(3) জলজ বাস্তুতন্ত্রে (সমুদ্র এবং আবদ্ধ জলাশয়ে) খাদ্য শৃঙ্খলের সূচনাকারী 'ফাইটোপ্লাঙ্কটনের' বিনাশ ঘটে UV-B রশ্মির প্রভাবে। ফলে সামুদ্রিক এবং অন্যান্য জলজ বাস্তুতন্ত্রের গতিশীলতা বিঘ্নিত হয়।

5.2.9. বায়ুমণ্ডলের বর্তমান অবস্থা (Present Status of Atmosphere) ঃ কারণ ও প্রভাব (Cause & Effects)

বায়ুমণ্ডলের সার্বিক অবস্থা (বা উৎকর্ষ) ঠিক পূর্বের অবস্থায় নেই। বিশ্বের বর্তমান জনসংখ্যা সঙ্কটজনক সীমায় পৌছেছে। এই বিপুল জনসংখ্যার খাদ্য এবং বাসস্থান সমস্যার সমাধানে—বায়ুমণ্ডল তথা পরিবেশকে উপেক্ষা করে শিল্পের প্রসার ঘটছে, বনজঙ্গল ধ্বংস হচ্ছে এবং কৃষিপদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটছে। তার ফলে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য যে বিশুদ্ধ বায়ুর প্রয়োজন তা ক্রমশ দূষিত হচ্ছে। এই অবস্থায়

বায়ুমণ্ডল সম্পর্কীয় যেসব পরিবেশগত সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে সেগুলির কারণ এবং প্রভাব সম্পর্কীয় সংক্ষিপ্ত খসড়া বর্ণনা করা হল ঃ

(1) **কার্বনডাই-অক্সাইড ঘটিত বায়ু দূষণ ঃ** বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইডের স্বাভাবিক পরিমাণ (0.03%) বজায় রাখা জীবজগতের অস্তিত্বের জন্য খুবই প্রয়োজন এবং এই পরিমাণ বজায় থাকে কার্বনচক্রের স্বাভাবিক আবর্তনের মাধ্যমে। কার্বন জীবদেহের একটি অপরিহার্য সর্বজনীন মৌলিক পদার্থ। বায়ুমণ্ডল থেকে উদ্ভিদ কার্বন আবদ্ধ করে সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে এবং উদ্ভিদ থেকে কার্বন জৈব খাদ্যের মাধ্যমে প্রাণীদেহে সঞ্চারিত হয়। আবার প্রাণীর শ্বসন এবং মৃত কার্বনসমৃদ্ধ জীবভরের (উদ্ভিদ এবং প্রাণীর উভয়ের) মাধ্যমে কার্বন বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায়। বায়ুমণ্ডলে কার্বনের সংযোজন এবং বিয়োজন নির্ভর করে উদ্ভিদ এবং প্রণীর সুষম আন্তঃক্রিয়ার উপর।

কিন্তু মানুষের অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। কারণ একাধারে বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইড বিয়োজনকারী—অরণ্যের বাধাহীন ধ্বংস ঘটছে, অপরদিকে কার্বনডাইঅক্সাইড সংযোজনকারী জীবাশ্ম জ্বালানী—কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতির যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে। দেখা গেছে যে—1874 খ্রীঃ থেকে 1995 খ্রীঃ পর্যন্ত বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ 19% বেড়ে গেছে। তার ফলে শুধু মানুষ নয়, সমগ্র জীব-পরিবেশ এবং অজীব পরিবেশের প্রভূত ক্ষতি হচ্ছে।

(2) **বিশ্বব্যাপী উষ্ণকরণ** (Global Warming) **ঃ**

বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইড (প্রধান গ্রীণহাউস গ্যাস), মিথেন, জলীয়বাষ্প, নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং 'ক্লোরোফ্লুরোকার্বন' (CFC) প্রভৃতি গ্রীণহাউস গ্যাসের পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটায় পৃথিবী ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে। দূষণজনিত কারণে বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বর্তমানের দ্বিগুণ হলে বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বাড়বে 3.6^{0}C। গড় তাপমাত্রা বাড়লে **'হিমবাহ'** (glacier) এবং **'মেরুঅঞ্চলের তুষার আচ্ছাদন'** (polar ice cap) গলতে শুরু করবে। ফলে সমুদ্রপৃষ্ঠ বা সাগরাঙ্ক (sea level) কয়েকমিটার বেড়ে যাবে এবং পৃথিবীর সমুদ্র-উপকূলবর্তী জনবসতি (গ্রাম ও শহর) সমুদ্রে তলিয়ে যাবে।

(3) **অ্যাসিড বৃষ্টি** (Acid Rain) **ঃ**

বৃষ্টি, তুষারপাত এবং শিশির অধঃক্ষেপণে pH এর মাত্রা যদি স্বাভাবিক অম্লমাত্রার তুলনায় কম হয় ((pH 5.6 এর কম), তখন এই অধঃক্ষেপণকে **'অ্যাসিড বৃষ্টি'** বলা হয়। পানীয় জলে অ্যাসিড এর পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে শুধুমাত্র মানুষ এবং প্রাণীর স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয় না, মৃত্তিকার অনুর্বরতায় ফসল উৎপাদন হ্রাস পায়, অজীব সম্পদ যথা—অট্টালিকা, স্মৃতিস্তম্ভ, এবং বিভিন্ন ধাতব গঠন ক্ষয়ে যায়। পরিবেশের এই অম্লকরণের মূল কারণ কিন্তু মানুষ। কলকারখানার চিমনি থেকে প্রতিনিয়ত যে বিপুল পরিমাণ 'সালফার' এবং নাইট্রোজেনের অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে মেশে সেগুলিই বায়ুর আর্দ্রতার সঙ্গে

বিক্রিয়া করে সালফিউরিক এবং নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। উক্ত অ্যাসিডদ্বয় বৃষ্টি বা তুষারপাতের মাধ্যমে স্থলে এবং জলে অধঃক্ষিপ্ত হয়।

(4) **ওজোন স্তরের হ্রাস** (Ozone Layer Depletion) ঃ

বিশ্বব্যাপী ফ্রেয়ন গ্যাসের (CFC) অবাধ ব্যবহারের ফলে বায়ুমণ্ডলে ক্লোরিনের সঞ্চয় বেড়ে গেছে। দেখা গেছে যে স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যার স্তরে ক্লোরিনের ঘনত্ব প্রায় 3.5ppb, যা নিম্নবায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক পরিমাণের (0.6ppb) চেয়ে ছয়গুণ বেশি। যেহেতু ক্লোরিন ওজোন বিয়োজনের একটি ধনাত্মক অনুঘটক, তাই ক্লোরিন অনুঘটন পদ্ধতিতে সমগ্র বিশ্বে স্ট্র্যাটোস্ফেরিক ওজোনস্তর পাতলা হচ্ছে। ওজোন স্তরের হ্রাস বায়ুমণ্ডলীয় অস্থিতিকরণের একটি অন্যতম প্রধান ঘটনা। ওজোন স্তরের হ্রাসে পরিবেশ সঙ্কটের মূলকারণ পৃথিবীপৃষ্ঠে ক্ষতিকারক UV-B রশ্মির আবির্ভাব এবং জীবজগতের উপর UV-রশ্মির মারাত্মক প্রভাব। অধুনা অ্যান্টার্কটিকায় ওজোন স্তরে বৃহৎ ছিদ্রের (ozone hole) উপস্থিতিই ভবিষ্যতে পরিবেশসম্পর্কীয় সঙ্কটের উদ্রেক করেছে।

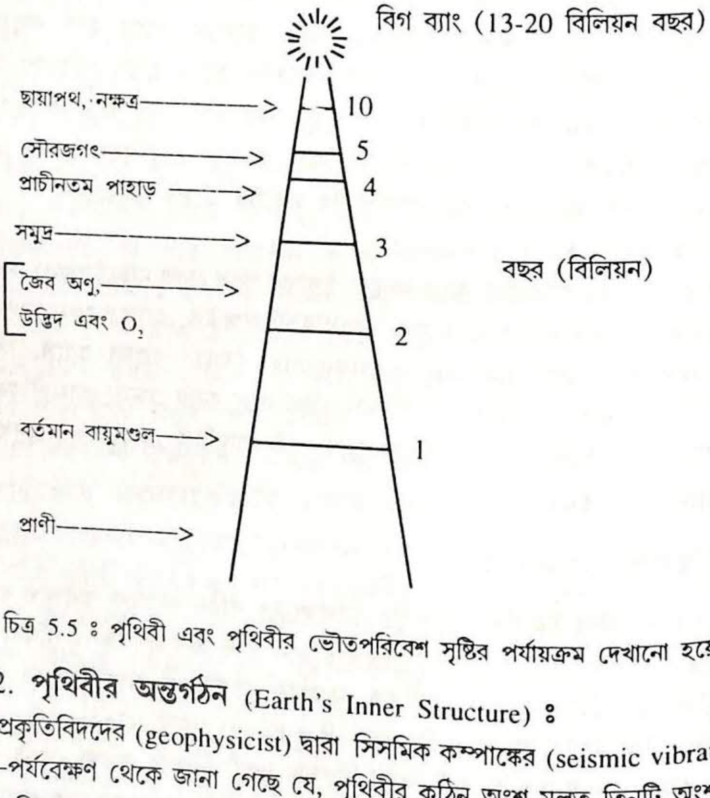
(5) **বায়ুদূষণ** (Air Pollution) ঃ

উপরিউক্ত সঙ্কট ব্যতিরেকে বায়ুর অন্যান্য উপাদান গ্যাস (যথা নাইট্রোজেন), সম্বন্ধহীন গ্যাস (যথা—কার্বনমনোক্সাইড, মিথেন, সালফারডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড) এবং বহিরাগত বস্তুর (foreign constituents) (যথা—কোল অ্যাস, সিলিকা, অ্যাজবেসটস, প্রভৃতি) উপস্থিতি এবং পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে বায়ুর শুদ্ধতা এবং জীবজগতের সঙ্গে বায়ুর আন্তঃক্রিয়া বিপন্ন। বায়ুমণ্ডলের এই সামগ্রিক অবস্থাকে বায়ুদূষণ (air pollution) বলা হয়।

5.3. স্থলভাগ (Land) ঃ

5.3.1. **পৃথিবীর উৎপত্তি** ঃ পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত কঠিন অংশকে স্থলভাগ বা ল্যাণ্ড বলা হয়। পৃথিবীর মোট আয়তনের তিনভাগ জল এবং একভাগ স্থল। পৃথিবীর বয়স আনুমানিক 4-5 বিলিয়ন বছর। সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসারে মহাবিশ্বের অংশ হিসাবে পৃথিবীর উৎপত্তি ঘটেছে মহাবিস্ফোরণ বা বিগ-ব্যাং (Big-Bang) থেকে (George Gammow, 1946; USA)। এই তত্ত্ব-অনুযায়ী সমগ্র বিশ্ববস্তু একটি বিন্দুবৎ অবস্থা থেকে বেরিয়ে এসেছে। বিস্ফোরণের ঠিক পরেই অর্থাৎ জন্ম মুহূর্তের একসেকেণ্ডের এক শতাংশ পর তাপমাত্রা ছিল 10,000 কোটি ডিগ্রী কেলভিন। তারপর থেকে বিশ্ব যতই স্ফীত হতে থাকে ততই তাপমাত্রা কমতে থাকে এবং কম তাপমাত্রায় পর্যায়ক্রমে নক্ষত্র এবং গ্রহের সৃষ্টি হয়। বিশ্বসৃষ্টির আদি অবস্থা থেকে আনুমানিক সাতলক্ষ বছর পর তাপমাত্রা 4000 ডিগ্রীকেলভিন-এ নেমে আসে। সেই সময় থেকেই বস্তুকণাদের মধ্যে অধিকাংশ শক্তি সংগৃহীত হয়। সৃষ্টির ক্রমপর্যায়ে 10 বিলিয়ন বছর পূর্বে প্রথম সৃষ্টি হয় নক্ষত্র এবং ছায়াপথ ; দ্বিতীয় পর্যায়ে 4-5 বিলিয়ন বছর পূর্বে সৃষ্টি হয় সৌরজগৎ (তথা পৃথিবী)।

3-4 বিলিয়ন বছর পূর্বে সৃষ্টি হয় পৃথিবীর প্রাচীনতম পর্বত (oldest rocks), 3 বিলিয়ন বছর পূর্বে সৃষ্টি হয় সমুদ্র (এই সময় পৃথিবীর তাপমাত্রা নেমে আসে 25-40^{0}C), সমুদ্রেই সৃষ্টি হয় জৈব-অণু এবং পর্যায়ক্রমিক বিবর্তনে উদ্ভিদ (আনুমানিক 2 বিলিয়ন বছর পূর্বে)। তারপরেই উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের ফলে সৃষ্টি হয় অক্সিজেন গ্যাস (O_2)। ভৌতপরিবেশ সৃষ্টির শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ 1 বিলিয়ন বছর পূর্বে সৃষ্টি হয় বর্তমান বায়ুমণ্ডল। এরপরেই পৃথিবীতে প্রাণীর আবির্ভাব ঘটে।



চিত্র 5.5 ঃ পৃথিবী এবং পৃথিবীর ভৌতপরিবেশ সৃষ্টির পর্যায়ক্রম দেখানো হয়েছে।

5.3.2. পৃথিবীর অন্তর্গঠন (Earth's Inner Structure) ঃ

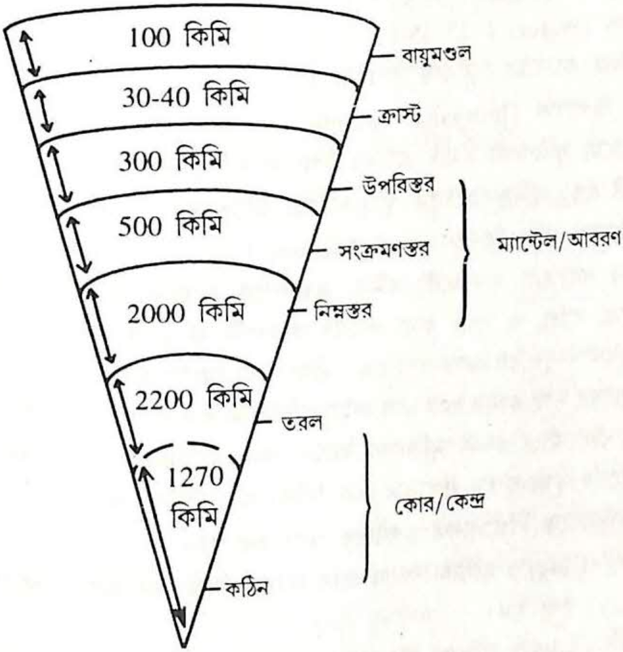
ভূপ্রকৃতিবিদদের (geophysicist) দ্বারা সিসমিক কম্পাঙ্কের (seismic vibrations) বিস্তার-পর্যবেক্ষণ থেকে জানা গেছে যে, পৃথিবীর কঠিন অংশ মূলত তিনটি অংশ দ্বারা গঠিত। ভিতর থেকে বাইরে স্তরগুলি যথাক্রমে—

i) **কেন্দ্র বা কোর (Core) ঃ** পৃথিবীর কেন্দ্র আংশিক গলিত এবং আংশিক কঠিন আয়রন দ্বারা গঠিত। কঠিন এবং তরল কেন্দ্রীয় অংশের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে 1270 এবং 2200 কিমি.

ii) **আবরণ বা ম্যান্টেল (Mantle) ঃ** পৃথিবীর আবরণ অংশ সিলিকেট দ্বারা গঠিত এবং প্রধানত তিনটি স্তর—(উপরিস্তর— 300 কিমি ; সংক্রমণ বা ট্রানজিশান স্তর— 500 কিমি ; এবং নিম্নস্তর—2000 কিমি) দ্বারা গঠিত।

iii) **ভূত্বক বা ক্রাস্ট** (Crust) : পৃথিবীর ভূ-ত্বক বা ক্রাস্ট অঞ্চল (30-40 কিমি) পৃথিবীর মোট ওজনের এক শতাংশ। এই স্তরের ঘনত্ব কম এবং **সংযুতি বিচিত্র** (diverse composition)।

পৃথিবীর ক্রাস্ট অঞ্চলকে ঘিরে থাকে বায়ুমণ্ডলের স্তর (ট্রপোস্ফিয়্যার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যার এবং আয়নোস্ফিয়্যার। এই বায়ুমণ্ডলের ব্যাসার্ধ প্রায় 100 কিমি।



চিত্র 5.6 : পৃথিবীর অন্তর্গঠনের অনুচিত্র দেখানো হয়েছে।

5.3.3. মৃত্তিকা (Soil) :

1. মৃত্তিকা বলতে কি বোঝায়?

মৃত্তিকা হচ্ছে পৃথিবীর প্রস্তরময় কঠিন আবরণের উপর ক্রাস্ট (crust) বা ভূত্বকের প্রান্তস্থ (peripheral) বিশেষ মিশ্রিত উপাদান-পদার্থের আস্তরণ যা স্থলজ বাস্তুতন্ত্রে অজীব এবং সজীব উপাদানের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে। রাশিয়ান বিজ্ঞানী ডকুচেভের (dokuchaev) মতে মৃত্তিকা হচ্ছে একটি গতিশীল মাধ্যম, কারণ মৃত্তিকা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত এবং পদার্থ সহযোগে সুগঠিত হয়। মৃত্তিকার একটি নির্দিষ্ট গতিশীল অঞ্চলেই নানাবিধ ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক ক্রিয়া ঘটে। মৃত্তিকাই সমস্ত উদ্ভিদের পুষ্টি এবং

বৃদ্ধির উৎস। মৃত্তিকার উৎপত্তি, গঠন ও বিন্যাস এবং জীবের সঙ্গে আন্তঃক্রিয়া সম্পর্কীয় বিজ্ঞানকে **'পেডোলজি'** (Pedology) বলা হয়।

2. **মৃত্তিকার গঠনমূলক উপাদান** (Structural Components of Soil) ঃ মূলত চারটি উপাদান দ্বারা মৃত্তিকা গঠিত ঃ

I. খনিজ কাঠামো (Mineral Skeleton) ঃ মোট সংযুতির 50-60%

II. জৈব পদার্থ (Organic matter) ঃ 10% পর্যন্ত

III. বায়ু (air) ঃ 15-25%

IV. জল (Water) ঃ 25-35%

(I) খনিজ কাঠামো (অজৈব উপাদান) ঃ

অজৈব উপাদান (Inorganic components) দ্বারা মৃত্তিকার কাঠামো সৃষ্টি হয়। খনিজ কাঠামো সৃষ্টিকারী সমস্ত অজৈব উপাদান জনিতৃ পর্বত-ভূখণ্ড থেকে জলবায়ুর প্রভাবে সৃষ্টি হয়। খনিজ কাঠামো দুটি পর্যায়ে আলোচনা করা হল ঃ

a) **মৃত্তিকার গঠন বিন্যাস** (Soil Texture) ঃ

মৃত্তিকার কাঠামো গঠনকারী খনিজ ভগ্নাংশকে আয়তন অনুযায়ী (বোল্ডার এবং পাথর থেকে বালি ও সূক্ষ্ম কণা পর্যন্ত) কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। কাঠামো পদার্থকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয়—**সূক্ষ্ম কণা** (কণার ব্যাস < 2 মিমি) এবং **বৃহৎ ভগ্নাংশ**। যে সব সূক্ষ্ম কণার ব্যাস এক মাইক্রোমিটারের কম (< 1µm) তাদের **'কোলয়েড'** (colloid) বলা হয়। কোন মৃত্তিকার যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক ধর্ম মৃত্তিকা গঠনকারী খনিজ পদার্থের সূক্ষ্ম কণার উপাদান দ্বারা নির্ণিত হয়। মৃত্তিকা কণার ব্যাস (diameter) অনুসারে মৃত্তিকাকে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—

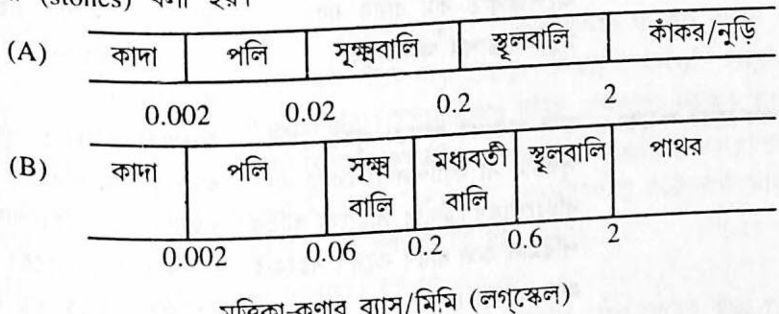
i) **কাদা** (Clay) ঃ মৃত্তিকা কণার ব্যাস 0.002 মিমি. এর মধ্যে থাকলে মৃত্তিকাকে **'কাদা'** (clay) বলা হয়।

ii) **পলি** (Silt) ঃ মৃত্তিকা বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক সমিতি (ISSS) অনুসারে পলি মৃত্তিকা-কণার ব্যাস 0.002 মিমি থেকে 0.02 মিমি এর মধ্যে (কিন্তু ব্রিটিশ স্ট্যাণ্ডার্ড সিসটেম [BSS] অনুযায়ী পলি মৃত্তিকা কণার ব্যাস 0.002 মিমি থেকে 0.06 মিমি.এর মধ্যে)।

iii) **সূক্ষ্মবালি** (Fine Sand) ঃ ISSS অনুযায়ী মৃত্তিকা কণার ব্যাস 0.02 মিমি থেকে 0.2 মিমি এর মধ্যে থাকলে মৃত্তিকাকে সূক্ষ্মবালি বলা হয় (BSS অনুসারে সূক্ষ্মবালিকণার ব্যাস 0.06 মিমি — 0.2 মিমি)।

iv) **স্থূলবালি** (Coarse sand) ঃ ISSS অনুযায়ী বালি-কণার ব্যাস 0.2 মিমি থেকে 2 মিমি এর মধ্যে থাকলে বালিকে 'স্থূল-বালি' বলা হয় (BSS অনুযায়ী সূক্ষ্ম বালিকণার পরবর্তী দশাকে কণার ব্যাস অনুসারে দুভাগে ভাগ করা হয়— মধ্যবর্তী বালি (medium sand) —[0.2—0.6 মিমি ব্যাস] এবং স্থূলবালি [0.6—2 মিমি ব্যাস])।

v) **কাঁকর বা নুড়ি** (Gravel) ঃ মৃত্তিকা কণার ব্যাস 2 মিমি-এর বেশি হলে মৃত্তিকাকে কাঁকর বা নুড়ি বলা হয়। BSS অনুযায়ী কাঁকর (বা নুড়ি) মৃত্তিকাকে পাথর (stones) বলা হয়।



চিত্র 5.7 ঃ মৃত্তিকা কণার বিন্যাস দেখানো হয়েছে। (A) মৃত্তিকা-বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক সমিতি অনুসারে এবং (B) ব্রিটিশ স্ট্যাণ্ডার্ড সিস্টেম অনুসারে।

● মৃত্তিকার গঠনবিন্যাস ও উৎকর্ষতা ঃ

মৃত্তিকার কৃষিজ গুরুত্ব মৃত্তিকার গঠনবিন্যাসের উপর নির্ভরশীল। মধ্যবর্তী এবং সূক্ষ্ম গঠন-বিন্যাস যুক্ত মৃত্তিকা যথা কাদা, কাদা-দো-আঁশ (clay loams) এবং পলি-দো-আঁশ (silt loams) মৃত্তিকার যথাযোগ্য জল-ধারণের ক্ষমতা এবং সন্তোষজনক পুষ্টি-পদার্থের উপস্থিতি উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে খুবই সহায়ক। তুলনামূলকভাবে (তালিকা 5.2) কাদামৃত্তিকার তুলনায় বালি মৃত্তিকার জল-ধারণের ক্ষমতা কম। এছাড়া পুষ্টি-পদার্থের অপসারণ এই মৃত্তিকাতে খুব দ্রুত হয়। যদিও মৃত্তিকার উপরাংশ দ্রুত শুকিয়ে যাওয়ায় প্রারম্ভিক বসন্তে কিছু কিছু ফসল উৎপাদনে বালিমৃত্তিকা খুবই সহায়ক।

মধ্যবর্তী আয়তনের (বা ব্যাসের) সমপরিমাণ কাদা ও বালিকণা মিশ্রিত মৃত্তিকাকে **'আদর্শ মৃত্তিকা'** (ideal soil) বলা হয়। আদর্শ মৃত্তিকাগত অবস্থায় মৃত্তিকায় **'রন্ধ্রবহুল নরম গঠন'** (porous crumb structure) তৈরি হলে মৃত্তিকাকে **দো-আঁশ মৃত্তিকা** (loams) বলা হয়। দো-আঁশ মৃত্তিকার গঠন বিন্যাস কৃষিতে সর্বাধিক উপযোগী।

ধর্ম	কাদামৃত্তিকা	বালিমৃত্তিকা
গঠনবিন্যাস	সূক্ষ্ম ; কণার ব্যাস 0.002 মিমি.এর কম।	স্থূল ; কণার ব্যাস 0.06 মিমি.এর অধিক।
গঠন	ভিজে অবস্থায় বৃহৎ আঠালো পুঞ্জ (ক্লড) তৈরি করে। কিন্তু শুকিয়ে গেলে পুঞ্জ খুব শক্ত হয়ে যায় এবং ফাটল ধরে।	কোন সুনির্দিষ্ট গঠন নেই।

ধর্ম	কাদামৃত্তিকা	বালিমৃত্তিকা
রন্ধ্রতা	রন্ধ্রের পরিসর খুবই ছোট, অপেক্ষাকৃত কম বায়ব এবং মন্থর নিষ্কাশন ক্ষমতাযুক্ত।	রন্ধ্রের পরিসর তুলনামূলক ভাবে বড়, অধিক বায়ব এবং দ্রুত নিষ্কাশন ক্ষমতাসম্পন্ন।
জলধারণের ক্ষমতা	জল ধারণের ক্ষমতা খুবই বেশি। পৃষ্ঠটান বা ক্যাপিলারী ক্রিয়া এবং বহিঃশোষণ ক্রিয়ার সাহায্যে অধিক পরিমাণ জল ধারণ করে ; সহজেই জলমগ্ন হয়।	জলধারণের ক্ষমতা খুবই কম। খুব কম পরিমাণে জল পৃষ্ঠটান এবং বহিঃশোষণ প্রক্রিয়ায় ধারণ করে। সহজেই জলমগ্ন হয় না।
তাপমাত্রা	আর্দ্রতার পরিমাণ বেশি থাকায় তাপমাত্রা কম থাকে (শীতল)।	আর্দ্রতার পরিমাণ কম থাকায় তাপমাত্রা তুলনা-মূলকভাবে বেশি (গরম)।
পুষ্টিপদার্থের ধারণ ক্ষমতা	খুব বেশি। কখনোই চুইয়ে নিষ্কাশিত হয় না। ধনাত্মক আধানযুক্ত আয়ন এবং কিছু ঋণাত্মক আয়ন কাদাকণা দ্বারা আকৃষ্ট হয়।	খুব কম। পুষ্টিপদার্থ খুব সহজেই চুইয়ে নিষ্কাশিত হয় (ক্ষার নিষ্কাশিত হওয়ার ফলে বালি মৃত্তিকা আম্লিক প্রকৃতির হয় এবং মৃত্তিকাতে হিউমিক অ্যাসিড জমা থাকে)।

তালিকা 5.2 ঃ কাদা এবং বালি মৃত্তিকার ধর্মের তুলনা দেখানো হয়েছে।

(b) **খনিজ কাঠামোর রসায়ন** (Chemistry of Mineral Skeleton) **ঃ** মৃত্তিকার রসায়ন আংশিকভাবে খনিজ কাঠামো দ্বারা এবং আংশিকভাবে মৃত্তিকায় উপস্থিত জৈবপদার্থের দ্বারা নির্ধারিত হয়। কিন্তু এই অংশে খনিজ কাঠামো সম্পর্কীয় রসায়ন আলোচনা করা হল ঃ

i) মৃত্তিকায় খনিজ উপাদান কেলাস আকারে উপস্থিত থাকে। বালি এবং পলি মূলত 'SiO_2 **খনিজ স্ফটিক**' দ্বারা গঠিত। নিষ্ক্রিয় অবস্থায় SiO_2কে '**সিলিকা**' (silica) বলা হয়। এই সিলিকাই '**সিলিকেট আয়ন**' (SiO_4^{4-}) এর উৎস। ঋণাত্মক আধানযুক্ত সিলিকেট আয়ন মৃত্তিকা দ্রবণের ধনাত্মক আয়ন যথা '**অ্যালুমিনিয়াম**' (Al^{3+}) এবং **আয়রন** (Fe^{3+}, Fe^{2+}) প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রশমিত হয় এবং '**প্রশমিত**' (neutralized) **সিলিকেট কেলাস** উৎপন্ন করে। এই '**প্রশমিত সিলিকেটই**' হচ্ছে মৃত্তিকার গরিষ্ঠ খনিজ উপাদান।

ii) পুষ্টি এবং জলধারণকারী সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য খনিজ হচ্ছে—'**কাদা-খনিজ**' (clay minerals)। কাদা-খনিজ ষড়ভূজাকৃতির সূক্ষ্মসূক্ষ্ম চ্যাপ্টা কেলাসাকারে বিদ্যমান থাকে।

এই খনিজ কেলাসগুলি মৃত্তিকাস্থ জলে **'কোলয়েড সাসপেনসান'** (colloid suspension) উৎপন্ন করে। প্রত্যেকটি কাদার খনিজ কেলাস অসংখ্য সিলিকেট স্তর এবং সিলিকেট স্তরের অন্তর্বর্তী স্থানে অবস্থিত অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড স্তর দ্বারা গঠিত। কাদা মৃত্তিকার ঋণাত্মক সিলিকেট আয়নের দ্বারা ধনাত্মক আয়নসমূহ দৃঢ়ভাবে আকৃষ্ট থাকায় ধনাত্মক আয়ন খুব সহজেই মৃত্তিকা থেকে নিষ্কাশিত হতে পারে না। তাছাড়া ধনাত্মক আয়নগুলি সহজেই **'বিনিময় যোগ্য'** (freely exchangeable)। কাদামৃত্তিকার খনিজ কেলাসের ধনাত্মক আয়ন বিনিময় করার ক্ষমতাকে **'ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা'** (cation exchange capacity) বলে এবং এই ক্ষমতাই কোন মৃত্তিকার উর্বরতার সূচক। এই কেলাসগুলির রন্ধ্রে জল আকৃষ্ট হওয়ার ফলে কাদামৃত্তিকা জলাসিক্ত হয় এবং স্ফীত হয়ে উঠে।

II) **জৈবপদার্থ** (Organic matter) ঃ

মৃত্তিকার জৈব উপাদান মৃত জীবদেহ, জীবদেহের উপাংশ (যথা গাছের ঝরে পড়া পাতা), রেচনপদার্থ এবং বর্জ্য পদার্থের ক্ষয়জনিত কারণে সৃষ্টি হয়। মৃত জৈবপদার্থ সমূহ **'ডেট্রিভোর'** এবং **'ডিকম্পোজার'** (ছত্রাক এবং ব্যাক্‌টিরিয়া) জীবের দ্বারা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ডিকম্পোজড্ হয়। ননডিকম্পোজড্ পদার্থকে **'লিটার'** (litter) এবং এই প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে উৎপন্ন সম্পূর্ণ ডিকম্পোজড্ অনিয়তাকার জৈবপদার্থকে **'হিউমাস'** (humus) বলা হয়। **হিউমাসই** মৃত্তিকার প্রধান জৈব উপাদান।

হিউমাস গাঢ় বাদামী থেকে কালো রঙ এর হতে পারে। রাসায়নিকভাবে হিউমাসের গঠন সংযুতি খুবই জটিল এবং পরিবর্তনশীল। হিউমাস প্রধানত **ফেনোলিক অ্যাসিড** (phenolic acid), **কার্বক্সিলিক অ্যাসিড** (carboxylic acid) এবং **'ফ্যাটি অ্যাসিডের এস্টার'** দ্বারা গঠিত। হিউমাস সাধারণত কোলয়ডীয় অবস্থায় থাকে এবং কিছু **'কোলয়েড হিউমাস'** কাদা-কেলাসের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত থেকে **'কাদা-হিউমাস জটিল'** (clay-humus complex) উৎপন্ন করে। কার্বক্সিল এবং ফেনোল 'অ্যানায়ন' দ্বারা গঠিত হওয়ায় হিউমাসের ক্যাটায়ন বিনিময় ক্ষমতা খুবই বেশি এবং পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলও সর্বাধিক। বিশেষ ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্মের জন্য হিউমাস মৃত্তিকার জল, বায়ু এবং পুষ্টি পদার্থের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মৃত্তিকার গঠন সংযুতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মৃত জীবভরের হিউমিফিকেশানের সঙ্গে সঙ্গে জৈব-উপাদান (মৌল) যথা ঃ নাইট্রোজেন, সালফার এবং ফসফরাস ইত্যাদি অজৈব যৌগের উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে অর্থাৎ জৈব পদার্থ থেকে অজৈব পদার্থে জৈব উপাদানের প্রবাহ ঘটে। এই ঘটনাকে **'খনিজভবন'** (mineralization) বলে। খনিজভবন প্রক্রিয়ায় নাইট্রোজেন থেকে **অ্যামোনিয়াম আয়ন** (NH_4^+), সালফার থেকে **সালফেট আয়ন** ($SO_4^=$), ফসফরাস থেকে **'অর্থোফসফেট'** আয়ন (H_2PO_4) এবং কার্বন থেকে কার্বনডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস উৎপন্ন হয়। প্রথমোক্ত তিনটি আয়ন মৃত্তিকায় বিদ্যমান থাকে এবং শেষোক্ত যৌগটি বায়ুতে মুক্ত হয় (কার্বনচক্রে বর্ণনা করা হয়েছে)।

• **পিট (Peat) কি?** মৃত্তিকায় অত্যধিক পরিমাণ জল জমে থাকলে হিউমিফিকেশান বাধাপ্রাপ্ত হয়। এক্ষেত্রে অক্সিজেনের অভাবে হিউমিফিকেশানে সাহায্যকারী ডিকম্পোজার জীবের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এই অবস্থায় উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মৃত দেহ বা দেহাবশেষ বহুবছর মৃত্তিকায় সুরক্ষিত থাকে এবং কালক্রমে অধিকচাপের ফলে মৃত জীবদেহ বা দেহাবশেষ থেকে **'পিট'** (Peat) উৎপন্ন হয়। পিট ভূগর্ভে মৃত্তিকাস্তরে সঞ্চিত থাকে।

III) **বায়ু (Air) ঃ** মৃত্তিকাস্থিত কণারন্ধ্র স্থানে (Pore-space) জল এবং বায়ু অবস্থান করে। বায়ুমণ্ডলের এবং মৃত্তিকাস্থিত বায়ুর গ্যাসীয় সংযুতি প্রায় সমান, কারণ বায়ুমণ্ডল এবং মৃত্তিকাস্থ বায়ুর মধ্যে গ্যাসীয় উপাদানের সহজ বিনিময় ঘটে। সাধারণভাবে মৃত্তিকাস্থিত বায়ুতে বায়ুমণ্ডলের বায়ুর তুলনায় কমপরিমাণ অক্সিজেন এবং বেশী পরিমাণ কার্বনডাইঅক্সাইড থাকে। গ্যাসীয় মাত্রার এরূপ তারতম্যের মূল কারণ মৃত্তিকায় বসবাসকারী প্রাণী, ডিকম্পোজার জীব এবং উদ্ভিদ মূলের শ্বসন। এছাড়া মৃত্তিকাস্থিত কিছু পরিমাণ বায়ু মৃত্তিকার দ্রবণে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে।

কোন কারণে মৃত্তিকা জলমগ্ন হলে মৃত্তিকার পরিবেশ অবায়বীয় হয়, কারণ কণারন্ধ্র স্থানের বায়ু জলের দ্বারা অপসারিত হয়। এক্ষেত্রে মৃত্তিকায় বসবাসকারী সমস্ত বায়বীয় জীব ধীরে ধীরে মারা যায় এবং মৃত্তিকাস্থিত খনিজ উপাদান যথা লৌহ (আয়রন), সালফার এবং নাইট্রোজেন ইত্যাদি বিজারিত (Fe^{3+}, সালফাইড, সালফাইট, নাইট্রাইট) হয়। তাছাড়া অবায়বীয় জীব থেকে নিরবচ্ছিন্ন কার্বনডাইঅক্সাইড উৎপাদনের ফলেও মৃত্তিকা আম্লিক-ধর্মী হয়। হিউমাসের উৎপাদন হ্রাসে **'হিউমিক অ্যাসিডের'** উৎপাদন এবং সঞ্চয় মৃত্তিকার অম্লত্বের একটি সহযোগী কারণ।

• **মৃত্তিকার বর্ণ-নির্ধারণে লৌহের ভূমিকা ঃ**

মৃত্তিকাস্থিত লৌহের জারণ বা বিজারণ মৃত্তিকার বর্ণ নির্ধারণ করে। লৌহ জারিত অবস্থায় (ফেরিক আয়রন, Fe^{3+}) মৃত্তিকায় উপস্থিত থাকলে মৃত্তিকার রঙ হলুদ, লাল বা বাদামী বর্ণের হয়, কিন্তু বিজারিত অবস্থায় (Fe^{2+}) থাকলে মৃত্তিকা ধূসর বর্ণের হয়।

IV) **জল (Water) ঃ**

মৃত্তিকার জলকে তিনভাগে ভাগ করা হয়—

a) হাইগ্রোস্কোপিক জল (Hygroscopic Water)

b) ক্যাপিলারী জল (Capillary Water) এবং

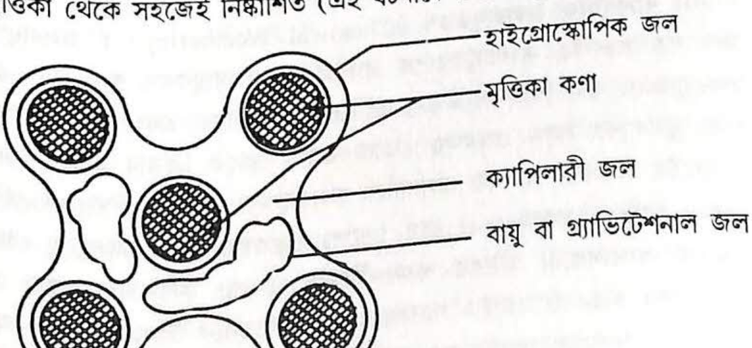
c) গ্র্যাভিটেশনাল জল (Gravitational Water)

(a) **হাইগ্রোস্কোপিক জল** ঃ মৃত্তিকার কাদাখনিজ এবং সিলিকা, বা হিউমাস এবং কাদা খনিজ-সংলগ্ন ধনাত্মক আয়নের উপরিতলে জল যখন হাইড্রোজেন বন্ধনী (hydrogen bond) দ্বারা পাতলা স্তরে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে, তখন ঐ জলকে **'হাইগ্রোস্কোপিক'** জল বলা হয়। কোলয়েড মৃত্তিকা কণার সঙ্গে জলের আসক্তি খুব দৃঢ় হওয়ায় উদ্ভিদ হাইগ্রোস্কোপিক জলকে খুব কম পরিমাণে কাজে লাগাতে পারে। কোন মৃত্তিকায় হাইগ্রোস্কোপিক জলের পরিমাণ নির্ভর করে ঐ মৃত্তিকার কোলয়ডীয় উপাদানের উপর। তাই কাদামৃত্তিকার হাইগ্রোস্কোপিক জলের পরিমাণ সর্বাধিক (ওজনের 15 শতাংশ) এবং বালি মৃত্তিকায় সব থেকে কম (ওজনের 0.5 শতাংশ)।

(b) **ক্যাপিলারী জল** ঃ মৃত্তিকা কণার চতুর্দিকে হাইগ্রোস্কোপিক জলস্তর গঠিত হওয়ার পর — প্রাথমিক পর্যায়ে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রন্ধ্রে এবং পরবর্তী পর্যায়ে বৃহৎ রন্ধ্রে জল বিস্তৃত হয়। কণারন্ধ্রে অবস্থিত জল পৃষ্ঠটানের দ্বারা মৃত্তিকাকণার চারদিকে সংলগ্ন থাকে। কণারন্ধ্রে অবস্থিত এরূপ জলকে **'ক্যাপিলারী জল'** বলা হয়। ক্যাপিলারী ক্রিয়ার ফলে কণারন্ধ্র এবং ক্ষুদ্র কৈশিক নালীর মাধ্যমে ক্যাপিলারী জল মৃত্তিকাস্তরের উপরের দিকে অগ্রসর হতে পারে। ক্যাপিলারী জলের এরূপ ক্রিয়ার ফলে উদ্ভিদ ক্যাপিলারী জলকে মূলের মাধ্যমে সহজেই শোষণ করতে পারে। মৃত্তিকার উপরিভাগে বাষ্পীভবনের দ্বারা ক্যাপিলারী জল খুব সহজেই বিনষ্ট হয়। সূক্ষ্ম গঠন বিন্যাসযুক্ত মৃত্তিকায় (যথা কাদা) এই জলের পরিমাণ স্থূল গঠনবিন্যাস যুক্ত মৃত্তিকার (যথা বালি) তুলনায় অনেক বেশি থাকে।

(c) **গ্র্যাভিটেশনাল জল** ঃ

ক্যাপিলারী এবং হাইগ্রোস্কোপিক জল ব্যতিরেকে মৃত্তিকাস্থিত কিছু পরিমাণ জল মৃত্তিকা কণার সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন না থেকে অভিকর্ষের টানে মৃত্তিকার মধ্য দিয়ে ভূ-গর্ভে প্রবাহিত হয়। অভিকর্ষজ টানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মৃত্তিকাস্থিত এই জলকে **'গ্র্যাভিটেশনাল জল'** বলা হয়। গ্র্যাভিটেশনাল জলের নিম্নাভিমুখী প্রবাহের ফলে মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদান এবং বিভিন্ন খনিজ মৃত্তিকা থেকে সহজেই নিষ্কাশিত (এই ঘটনাকে leaching বলা হয়) হয়।



চিত্র 5.8 ঃ মৃত্তিকায় তিন ধরণের জলের অবস্থান দেখানো হয়েছে।

3. **মৃত্তিকার উৎপত্তি** (Formation of Soil) ঃ

হঠাৎ কোন একটি কারণে মৃত্তিকার উৎপত্তি হয়নি। সময়ের সাপেক্ষে বিভিন্ন শর্তের মিথস্ক্রিয়ার ফলে মৃত্তিকা সৃষ্টি হয়েছে। মৃত্তিকার উৎপত্তিতে সহায়ক পাঁচটি সর্বাধিক উপযোগী শর্ত হচ্ছে—**জলবায়ু, জনিতৃ উপাদান, ভূ-সংস্থান, জীব** এবং **সময়**। মৃত্তিকার উৎপাদন পদ্ধতি একটি মন্থর প্রক্রিয়া। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে 1 সেমি টপসয়েল (topsoil) তৈরি হতে 100-400 বছর সময় লাগে কিন্তু ক্রান্তীয় জলবায়ুতে 10 সেমি. টপসয়েল সৃষ্টির জন্য 10-150 বছর সময়ের প্রয়োজন।

I. **জলবায়ু বা স্থানীয় আবহাওয়া** (Climate)

যেসব ভৌত এবং রাসায়নিক জলবায়ুকরণ পদ্ধতি শিলা থেকে মৃত্তিকা উৎপন্ন করতে সাহায্য করে সেগুলি আলোচনা করা হল ঃ

(a) **ভৌত জলবায়ুকরণ** (Physical Weathering) ঃ মৃত্তিকার উৎপত্তি সম্পর্কীয় জলবায়ুর ভৌত শর্তগুলি হচ্ছে তাপমাত্রার পরিবর্তন, জলের আয়তন প্রসারণ ও সংকোচন এবং বায়ু ও জলের প্রবাহ। প্রাত্যহিক তাপমাত্রার পরিবর্তনের ফলে (diurnal changes in temperature) প্রস্তরখণ্ড (শিলাখণ্ড) প্রসারিত এবং সংকুচিত হয়। প্রসারণ এবং সংকোচন কিছুদিন চলার পর প্রস্তরখণ্ড একসময় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে বালি, নুড়ি এবং অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র শিলাখণ্ড উৎপন্ন করে। তাপমাত্রা ছাড়া জলের প্রভাবেও প্রস্তরখণ্ডের আকারের পরিবর্তন ঘটে। তাপমাত্রার পরিবর্তনে প্রস্তরখণ্ডের সূক্ষ্ম ফাটলে উপস্থিত জল বরফে পরিণত হয় এবং বরফের গলনে পুনরায় জল উৎপন্ন হয়। বরফের আয়তন জলের চেয়ে বেশি হওয়ায় প্রস্তরখণ্ডের ফাটলের অভ্যন্তরে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হয়। উদ্ভূত এই চাপের ফলে প্রস্তরখণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। এছাড়া জলের স্রোত, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতির কারণেও কোন একস্থানের মৃত্তিকা কণা (যথা—বালি) পরিবাহিত হয়ে দূরবর্তী স্থানের অনাবৃত প্রস্তরখণ্ডের উপর মৃত্তিকার স্তর সৃষ্টি করতে সাহায্য করে।

(b) **রাসায়নিক জলবায়ুকরণ** (Chemical Weathering) ঃ জলবায়ুগত এবং জৈব শর্ত প্রভাবিত জলবায়ুকরণকে রাসায়নিক জলবায়ুকরণ বলা হয়। রাসায়নিক জলবায়ুকরণে জল শিলাখনিজের আর্দ্রবিশ্লেষণে বিকারক এবং দ্রাবক হিসেবে কাজ করে। চুনাপাথর সমৃদ্ধ প্রস্তরখণ্ড থেকে জলের দ্রাবক ক্রিয়ার মাধ্যমে ক্যালসিয়াম কার্বনেটের অপসারণ বা ক্ষয় রাসায়নিক জলবায়ুকরণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য আম্লিক মাধ্যমে (pH হ্রাস পেলে) প্রস্তরক্ষয় ক্রিয়া বহুলাংশে বেড়ে যায়। মৃত্তিকায় বসবাসকারী জীবের শ্বসন ক্রিয়ায় উৎপন্ন কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস বা বায়ুমণ্ডলের কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাসের জলীয় দ্রবীভবনে উৎপন্ন কার্বনিক অ্যাসিডের লঘুদ্রবণের সাহায্যে প্রস্তরখণ্ডের আদ্রবিশ্লেষণ ত্বরান্বিত হয়। অনাবৃত শিলাখণ্ডে বসবাসকারী 'লাইকেনও উপরিউক্ত প্রক্রিয়ায় শিলাখণ্ডকে আর্দ্র বিশ্লেষিত করতে

সাহায্য করে। লাইকেন থেকে নিঃসৃত কার্বনিক অ্যাসিডের প্রভাবে প্রস্তরখণ্ড সহজেই আর্দ্রবিশ্লেষিত হয় এবং দ্রবীভূত শিলাখনিজ থেকে পুস্টি পদার্থ সংগ্রহ করে লাইকেন সহজেই বেঁচে থাকে।

প্রস্তরখণ্ডের উদ্ভিদ আচ্ছাদন (যথা লাইকেন্ ও অন্যান্য উদ্ভিদ) মৃত্তিকার হিউমাস উৎপাদনে সাহায্য করে। কারণ মৃত উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ উপাংশ ও মৃত প্রাণীদেহ থেকে ডিকম্পোজিশান প্রক্রিয়ায় হিউমাস উৎপন্ন হয় কিন্তু বৃষ্টিপাত বা তুষারপাত হ্রাস পেলে পরোক্ষভাবে মৃত্তিকার হিউমাস উৎপাদন কমে যায়।

II. **জনিতৃ উপাদান (Parent Material) ঃ** মৃত্তিকার সংযুতি-উপাদান সৃষ্টিকারী মূল শিলা বা প্রস্তরখণ্ডকে জনিতৃ উপাদান (parent material) বলা হয়। আগ্নেয়গিরির মাধ্যমে পৃথিবীর ভূ-ত্বকের নিম্নাংশ থেকে উদগত উত্তপ্ত গলিত 'ম্যাগ্‌মা' (magma) শীতল হয়ে যে কঠিন শিলা বা প্রস্তরখণ্ড সৃষ্টি করে তা মৃত্তিকার জনিতৃ উপাদান হিসেবে কাজ করে। উৎপত্তির তারতম্য অনুসারে জনিতৃ শিলা তিনপ্রকার—

a) **আগ্নেয়গিরিসৃষ্ট শিলা বা ইগ্‌নিয়াস রক (Igneous Rocks) ঃ** ম্যাগ্‌মা'র (magma) শীতলিকরণের (cooling) ফলে সৃষ্ট শিলাকে 'ইগ্‌নিয়াস রক' বা **'আগ্নেয়গিরি সৃষ্ট শিলা'** বলা হয়। এই শিলা অ্যাসিডিক বা আম্লিক (যথা গ্রানাইট) এবং বেসিক বা ক্ষারীয় (যথা—ব্যাসল্ট, Basault) প্রকৃতির হতে পারে। আম্লিক ইগ্‌নিয়াস শিলার জলবায়ুকরণের (weathering) ফলে যে মৃত্তিকা কণা (যথা বালি কণা) উৎপন্ন হয় তাতে SiO_2 বা স্ফটিক রূপে সিলিকণ অত্যধিক মাত্রায় উপস্থিত থাকে। কিন্তু ক্ষারীয় ইগ্‌নিয়াস শিলার জলবায়ুকরণের ফলে সৃষ্ট মৃত্তিকা কণায় সিলিকণ 'সিলিকেট' (silicate) হিসেবে উপস্থিত থাকে। এই সিলিকেট থেকে জলবায়ুকরণের বিভিন্ন অনুক্রমিক পর্যায়ের মাধ্যমে পলি (silt) এবং কাদার (clay) বিভিন্ন খনিজ উৎপন্ন হয়।

b) **পাললিক শিলা বা সেডিমেন্টারী রক (Sedimentary Rocks) ঃ** অন্যান্য শিলার জলবায়ুকরণের ফলে উদ্ভূত পদার্থ সঞ্চিত এবং ঘন বিন্যস্ত হয়ে পাললিক শিলার সৃষ্টি করে। বিশেষ উল্লেখযোগ্য পাললিক শিলার উদাহরণ হচ্ছে **বালিপাথর** (sandstones) এবং **চুনাপাথর** (lime stones)। এই বালিপাথর এবং চুনাপাথর আবার জলবায়ুকরণের মাধ্যমে মৃত্তিকা সৃষ্টি করে।

c) **রূপান্তরিত শিলা বা মেটামরফিক রক্ (Metamorphic Rocks) ঃ** পূর্বে সৃষ্ট কোন শিলা যখন তাপ এবং পুনঃকেলাসিভবন প্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে নতুন কোন শিলা উৎপন্ন করে তখন তাকে 'রূপান্তরিত শিলা' বলা হয়। এই ধরণের শিলা জলবায়ুর দ্বারা খুব সহজেই প্রভাবিত হয় না। উদাহরণ ঃ সেলেট্ পাথর (slate) এবং মার্বেল (marble)।

III. ভূ-সংস্থান (Topography) ঃ

পাহাড় বা বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের ভূ-সংস্থান যথা উচ্চতা (altitude), ঢালের নতি এবং আকার মৃত্তিকার উৎপাদনকে প্রভাবিত করে। এই সব ভূ-সংস্থানজনিত শর্ত আবার স্থানীয় জলবায়ু এবং জল নিষ্কাশন (drainage) কে প্রভাবিত করে। যেমন ঢাল অংশে জলের নিষ্কাশন অত্যন্ত বেশি এবং পাহাড়ের মাঝে উপত্যকা অঞ্চলে নিষ্কাশন সবথেকে কম। উপত্যকা অঞ্চলে জলের নিষ্কাশন অনেক কম হওয়ায় ঐ অঞ্চলের মৃত্তিকা যদি দীর্ঘস্থায়ীভাবে জলে ডুবে থাকে তাহলে মৃত্তিকায় পিট সৃষ্টি হয়। পাহাড়ের ঢাল বরাবর জলের নিম্নাভিমুখী স্রোতের ফলে খাড়া ঢাল অঞ্চলের জলবায়ুকৃত শিলা এবং মৃত্তিকা অপেক্ষাকৃত কম ঢাল অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। এছাড়া অভিকর্ষের টানেও মৃত্তিকা খাড়া ঢাল অঞ্চল থেকে ধীরে ধীরে নিম্নঢাল অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। ফলে খাড়া ঢাল অঞ্চলের মৃত্তিকার স্তর খুবই পাতলা এবং নিম্নঢাল অঞ্চলের মৃত্তিকাস্তর খুবই পুরু হয়। কিন্তু পাহাড়ের ঢালে উদ্ভিদ আচ্ছাদনের উপস্থিতিতে উপত্যকা অঞ্চলে মৃত্তিকার উৎপাদন পদ্ধতি সীমায়িত হয়।

তাপমাত্রা এবং অধঃক্ষেপণ (বৃষ্টি) ভূসংস্থান দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং মৃত্তিকার উৎপত্তি আবার তাপমাত্রা ও অধঃক্ষেপণ দ্বারা ত্বরান্বিত হয়। আকার এবং উচ্চতা ভূ-সংস্থানও জলবায়ুকে প্রভাবিত করে। যেমন রৌদ্রকরোজ্জ্বল পার্শ্বে মৃত্তিকার সৃষ্টি খুব দ্রুত হয় এবং ঐ অংশে উদ্ভিদ আচ্ছাদনের বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। আবার বায়ুপ্রবাহের তারতম্যও ভূ-সংস্থান দ্বারা পরিবর্তিত হয়। যেহেতু বায়ু প্রবাহ এবং আর্দ্রতা সম্পর্কযুক্ত, তাই **অনুবাত ঢাল** (leeward slopes) **প্রতিবাত ঢালের** (windward slopes) তুলনায় অধিক সিক্ত। এইভাবে ভূ-সংস্থানগত শর্ত প্রত্যক্ষভাবে এবং ভূ-সংস্থান প্রভাবিত জলবায়ুগত শর্ত পরোক্ষভাবে মৃত্তিকার উৎপাদন পদ্ধতিতে সাহায্য করে।

IV. জীব (Organisms) ঃ

a) জলবায়ু এবং জনিতৃ উপাদানের মত জীবজগৎও মৃত্তিকার উৎপত্তি, গঠন এবং বিন্যাসে সাহায্য করে। মৃত্তিকার জৈব উপাদান (লিটার এবং হিউমাস) জীব থেকেই উদ্ভূত হয়। মৃত উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ উপাংশ, মৃত প্রাণীদেহ এবং প্রাণীর বর্জ্য পদার্থের আংশিক বা অসম্পূর্ণ পাচনে **'লিটার'** (litter) এবং সম্পূর্ণ পাচনে **হিউমাস** উৎপন্ন হয়। মৃত্তিকায় বসবাসকারী আণুবীক্ষণিক জীব (ডেট্রিভোর এবং ডিকম্পোজার) মৃত জীব-উপাদান থেকে **লিটার** এবং **হিউমাস** উৎপন্ন করে। কোন মৃত্তিকার জৈব উপাদানের প্রকৃতি আবার জৈবপদার্থের দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন **কনিফেরাস অরণ্যের 'লিটার' সমৃদ্ধ মৃত্তিকা 'পোডজল'** (podzols) সৃষ্টির মূল কারণ লিটার নিঃসৃত একপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ। এই রাসায়নিক পদার্থ মৃত্তিকায় বসবাসকারী আণুবীক্ষণিক জীবের দ্বারা লিটারের পাচন ক্রিয়াকে বাধা দেয়, ফলে লিটার থেকে হিউমাস উৎপন্ন হতে পারে না।

b) মৃত্তিকায় বসবাসকারী বিভিন্ন ডেট্রিভোর জীব (detrivores), বিশেষ করে নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে প্রাপ্ত 'কেঁচো' মৃত্তিকার গঠনবিন্যাসে প্রভূত সাহায্য করে। সাধারণত, ডেট্রিভোর জীব লিটারের খণ্ডন এবং ক্ষেত্রফলবৃদ্ধির মাধ্যমে পাচন ক্রিয়া (decomposition) ত্বরান্বিত করে। এছাড়া ডেট্রিভোর জীবের মল এবং অন্যান্য বর্জ্য পদার্থের মিশ্রণে মৃত্তিকায় প্রক্রিয়াকৃত জৈব এবং অজৈব উপাদানের আয়তনের বৃদ্ধি ঘটে। আবার মৃত্তিকা যখন কেঁচোর পৌষ্টিকনালীর মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয় তখন মৃত্তিকার গঠন বিন্যাসের সূক্ষ্মতা বাড়ে এবং খনিজ ও জৈব উপাদানের যথোপযুক্ত মিশ্রণে মৃত্তিকার গঠন উৎকর্ষতা বৃদ্ধি ঘটে। এছাড়া কেঁচোকৃত গর্তের মাধ্যমে মৃত্তিকার সংমিশ্রণ এবং বাতান্বয়ন (aeration) বাড়ে এবং গর্তের ফলে উদ্ভিদ-মূলের বৃদ্ধি সহজ হয়।

c) ইঁদুর এবং শশকজাতীয় প্রাণী কেঁচোর অনুরূপ মৃত্তিকার সংমিশ্রণ এবং বাতান্বয়নে সাহায্য করে।

• মানুষের হস্তক্ষেপে মৃত্তিকা সম্পদ বর্তমানে বিপন্ন কেন?

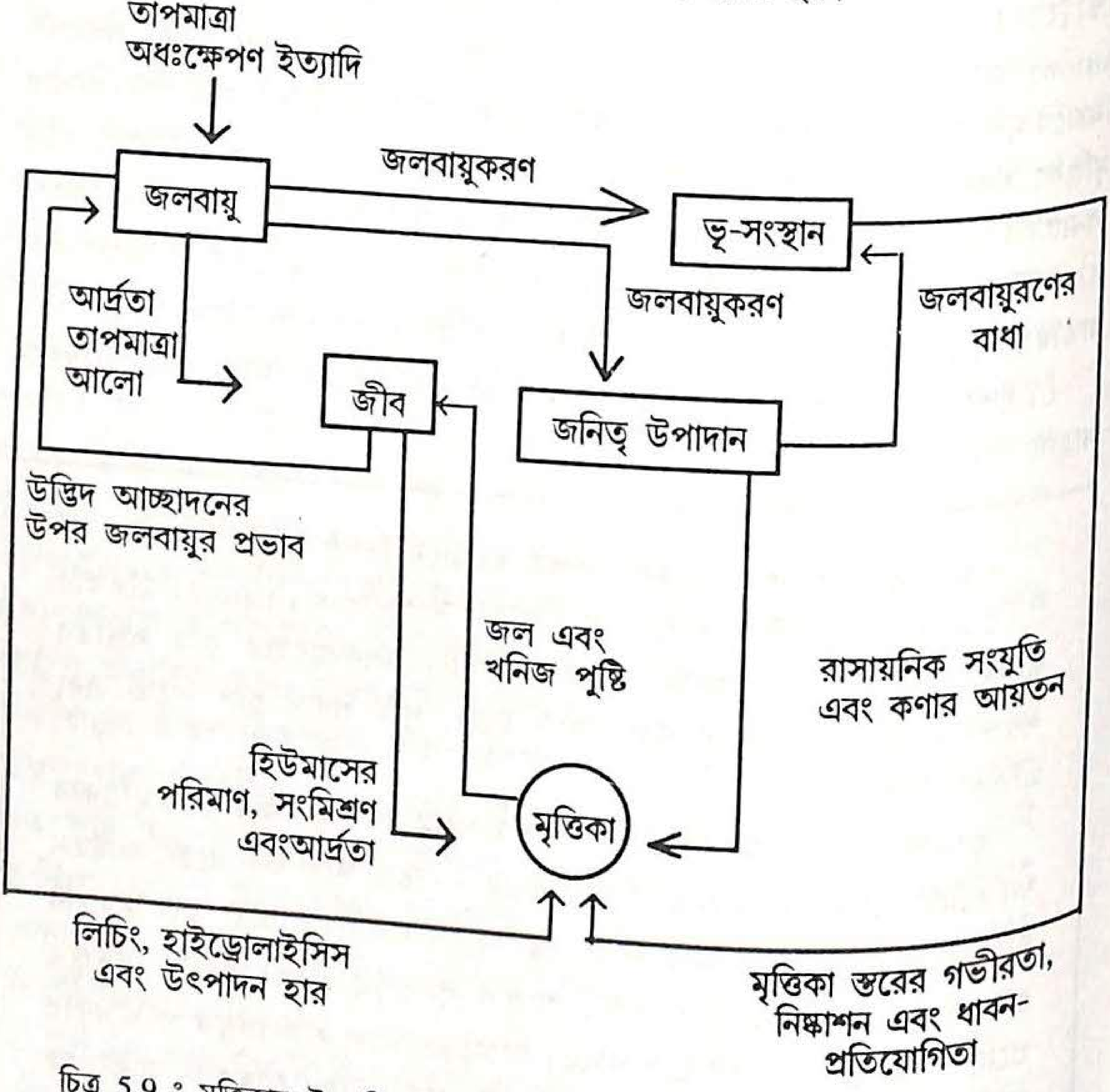
মানুষের অদূরদর্শী কৃষি পদ্ধতির প্রয়োগে সম্পূর্ণীকৃত (mature) মৃত্তিকার গতিশীল এবং সূক্ষ্ম ভারসাম্য বর্তমানে বিপন্ন। অধুনাব্যবহৃত কৃষি পদ্ধতির পরম্পরা হিসেবে মৃত্তিকার গঠন ধ্বংস হচ্ছে, পুষ্টি পদার্থ হ্রাস পাচ্ছে এবং মৃত্তিকার ক্ষয় ঘটছে।

কৃষিজমির উপর অত্যধিক ভারী কৃষি সরঞ্জাম ব্যবহার করার ফলে মৃত্তিকার ঘন সন্নিবিষ্টতা (compaction) বিঘ্নিত হচ্ছে — তার ফলে কণা-রন্ধ্রের আয়তন হ্রাস পাচ্ছে। কণারন্ধ্রের আয়তন হ্রাসের কারণে বায়বীয়তা এবং জল নিষ্কাশন হ্রাস পাচ্ছে। মৃত্তিকায় কোন একটি শস্যের পুনরাবৃত্ত চাষের কারণে মৃত্তিকার প্রয়োজনীয় পুষ্টি পদার্থের হ্রাস ঘটছে। পাহাড়ের ঢালে লাঙ্গলপ্রযুক্ত কৃষিক্রিয়ার ফলে বায়ু প্রবাহ এবং বৃষ্টির জলে মৃত্তিকার ক্ষয় ঘটছে। কৃষিকাজ ব্যতিরেকে মানুষের দ্বারা মৃত্তিকাসংরক্ষণকারী উদ্ভিদ আচ্ছাদন এবং অরণ্য ধ্বংসের কারণেও ভূমিক্ষয় ত্বরান্বিত হচ্ছে। মৃত্তিকার গঠন ধ্বংস এবং ক্ষয়ের কারণে উর্বর জমি অনুর্বর জমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে এবং সামগ্রিকভাবে বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে।

V. **সময় (Time) ঃ**

'সময়' মৃত্তিকার সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার না করলেও মৃত্তিকার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। দেখা গেছে যে, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে অনাবৃত শিলা থেকে মৃত্তিকার উৎপত্তিতে কয়েক দশক থেকে কয়েকহাজার বছর সময় লাগে।

তাছাড়া দীর্ঘ-সময়ের সাপেক্ষে জলবায়ু ও ভূ-সংস্থানের যে পরিবর্তন ঘটে, তার ফলে মৃত্তিকার উৎপত্তি এবং বিকাশপদ্ধতি পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়।



চিত্র 5.9 ঃ মৃত্তিকার উৎপত্তিতে চারটি প্রত্যক্ষ শর্তের আন্তঃক্রিয়া দেখানো হয়েছে (সময়ের প্রভাব দেখানো হয়নি)।

4. মৃত্তিকার পার্শ্বচিত্র (Soil Profile) ঃ

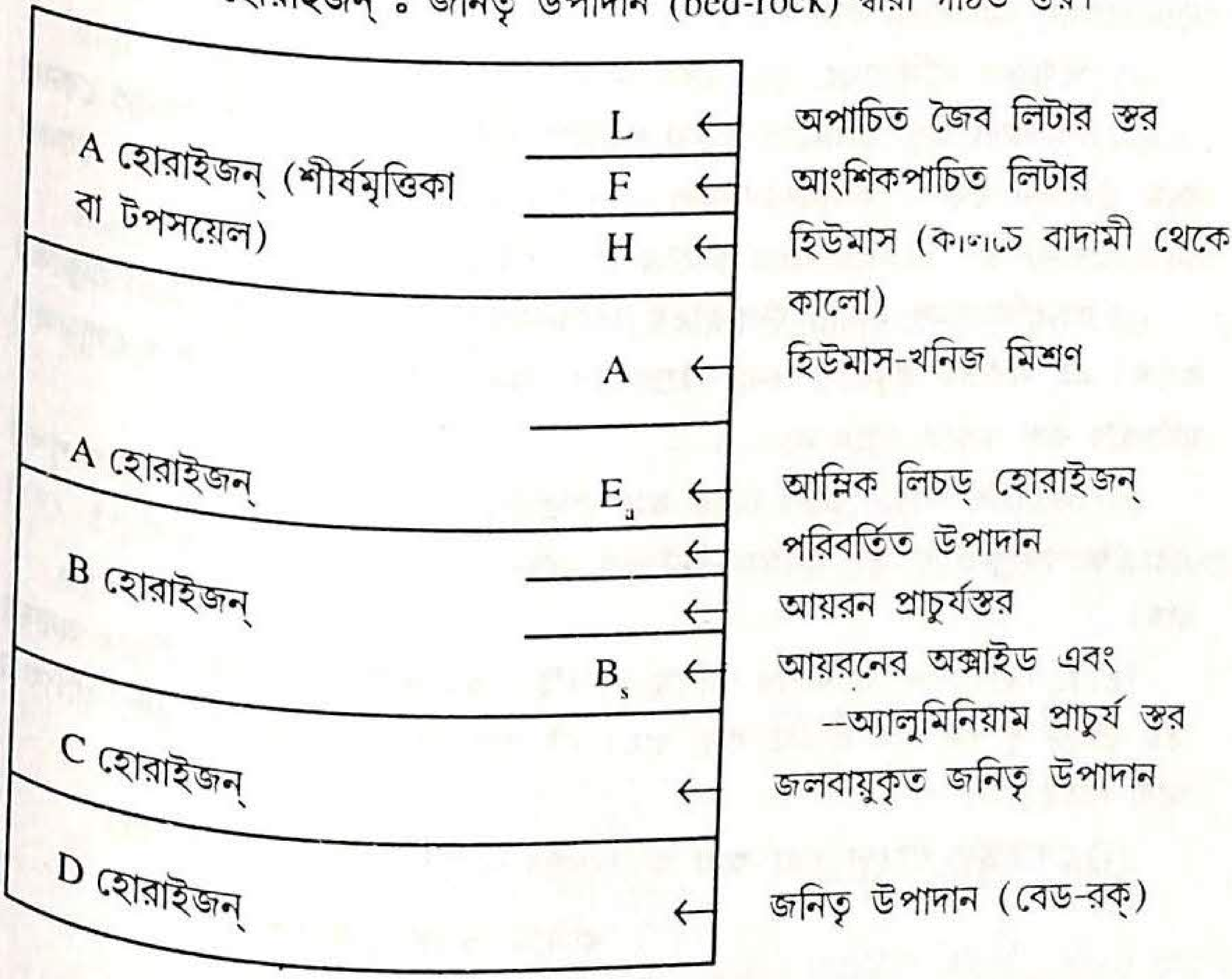
কতকগুলি আনুভূমিক স্তর পর্যায়ক্রমে সজ্জিত হয়ে মৃত্তিকা গঠন করে। মৃত্তিকাকে প্রস্থচ্ছেদ করলে যে পার্শ্বচিত্র (profile) পাওয়া যায় সেই চিত্র অনুসারে মৃত্তিকা প্রধানত কয়েকটি **আনুভূমিক স্তর বা হোরাইজন্** (horizon) দ্বারা গঠিত। একটি আদর্শ অবাধ নিষ্কাশনযুক্ত মৃত্তিকা সাধারণত চারটি হোরাইজন্ (-'A', 'B', 'C' এবং 'D') দ্বারা গঠিত (চিত্র 5.10)।

i) 'A' হোরাইজন্ ঃ খনিজ পদার্থের সঞ্চয়ের ফলে সৃষ্ট স্তর। এই স্তরকে **টপসয়েল** বলা হয় (0.3–0.5 মিটার পুরু)। এই স্তর নরম, রন্ধ্রবহুল এবং ভঙ্গুর।

ii) 'B' হোরাইজন্ ঃ পুষ্টি পদার্থ সঞ্চিত স্তর। 'B' স্তর খুবই ঘন, শক্ত এবং অপেক্ষাকৃত অভেদ্য।

iii) 'C' হোরাইজন্ ঃ জলবায়ুকৃত জনিতৃ উপাদান দ্বারা সৃষ্ট স্তর। এবং

iv) 'D' হোরাইজন্ ঃ জনিতৃ উপাদান (bed-rock) দ্বারা গঠিত স্তর।



চিত্র 5.10 ঃ একটি আদর্শ, অবাধ জলনিষ্কাশনযুক্ত মৃত্তিকার পার্শ্বচিত্রে সংগঠক হোরাইজন্ দেখানো হয়েছে।

5. মৃত্তিকার প্রকারভেদ (Types of Soil) :

যেহেতু মৃত্তিকা বাস্তুতন্ত্রের সজীব এবং অজীব উপাদানের আন্তঃক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয়, তাই মৃত্তিকার গঠনে জটিলতা এবং প্রকারভেদ লক্ষ করা যায়। এরূপ ক্ষেত্রে মৃত্তিকার শ্রেণীবিভাগ অত্যন্ত দুরূহ। আলোচনার সুবিধার্থে আর্দ্র-নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে প্রাপ্ত তিন ধরনের মৃত্তিকার পরিচিতি উল্লেখ করা হল।

I. পোডজল (Podzols) ঃ

'Podzol' নামটি রাশিয়ান শব্দ 'Pod' (কথার অর্থ Under, নীচে) এবং 'Zola' (অর্থ ash, ছাই) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 'পোডজল' একপ্রকার অনুর্বর মৃত্তিকা। কারণ এই মৃত্তিকার যাবতীয় পুষ্টি পদার্থ লিটার এবং উদ্ভিদ জীবভরে সীমাবদ্ধ থাকে। তাছাড়া লিটারের পাচন অত্যন্ত ধীরগতিতে সম্পন্ন হওয়ায় পুষ্টি পদার্থের চক্রাবর্তও (cycling

of nutrients) ধীরে গতিতে ঘটে। পোডজল আম্লিক প্রকৃতির (pH3—6.5) হওয়ায় বিশেষ প্রজাতির **'অম্লঅনুরাগী উদ্ভিদ'** (acid loving plant) যথা— 'Rhododendron', Rumex, Calluna এবং Erica এই মৃত্তিকায় জন্মায়। পোডজলের বৈশিষ্ট্য অতিসংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

(a) পোডজল বালিপাথর, নুড়ি এবং অ্যালুভিয়াল সঞ্চয় দ্বারা গঠিত।

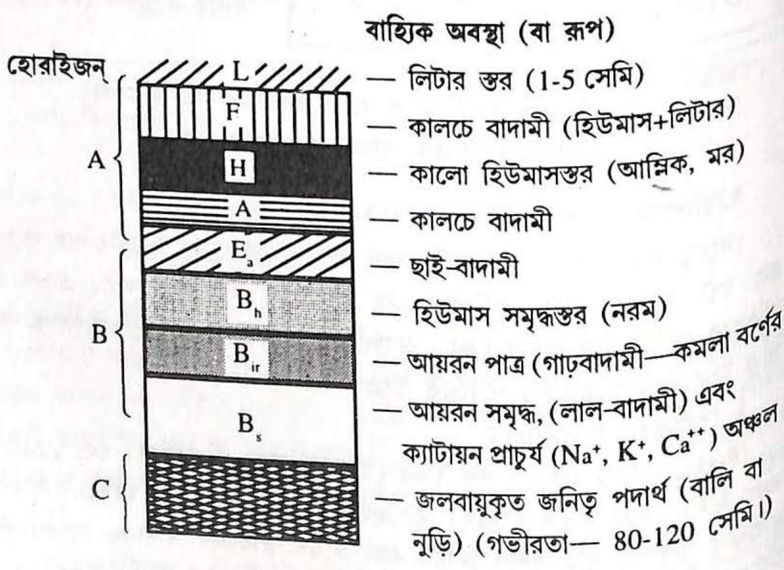
(b) পোডজল অন্তর্গত লিটার স্তরের গভীরতা অনেক বেশি। লিটার প্রধানত ফেনল সমৃদ্ধ উপাদান যথা— **কনিফার-নিড্‌ল** (conifer needle) দ্বারা গঠিত। এই ফেনল সমৃদ্ধ উপাদানগুলি ডিকম্পোজার জীবের দ্বারা পাচিত হয় না।

(c) ক্যালসিয়ামের মাত্রার উপস্থিতিই পোডজলের আম্লিক (pH3—6.5) প্রকৃতির কারণ। এই আম্লিক প্রকৃতির জন্য কেঁচো এবং অন্যান্য ডিকম্পোজার জীব পোডজল মৃত্তিকায় বাস করতে পারে না।

(d) লিটারের পাচন কেবল ছত্রাক দ্বারা ধীরগতিতে সম্পন্ন হয়, এই কারণে পৃথক এবং অপেক্ষাকৃত চওড়া আম্লিক হিউমাস স্তর—**'মর'** (mor) এর উপস্থিতি দেখা যায়।

(e) E_a হোরাইজনকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছাই রঙের জন্য উপরে এবং নীচের অন্যান্য স্তর থেকে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা যায়। এই স্তর অধিকরূপে লিচড্‌ এবং বালিকণা দ্বারা গঠিত।

(f) পোডজল শীতল এবং আর্দ্র কনিফেরাস অরণ্যে সচরাচর দেখা যায়।



চিত্র 5.11 ঃ পোডজলের পার্শ্বচিত্র দেখানো হয়েছে।

II. বাদামী মৃত্তিকা (Brown Earths) :

বাদামী মৃত্তিকা নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের ডেসিডুয়াস অরণ্যে সৃষ্টি হয়। এই মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

i) বাদামী মৃত্তিকা দুটি সমান বাদামী বা কালচে বাদামী বর্ণের 'A' এবং 'B' হোরাইজন্ দ্বারা গঠিত।

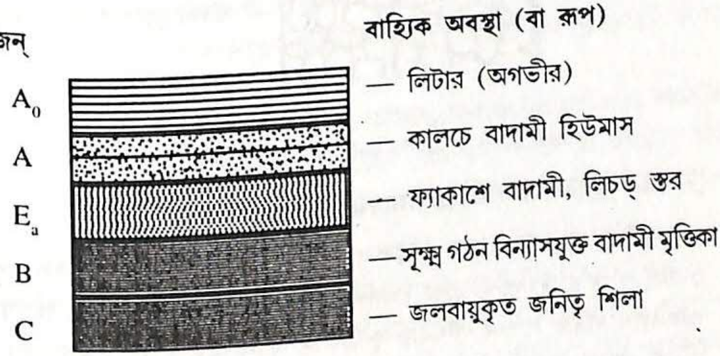
ii) পোডজলের তুলনায় এই মৃত্তিকার লিটার উৎপাদন এবং পাচন হার অনেক বেশি।

iii) এই মৃত্তিকায় ক্যালসিয়ামের আধিক্য দেখা যায়। ক্যালসিয়াম আধিক্যের কারণে মৃত্তিকার pH-এর মান থাকে 4.5–8 এর মধ্যে। ফলে কেঁচোসহ অন্যান্য প্রাণী স্বাচ্ছন্দ্যে বাস করতে পারে। মৃত্তিকার উপরের স্তরের সংমিশ্রণ কেঁচো প্রভৃতি প্রাণীর দ্বারা সম্পন্ন হয়।

iv) এই মৃত্তিকার হিউমাসকে **'মাল'** (mull) বলা হয়।

v) মৃত্তিকার উর্বরতা B-হোরাইজন অভিমুখে ক্রমশ বাড়ে।

vi) এই প্রকারমৃত্তিকার খনিজ পুষ্টির পরিমাণ অনেক বেশি এবং পুষ্টি পদার্থের চক্রাবর্তও খুব দ্রুত।



চিত্র 5.12 : বাদামী মৃত্তিকার পার্শ্বচিত্র দেখানো হয়েছে।

III. রেনড়্জিনাস (Rendzinas) :

রেনড়্জিনাস কথাটি 'Rzedzic' (= tremble) শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। জলবায়ু এই প্রকার মৃত্তিকা সৃষ্টিতে সাহায্য করে না। তাই যেকোন জলবায়ুগত অবস্থায় রেনড়্জিনাসের উপস্থিতি দেখা যায়। রেনড়্জিনাস মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লিখিত হল :

i) ক্যালকেরিয়াস বেড়রকের উপরে কালচে বাদামী বা কালো পাতলা ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ স্তর দ্বারা রেনড়্জিনাস মৃত্তিকা (অগভীর) গঠিত।

ii) রেনড়্জিনাস হচ্ছে **'চক্'** (chalk) এবং **'চুনাপাথর'** (limestone) সমৃদ্ধ মৃত্তিকা।

iii) এই জাতীয় মৃত্তিকার পার্শ্বচিত্রে 'B' হোরাইজন্ অনুপস্থিত থাকে।

iv) রেনড্জিনাস মৃত্তিকার ক্ষারীয় প্রকৃতি হওয়ার (pH8 বা তার বেশি) অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে অধিক পরিমাণ ক্যালসিয়াম কার্বনেটের উপস্থিতি (80%)।

v) মৃত্তিকার জলভেদ্যতা বেশি হওয়ায় বৃষ্টির জলে ক্যালসিয়াম পদার্থ দ্রবীভূত হয়ে নিষ্কাশিত হয় এবং মৃত্তিকার উপরের স্তরে সিলিসিয়াস পদার্থ পড়ে থাকে।

vi) ক্ষারীয় মৃত্তিকায় বসবাসের উপযোগী **ক্যালসিকল্** (Calcicoles) জাতীয় উদ্ভিদ (যথা— Clematis, Polygala, Acinos এবং Origanum) জন্মায়।

vii) রেনড্জিনাস মৃত্তিকায় **ফ্লোরার** (flora) প্রাচুর্য্য দেখা যায়।

হোরাইজন্ **বাহ্যিক রূপ**



চিত্র 5.13 ঃ 'রেনড্জিনা' মৃত্তিকার পার্শ্বচিত্র দেখানো হয়েছে।

5.3.4. খনিজ সম্পদ (Mineral Resources) ঃ

খাদ্য-শস্যের উৎপাদনে মৃত্তিকার ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, কোন দেশের শিল্পের প্রগতি, শক্তি'র উৎপাদন এবং দৈনন্দিন প্রয়োজনে খনিজ সম্পদের গুরুত্বও প্রশ্নাতীত। অধিকাংশ খনিজ সম্পদ পৃথিবীর ভূ-ত্বক বা ক্রাস্ট অংশে বিদ্যমান থাকে। ভারত একটি খনিজ পদার্থ সমৃদ্ধ দেশ। অত্যাবশ্যক খনিজ সামগ্রী—কয়লা, পেট্রোলিয়াম, লৌহ আকরিক সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খনিজ যথা— তামা, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, জিপসাম, সোনা প্রভৃতি ভারতের ভূ-ত্বকে পাওয়া যায়। কয়েকটি বহুল আলোচিত খনিজ সম্পদের প্রাপ্তিস্থান, প্রকৃতি এবং গুরুত্ব সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

1. **কয়লা** (Coal) ঃ কয়লা পাললিক শিলাস্তরে জোড়াযুক্ত স্তরের আকারে (in the form of layers of seams) অবস্থান করে। এইরূপ কয়লা স্তরের গভীরতা 1 সেমি বা তার কম থেকে 200 মিটারের বেশি হতে পারে। তবে অধিকাংশ কয়লা স্তরের গড় গভীরতা (average thickness) 1–10 মিটারের মধ্যে। কার্বন সংযুতি অনুসারে চারধরনের কয়লা পাওয়া যায়— **পিট** (< 30% কার্বন), **লিগনাইট** (30-50% কার্বন), **বিটুমিনাস** (50-90% কার্বন) এবং **অ্যানথ্রাসাইট** (> 90% কার্বন)।

বিশ্বে বাৎসরিক কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ (প্রকৃত অর্থে খনি থেকে উত্তোলন) প্রায় 2400 মিলিয়ন টন এবং মোট উৎপাদনের বেশির ভাগটাই আসে আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া এবং চীন থেকে। ভারতের বাৎসরিক কয়লা উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় 140 মিলিয়ন টন।

ভারতে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত মজুত কয়লার মোট পরিমাণ 122 বিলিয়ন টন এবং লিগনাইট 2.1 বিলিয়ন টন। আশা করা যাচ্ছে ভবিষ্যতে আরোও মজুত কয়লাভাণ্ডার আবিষ্কৃত হবে। ভারতের অধিকাংশ কয়লাখনিগুলি পূর্বভারতে অবস্থিত।

a) **ঝরিয়া ঃ**— ভারতে মোট উৎপাদিত কয়লার এক তৃতীয়াংশ আসে ঝরিয়া কয়লাখনি থেকে।
b) **রানীগঞ্জ ঃ**— রানীগঞ্জ কয়লাখনিতে উৎপাদিত কয়লার পরিমাণ ঝরিয়ার পরেই।
c) ঝরিয়া এবং রানীগঞ্জের পরেই অবশিষ্ট পরিমাণ কয়লা আসে **বোকারো, করণপুরা,** এবং দামোদর উপত্যকার অন্যান্য কয়লাখনি থেকে।
d) মহানদী উপত্যকা, গোদাবরী উপত্যকার ওয়ার্ধা, মধ্যপ্রদেশের **'সাতপুরা'** পর্বতের পাদদেশের কয়লা ভাণ্ডারগুলিতেও প্রচুর পরিমাণ কয়লা মজুত আছে।
e) **বিকানের** এবং তামিলনাড়ুর **দক্ষিণ আরকট** জেলায় প্রচুর লিগনাইট ভাণ্ডার রয়েছে।
f) উপরিউক্ত কয়লাখনিগুলি ছাড়া— আসাম, অরুণাচলপ্রদেশ এবং দার্জিলিং জেলায় (হিমালয়ের পাদদেশে) ছোট ছোট কয়লা ভাণ্ডার রয়েছে। কিন্তু আসামে প্রাপ্ত কয়লায় সালফার বেশি থাকায় শিল্পে ব্যবহারের পক্ষে অত্যন্ত অনুপযোগী।

II. পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস (Petroleum and Natural Gas) ঃ

অধিকাংশ সংগ্রহণযোগ্য পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায় পাললিক স্তরের **'ঊর্দ্ধ-ধনুকাকৃতি অঞ্চলে'** (যা 'অ্যান্টিক্লাইন' অঞ্চল নামে পরিচিত)। এই অ্যান্টিক্লাইন অঞ্চল আবার **'হাই'** (high) নামে পরিচিত। (যথা—মুম্বাই হাই [Mumbai High])। পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ধারণকারী পাললিক মৃত্তিকাস্তর অত্যন্ত রন্ধ্রবহুল এবং ভেদ্য। বিশ্বের অধিকাংশ তৈল সমৃদ্ধ স্তর 2000 মিটার গভীরতার মধ্যে অবস্থিত এবং কতিপয় স্থানে তেল উত্তোলিত হয় 6000 মিটার বা তারও বেশি গভীর মৃত্তিকাস্তর থেকে। অধুনা পশ্চিম কানাডায় প্রাপ্ত টার-স্যাণ্ড (tar-sand) **'বিটুমেন'** পেট্রোলিয়ামের উৎস হিসেবে সংগৃহীত হচ্ছে। বিশ্বের পেট্রোলিয়াম সমৃদ্ধ দেশগুলির নাম উল্লেখ করা হল।

i) বিশ্বের পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের 50 শতাংশ সঞ্চিত আছে মধ্য-প্রাচ্যের (middle-east) দেশগুলিতে যথা—**সৌদি আরব** (1নং), কুয়েত, ইরান, ইরাক এবং লিবিয়ায়।

ii) তেল সঞ্চয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রাশিয়া এবং সি.আই.এস (CIS) অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য দেশ।

iii) অন্যান্য তেল সঞ্চয়কারী দেশগুলি হচ্ছে যথাক্রমে আমেরিকা, আবুধাবি, নাইজেরিয়া, চিন, ভেনেজুয়েলা, ইন্দোনেশিয়া, কানাডা, ইংল্যাণ্ড, আলজেরিয়া এবং সিরিয়া।

iv) ভারতে সঞ্চিত তেলের পরিমাণ উপরিউক্ত দেশগুলির তুলনায় অনেক কম। ভারতে অধুনা আবিষ্কৃত পেট্রোলিয়ামের উৎসস্থল মুম্বাই-এর বিপরীতে **অফ্‌শোর** (offshore) বা হাই অঞ্চল। যদিও গুজরাটে এবং আসামের **এনশোর** (enshore) অঞ্চলে পেট্রোলিয়াম ভাণ্ডার ইতঃপূর্বে আবিষ্কৃত হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশে ও উড়িষ্যার অফ্‌শোর অঞ্চলে তৈল ভাণ্ডার আবিষ্কারের সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল।

III. **ধাতব খনিজ সম্পদ** (Metalliferous Mineral Resources) ঃ

শিল্পের কাজে ব্যবহৃত অধিকাংশ ধাতু পৃথিবীর ক্রাস্ট বা পাতলা বহিঃস্থ আবরণীর অংশে (10-70 কিমি'র মধ্যে) পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ক্রাস্টের কোন অংশে সঞ্চিত ধাতুর পরিমাণ গড় ক্রাসটাল মান এর 10 গুণ বেশি হলে ঐ অংশের ক্রাস্ট খনন করে ধাতু উত্তোলন করা হয়। ব্যবহার অনুসারে ধাতুসমূহকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা হয়—

(A) **গঠনমূলক ধাতু** (Structural Metal) ঃ যে সমস্ত ধাতু লোহা, ইস্পাত এবং অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদনের কাজে লাগে।

(B) **বিরল ধাতু** (Scarce metals) ঃ যথা—Cu, Pb, Zn, Mg, Ni, এবং Hg প্রভৃতি।

(C) বহুমূল্য ধাতু (Precious metal) ঃ যথা—Au (সোনা), Pt (প্লাটিনাম), এবং Ag (রূপা)।

ধাতু	ক্রাস্টাল গড় (ppm)	সঞ্চিত আকরিকের ঘনত্ব
লোহা (Fe)	50,000	50-65%
অ্যালুমিনিয়াম (Al)	83,000	45-60% (Al_2O_3)
তামা (Cu)	70	1-2%
সীসা (Pb)	16	5-10%
দস্তা (Zn)	80	10-15%
ম্যাঙ্গানীজ (Mn)	1000	40-50%
সোনা (Au)	0-1	5-50ppm

তালিকা 5.3 ঃ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাতুর গড় ক্রাস্টাল মান এবং সঞ্চিত আকরিকের ঘনত্ব উল্লেখ করা হয়েছে।

A) গঠনমূলক ধাতু (Structural Metals) ঃ

(1) **লোহা এবং ইস্পাত ঃ** লোহা এবং ইস্পাত তৈরির কাজে অপরিহার্য কাঁচামালগুলি হচ্ছে লৌহ-আকরিক, চুনাপাথর কোক, ম্যাঙ্গানীজ এবং এদের সঙ্গে স্বল্প পরিমাণ ক্রোমিয়াম, টাঙ্গস্টেন, ভ্যানাডিয়াম, নিকেল এবং মলিবডেনাম। বাৎসরিক 800 মিলিয়ন টন ইস্পাত উৎপাদনের জন্য 1500 মেট্রিকটন লৌহ-আকরিক ব্যবহার করা হয়। উন্নত মানের লৌহ আকরিকের সঞ্চয়ে ভারত প্রথম সারিতে (লৌহ আকরিকে [হিমাটাইট, Fe_2O_3 এবং ম্যাগনেটাইট Fe_3O_4] লোহার মান 60-69%, বিশ্বের সর্বোত্তম)। ভারতে বর্তমান সঞ্চিত লৌহ আকরিকের মোট পরিমাণ প্রায় 22,000 মিলিয়ন টন কিন্তু বাৎসরিক উৎপাদনের হার মাত্র 40 মিলিয়ন টন। এই উৎপাদনের কিছু অংশ বাৎসরিক 8 মিলিয়ন টন ইস্পাত উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ বিদেশে রপ্তানী করা হয়। ভারতে যেসব স্থানে লৌহ আকরিকের ভাণ্ডার রয়েছে, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ঃ—

সিংভূম-উড়িষ্যা অঞ্চল (বৃহত্তম), মধ্যপ্রদেশের **'বাইলাডিলা'** এবং **'রাঝারা'** অঞ্চল, তামিলনাড়ুর **সালেম**, কর্ণাটকের **'বাবাবুদান'** এবং **'কুদরেমুখ'**।

ভারতছাড়া লৌহআকরিকের সঞ্চয়কারী বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলি হচ্ছে **রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, আমেরিকা,** এবং **সুইডেন**। সমগ্র বিশ্বে সঞ্চিত ব্যবহারযোগ্য লৌহআকরিকের মোট পরিমাণ 300 বিলিয়ন টন বা তার বেশি।

2. **ম্যাঙ্গানীজ আকরিক** (Manganese Ore) ঃ

একটন ইস্পাত তৈরি করার জন্য 6-16 কেজি ম্যাঙ্গানীজ আকরিকের প্রয়োজন হয়। এইপর্যন্ত বিশ্বে সংগ্রহণযোগ্য মোট সঞ্চিত ম্যাঙ্গানীজ আকরিকের পরিমাণ প্রায় 1 বিলিয়ন টন। প্রতি বছর 10 মিলিয়ন টন ম্যাঙ্গানীজ-আকরিক ইস্পাত উৎপাদনে ব্যবহৃত হলেও সঞ্চিত পরিমাণ শেষ হতে বেশ কয়েকবছর লাগবে। এছাড়া নিম্নমানের ম্যাঙ্গানীজ আকরিক (Mn, 15-20%) ক্রান্তীয় এবং উপক্রান্তীয় অঞ্চলের সমুদ্রের তলদেশে এবং বিশ্বের অন্যান্য স্থানের স্থলভূমিতে **'ম্যাঙ্গানীজ'-'নডিউল'** আকারে সঞ্চিত আছে। শুধুমাত্র প্রশান্ত মহাসাগরের মেঝেতেই সঞ্চিত আছে 1-5 ট্রিলিয়ন টন।

ভারতে সঞ্চিত ম্যাঙ্গানীজ আকরিকের মোট পরিমাণ 180 মিলিয়ন টন এবং বার্ষিক উৎপাদিত ম্যাঙ্গানীজ আকরিকের পরিমাণ 2 মিলিয়ন টন। ইতঃপূর্বে উন্নতমানের সমস্ত ম্যাঙ্গানীজ আকরিক নিঃশেষিত হলেও ভারতে বর্তমান ম্যাঙ্গানীজ সঞ্চিত স্থানগুলি হচ্ছে মহারাষ্ট্রের **'ভানদারা'** জেলা ; মধ্যপ্রদেশের **'বালাঘাট'** জেলা ; উড়িষ্যার **'জামডা-কৈরা'** অঞ্চল ; অন্ধ্রপ্রদেশের **'ভিজিয়েনা গ্রাম'** অঞ্চল এবং কর্ণাটকের **'সান্দু'**। ভারতছাড়া বিশ্বের অন্যান্য দেশ যথা—রাশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ব্রাজিল এবং অস্ট্রেলিয়ায় প্রচুর পরিমাণ ম্যাঙ্গানীজ আকরিক সঞ্চিত আছে।

3. **ক্রোমাইট** (Chrom'te—$Feo.Cr_2O_3$) ঃ ক্রোমাইট স্টেনলেস স্টীল উৎপাদনের একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। আবিষ্কৃত মোট সঞ্চয়ের 90 শতাংশ বা তার বেশি

ক্রোমিয়াম সঞ্চিত আছে রোডেসিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকায়। বিশ্বে নির্ণীত ক্রোমাইট সঞ্চয়ের মোট পরিমাণ প্রায় 700 মিলিয়ন টন কিন্তু এই সঞ্চয়ে ভারতের অবদান মাত্র 10 মিলিয়ন টন। ভারতের ক্রোমাইট সঞ্চিত স্থানগুলি হচ্ছে যথাক্রমে উড়িষ্যা, কর্নাটক, তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্ট্র।

4. **অন্যান্য** ঃ ইস্পাত শিল্পে ব্যবহৃত অন্যান্য ধাতুগুলি হচ্ছে ভ্যানাডিয়াম, নিকেল, টাংসটেন এবং মলিবডেনাম। ইতোমধ্যে উড়িষ্যার কটক জেলার **'সুকিন্দা'** অঞ্চলে নিকেল-আকরিকের বৃহত্তম সঞ্চয় ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। বাঁকুড়ার ছেন্দাপাথর অঞ্চলে (খুব কম) এবং দক্ষিণ রাজস্থানেও প্রচুর পরিমাণে টাংসটেন সঞ্চিত আছে।

5. **অ্যালুমিনিয়াম** (Aluminium) ঃ

অ্যালুমিনিয়াম আকরিক (বক্সাইট) থেকে অ্যালুমিনিয়াম উৎপাদিত হয়। আবার অ্যালুমিনিয়াম-আকরিক-'বক্সাইট' উৎপন্ন হয় ইগনিয়াস, পাললিক এবং রূপান্তরিত শিলার জলবায়ুকরণের ফলে। অধিকাংশ বক্সাইট মালভূমির উচ্চঅংশের উপরিতলে ল্যাটেরাইটের সঙ্গে উপস্থিত থাকে। ভারতের বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা (উপকূল অঞ্চল) এবং অন্ধ্রপ্রদেশে সঞ্চিত অ্যালুমিনিয়াম-আকরিকের মোট পরিমাণ প্রায় 200 মিলিয়ন টন, কিন্তু বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র 2 মিলিয়ন টন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সমগ্র বিশ্বে বক্সাইট সঞ্চয়ের মোট পরিমাণ প্রায় 1.2 বিলিয়ন টন।

(B) **বিরল ধাতু** (Scarce Metals) ঃ

1. **তামা** ঃ তামার প্রধান আকরিক **'ক্যালিওপাইরাইট'** (chaleopyrite) পাওয়া যায় ইগনিয়াস এবং রূপান্তরিত শিলায় (ক্রাস্ট অংশের কয়েক কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত)। বিশ্বের বার্ষিক তামা উৎপাদনের পরিমাণ 8 মিলিয়ন টন হলেও ভারতে বার্ষিক উৎপাদনের হার মাত্র 40,000 টন (প্রয়োজনের 60 শতাংশ)। বিশ্বে ব্যবহারোপযোগী সঞ্চিত তামার মোট পরিমাণ প্রায় 300 মিলিয়ন টন কিন্তু ভারতে সঞ্চয়ের পরিমাণ প্রায় 5 মিলিয়ন টন। ভারতের তামা সঞ্চিত স্থানগুলি হচ্ছে যথাক্রমে বিহারের সিংভূম, রাজস্থানের ক্ষেত্রী, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার মালাঞ্জখান্দ। উল্লেখ্য, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাম্বিয়া, জাইরি, চিলি এবং ইন্দোনেশিয়ায় তামা সঞ্চয়ের পরিমাণ বিশ্বের সর্বাধিক।

2. **সীসা এবং দস্তা** (Lead and Zinc) ঃ

সীসা এবং দস্তার প্রধান আকরিক **'গেলেনা'** (galena, PbS) এবং **স্ফ্যালেরাইট** (Sphalerite, ZnS)। এই আকরিকদ্বয় একসঙ্গে ইগনিয়াস এবং রূপান্তরিত পাললিক শিলায় ক্রাস্ট অংশে কয়েক কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। বিশ্বে সীসা এবং দস্তার মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ যথাক্রমে 150 এবং 250 মিলিয়ন টন কিন্তু বর্তমানে উৎপাদন হার যথাক্রমে 3 (সীসার) এবং 6 (দস্তার) মেট্রিক টন। সীসা এবং দস্তার প্রধান উৎপাদক দেশ—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, মেক্সিকো এবং পেরু। ভারতে সীসা এবং দস্তার সঞ্চয়ের পরিমাণ খুবই কম (157 মিলিয়ন টন ; বার্ষিক

উৎপাদন মাত্রা ঃ সীসা—15,000 টন এবং দস্তা—55,000 টন)। ভারতে সীসা পাওয়া যায় রাজস্থানের জাওয়ার এবং উড়িষ্যার সার্গিপল্লিতে ; কিন্তু দস্তার সঞ্চয় ভাণ্ডারগুলি রাজস্থানের—**রাজপুরা-ডরিবা; রামপুরা-আগুচা** এবং **জাওয়ারে** অবস্থিত। অধুনা দার্জিলিং জেলার **গোরুবাথান** অঞ্চলে খুব কমপরিমাণ 'দস্তা-সীসার' সন্ধান পাওয়া গেছে।

C. **বহুমূল্য ধাতু** (Precious Metals) ঃ

সোনা (Gold) ঃ স্ফটিক শিরায় (quartz veins), নদীর বালি এবং নুড়ির সঙ্গে পিণ্ডীভূত অবস্থায় এবং কখনো কখনো Cu, Pb, Zn প্রভৃতি খনিজ ধাতুর সালফাইডের সঙ্গে সোনা উপস্থিত থাকে। খনি থেকে সংগ্রহণ-যোগ্য বিশ্বে সঞ্চিত সোনার মোট পরিমাণ প্রায় 1 বিলিয়ন ওজ (প্রায় 350,000 টন)। এই মোট পরিমাণের 60 শতাংশ আছে দক্ষিণ আফ্রিকায়, এবং অবশিষ্ট 40 শতাংশ আছে অন্যান্য সোনা উৎপাদক দেশ যথা : রাশিয়া, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, এবং অস্ট্রেলিয়ায় (বিশ্বের গড় বার্ষিক উৎপাদন 40 মিলিয়ন ওজ [প্রায় 1300 টন])। ভারতে সংগ্রহণযোগ্য সোনার মোট পরিমাণ মাত্র 40 টন এবং বার্ষিক উৎপাদন মাত্র 2 টন। ভারতের সোনার উৎপাদন প্রধানত দুটি খনিতে সীমাবদ্ধ—কর্নাটকের **'কোলার'** এবং **'হুট্টি'**। যদিও কিছু পরিমাণ সোনা উত্তোলিত হয় বিহার (ছোটনাগপুর), মধ্যপ্রদেশ এবং অন্ধ্রপ্রদেশের নদীর বালি থেকে।

IV. **অধাতব খনিজ সম্পদ** (Non-metallic Mineral Resources) ঃ

ভারতে প্রাপ্ত অধাতব খনিজ পদার্থগুলির মধ্যে চুনাপাথর, অভ্র এবং হীরা উল্লেখযোগ্য।

1. **চুনাপাথর** (Limestone) ঃ চুনাপাথর প্রধানত লোহা এবং ইস্পাত তৈরি করতে এবং সিমেন্ট উৎপাদনে কাজে লাগে। ভারতে চুনাপাথরের প্রাপ্তিস্থানগুলি হচ্ছে কর্নাটক, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ। পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সে (Mg-সমৃদ্ধ চুনাপাথর—'ডলোমাইট') এবং পুরুলিয়া জেলার ঝালদায় (সিমেন্ট মানের) চুনাপাথর (কম পরিমাণে) পাওয়া গেছে। ভারতে চুনাপাথরের মোট পরিমাণ 5000 মিলিয়ন টন কিন্তু বার্ষিক উৎপাদন মাত্র 30 মিলিয়ন টন।

2. **হীরা** (Diamond) ঃ

হীরা বহুমূল্য রত্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং রাশিয়াই প্রধান হীরা উৎপাদক দেশ। ভারতে খুব কম পরিমাণে হীরা পাওয়া যায়—মধ্যপ্রদেশের **'পান্না'** এবং দক্ষিণ অন্ধ্রপ্রদেশের **'ওয়াজরা-কারুর'** খনিতে। যদিও শেষোক্ত খনিতে হীরার উত্তোলন এখনও শুরু হয়নি। বিশ্বের বার্ষিক হীরা উৎপাদন মাত্রা 12 মিলিয়ন ক্যারেট হলেও ভারতের বার্ষিক উৎপাদন অতি নগণ্য, মাত্র 10,000 ক্যারেট।

3. **অভ্র** (Mica) ঃ প্রায় 30-40 বছর আগে ভারতই ছিল বিশ্বের সর্বাধিক অভ্র উৎপাদক দেশ। বর্তমানে ভারতের উৎপাদন হার ব্রাজিল এবং রাশিয়ার তুলনায় অনেক কম। ভারতের অভ্র গুণগতভাবে সর্বোৎকৃষ্ট। ভারতের তিনটি অঞ্চলের ভূ-গর্ভের খনি

থেকে অভ্র উৎপাদিত হয়—(a) **বিহার অভ্র বলয় (Bihar Mica Belt)**ঃ বৃহত্তম খনি। গয়া, হাজারিবাগ এবং গিরিডি জেলার নীচ-বরাবর 150 কিমি বিস্তৃত অভ্রবলয়। (b) **রাজস্থানের অভ্রবলয়** এবং (c) অন্ধ্রপ্রদেশের **'নেল্লোর'** অভ্রবলয়।

5.3.5. খনিজ সম্পদ কি অফুরন্ত?

1. **অধিকাংশ খনিজ সম্পদ অপুনর্নবীকরণযোগ্য (Mineral Resources are By and Large Non-Renewable)ঃ**

খনিজ সম্পদের সৃষ্টি একটি দীর্ঘস্থায়ী পদ্ধতি। পৃথিবীর ক্রাস্ট এবং ম্যান্টেল অংশে প্রাকৃতিক উপায়ে খনিজ সম্পদের সৃষ্টি হতে 4.5 বিলিয়ন বছর সময় লেগেছে এবং এখনও উৎপাদন পদ্ধতি অব্যাহত আছে। খনিজ সম্পদের অতিদ্রুত সৃষ্টির জন্যও কয়েকহাজার বছর সময়ের প্রয়োজন। কয়েকটি খনিজ ব্যতিরেকে অধিকাংশ খনিজ (কয়লা এবং পেট্রোলিয়ামসহ)—অপুনর্নবীকরণযোগ্য। পুনর্নবীকরণযোগ্য খনিজগুলির মধ্যে সাধারণ লবণ, সোডিয়াম, ক্লোরিন, জিপসাম, ব্রোমিন, ম্যাগনেসিয়াম (সমুদ্রের জল থেকে ক্ষতিপূরণ করা যায়) এবং ম্যাঙ্গানিজ, নিকেল, এবং তামা (গভীর সমুদ্রের তলদেশে প্রাপ্ত ম্যাঙ্গানীজ নোডিউল থেকে ক্ষতিপূরণ করা যায়) উল্লেখযোগ্য (তালিকা 5.4)।

	নদীর জল (μg/ml)	**সমুদ্রের জল** (μg/ml)
Na	6	10,800
Mg	4	1,290
$SO_4^{=}$	17	2,700
Cl^-	8	19,400
K	2	392
Ca	15	411
Mn	0.07	0.009
Fe	0.7	0.003
Cu	0.007	0.002
Br	0.020	67
I	0.007	0.064
Au	0.00002	0.000011
Pb	0.003	0.00003

তালিকা 5.4 ঃ নদী এবং সমুদ্রের জলে কয়েকটি খনিজ পদার্থের ঘনত্ব দেওয়া হয়েছে (μg/ml)।

2. **অপুনর্নবীকরণযোগ্য খনিজ সম্পদ অচিরেই নিঃশেষিত হবে ঃ**

কয়েকটি উন্নত দেশের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অপুনর্নবীকরণযোগ্য খনিজ সম্পদের বাধাহীন ব্যবহার ঘটছে। খনিজ সম্পদের এই বাধাহীন ব্যবহার বা শোষণ যদি বর্তমান প্রবণতায়

চলতে থাকে তাহলে আগামী 50 থেকে 500 বছরের মধ্যে বিশ্বের সমস্ত সঞ্চয় ভাণ্ডার নিঃশেষিত হবে (কয়েকটি দেশে আরোও দ্রুত নিঃশেষ ঘটবে)। ভবিষ্যতে অনুন্নত মানের খনিজ উৎস থেকে খনিজ পদার্থ উৎপাদনের বিকল্প পদ্ধতি আবিষ্কৃত না হলে মানুষের প্রগতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। তাই এই মুহূর্ত থেকেই আমাদের সজাগ হওয়া প্রয়োজন। খনিজ সম্পদ সমূহের যথাযোগ্য সংরক্ষণ এবং ব্যবহার অতি জরুরী।

5.3.6. মৃত্তিকার ক্ষয় (Soil Erosion) ঃ

মৃত্তিকা পরিবেশের একটি অপুনর্নবীকরণযোগ্য উপাদান। সময়ের সাপেক্ষে মৃত্তিকার ক্ষয় বাস্তুতন্ত্রের একটি প্রাকৃতিক ঘটনা হলেও কোন একটি সময়ে যে পরিমাণ মৃত্তিকা ক্ষয়িত হয় ঠিক একই পরিমাণ মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। ফলে মৃত্তিকার মোট পরিমাণ বজায় থাকে। কিন্তু বর্তমানে মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ হস্তক্ষেপে একদিকে মৃত্তিকার ক্ষয় ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং অন্যদিকে মৃত্তিকার সৃষ্টি বিঘ্নিত হচ্ছে। ফলে মৃত্তিকার আয়তন ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। মৃত্তিকার ক্ষয় বর্তমানের পরিবেশ সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

I. মৃত্তিকা ক্ষয়ের প্রকারভেদ (Types of Soil Erosion) ঃ

মৃত্তিকা প্রধানত তিন উপায়ে ক্ষয়িত হয়—

a) **সিট ইরোসান** (Sheet Erosion) ঃ ঢালযুক্ত অংশে অরক্ষিত দানাদার মৃত্তিকায় এই জাতীয় ক্ষয় দেখা যায়। বৃষ্টির ফলে সঞ্চিত জলের ধাক্কায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকার দানা যখন ঢাল বরাবর নীচের দিকে গড়াতে থাকে তখন তার গতিপথ বরাবর মৃত্তিকা ক্ষয়ে যায় ফলে ঐ অঞ্চলের মৃত্তিকা পাতলা হয় এবং ক্ষয়িত মৃত্তিকা জলের দ্বারা বাহিত হয়।

b) **রিল ইরোসান** (Rill Erosion) ঃ ছোট ছোট নালীর মাধ্যমে মৃত্তিকার ক্ষয়কে 'রিল ইরোসান' বলা হয়। জমি কর্ষণের সময় এই জাতীয় নালী অবরুদ্ধ হয়ে যায়, তাই রিল ইরোসানকে 'সিট ইরোসানে'র অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

c) **গালি ইরোসান** (Gully Erosion) ঃ জলস্রোতের ফলে সৃষ্ট খাঁজের মাধ্যমে মৃত্তিকার ক্ষয়কে গালি ইরোসান বলা হয়। লাঙ্গলের দ্বারা সৃষ্ট খাঁজ, প্রাণীর গমন পথ এবং যানবাহনের রুট প্রভৃতি থেকে গালি সৃষ্টি হতে পারে।

II. মৃত্তিকার ক্ষয়জনিত কারণ ঃ

মৃত্তিকার ক্ষয়কারী গুরুত্বপূর্ণ মনুষ্যপ্রভাবিত কারণগুলি অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

i) **অরণ্যধ্বংস** (Deforestaion) ঃ অরণ্যের উদ্ভিদ আচ্ছাদনই শিকড়ের মাধ্যমে মৃত্তিকাকে ধরে রাখে অর্থাৎ মৃত্তিকার ক্ষয় রোধ করে। কৃষিকাজের প্রয়োজনে অধিক কৃষিজমি প্রাপ্তির কারণে, আসবাবপত্র তৈরির জন্য, শিল্পস্থাপনের উদ্দেশ্যে কিংবা নগরায়নের কারণে অরণ্যের বিলুপ্তি মৃত্তিকা ক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ। প্রতিবছর ভারতে 6000 মিলিয়ন টন মৃত্তিকার ক্ষয় ঘটে এবং এই ক্ষয়ের ফলে মৃত্তিকার

মোট যে পরিমাণ পুষ্টি পদার্থ ক্ষয় হয় তার পরিমাণ বার্ষিক ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের তুলনায় অনেক বেশি।

ii) **আধুনিক কৃষিপদ্ধতি** (Modern Farming Practice) ঃ

মৃত্তিকা তৈরি করার সময় বা বীজ অঙ্কুরোদ্‌গমের পরে দীর্ঘসময় মৃত্তিকা কর্ষিত করে ফেলে রাখার সময় বৃষ্টি বা বায়ুপ্রবাহের কারণে মৃত্তিকার ক্ষয় ঘটে। তাছাড়া আড়াআড়ি (পার্শ্বীয়) ভাবে জমিকর্ষণ এবং মই না দিয়ে উলম্বভাবে কর্ষণ করার ফলে যে নালীর সৃষ্টি হয়, তার ফলেও মৃত্তিকার ক্ষয় ত্বরান্বিত হয়। পাহাড়ের ঢালে ধাপে ধাপে চাষ করার প্রবণতা পাহাড়ে মৃত্তিকা ক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ।

iii) **গোচারণ** (Overgrazing) ঃ

অত্যধিক গোচারণে তৃণাচ্ছাদন বিনষ্টের কারণে মৃত্তিকার ক্ষয় ত্বরান্বিত হয়।

iv) **ত্রুটিপূর্ণ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা** (Error in Developmental Planning) ঃ

নগর পরিকল্পনা, শিল্পপরিকল্পনা কিংবা বাঁধ দেওয়ার পরিকল্পনাগত ত্রুটি মৃত্তিকা ক্ষয়ের অন্যতম কারণ। দেখা গেছে যে, অরণ্য ভূমি এবং কৃষি ভূমির তুলনায় নগরায়নে রূপান্তরিত ভূমির ক্ষয়-ক্ষমতা যথাক্রমে 2000 এবং 10 গুণ বেশি। তবুও অপরিকল্পিত উপায়ে কৃষিজমি বা অরণ্যভূমির রূপান্তর ঘটছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য আমেরিকায় প্রতিবছর 10 লক্ষ একর কৃষিজমি এবং অরণ্যভূমি নগরায়নের কাজে পরিবর্তিত হচ্ছে।

III. **মৃত্তিকা সংরক্ষণ** (Soil Conservation) ঃ

কৃষিজমির শীর্ষমৃত্তিকার ক্ষয়, অনুর্বরতা, নগরায়ন বা শিল্পায়ন প্রভৃতি কাজে কৃষিজমির সংকোচন ভবিষ্যতে বিপুলায়তন জনসংখ্যার ভরণ-পোষণের একটি অনির্বচনীয় সমস্যা। এই পরিপ্রেক্ষিতে কৃষিজমি তথা সমস্ত স্থলভূমির মৃত্তিকা সংরক্ষণ অত্যধিক জরুরী। ভারতের মোট স্থলভূমির 50 শতাংশ অর্থাৎ 150 মিলিয়ন হেক্টর জমি ক্ষয় এবং উৎকর্ষহানির (soil erosion and degradation) আওতায়, 69 মিলিয়ন হেক্টর জমি (মোট স্থলভূমির 20%) আশঙ্কাজনক এবং 25 মিলিয়ন হেক্টর জমি অনুর্বর (ক্ষারীয়, লবণাক্ত এবং জলসঞ্চয়ী)। এই অবস্থায় ভারতের মৃত্তিকা সংরক্ষণ অত্যাবশ্যক। প্রায় 100 বছর আগে গঠিত **'জাতীয় দুর্ভিক্ষ অনুসন্ধান কমিশনের'** রিপোর্ট অনুসারে ভারতের দুর্ভিক্ষ এবং খরা জনিত সমস্যার মূল কারণ ছিল **'অরণ্য নিধন'**। কারণ উদ্ভিদ কেবল ভূগর্ভে জল সঞ্চয় এবং ধরে রাখতে সাহায্য করে না, গ্রীষ্মকালীন সময়ে কূপ ও ঝরণার জল সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখে এবং বহুমূল্য শীর্ষমৃত্তিকার ক্ষয় রোধ করে। মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ তথা মৃত্তিকা সংরক্ষণে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।

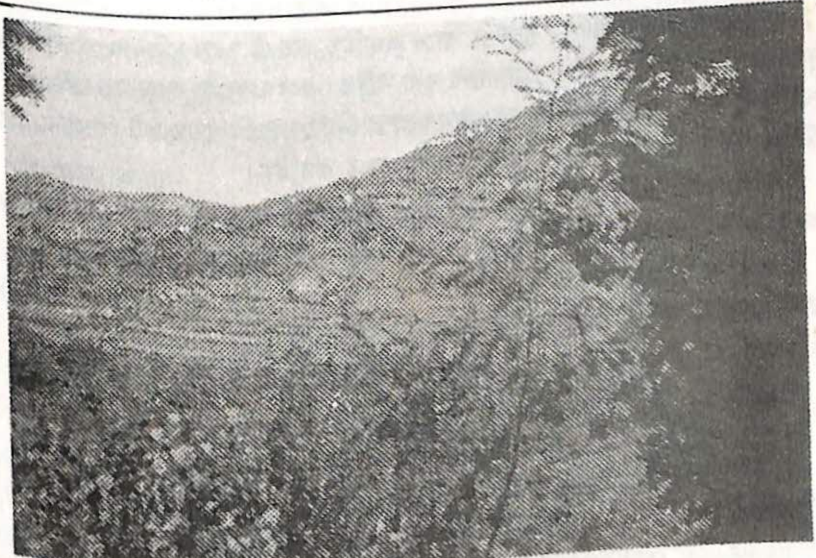
i) **অরণ্যসৃজন** (Aforestation) এবং **অরণ্যনিধনের সীমায়ন** (Limitation of Deforestation) ঃ

এখনই অরণ্য ধ্বংস বন্ধ করা উচিত। বৃক্ষজাতীয় উদ্ভিদ ব্যবহার করা হলেও তা অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অনাচ্ছাদিত পতিত স্থলভূমিকে

কৃত্রিম পদ্ধতিতে অরণ্যে রূপান্তরিত করা জরুরী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মৃত্তিকা সংরক্ষণকারী (বা ক্ষয় রোধকারী) বৃক্ষ এবং গুল্মজাতীয় উদ্ভিদ খুবই উপযোগী।

•• ভারতের অরণ্য আচ্ছাদনের বর্তমান অবস্থা কি?

1956 সালে রূপায়িত 'জাতীয় অরণ্য নীতি'র (National Forest Policy) সুপারিশ অনুসারে কোন অবস্থাতেই ভারতের মোট অরণ্য আচ্ছাদন 33 শতাংশের কম হওয়া উচিত নয় এবং পাহাড়ের ঢাল অঞ্চলে মৃত্তিকার ক্ষয়রোধে ন্যূনপক্ষে 60 শতাংশ অরণ্য আচ্ছাদন থাকা উচিত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে নীতি রূপায়িত হওয়ার 40 বছর পরেও আধিকারিকভাবে (officially) 23 শতাংশ ভূমি অরণ্যে আচ্ছাদিত। কয়েকটি রাজ্যে আবার আরোও কম—গুজরাটে মাত্র 10 শতাংশ এবং রাজস্থানে 4 শতাংশ। স্যাটেলাইট চিত্র অনুসারে আধিকারিকভাবে ঘোষিত 23 শতাংশ অরণ্যের অর্ধেক ক্ষীয়মান ছোট ঝোপ (degraded scrub) এবং অবশিষ্ট 12 শতাংশ প্রকৃত অরণ্য। বাস্তুতন্ত্রের সহ্যসীমার মাত্রাতিরিক্ত অরণ্যসম্পদের এই বিনাশের ফলে আমাদের অবশ্যই মূল্য দিতে হবে।



চিত্র 5.14 : পাহাড়ের ঢালু অংশে অরণ্য আচ্ছাদন ধ্বংস করে ধাপে ধাপে চাষের কারণে মৃত্তিকার ক্ষয় ত্বরান্বিত হয়।

ii) **কৃষিজমির ব্যবহারের পরিবর্তন** (Changing Use In Agricultural Land) :

(a) পাহাড়ের ঢাল চিহ্ন বরাবর লাঙ্গল কর্ষণ করা, রোপণ করা, এবং চাষ করা উচিত।

(b) জমি ন্যূনতম কর্ষণ করা উচিত। কর্ষণ করার পর মসৃণ না করে সঙ্গে সঙ্গেই

বীজ ফেলা বা রোপণ করা দরকার, বিশেষ করে যে সমস্ত স্থানে চারা পোঁতার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামে।

(c) মৃত্তিকার ক্ষয়রোধী শস্যের একান্তর কৃষিপদ্ধতি অনুসরণ করা দরকার। দানাশস্য, ভোজ্যপত্র, আলফালফা, এবং ভুট্টার চাষ বিশেষ উপযোগী।

(d) কৃষিজমিতে শস্য-আবর্তন (crop-rotation) পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিত। অর্থ উপার্জনকারী শস্যের চাষাবাদ ন্যূনতম রেখে মৃত্তিকা সংরক্ষণকারী এবং ক্ষয়রোধকারী শস্য যথা, রাই ঘাস (Rye-Grass), মিষ্টি-ভোজ্যপত্র এবং বার্লি প্রভৃতি চাষ করা দরকার।

iii) **চারণভূমির উপযুক্ত পরিচালন** (Proper Management of Pastureland) ঃ

চারণভূমির তৃণাচ্ছাদন মৃত্তিকার ক্ষয়রোধ করতে সাহায্য করে। সেই কারণে অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে চারণভূমির ব্যবস্থাপন জরুরী। কিছু অঞ্চলে গোচারণের উপর কঠোরভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করা উচিত। সেই সঙ্গে কিছু চারণভূমিকে স্থায়ী চারণের জন্য রাখা প্রয়োজন।

iv) **উন্নয়নমূলক প্রকল্পের যথাযথ প্রয়োগ** (Proper Execution of Developmental Plan) ঃ

a) কোন প্রকল্প রূপায়ণের পূর্বে যে স্থানে রূপায়িত হবে ঐ স্থানে মৃত্তিকার গঠনবিন্যাস, দৃঢ়তা এবং ক্ষয়রোধী ক্ষমতা পর্যালোচনা করা উচিত। এবং প্রকল্পের কাজ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শেষ করা প্রয়োজন। বাস বা ট্রেনের রাস্তা নির্মাণে সংক্ষিপ্ততম রুট বিবেচনা করা উচিত, তাতে মৃত্তিকা ক্ষয়ের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম হয়।

b) ঋণ দেওয়ার পূর্বে যে ল্যাণ্ডের জন্য ঋণ প্রদত্ত হবে ব্যাঙ্কারদের ঐ ল্যাণ্ডের অবস্থা সম্পর্কে সার্ভে করা প্রয়োজন।

c) প্রকল্প রূপায়ণে প্রাকৃতিক ঢালগুলি বাদ দেওয়া উচিত এবং ঐ ঢালের সমস্ত উদ্ভিদ এবং অন্যান্য আচ্ছাদনকে সংরক্ষণ করা উচিত। ঢাল-অংশে কোন গঠন তৈরি বা রূপায়ণকালে ক্ষয়-আসক্ত অঞ্চলগুলিতে শস্যের আচ্ছাদন সৃষ্টি করা জরুরী।

5.3.7. শীর্ষ-মৃত্তিকা (Top-Soil) ঃ

i) **'শীর্ষ-মৃত্তিকা' বলতে কি বোঝায়?**

মৃত্তিকাকে উলম্বভাবে তিনটি হোরাইজনে ভাগ করা হয়—'A', 'B' এবং 'C' হোরাইজন। 'A' হোরাইজনের উর্বর হিউমাস সমৃদ্ধ মৃত্তিকাকে 'শীর্ষ-মৃত্তিকা' বলা হয়। শীর্ষ-মৃত্তিকার গভীরতা 0.3-0.5 মিটার। এই মৃত্তিকা খুবই নরম, রন্ধ্রবহুল এবং ভঙ্গুর (friable)।

ii) **শীর্ষ-মৃত্তিকার গুরুত্ব** (Importance of Top Soil) ঃ

শীর্ষ-মৃত্তিকা একটি বহুমূল্য সম্পদ। উদ্ভিদের সৃষ্টি এবং বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ এবং পুষ্টি কেবল শীর্ষ-মৃত্তিকাতেই যথোপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। বাস্তুতন্ত্রের গতিশীলতা

নিয়ন্ত্রণে জীবজগতে উদ্ভিদের ভূমিকা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রাণীজগতের প্রতিপালনের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা কেবল উদ্ভিদ সৌরশক্তি থেকে সংগ্রহ করতে পারে। অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদনশীলতা (productivity) উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। আবার উদ্ভিদ-সৃষ্টি নির্ভর করে শীর্ষ-মৃত্তিকার উপর। তাই শীর্ষ-মৃত্তিকার গুরুত্ব অপরিসীম।

iii) **শীর্ষ-মৃত্তিকার ক্ষতি** (Loss of Topsoil) ঃ

শীর্ষ-মৃত্তিকার ক্ষতি বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদনশীলতার উপর এক বিরাট আঘাত। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে 1 সেমি শীর্ষ-মৃত্তিকা সৃষ্টি হতে সময় লাগে প্রায় 100-400 বছর এবং ক্রান্তীয় ও উপক্রান্তীয় জলবায়ুতে 10 সেমি শীর্ষ-মৃত্তিকা সৃষ্টি হতে সময় লাগে প্রায় 50-150 বছর। তাই শীর্ষ-মৃত্তিকার ক্ষয়ে পরিবেশগত বিপদের সম্ভাবনা সন্দেহাতীত। নিম্নলিখিত উপায়ে শীর্ষ-মৃত্তিকার ক্ষতি হয় ঃ

a) বায়ুপ্রবাহের দ্বারা সমুদ্রতীর এবং মরুভূমির বালি বাহিত হয়ে উর্বর কৃষিজমির শীর্ষ-মৃত্তিকাকে ঢেকে দেয়, ফলে কৃষিজমির উর্বরতা বিনষ্ট হয়। অধুনা রাজস্থানে 1.37 লক্ষ হেক্টর কৃষি জমি মরু-বালি দ্বারা আবৃত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে জমির শীর্ষ-মৃত্তিকা 3 মিটার গভীর বালির আস্তরণে ঢাকা পড়ে গেছে। এছাড়া কৃষি এবং পানীয়ের কাজে জলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস 6,000 কূপ বালি জমে নষ্ট হয়ে গেছে।

b) কৃষিপদ্ধতির পরিবর্তন, উর্বর কৃষি জমির অনভিপ্রেত রূপান্তর এবং অরণ্য ও উদ্ভিদ-আচ্ছাদনের বিনষ্টের ফলে মৃত্তিকার ক্ষয় (erosion) শীর্ষ-মৃত্তিকা ক্ষয়ের অন্যতম প্রধান কারণ।

গঙ্গার মোহানায় বঙ্গোপসাগরে ব-দ্বীপ সৃষ্টির মূল কারণ কিন্তু হিমালয়ের পাদদেশে তরাই অঞ্চলের উর্বর শীর্ষ মৃত্তিকার ক্ষয়। দেখা গেছে যে, তরাই অঞ্চলের অধিকাংশ নদীর গভীরতা (নাব্যতা) পলি বা ধোয়াটে-মৃত্তিকা জমে প্রতি বছর 6 ইঞ্চি থেকে 1 ফুট হ্রাস পাচ্ছে। নাব্যতা হ্রাসের কারণে নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হচ্ছে এবং তার সঙ্গে জল পরিবহন ক্ষমতাও কমে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে দেখা দিচ্ছে বন্যা। বন্যার কবলে প্রতিবছর 80 লক্ষ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হচ্ছে, 450 মিলিয়ন মানুষকে ত্রাণ দিতে হচ্ছে এবং হাজার হাজার মানুষ ও প্রাণী দুর্ভিক্ষে, জলে ডুবে এবং রোগের কবলে মারা যাচ্ছে। দেখা গেছে যে, পুরো গাঙ্গেয়-উপত্যকার 60 শতাংশ অঞ্চল অর্থাৎ ভারতের 40 শতাংশ জনসংখ্যার খাদ্য-উৎপাদনযোগ্য 60 মিলিয়ন হেক্টর জমি প্রতি-বছর বন্যায় প্লাবিত হচ্ছে। 1971 সালে ভারতের বার্ষিক বন্যাপ্রবণ জমির পরিমাণ ছিল যেখানে 20 মিলিয়ন হেক্টর 1996 সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 40 মিলিয়ন হেক্টরে।

5.4 জল (Water) ঃ

জল পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অজীব উপাদান। পৃথিবীর আয়তনের প্রায় তিন চতুর্থাংশই জল। ভৌতপরিবেশ এবং জীব পরিবেশের মধ্যে আন্তঃক্রিয়ায় জল অংশগ্রহণ

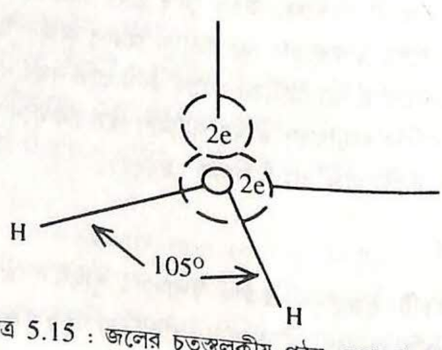
করে। সজীব কোষে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়া জলীয় পরিবেশেই সম্পন্ন হয়। এছাড়া অসংখ্য জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জল সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন জৈব অণুর (যথা—প্রোটিনের) ধর্ম নিরূপণে জল সাহায্য করে।

5.4.1 জল কি? (What is Water ?) ঃ

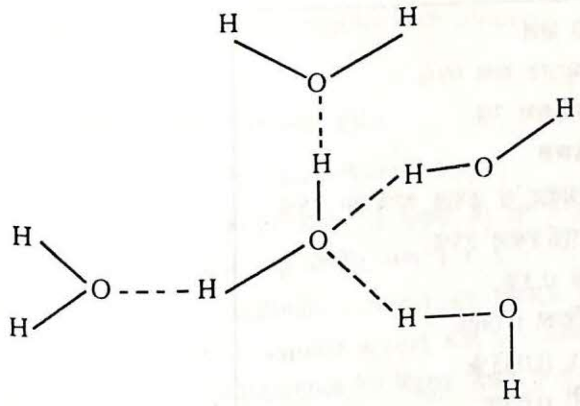
জল একটি বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং স্বাদহীন প্রশম (pH-7) তরল পদার্থ। জলের গভীরতা বেশি থাকলে জলকে ঈষৎ নীলাভ সবুজ মনে হয়। প্রমান চাপে জলের গলনাঙ্ক 0^0C এবং স্ফুটনাঙ্ক 100^0C। 4^0C তাপমাত্রায় জলের ঘনত্ব সর্বাধিক। জল জমে যে বরফ হয় তার আয়তন জলের চেয়ে অধিক অর্থাৎ বরফের ঘনত্ব জলের চেয়ে কম।

5.4.2 জলের রাসায়নিক সংযুতি (Chemical Structure of Water) ঃ

1978 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী 'ক্যাভেণ্ডিস' সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন, জল একটি যৌগ। পরবর্তী সময়ে 'ল্যাভয়সিয়র' পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেন, জল হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগে সৃষ্টি হয়। এক অণু জল দু-পরমাণু হাইড্রোজেন এবং এক পরমাণু অক্সিজেন দ্বারা গঠিত (HOH/H_2O)। প্রতিটি জলের অণু একটি অনিয়মিত চতুস্তলক গঠন করে। এইরূপ চতুস্তলক গঠনে (tetrahedron) অক্সিজেন পরমাণু কেন্দ্রে অবস্থান করে, অক্সিজেনের সঙ্গে দুটি বণ্ডের মাধ্যমে যুক্ত দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু চতুস্তলকের দুটি ভিন্ন কোণে প্রসারিত থাকে এবং অবণ্টিত (unshared) Sp^3 অরবিটাল ইলেকট্রন যুগল দ্বয় চতুস্তলকের অবশিষ্ট দুটি কোণ দখল করে। জলের এই চতুস্তলকীয় গঠনে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যবর্তী কোণের মান 105^0। ডাইপোলার চরিত্রের জন্য জলের অণু তরল এবং কঠিন উভয় অবস্থাতেই পরস্পরের সঙ্গে হাইড্রোজেন দ্বারা যুক্ত হয়ে বৃহৎ অণু (macromolecule) গঠন করে। কঠিন অবস্থায় জলের যে কোন অণু জলের চারটি ভিন্ন অণুর সঙ্গে যুক্ত হয় কিন্তু তরল অবস্থায় এই সংখ্যাটি একটু কম হয় (প্রায় 3.5)। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় জলের বৃহৎ-আণবিক জটিল (macromolecular complex) ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় জল তরল অবস্থাতেই থাকে।



চিত্র 5.15 : জলের চতুস্তলকীয় গঠন দেখানো হয়েছে।



চিত্র 5.16 ঃ কেন্দ্রীয় একটি জলের অণুর সঙ্গে ভিন্ন চারটি জলের অণুর সংযোগে গঠিত বৃহৎ অণু দেখানো হয়েছে (............. হাইড্রোজেন বন্ড)।

5.4.3 **পৃথিবীতে জলের উপস্থিতি** (Occurrence of Water in Earth) ঃ

অশ্মমণ্ডল, বারিমণ্ডল এবং **বায়ুমণ্ডল**—এই তিন সমষ্টিতে জল পৃথিবী পরিবেশে বিদ্যমান থাকে।

i) **অশ্মমণ্ডলে** (In lithosphere) ঃ মৃত্তিকার রন্ধ্রে, কঠিন শিলা বা পাহাড়ের ফাটলে জল পাওয়া যায় (হাইগ্রোস্কোপিক এবং ক্যাপিলারী জল)। মৃত্তিকা বা পাহাড়ের 5 কিমি গভীরতা পর্যন্ত জল উপস্থিত থাকে।

ii) **বারিমণ্ডলে** (In lithosphere) ঃ সমুদ্র, হ্রদ, নদী এবং ধীরে ধীরে চলমান হিমবাহের জল সামগ্রিক ভাবে বারিমণ্ডল গঠন করে। উষ্ণ প্রস্রবণ বা ঝরণা এবং আগ্নেয়গিরি নির্গত কিছু পরিমাণ জলও বারিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত।

iii) **বায়ুমণ্ডলে** (In atmosphere) ঃ বায়ুমণ্ডলের অন্তর্গত জলীয়বাষ্প, মেঘ, তুষার এবং বৃষ্টিরূপে জল উপস্থিত থাকে।

5.4.4) **পৃথিবীতে জলের পরিমাণ** (Amount of Water in Earth) ঃ পৃথিবীতে মোট নির্ণীত জলের পরিমাণ প্রায় 359×10^{18} গ্যালোন। এই বিশাল জলরাশির 97.2 শতাংশই সামুদ্রিক জল। হিমবাহ এবং পর্বত শৃঙ্গের তুষারে (ice cap) উপস্থিত জলের পরিমাণ 2.15 শতাংশ এবং অবশিষ্ট 0.65 শতাংশ জল নদী, হ্রদ, বায়ুমণ্ডল এবং অশ্মমণ্ডলে ভূ-গর্ভ জল (ground water) হিসেবে উপস্থিত থাকে। 0.65 শতাংশ জলের মধ্যে ভূ-গর্ভের জল বা গ্রাউন্ড ওয়াটারের পরিমাণ 0.60 শতাংশ। ভূগর্ভ জলের খুব সামান্য অংশ মানুষের ব্যবহারের জন্য মৃত্তিকা থেকে নিষ্কর্ষণ করা হয়।

•• মোট জল
- সমুদ্রের জল 97%
- মিষ্টিজল 3%

•• মিষ্টিজল
- হিমবাহ ও তুষার আচ্ছাদন 75%
- ভূগর্ভস্থজল 25%
- হ্রদ 0.3%
- মৃত্তিকা 0.06%
- বায়ু 0.035%
- নদী 0.03%

5.4.5 জলের ব্যবহার (Use of Water) ঃ জল নিম্নলিখিত কাজে ব্যবহৃত হয়:

i) পানীয় হিসেবে জলের ব্যবহার অপরিহার্য।

ii) রান্নার কাজে, কাপড় এবং অন্যান্য বস্তু ধোয়ার কাজে জল ব্যবহৃত হয়।

iii) কৃষিতে সেচের কাজে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়।

iv) শিল্প কারখানায় বয়লার চালানোর জন্য এবং শীতলিকরণের কাজে (cooling) জল ব্যবহার করা হয়।

v) পরীক্ষাগারে বিশেষত দ্রাবক হিসেবে জলের ব্যবহার গুরুত্বপূর্ণ।

vi) ফটোগ্রাফী এবং ঔষধি প্রস্তুতিতে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়।

vii) অগ্নিনির্বাপণে জল ব্যবহৃত হয়।

viii) বিদ্যুৎ উৎপাদনে জলকে কাজে লাগানো হয়।

ix) মৎস চাষে জলের ব্যবহার অপরিহার্য।

x) অধুনা সমুদ্রের জলের খনিজ উপাদান কে পুননবীকরণযোগ্য খনিজ সম্পদের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়াস চলছে।

● **সমুদ্রের জল অব্যবহার্য কেন?** (Why sea water is useless?) : সামুদ্রিক জল এবং 50 শতাংশেরও বেশি ভূ-গর্ভের জল (বা গ্রাউন্ড ওয়াটার) লবণ আধিক্যের কারণে অব্যবহার্য। গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত জলে 'মোট দ্রবীভূত কঠিনপদার্থের পরিমাণ (Total Dissolved Solids, TDS) কখনোই 400 ppm-এর এবং কৃষিকাজে ব্যবহৃত জলে TDS কখনোই 1000 ppm এর বেশি হওয়া উচিত নয়। কিন্তু সমুদ্রের জলে TDS এর মান 35,000 ppm বা তার বেশি হওয়ায় সমুদ্রের জল অব্যবহার্য।

5.4.6. মানুষের ব্যবহার্য জল সরবরাহের উৎস (Sources of Water Supply For Human Use)

জলের উৎসকে দু-ভাগে ভাগ করা হয় ঃ

a) বহির্ভাগপৃষ্ঠের জল (Surface-Water) ঃ

i) নদী, হিমবাহ এবং হ্রদের জল, ii) ঝরণা বা প্রস্রবণের জল iii) কৃত্রিম জলপ্রণালী (aqueduct), খাল এবং নালীর জল, iv) বাঁধ এবং খাতে সঞ্চিত জল, v) অলবণাক্তকারী প্লান্ট' (desalination plant) এর মাধ্যমে লবণাক্ত জল থেকে রূপান্তরিত অবলবণাক্ত জল (desalined water) এবং vi) নর্দমার আবর্জনা মিশ্রিত জলের (sewage water) পুনঃবিশোধনের পর উৎপন্ন বিশুদ্ধ জল (জলের পুনরাবর্তন)।

b) ভূগর্ভের জল (Ground Water) ঃ

i) অগভীর কূপের মাধ্যমে পাললিক (alluvial) এবং বালু-শিলার (sanddunes) সঞ্চয়ভাণ্ডার থেকে নির্গত জল।

ii) অগভীর কূপের মাধ্যমে বেড্-রক (bed rock) থেকে নির্গত জল।

iii) গভীর কূপের মাধ্যমে আর্টেজিয়ান বেসিন (artesian basin) থেকে নির্গত জল।

এবং iv) অ্যাকুইফারকে কৃত্রিম উপায়ে পুনঃসঞ্চারিত করার পর অ্যাকুইফার থেকে নির্গত জল।

> ** **জলের সংক্রমণ বা দূষণ** (Contamination of Water) ঃ
>
> জলের সঙ্গে মৃত্তিকা এবং শিলার বিক্রিয়ার ফলে অসংখ্য দ্রবীভূত এবং কোলয়ডীয় পদার্থ বহির্ভাগপৃষ্ঠের এবং ভূগর্ভের জলে মিশে যায়। তাছাড়া মানুষসহ অন্যান্য জীবের জৈবিক কারণে উদ্ভুত জৈব-পদার্থ জলে মিশ্রিত হয়। শিল্প-কারখানা থেকে নির্গত জলের মাধ্যমেও অসংখ্য বিষাক্ত ধাতু যথা— Pb, Hg, As, Zn, Se, Cd এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ জলে মেশে। এই সমস্ত কারণে জল দূষিত হয়।

5.4.7. জল সরবরাহ সম্পর্কীয় পরিবেশ সমস্যা (Environmental Problems Related to Water Supply) ঃ

যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশি এবং জনসংখ্যা বিরল ঐ সব অঞ্চলে জল সরবরাহ করা হয় মূলত নদী, হ্রদ, অগভীর কূপ এবং আবর্জনাযুক্ত জলের পুনরাবর্তন প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন জল থেকে। কিন্তু নগর বা শহরে জল সরবরাহ করা হয়

প্রধানত রিজার্ভার থেকে (এমনকি শতাধিক কিলোমিটার দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত রিজার্ভার থেকে) বা জলধারক মৃত্তিকাস্তরে (aquifer) গভীর কূপ খনন করে। কিন্তু শহর বা নগরে এবং কলকারখানায় প্রচুর পরিমাণ জল সরবরাহের কারণে বর্তমানে প্রাকৃতিক পরিবেশের বিপদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। কারণ অ্যাকুইফার থেকে অত্যধিক পরিমাণ ভূ-গর্ভের জল তোলার ফলে অ্যাকুইফার—সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের জলের লেভেল (Water table) অনেক নীচে নেমে যাচ্ছে এবং ঐ অঞ্চল থেকে পুনরায় জল তোলার তাগিদে অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যয়ে আরো গভীরে কূপ বসানো হচ্ছে। এইভাবে কিছুদিন চলার পর অ্যাকুইফারে সঞ্চিত জল নিঃশেষিত হচ্ছে এবং কূপ অকেজো হয়ে যাচ্ছে। অ্যাকুইফার থেকে জলের স্থায়ী নির্গমনে ভূগর্ভে যে শূন্যতার (voiding) সৃষ্টি হচ্ছে, তা পূরণ করার জন্য স্থলভূমি নিচে নেমে যাচ্ছে (বা অধোগামী হচ্ছে) (Land Subsidence)। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 'নিউ ওরলিন' এবং অন্যান্য নগরে এই ধরনের প্রবণতা ইতঃপূর্বে দেখা দিয়েছে। কলকাতার **'ভবানীপুর—পার্কসার্কাস'** অঞ্চলে 1955 থেকে 1980 সালের মধ্যে অর্থাৎ বিগত 25 বছরে **'পিজোমেট্রিক তল'** (Piezometric Surface) 6-7 মিটার বসে গেছে (নীচে নেমে গেছে)।

5.4.8. ভারতে জলের বণ্টন (Distribution of Water in India) ঃ

ভারতে বহির্ভাগপৃষ্ঠের এবং ভূ-গর্ভের জলের পরিমাণ যথেষ্ট হলেও সর্বত্র জলের বণ্টন সমান নয়। যেমন, বহির্ভাগপৃষ্ঠের জলের সরবরাহ বৃষ্টিকালে 3-4 মাস প্রচুর হলেও শুষ্ক ঋতুতে জলের সরবরাহে যথেষ্ট ঘাটতি দেখা যায়, এমনকি পশ্চিমবঙ্গের আর্দ্র অঞ্চলেও। তাছাড়া মধ্য, দক্ষিণ এবং পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল খরা-প্রবণ, কারণ ঐ সব অঞ্চলে বহির্ভাগপৃষ্ঠের জলের সঞ্চয় অতি-নগণ্য। ভারতে বহির্ভাগপৃষ্ঠের জলের সমস্যার মূল কারণ কিন্তু মৌসমী জলবায়ুর অনিশ্চয়তা। এইরূপ অবস্থায় বছরের সব সময় জলের সরবরাহ ন্যূনতম মাত্রায় বজায় রাখার জন্য বৃষ্টির সময়ে ছোট / মাঝারী / বড় মাপের রিজার্ভার তৈরি করে বা বাঁধ দিয়ে জল সঞ্চয় করা হয় এবং সঞ্চয় ভাণ্ডার থেকে খাল / নালীর মাধ্যমে দূরবর্তী স্থানে জল সরবরাহ করা হয় (বিশেষ করে কৃষিকাজের জন্য)।

ভারতে ভূ-গর্ভ জলের পরিমাণ বেশি হলেও দক্ষিণ এবং মধ্যভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে এই জল ব্যবহার করা সম্ভব হয় না। কারণ, এই সব অঞ্চলে জল সঞ্চয়ী স্তরের উপরে রয়েছে শক্ত এবং অভেদ্য-পাহাড়। যদিও বিশেষ কিছু অঞ্চলে (জলবায়ুকৃত পাহাড় বা পাললিক বেসিনে) অগভীর-গর্ত-কূপের মাধ্যমে কিছু পরিমাণ ভূ-গর্ভের জল সংগৃহীত হয়। অগভীর এবং গভীর কূপের মাধ্যমে নিষ্কর্ষণযোগ্য ভারতের বৃহৎ ভূগর্ভ-জলের ভাণ্ডার রয়েছে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা অঞ্চলে। আবার কিছু কিছু

অঞ্চলে ভূগর্ভের জল লবণাক্ততার কারণে অব্যবহার্য্য (কলকাতা, হরিয়ানা এবং উত্তর প্রদেশের পশ্চিম অংশে যেখানে ভূ-গর্ভ জলের নিষ্কর্ষণ অপেক্ষাকৃত বেশি)।

5.4.9. হাইড্রোলজিক্যাল সাইকল্ (Hydrological cycle) ঃ

i) **'হাইড্রোলজিক্যাল চক্র' বলতে কি বোঝায়?**

বারিমণ্ডল (hydrosphere), **অশ্মমণ্ডল** (lithosphere), এবং **বায়ুমণ্ডল** (atmosphere)—এই তিনটি পরিবেশে পৃথিবীর 'জল' বিস্তৃত থাকে। পৃথিবীর এই তিনটি জলীয় পরিবেশের একটি থেকে অন্যটিতে জলের অবাধ যাতায়াত ঘটে। এই তিনটি পরিবেশের জলের পরিমাণের ভারসাম্য এবং পৃথিবীর মোট জলের পরিমাণ বজায় থাকে একটি নির্দিষ্ট চক্রাকার পদ্ধতি এবং হারে জলের আন্তঃপরিবেশীয় প্রচরণের উপর। জলের এই চক্রাকার আবর্তনকে **'হাইড্রোলজিক্যাল চক্র'** বলা হয়।

ii) **পদ্ধতি** (Mode of Cycling)

অশ্মমণ্ডল এবং বারিমণ্ডলের জল বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মেশে এবং মেঘের সৃষ্টি করে। মেঘের শীতলিকরণ এবং ঘনীভবনের ফলে জল বৃষ্টি এবং তুষারবৃষ্টি রূপে অশ্মমণ্ডল এবং বারিমণ্ডলে পুনরায় ফিরে আসে। এইভাবে জলের **'চক্রাকার প্রচরণ'** (cyclic migration) ঘটে।

a) পৃথিবীর স্থলভাগ সমূহের (continents) মৃত্তিকার উপরিতল থেকে জল **বাষ্পীভবনের** (evaporation) দ্বারা বায়ুমণ্ডলে প্রচরণ করে এবং মেঘ (clouds) সৃষ্টি করে। স্থলভাগে বসবাসকারী উদ্ভিদ থেকে ট্র্যান্সস্পিরেশান (transpiration) ও বাষ্পীভবনের মাধ্যমে এবং প্রাণীদেহ থেকে শ্বসন ও বাষ্পীভবনের মাধ্যমে জল বায়ুমণ্ডলে প্রচরিত হয়। তাছাড়া স্থলের ভূগর্ভস্থ জল (ground water) সম্পৃক্ত অঞ্চলের (zone of saturation) উপরিতল থেকে সমুদ্র, নদী, প্রস্রবণ, হ্রদ এবং পুকুরে প্রবাহিত বা নিঃসৃত হয় (run-off)। জীব স্থলভাগের কিছু পরিমাণ জলকে জৈবিক কারণে গ্রহণ করে।

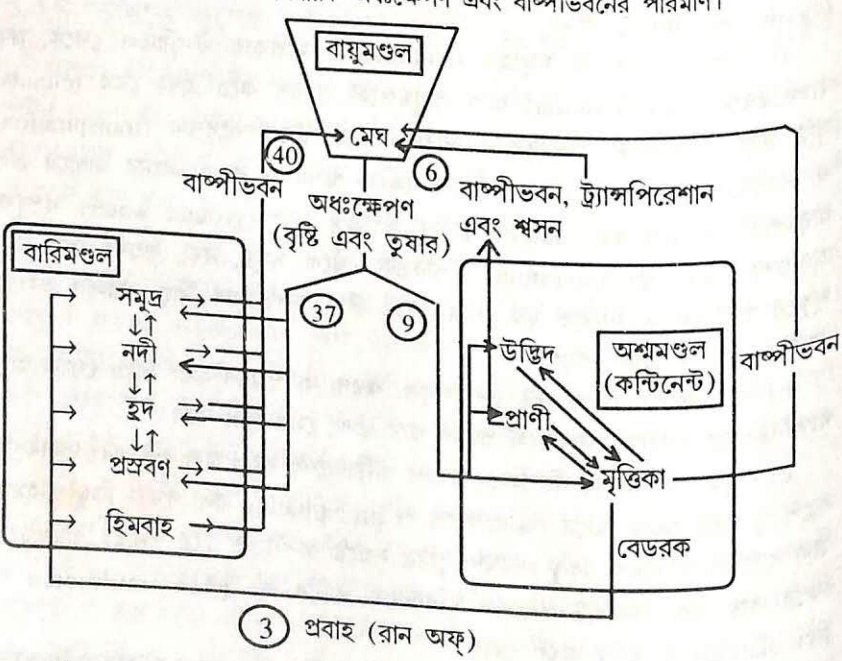
b) বারিমণ্ডলের অংশ নদী, হ্রদ, পুকুর, ঝরণা বা প্রস্রবণ এবং সমুদ্র থেকে জল বাষ্পীভবনের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে প্রচরণ করে এবং মেঘ সৃষ্টি করে।

c) বায়ুমণ্ডলে মেঘের শীতলিকরণ এবং ঘনীভবনের ফলে জল বৃষ্টি এবং তুষারবৃষ্টি রূপে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে (অধঃক্ষেপণ বা precipitation বলা হয়)। কিছু পরিমাণ জল বারিমণ্ডলে মেশে, কিছু পরিমাণ বৃষ্টির সময়ে বাষ্পীভূত হয়ে পুনরায় বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায় এবং অবশিষ্ট পরিমাণ মৃত্তিকাতে পড়ার পর চুইয়ে (infiltration বা percolation) ভূ-গর্ভস্থ জলে মেশে।

বারিমণ্ডল, অশ্মমণ্ডল এবং বায়ুমণ্ডলে জলের এই আন্তঃপ্রচরণকে 'হাইড্রোজিক্যাল সাইকল্' বলা হয় (চিত্র 5.17 এবং সারণি 5.5)।

সমুদ্র/মহাদেশ		বাষ্পীভবন (সেমি/বছর)	অধঃক্ষেপণ (সেমি/বছর)
মহাসমুদ্র			
	আটলান্টিক	144	78
	ভারত	138	101
	প্রশান্ত	114	121
সুমেরুপ্রদেশ		12	24
	(গড়)	102	81
মহাদেশ			
	এশিয়া	39	60
	ইউরোপ	36	60
	আফ্রিকা	51	60
	উত্তর আমেরিকা	40	76
	দক্ষিণ আমেরিকা	86	135
	অস্ট্রেলিয়া এবং অ্যান্টার্কটিকা	41	50
	(গড়)	49	73

তালিকা 5.5 ঃ বাৎসরিক অধঃক্ষেপণ এবং বাষ্পীভবনের পরিমাণ।



চিত্র 5.17 ঃ হাইড্রোলজিক্যাল চক্র দেখানো হয়েছে। এই চক্রে বাষ্পীভবন এবং অধঃক্ষেপণের পরিমাণ (1 একক = 10^{13} m^3/ বছর) এককে দেখানো হয়েছে।

5.4.10. ব্যবহারোপযোগী মিষ্টিজলের সংকোচন ঃ

ব্যাবহারোপযোগী মিষ্টি জলের পরিমাণ মোট জলের মাত্র 0.60 শতাংশ। মানুষের অদূরদর্শী কাজের ফলে এই সামান্য মিষ্টি জলের পরিমাণ ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। একদিকে বাধাহীন এবং যথেচ্ছ ব্যবহারে মিষ্টি জলের প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হচ্ছে অপরদিকে দূষণের (মানবসৃষ্ট) ফলে জলের ব্যবহার আরোও সীমিত হয়ে পড়ছে। ফলে সামগ্রিকভাবে ব্যবহারোপযোগী জলের পরিমাণ ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

5.5. সারাংশ (Summary) ঃ

- পৃথিবীর পরিবেশের প্রধান তিনটি অজীব (abiotic) উপাদান হচ্ছে বায়ু, স্থল এবং জল।
- ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে চারটি বায়ুমণ্ডলীয় স্তর হচ্ছে যথাক্রমে—ট্রপোস্ফিয়্যার, স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যার, আয়নোস্ফিয়্যার এবং এক্সোস্ফিয়্যার। ট্রপোস্ফিয়্যারে বায়ুর ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি এবং সমস্ত বায়ুমণ্ডলীয় প্রাকৃতিক ঘটনা যেমন ঝড়, ঝঞ্ঝা, বজ্র-বিদ্যুৎ উৎপাদন এই স্তরেই সংঘটিত হয়। অন্যান্য বায়ুমণ্ডলীয় স্তর অপেক্ষাকৃত শান্ত। ট্রপোস্ফিয়্যারের উচ্চতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে (এই স্তরের সর্বোচ্চ উচ্চতায় তাপমাত্রা থাকে—50^0C)। আবার স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যারের তাপমাত্রা উচ্চতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে এবং আয়নোস্ফিয়্যারে উচ্চতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা কমতে থাকে।
- পৃথিবীতে আবদ্ধ সৌরশক্তির কেবল 45 শতাংশ পৃথিবীপৃষ্ঠে পৌঁছায় এবং অবশিষ্ট পরিমাণের কিছু অংশ মহাশূন্যে ফিরে যায় (40 শতাংশ) এবং কিছু অংশ বায়ুমণ্ডলে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয় (15 শতাংশ)।
- বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফেরিক 'ওজোন স্তর' পৃথিবীর প্রাকৃতিক সৌর পর্দা হিসেবে কাজ করে, কারণ, সৌর বিকিরণের জীব-নশাক UV-C এবং UV-B অতি-বেগ্‌নী রশ্মিকে পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রবেশ করতে দেয় না। ফলে জীবরাজ্য অতি-বেগ্‌নী রশ্মির মারণক্রিয়া থেকে রক্ষা পায়। অধুনা ওজোন স্তরের হ্রাস পরিবেশগত বিপন্নতার পূর্বাভাস।
- পৃথিবীর স্থলভাগ বাইরে থেকে ভিতরে ক্রাস্ট, ম্যান্টেল এবং কেন্দ্রীয় অংশ দ্বারা গঠিত। ক্রাস্টের উপরিস্তর মৃত্তিকা গঠন করে। শিলার জলবায়ুকৃত খনিজ পদার্থ এবং জৈব উপাদান যথা হিউমাসের সংমিশ্রণে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। বাইরে থেকে ভিতরে মৃত্তিকা যথাক্রমে—A, B এবং C হোরাইজন্ দ্বারা গঠিত। 'A' হোরাইজনের মৃত্তিকা **শীর্ষ-মৃত্তিকা** নামে পরিচিত। শীর্ষ মৃত্তিকা একটি অমূল্য সম্পদ, কারণ বাস্তুতন্ত্রের উৎপাদনশীলতা শীর্ষ-মৃত্তিকার উপর নির্ভরশীল। শীর্ষ-মৃত্তিকার ক্ষয় পরিবেশগত ভারসাম্যের অস্থিরতার একটি লক্ষণ।

- কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস, বিভিন্ন বিরল এবং মহামূল্য ধাতব ও অধাতব খনিজ উপাদানের প্রধান উৎস হচ্ছে স্থলভাগ। বাধাহীন ব্যবহার এবং অপচয়ে অধিকাংশ অপুনর্নবীকরণযোগ্য খনিজ সম্পদ নিঃশেষের পথে।
- পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশই জল। কিন্তু মোট জলের মাত্র 0.60 শতাংশ ব্যবহারোপযোগী। অবাধ ব্যবহার, অপচয় এবং দূষণজনিত কারণে ব্যবহারোপযোগী জলের এই ক্ষুদ্র সঞ্চয়ভাণ্ডার ক্রম-সংকুচিত।

• অনুশীলনী •

A. রচনাভিত্তিক বা দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. বায়ুমণ্ডল কাকে বলে? বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর এবং নিম্ন-বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরে বায়ুর তাপমাত্রা বর্ণনা কর।
2. বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তরের সৃষ্টি, অবস্থান এবং ওজোন স্তরের গুরুত্ব বর্ণনা কর।
3. 'মৃত্তিকা' বলতে কি বোঝায়? মৃত্তিকার উপাদান এবং গঠনবিন্যাস বর্ণনা কর।
4. মৃত্তিকা কয়প্রকার এবং কিকি? বিভিন্ন প্রকার মৃত্তিকার গঠন বর্ণনা কর।
5. 'টপসয়েল' বা শীর্ষ-মৃত্তিকা কি? মৃত্তিকার উৎপাদন পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
6. বাস্তুতন্ত্রের উপর মানুষের প্রভাব বর্ণনা কর।
7. মৃত্তিকার ক্ষয় বলতে কি বোঝায়? মৃত্তিকা ক্ষয়ের কারণ এবং সংরক্ষণ পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
8. 'জল' কি? মানুষের ব্যবহার্য জল সরবরাহের উৎস এবং জল সরবরাহ সম্পর্কিত পরিবেশ সমস্যা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
9. 'হাইড্রোলজিক্যাল সাইকল্' কাকে বলে? হাইড্রোলজিক্যাল সাইকল্ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. বায়ুকে বিশ্বের বিপন্ন সর্বজনীন সম্পদ বলা হয় কেন?
2. বায়ুমণ্ডলকে কয়টি স্তরে ভাগ করা হয়েছে এবং কি কি?
3. সৌর বিকিরণ কি কি তড়িৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ দ্বারা গঠিত?
4. অতি-বেগ্নী রশ্মি (UV-rays) কাকে বলে? সৌর বিকিরণে কয়প্রকার অতি-বেগ্নী রশ্মি পাওয়া যায়?
5. অতি-বেগ্নী রশ্মির উপকারী এবং অপকারী ভূমিকা উল্লেখ কর।
6. ওজোন কি? ওজোন স্তর বলতে কি বোঝায়?
7. ওজোন স্তরকে প্রাকৃতিক সৌরপর্দা বলা হয় কেন?
8. বায়ুমণ্ডলে ওজোনের ঘনত্ব কত? ওজোন স্তর কিভাবে সৃষ্টি হয়।
9. স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যারের নীচে ওজোন স্তর বিস্তৃত হয় না কেন?
10. ওজোন স্তরের গুরুত্ব আলোচনা কর।

11. 'মৃত্তিকা' কাকে বলে? টপ-সয়েল বা শীর্ষ-মৃত্তিকা কি?
12. হোরাইজন্ কি? আদর্শ মৃত্তিকা কয়টি হোরাইজন দ্বারা গঠিত এবং কি কি?
13. রেনড্‌জীনা মৃত্তিকার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর।
14. মৃত্তিকার ক্ষয় বলতে কি বোঝায়? ভারতে অরণ্য আচ্ছাদনের বর্তমান অবস্থা কি?
15. খনিজ সম্পদ কি অফুরন্ত?
16. অপুননবীকরণযোগ্য খনিজ সম্পদ কি?
17. ভারতে এবং বিশ্বে কয়লা, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের ভবিষ্যৎ কি?
18. জল কি? পৃথিবীতে জলের বণ্টন উল্লেখ কর।
19. জলের ব্যবহার বর্ণনা কর।
20. ব্যবহারোপযোগী মিষ্টি-জলের সংকোচনের কারণ কি?
21. 'হাইড্রোলজিক্যাল সাইকল্' কি?

6 প্রচলিত এবং অপ্রচলিত শক্তির উৎস

6.1. ভূমিকা (Introduction) :

শক্তিই হচ্ছে মানব সভ্যতার প্রধান চালক। দৈনন্দিন কাজে, কৃষিতে, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থায়, চিকিৎসা ও শিক্ষায়, শিল্পে এবং আমোদ-প্রমোদ ব্যবস্থায় শক্তির ব্যবহার অনস্বীকার্য। বহুল ব্যবহৃত শক্তির প্রচলিত (conventional) উৎস হচ্ছে 'জীবাশ্ম জ্বালানি (যথা : কয়লা, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস) এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থ। কিন্তু প্রচলিত শক্তি-উৎসের সঞ্চয় খুবই সীমিত এবং বাধাহীন ব্যবহারের ফলে সঞ্চয় ভাণ্ডার নিঃশেষের মুখে (অনবীভবনযোগ্য)। তাছাড়া প্রচলিত শক্তির উৎস থেকে শক্তি আহরণের পদ্ধতিতে পরিবেশের উপর ক্ষতিকারক প্রভাবও যথেষ্ট (জীবাশ্ম জ্বালানির দহনে উৎপন্ন SO_x, NO_x, CO, CO_2 প্রভৃতি গ্যাস বায়ুমণ্ডলের দূষণের জন্য দায়ী)। এই অবস্থায় গতিশীল বাস্তুতন্ত্রের পরিবেশ-ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণে প্রচলিত শক্তি-উৎসের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে। পরিবেশ সঙ্কটের এই সন্ধিক্ষণে অপ্রচলিত

(non-conventional) শক্তির উৎস (যথা সূর্যরশ্মি, বায়ুপ্রবাহ, জোয়ার-ভাটা, আবর্জনা, ভূতাপ ইত্যাদি) থেকে শক্তি আহরণের উদ্যোগ শুরু হয়েছে, এবং প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। কারণ অপ্রচলিত শক্তি-উৎসের যোগান অফুরন্ত (নবীভবনযোগ্য) এবং পরিবেশ দূষণের সমস্যা নেই বললেই চলে।

6.2. অনবীভবন এবং নবীভবন যোগ্য শক্তির উৎস (Non-renewable and Renewable Energy Sources) ঃ

যে সমস্ত শক্তি-উৎসের প্রাকৃতিক সঞ্চয় মানুষের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল এবং একবার শেষ হয়ে গেলে পুনরায় উৎপাদন করা যায় না, তাদের 'অনবীভবনযোগ্য' (non-renewable) শক্তি-উৎস বলা হয়। অনবীভবনযোগ্য শক্তি-উৎসের উৎপত্তি ঘটে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মৃত জীব-উপাংশ (বা জীবদেহের) বা মৌলের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে। উদাহরণ : জীবাশ্ম জ্বালানী (fossil fuel) যথা-কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং পেট্রোলিয়াম।

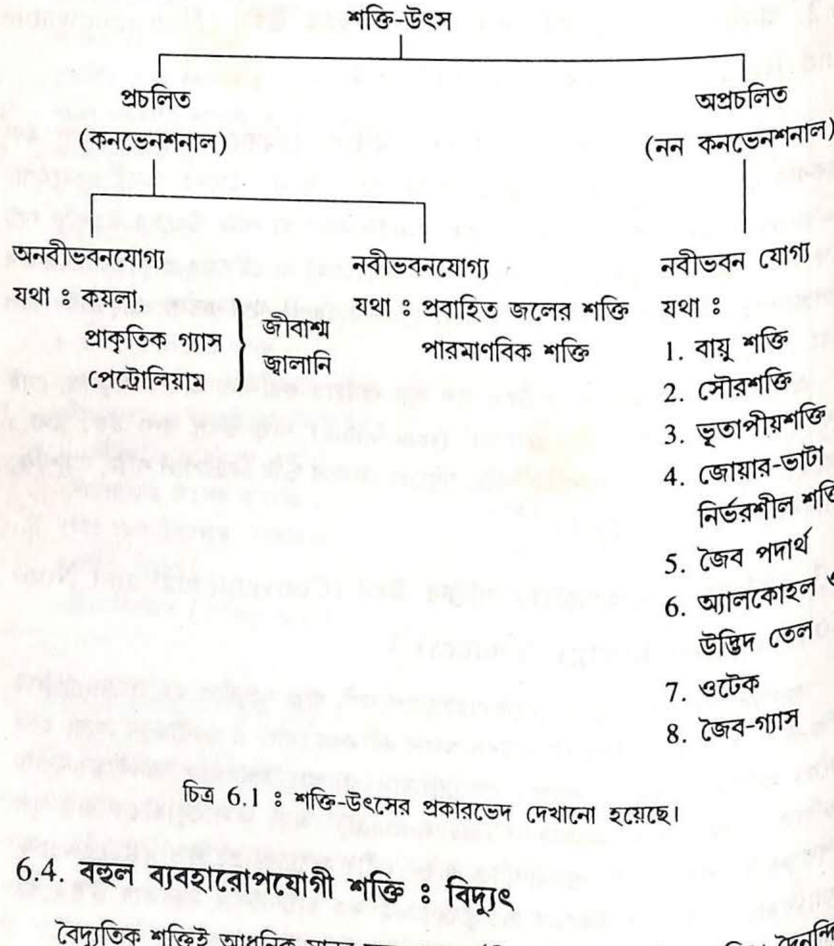
অপরপক্ষে যে সমস্ত শক্তি-উৎস বার বার ব্যবহার করা যায় অর্থাৎ অফুরন্ত, সেই সব শক্তির উৎস কে 'নবীভবনযোগ্য' (renewable) শক্তি-উৎস বলা হয়। যথা : প্রবাহিত জলের শক্তি, পারমাণবিক শক্তি, সমুদ্রের জোয়ার ভাটা নির্ভরশীল শক্তি, বায়ুশক্তি, সৌরশক্তি, জৈবগ্যাস প্রভৃতি।

6.3. প্রচলিত এবং অপ্রচলিত শক্তির উৎস (Conventional and Non-Conventional Energy Sources) ঃ

সচরাচর যে সব শক্তি-উৎস থেকে ব্যবহারোপযোগী শক্তি সংগৃহীত হয়, তাদের প্রচলিত শক্তি-উৎস বলা হয়। প্রচলিত শক্তি-উৎস আবার নবীভবন যোগ্য বা অনবীভবন যোগ্য হতে পারে। জীবাশ্ম জ্বালানী—কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস 'অনবীভবনযোগ্য প্রচলিত' (Non-renewable Conventional) এবং জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মূল উপকরণ জলপ্রবাহ এবং পারমাণবিক শক্তি 'নবীভবনযোগ্য প্রচলিত' (Renewable Conventional) শক্তি-উৎসের অন্তর্ভুক্ত। এই সব শক্তি-উৎস সভ্যতার উত্তরণের আদিপর্ব থেকেই ব্যবহারোপযোগী শক্তি উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

অনবীভবনযোগ্য-প্রচলিত শক্তি-উৎসের সীমিত সঞ্চয় এবং ব্যবহারোপযোগী শক্তি আহরণের সময় সৃষ্ট পরিবেশ দূষণজনিত সমস্যার কথা মাথায় রেখে অধুনা নবীভবনযোগ্য বিশেষ শক্তি-উৎস ব্যবহারোপযোগী শক্তি আহরণের কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে, যেগুলি পূর্বে কখনোও শক্তি আহরণের কাজে ব্যবহার করা হয় নি। এই সব নবীভবনযোগ্য শক্তি-উৎসকে **'নবীভবন যোগ্য অপ্রচলিত'** (Renewable Non-conventional)

শক্তি উৎস বলা হয়। যথা ঃ সৌরশক্তি, ভূ-তাপীয় শক্তি, ওটেক, বায়ুশক্তি, জোয়ার ভাটার শক্তি এবং জৈব-গ্যাস। এই-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, জ্বালানী কাঠ থেকে তাপশক্তি আহরণের পদ্ধতি বহু প্রাচীন হলেও উন্নত প্রক্রিয়ায় জ্বালানী কাঠ থেকে শক্তি সংগ্রহের পদ্ধতি অপ্রচলিত শক্তি উৎসের পর্যায়ে পড়ে।



চিত্র 6.1 ঃ শক্তি-উৎসের প্রকারভেদ দেখানো হয়েছে।

6.4. বহুল ব্যবহারোপযোগী শক্তি ঃ বিদ্যুৎ

বৈদ্যুতিক শক্তিই আধুনিক মানব সভ্যতার সর্বাধিক ব্যবহৃত কার্যক্ষম শক্তি। দৈনন্দিন জীবনে, শিল্প ব্যবস্থায়, যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থায়, কৃষিতে, শিক্ষায়, চিকিৎসা ব্যবস্থায় এবং আমোদ প্রমোদে অর্থাৎ জীবনের সর্বত্রই বিদ্যুৎ এর অবাধ প্রয়োগ। এই কারণেই মানুষ বৈদ্যুতিক শক্তি আহরণের ব্যাপারে অধিক আগ্রহী এবং যত্নশীল। প্রকৃতি থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ সংগ্রহ করা যায় না। তাই বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রচলিত এবং অপ্রচলিত শক্তির উৎস থেকে 'শক্তি রূপান্তরের' নীতি কাজে লাগিয়ে

বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা হয়। প্রচলিত শক্তির উৎস যথা কয়লা, পেট্রোলিয়াম তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং জলপ্রবাহ কে পূর্বে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়েছে এবং বর্তমানে বহুলভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু প্রচলিত শক্তি-উৎসের অপ্রতুলতা এবং দূষণ ক্রিয়ার জন্য অধুনা অপ্রচলিত শক্তির উৎসকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কাজে লাগানোর প্রয়াস শুরু হয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই সুযোগের প্রসার ঘটানো সম্ভব হবে।

6.5. অনবীভবনযোগ্য প্রচলিত শক্তির উৎস (Non-renewable Conventional Energy Sources) ঃ

কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অনবীভবনযোগ্য প্রচলিত শক্তির উৎস এবং ঐ শক্তি-উৎস থেকে উৎপন্ন সর্বাধিক উপযোগী শক্তির উৎপাদন সম্পর্কে অতি-সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

6.5.1. কয়লা (Coal) ঃ

a) কয়লা বলতে কি বোঝায়?

কার্বন সমৃদ্ধ কালোরঙের জৈবজড় পদার্থ যা মৃত্তিকার নীচে পাওয়া যায় (300 সেমি-1800 মি গভীরতার মধ্যে), অর্থাৎ পাললিক শিলাস্তরে জোড়া-স্তরের আকারে উপস্থিত থাকে, তাকে কয়লা বলা হয়। মৃত্তিকা খুঁড়ে (পুকুরের মত মৃত্তিকা কেটে বা সুড়ঙ্গ করে) ভূগর্ভ থেকে কয়লা সংগ্রহ করা হয়।

● কয়লা কিভাবে সৃষ্টি হয়?

মৃত জীবদেহ বা উপাংশ প্রাকৃতিক কারণে মৃত্তিকাস্তর দ্বারা ঢাকা পড়ার পর ডিকম্পোজড্ হয়ে হিউমাস উৎপন্ন করে (কালো / বাদামী বর্ণের কাদার মত থকথকে পদার্থ)। এই হিউমাস থেকে জলীয় অংশের বিয়োজনে পিট্ (peat) উৎপন্ন হয়। পিটই কয়লা উৎপাদনের প্রাথমিক ধাপ। পরবর্তী পর্যায়ে পাললিক শিলাস্তরের চাপ, বায়ুর অনুপস্থিতি, ভূ-স্তরের তাপ এবং জলের প্রভাবে পিট্ অঙ্গারীভূত হয়ে কয়লা উৎপন্ন করে। অঙ্গারীভবনের মাত্রা অনুসারে কয়লার বিভিন্ন শ্রেণী উৎপন্ন হয়। বিটুমেন জাতীয় কয়লা উৎপন্ন হয় অঙ্গারীভবনের প্রথম পর্যায়ে।

b) কয়লাকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয় কেন?

কয়লা যেহেতু মৃত জীবদেহ থেকে উৎপন্ন লক্ষ লক্ষ বছরের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার ফসল, তাই কয়লার মধ্যে শক্তি **'রাসায়নিক শক্তি'** রূপে সঞ্চিত থাকে। কয়লার দহনে সরাসরি প্রভূত পরিমাণ তাপশক্তি পাওয়া যায়, কারণ দহনের ফলে কয়লার রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। **কয়লার প্রভূত পরিমাণ তাপশক্তি উৎপাদন ক্ষমতার জন্যই কয়লাকে শক্তি উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়।** শিল্প পদ্ধতিতে বয়লারে জলবাষ্পীভূত

করার কাজে, রান্নার কাজে কয়লার উদ্ভূত তাপশক্তিকে সরাসরি কাজে লাগানো হয় এবং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লার দহনজনিত তাপশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। অধুনা কয়লার সর্বাধিক ব্যবহার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কাজে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বিটুমিনাস এবং অ্যানথ্রাসাইট কয়লার তাপশক্তি উৎপাদন করার ক্ষমতা লিগনাইট কয়লার তুলনায় অনেক বেশি। 1 মেট্রিকটন বিটুমিনাস বা অ্যানথ্রাসাইট কয়লা থেকে 70 লক্ষ 40 হাজার কিলোক্যালরি তাপশক্তি পাওয়া যায়, কিন্তু 1 মেট্রিক টন লিগনাইট কয়লা থেকে 30 লক্ষ 10 হাজার থেকে 47 লক্ষ কিলোক্যালরি তাপ পাওয়া যায়।

● **কয়লার শ্রেণীবিভাগ ঃ**

1. কার্বনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে কয়লাকে চার ভাগে ভাগ করা হয় ঃ

কয়লা—
- পিট (কার্বন <30%)
- লিগনাইট (কার্বন, 30-50%)
- বিটুমিনাস (কার্বন, 50-90%)
- অ্যানথ্রাসাইট (কার্বন, >90%)

2. ভারতের কোল গ্রেডিং বোর্ড (কোল ইন্ডিয়ার একটি সংস্থা) অনুসারে কয়লাকে চারটি গ্রেডে বিভক্ত করা হয় ঃ

কয়লা—
- সিলেক্টেড গ্রেড্
- ফার্স্ট গ্রেড্
- সেকেন্ড গ্রেড্
- থার্ড গ্রেড্

3. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যান্ডার্ডাইজেশান অ্যাসোসিয়েশান (A. S.T.M.S) অনুসারে কয়লাকে প্রধানত চারভাগে ভাগ করা হয় ঃ

কয়লা
- অ্যানথ্রাসাইট
  - মেটা অ্যানথ্রাসাইট
  - নর্মাল অ্যানথ্রাসাইট
  - সেমি অ্যানথ্রাসাইট
- বিটুমিনাস*
  - অল্প উদ্বায়ী
  - মধ্যম উদ্বায়ী
  - উচ্চ উদ্বায়ী (A)
  - উচ্চ উদ্বায়ী (B)
  - উচ্চ উদ্বায়ী (C)
- সাব বিটুমিনাস
- লিগনাইট
  - বাদামী কয়লা
  - প্রকৃত লিগনাইট

* বিটুমিনাস কোক্ তৈরির পক্ষে আদর্শ কয়লা এবং অ্যানথ্রাসাইট ও লিগনাইট কোক তৈরিতে অনুপযুক্ত।

c) কয়লার যোগান কি অফুরন্ত?

কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি প্রচলিত উৎস। কিন্তু কয়লা আবার অনবীভবনযোগ্য উৎস অর্থাৎ একবার নিঃশেষিত হলে পুনরায় ব্যবহারের জন্য কয়লার উৎপাদন সম্ভব নয়। তাছাড়া পৃথিবীতে কয়লার সঞ্চয় খুবই সীমিত। এই অবস্থায় বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের জন্য কয়লার বাধাহীন ব্যবহার ঘটছে। তার ফলে পৃথিবীতে কয়লার সঞ্চয়

বাংকার (কয়লা সঞ্চয়কারী স্থান)
↓
পালভারাইজার (কয়লা চূর্ণকারী স্থান)
↓ পাখা | চূর্ণ কয়লা
ফার্নেস (কয়লার দহন স্থান)
↓ তাপ
বয়লার (বয়লারের জল বাষ্পে পরিণত হয়)
↓
উত্তপ্ত জলীয় বাষ্প
↓ (জল ← শীতল জলীয় বাষ্প ←)
টারবাইন ঘূর্ণন
↓
জেনারেটার ঘূর্ণন
↓ বিদ্যুৎ
টারমিনাল
↓
বিদ্যুতের সঞ্চয় ও ব্যবহার

চিত্র 6.2 ঃ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কীয় কার্য পদ্ধতির শব্দচিত্র দেখানো হয়েছে।

দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। মানুষের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগছে কয়লার যোগান আর কতদিন অব্যাহত থাকবে? জানা গেছে, পৃথিবীতে মজুত কয়লার মোট পরিমাণ 15,26,400 কোটি টন কিন্তু ব্যবহারযোগ্য কয়লার মোট পরিমাণ 7,60,000 কোটি টন (পল এভারিট, 1969)। ভারতের মজুত কয়লার পরিমাণও যথেষ্ট নয়— কোকিং কয়লা মাত্র 180 কোটি টন এবং নন কোকিং কয়লা মাত্র 11,500 কোটি টন। বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যতিরেকে

রান্নার কাজে, শিল্পে, এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদনে কয়লার ব্যাপক ব্যবহার এই হারে চলতে থাকলে পৃথিবী অচিরেই কয়লা শূন্য হবে।

d) তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কয়লার ব্যবহার ঃ

তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে (Thermal Power Station) কয়লার রাসায়নিক শক্তিকে প্রথমে তাপ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়, পরবর্তী পর্যায়ক্রমিক ধাপে তাপশক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি এবং যান্ত্রিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা হয়। কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি অতিসংক্ষেপে বর্ণনা করা হল (চিত্র 6.2)।

i) বাংকারে সঞ্চিত কয়লা পালভারাইজারে চূর্ণ হওয়ার পর পাখার সাহায্যে চূর্ণ কয়লাকে ফার্ণেসে পাঠানো হয়। ফার্ণেসে কয়লার দহনে সৃষ্ট তাপে (1500-2000^0C) বয়লারের জল বাষ্পীভূত হয়। এরপর উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পকে স্ট্যাক-এর মাধ্যমে টারবাইন কক্ষে পাঠানো হয়।

ii) উত্তপ্ত জলীয় বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন ঘুরতে শুরু করে (তাপশক্তির যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর) এবং টারবাইন ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে টারবাইনের সঙ্গে যুক্ত জেনারেটারও ঘুরতে শুরু করে।

iii) জেনারেটার ঘূর্ণনের ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় (যান্ত্রিক শক্তি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়) এবং উৎপন্ন বিদ্যুৎ কে টারমিনালের মাধ্যমে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়।

6.5.2. পেট্রোলিয়াম (Petroleum) ঃ

a) পেট্রোলিয়াম কি?

পেট্রোলিয়াম শব্দটি দুটি গ্রীক্ শব্দ 'পেট্রা' (পাথর) এবং 'অলিয়াম' (তেল) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। পেট্রোলিয়াম কথার অর্থ পাথরে সঞ্চিত তেল। ভূ-গর্ভ থেকে সংগৃহীত অপরিশোধিত পেট্রোলিয়ামকে **'ক্রুড অয়েল'** (Crude Oil) বলা হয় (আঃ গুঃ 0.76-0.98, জলের চেয়ে হাল্কা)। পেট্রোলিয়াম প্রকৃতপক্ষে হাইড্রোকার্বন যৌগ (কিন্তু অশুদ্ধি হিসেবে নিকেল, সীসা, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং সালফার মিশ্রিত থাকতে পারে) এবং বাদামী, কালো, হলুদ, বা সবুজ বর্ণের হয়। ক্রুড অয়েলের আংশিক পাতনের বিভিন্ন পর্যায়ে পেট্রোল, ডিজেল এবং কেরোসিন পাওয়া যায় এবং অবশেষ বা তলানি হিসেবে প্যারাফিন ও ন্যাপথা জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়।

b) পেট্রোলিয়াম কোথায় পাওয়া যায়?

স্থলভাগের এবং সমুদ্রের তলদেশের ভূ-গর্ভে পাললিক শিলাস্তরের অ্যান্টিক্লাইন অঞ্চলে ('হাই' নামে পরিচিত, যথা—ভারতের মুম্বাই হাই) পেট্রোলিয়াম বা ক্রুড অয়েল পাওয়া যায়। উপরে এবং নীচে অভেদ্য শিলাস্তরের মধ্যভাগে ভেদ্য, রন্ধ্রবহুল পাললিক

মৃত্তিকা স্তরের রন্ধ্রে পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়। এই পেট্রোলিয়াম সুরক্ষিত স্থানকে 'অয়েল ট্র্যাপ' (oil trap) বলা হয়। অধিকাংশ অয়েল-ট্র্যাপ 2000 মিটার গভীরতায় অবস্থান করলেও কিছু কিছু স্থানের অয়েল ট্র্যাপ 6000 মি. বা তার বেশি গভীরতায় অবস্থান করে। প্রথমে অয়েল-ট্র্যাপ পর্যন্ত ড্রিলিং করে ঐ স্থানে অপেক্ষাকৃত সরু ভালব্ যুক্ত নল বা 'ক্রিসমাস ট্রি' বসিয়ে পেট্রোলিয়াম সংগ্রহ করা হয়।

● টারস্যাণ্ড বা অয়েল সেল ঃ পেট্রোলিয়ামের উৎস

টারস্যাণ্ড হচ্ছে পেট্রোলিয়াম সমৃদ্ধ একপ্রকার বালি। ভেনেজুয়েলা এবং কানাডার অ্যালবার্টায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই জাতীয় বালি পাওয়া যায়। অধুনা কানাডায় টারস্যাণ্ড থেকে বছরে 1 কোটি টন পেট্রোলিয়াম উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন দুটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

কোরাজেন (জৈবপদার্থ) যুক্ত একপ্রকার শিলাকে অয়েল সেল বলা হয়। উচ্চ তাপমাত্রায় (300-400^{0}C) কোরাজেন তেল এবং গ্যাসে বিয়োজিত হয়। উদ্ভূত তেল পেট্রোলিয়াম উদ্ভূত তেলের মত ব্যবহারোপযোগী। ইটালী, ফ্রান্স, স্কটল্যাণ্ড এবং সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ায় ইতঃপূর্বে অয়েল সেল থেকে নির্গত তেল বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। চীন এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেও প্রচুর পরিমাণ অয়েল সেল সঞ্চিত আছে। ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে,—পৃথিবীতে যে বিপুল পরিমাণ অয়েল সেল আছে—তার থেকে প্রাপ্ত ব্যবহারোপযোগী তেলের পরিমাণ ভূগর্ভে সঞ্চিত তেলের চেয়ে বহুগুণ বেশি। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে অয়েল সেল থেকে তেল নিষ্কাশনের পদ্ধতিটি জটিল এবং ব্যয়বহুল। তবে ভবিষ্যতে তেলের সম্ভাবনাময় উৎস হিসেবে টার-স্যাণ্ড বা অয়েল সেল বিবেচিত হবে।

c) বিশ্বের মজুত পেট্রোলিয়ামের পরিমাণ ঃ

বিশ্বে মজুত পেট্রোলিয়ামের মোট পরিমাণ প্রায় 20,09000 কোটি ব্যারেল। মোট পরিমাণের সিংহভাগ সঞ্চিত আছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে (আরব, কুয়েত, ইরাক, ইরান এবং লিবিয়ায়)। মোট পরিমাণের বন্টন নীচে উল্লেখ করা হল ঃ

i) মধ্যপ্রাচ্যে 30,000 কোটি ব্যারেল,

ii) চীন ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে 50,000 কোটি ব্যারেল,

iii) আফ্রিকায় 25,000 কোটি ব্যারেল,

iv) দক্ষিণ আমেরিকায় 22,500 কোটি ব্যারেল,

v) আমেরিকায় 20,000 কোটি ব্যারেল,

vi) কানাডায় 9,500 কোটি ব্যারেল,

vii) ইউরোপে 2,000 কোটি ব্যারেল এবং

viii) দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলিতে অবশিষ্ট 20,000 কোটি ব্যারেল

d) পেট্রোলিয়ামকে শক্তি'র উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয় কেন?

এককথায় পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার ব্যাপক। রাসায়নিক বস্তু যথা পরিধান উপাদান—পলিয়েস্টার ; ক্যাশমিলান ; পিচ ; ন্যাপথলিন ; রাসায়নিক সার এবং অন্যান্য প্রসাধন সামগ্রী উৎপাদনের মূল উপকরণ ব্যতীত পেট্রোলিয়ামের প্রধান ব্যবহার জ্বালানী (fuel) বা শক্তি'র উৎস হিসেবে। পেট্রোলিয়াম থেকে প্রাপ্ত পেট্রোল, ডিজেল এবং কেরোসিন অনবীভবনযোগ্য-প্রচলিত শক্তির উৎস হিসেবে পরিচিত। পেট্রোলিয়াম জাত তেলের প্রধান ব্যবহার বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে এবং যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরে (পরিবহন ব্যবস্থায় যানের জ্বালানী হিসেবে)। পেট্রোলিয়াম জাত তেলের বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের মূলে রয়েছে প্রভূত পরিমাণ তাপশক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা (এক মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল থেকে প্রাপ্ত তাপশক্তির পরিমাণ প্রায় 91 লক্ষ কিলোক্যালরি এবং এক মেট্রিক টন পেট্রোল থেকে প্রাপ্ত তাপশক্তির পরিমাণ প্রায় 1 কোটি 5 লক্ষ 50 হাজার কিলোক্যালরি)।

ডিজেল জেনারেটারে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মূল নীতি কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অনুরূপ। ডিজেলের রাসায়নিক শক্তি প্রথমে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং শেষ পর্যায়ে যান্ত্রিক শক্তি তড়িৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

e) পেট্রোলিয়াম অনবীভবনযোগ্য শক্তির উৎস ঃ

আধুনিক মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে প্রচলিত শক্তির উৎস হিসেবে পেট্রোলিয়াম একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। পেট্রোলিয়াম ব্যতীত মানুষের প্রগতি কল্পনা করা যায় না। কিন্তু পেট্রোলিয়াম অনবীভবনযোগ্য (non-renewable) শক্তির উৎস এবং চাহিদার তুলনায় পেট্রোলিয়ামের সঞ্চয়ও অতি-নগণ্য। এই বিপুলায়তন বিশ্বে কালের অগ্রগতিতে পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার যতই বাড়বে সঞ্চয়ভাণ্ডার ততই নিঃশেষিত হবে। তাই এই মুহূর্ত থেকেই পেট্রোলিয়ামের যথেচ্ছ ব্যবহারের সীমায়ন এবং সঙ্গে সঙ্গে বিকল্প শক্তি উৎসের সন্ধান ও বিকাশ জরুরী।

6.5.3. প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural Gas) ঃ

a) 'প্রাকৃতিক গ্যাস' বলতে কি বোঝায়?

প্রাকৃতিক গ্যাস হচ্ছে পৃথিবীর ভূ-গর্ভ থেকে সংগৃহীত মিথেন সমৃদ্ধ গ্যাসীয় এবং অনবীভবনযোগ্য একটি প্রচলিত শক্তি উৎস। রাসায়নিক সংযুতি অনুসারে প্রাকৃতিক গ্যাসের মূল উপাদান মিথেন গ্যাস (60-95%), সামান্য পরিমাণ ইথেন গ্যাস (সর্বোচ্চ 25%) এবং অতি সামান্য পরিমাণ অন্যান্য হাইড্রোকার্বন। প্রাকৃতিক গ্যাস সাধারণত বর্ণহীন এবং বিষক্রিয়াবিহীন। ভূ-গর্ভের অধিকাংশ 'অয়েল-ট্র্যাপ' থেকে কিছু পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস সংগৃহীত হলেও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রধানত উত্তোলন করা হয় পৃথক গ্যাসসঞ্চিত কূপ থেকে।

● প্রাকৃতিক গ্যাস ছাড়া কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত জ্বালানী গ্যাস— 'প্রোডিউসার গ্যাস' (CH_4, CO, CO_2 এবং H_2) এবং ব্লাস্ট-ফার্নেস কোকওভেন থেকে প্রাপ্ত উপজাত—**'কোল গ্যাস'** (CH_4, H_2) শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

b) শক্তির উৎস হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার ঃ

প্রাকৃতিক গ্যাসের তাপ উৎপাদক শক্তি প্রভূত হওয়ায় জ্বালানী হিসেবে এবং বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের উৎস হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রেও রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তি বা বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। উল্লেখ্য, কঠিন বা তরল জ্বালানীর তুলনায় প্রাকৃতিক গ্যাসের তাপ উৎপাদন ক্ষমতা অনেক বেশি।

c) প্রাকৃতিক গ্যাস একটি অনবীভবনযোগ্য শক্তির উৎস ঃ

প্রাকৃতিক গ্যাস অনবীভবনযোগ্য অর্থাৎ একবার ব্যবহৃত হলে পুনরায় ব্যবহার করা যায় না। সমগ্র বিশ্বে এবং ভারতে প্রাকৃতিক গ্যাস সঞ্চয়ের আনুমানিক পরিমাণ যথাক্রমে 72 লক্ষ 360 হাজার কোটি ঘনমিটার এবং 8 হাজার 952 ঘনমিটার। বিশ্বের উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশগুলিতে প্রাকৃতিক গ্যাসের ক্রমবর্ধমান ব্যবহার প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডারকে ক্রমশই সংকুচিত করছে এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের সঞ্চয় ভাণ্ডারের ক্রমসংকোচন মানুষকে ভাবিয়ে তুলেছে।

6.6. নবীভবনযোগ্য প্রচলিত শক্তির উৎস (Renewable Conventional Energy Sources) ঃ

6.6.1. প্রবাহিত জলের শক্তি (Flowing Water Energy) ঃ

a) জলপ্রবাহ ঃ নবীভবনযোগ্য প্রচলিত শক্তির উৎস

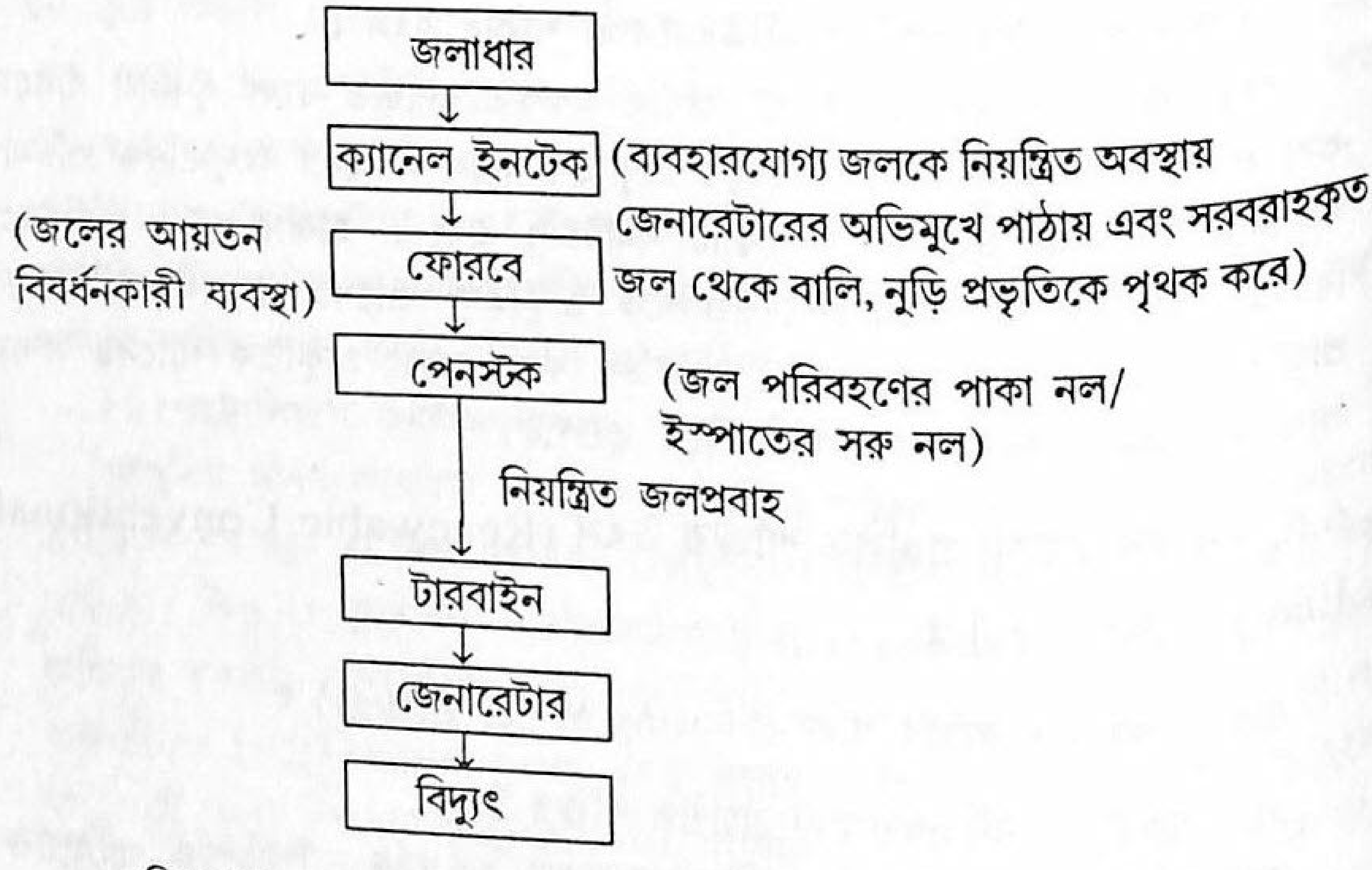
বারনৌলির সমীকরণ অনুযায়ী প্রবাহিত জলের সামগ্রিক শক্তি—'স্থিতিশক্তি', গতিশক্তি এবং জলের মধ্যে স্থিতিশীল চাপের জন্য সৃষ্ট গতিশক্তির যোগফলের সমান অর্থাৎ

প্রবাহিত জলের
সামগ্রিক শক্তি = স্থিতিশক্তি + গতিশক্তি + স্থিতিশীল চাপের জন্য সৃষ্ট গতি-শক্তি।

প্রবাহিত জলের এই শক্তিকে সহজেই বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। তাই জলপ্রবাহ বিদ্যুতের একটি প্রচলিত শক্তি-উৎস এবং অবশ্যই নবীভবনযোগ্য, কারণ জলের সরবরাহ নিঃশেষ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ভারতে উৎপন্ন বিদ্যুতের 5-10% জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থেকে সংগৃহীত হয়। কিন্তু সারাবছর জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের হার সমান নয় কারণ, বছরের তিন/চার মাস (বৃষ্টির সময়ে) কেবল জলের সরবরাহ উপযুক্ত পরিমাণে বজায় থাকে।

b) জলপ্রবাহ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদ্ধতি ঃ

নদীর গতিপথে বাঁধ দিয়ে এবং বাঁধ সংলগ্ন জলাধার তৈরি করে প্রচুর পরিমাণ জলকে সঞ্চিত করা হয়। এরপর সঞ্চিত জলকে বিশেষ উপায়ে অনেক উঁচু থেকে দূরে এবং নীচে অবস্থিত টারবাইনের উপর ফেলা হয় (যে জায়গা থেকে জল নীচে পড়ে এবং যেখানে পড়ে এই দুই স্থানের দূরত্বকে হেড বলা হয়। হেড যত বেশি হবে তত বেশি জোরে জলে নীচে ধাবিত হবে)। প্রবাহিত জলের শক্তির দ্বারা প্রথমে টারবাইন ঘুরতে শুরু করে এবং সঙ্গে সঙ্গে টারবাইনের সঙ্গে যুক্ত জেনারেটারও ঘুরতে শুরু করে। জেনারেটারের ঘূর্ণনের ফলে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে জলের গতিশক্তি যান্ত্রিকশক্তিতে এবং যান্ত্রিকশক্তি পরবর্তী পর্যায়ে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত হয়।



চিত্র 6.3 ঃ জলপ্রবাহ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নকশাচিত্র দেখানো হয়েছে।

c) ভারতে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা ঃ

নদীবহুল দেশ ভারতবর্ষের জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল। উল্লেখ্য, ভারতবর্ষে বছরে 400 মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষম জলবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের সুযোগ আছে। জীবাশ্ম জ্বালানীর স্বল্প সঞ্চয় এবং দূষণের প্রভাব মাথায় রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদনে নবীভবনযোগ্য 'জলপ্রবাহ' শক্তি-উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। যদিও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বাঁধ দেওয়ার কারণে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিঘ্নিত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। যেমন জলাধার নির্মাণের জন্য বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কৃষিজমি নষ্ট হয় এবং বাঁধ দেওয়ার ফলে বিভিন্ন অক্ষত অরণ্য সম্পদের (উদ্ভিদ ও প্রাণী) চিরতরে বিলুপ্তির সম্ভাবনা থাকে (যথা সাইলেন্ট ভ্যালি প্রজেক্ট)।

6.6.2. পারমাণবিক শক্তি বা নিউক্লিয়ার শক্তি (Atomic Energy or Nuclear Energy) ঃ

a) পারমাণবিক বা নিউক্লিয়ার শক্তি বলতে কি বোঝায়?

পারমাণবিক শক্তি এবং নিউক্লিয়ার শক্তি একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। কোন মৌলের পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তিকেই **পারমাণবিক** বা **নিউক্লিয়ার শক্তি** বলা হয়। বিশেষ নিউক্লিয়ার প্রযুক্তির সাহায্যে তেজস্ক্রিয় মৌলের পরমাণুর নিউক্লিয়াসের পারমাণবিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়।

b) পারমাণবিক শক্তি আহরণের উপায় ঃ

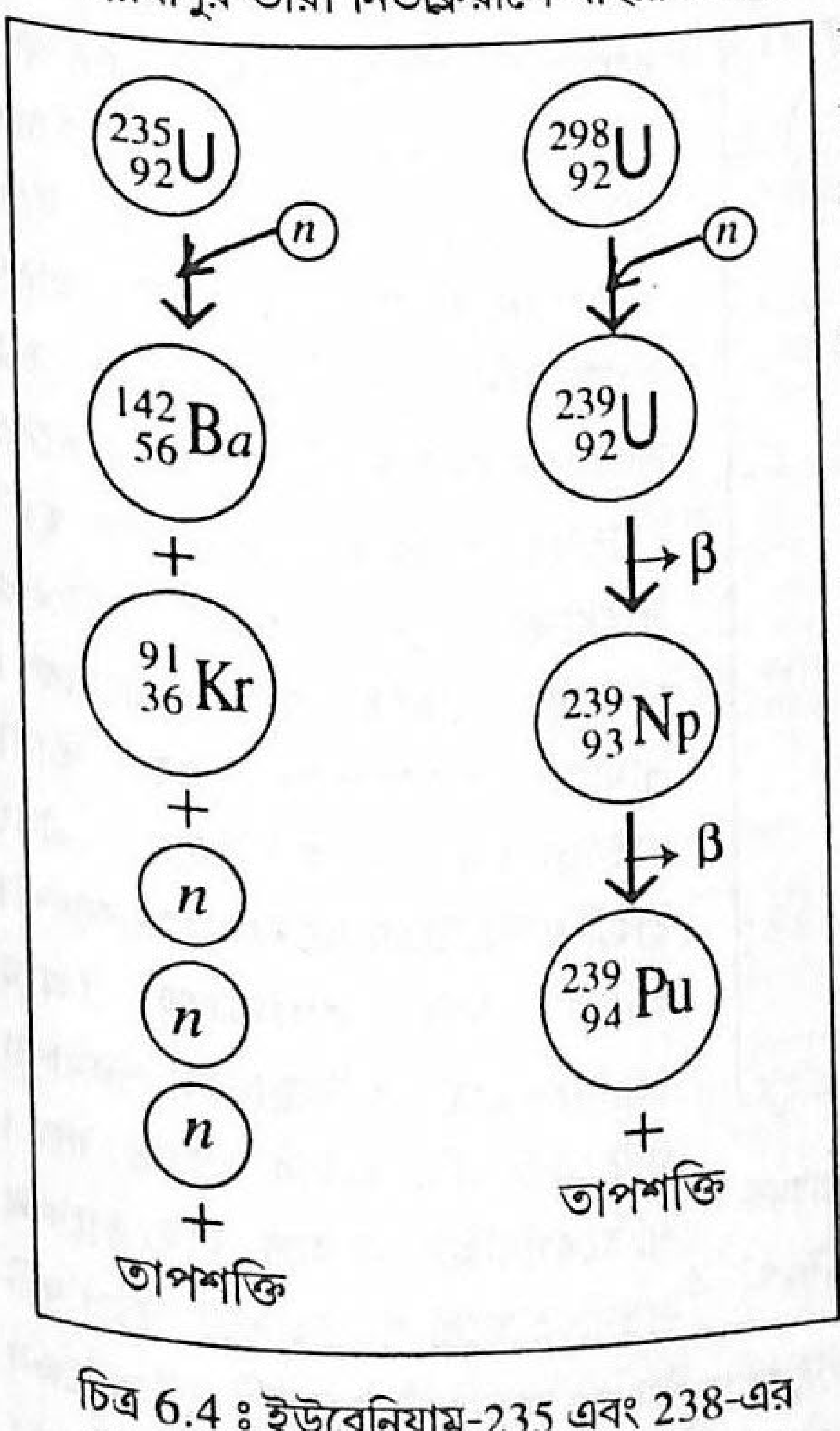
পারমাণবিক শক্তি দুটি পদ্ধতির মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়—

i) **নিউক্লিয়ার বিভাজন** (Nuclear fission) এবং

ii) **নিউক্লিয়ার সংযোজন** (Nuclear fusion) পদ্ধতি।

i) 'নিউক্লিয়ার বিভাজনের' মাধ্যমে পারমাণবিক শক্তি সংগ্রহ ঃ

পরমাণুর ভারী নিউক্লিয়াসে বহিরাগত ভিন্ন একটি নিউট্রন (neutron) কণাকে অনুপ্রবেশ করানো হলে পরমাণুর নিউক্লিয়াসের স্থায়িত্ব বিঘ্নিত হয়, কারণ এক্ষেত্রে প্রোটন এবং নিউট্রনের আকর্ষী বলের চেয়ে প্রোটনের বিকর্ষী বল বেশি হয়। অস্থির নিউক্লিয়াসটি দু-ভাগে বিভাজিত না হওয়া পর্যন্ত নিউক্লিয়াসের স্থায়িত্ব ফিরে আসে না অর্থাৎ অস্থির নিউক্লিয়াসের স্থায়িত্বের জন্য বিভাজন অতি আবশ্যক। নিউক্লিয়াস বিভাজনের সময় কিছু পরিমাণ শক্তি তাপশক্তিরূপে উদ্ভূত হয়। উদ্ভূত এই শক্তিকে **'পারমাণবিক শক্তি'** বলা হয়। দেখা গেছে যে বিভাজিত নিউক্লিয়াস দুটির ওজনের যোগফল মূল নিউক্লিয়াসের ওজনের চেয়ে সামান্য কম হয়, এই ঘাটতি ওজনটুকুই শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।



চিত্র 6.4 ঃ ইউরেনিয়াম-235 এবং 238-এর নিউক্লিয়ার বিভাজন-ক্রম দেখানো হয়েছে।

কিন্তু যে কোন মৌলের যে কোন অবস্থায় পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বিভাজন ঘটানো যায় না। নিউক্লিয়াস বিভাজনের জন্য ভারী ইউরেনিয়ামের সমস্থানিক যথা ঃ

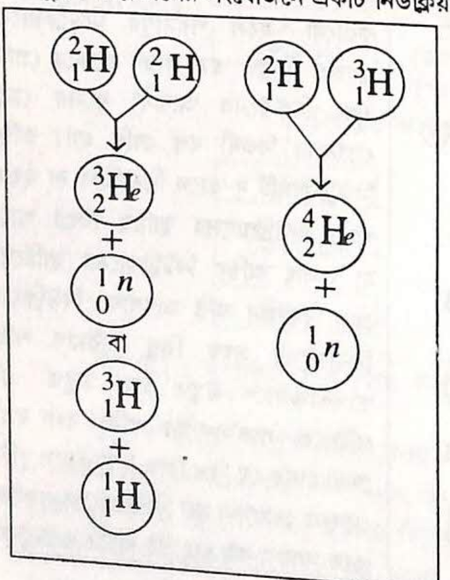
ইউরেনিয়াম-235, ইউরেনিয়াম-238, এবং থোরিয়াম-232 আদর্শ। একটি ইউরেনিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসের বিভাজনে 200 **মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট** (MEV) শক্তি পাওয়া যায়। উল্লেখ্য একগ্রাম ইউরেনিয়ামে প্রায় 25 x 10^{20} টি নিউক্লিয়াস থাকে।

● ভারতে স্থাপিত 'নিউক্লিয়ার বিভাজন' পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র ঃ

ভারতে প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (নিউক্লিয়ার বিভাজন) স্থাপিত হয় তারাপুরে (আমদানীকৃত ^{235}U জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়) এবং পরবর্তী পর্যায়ে স্থাপিত হয় 'কোটা' এবং 'কালপক্কমে' (প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হয়)। তারাপুরে দুটি 160MW, কোটায় দুটি 220MW এবং কালপক্কমে একটি 225MW ক্ষমতা সম্পন্ন ইউনিট রয়েছে। এছাড়া উত্তরপ্রদেশের নারোরাতে দুটি এবং গুজরাটের 'কাকরাপার' এ দুটি নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদন ইউনিট উৎপাদনের মুখে।

ii) **'নিউক্লিয়ার সংযোজনের' মাধ্যমে পারমাণবিক শক্তি সংগ্রহ ঃ**

দুটি নিউক্লিয়াসের সংযোজনে একটি নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হওয়ার পদ্ধতিকে **'নিউক্লিয়ার সংযোজন'** বা Nuclear fusion বলা হয়। সংযোজনের সময় নিউক্লিয়াস দুটির কিছু ভর অবলুপ্ত হয়ে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কারণ সংযোজনে সৃষ্ট নিউক্লিয়াসের ভর সংযোজনকারী নিউক্লিয়াস দ্বয়ের ভরের যোগফলের চেয়ে সামান্য কম হয়। সংযোজন মূলত হাল্কা মৌলের পরমাণুর ক্ষেত্রে অধিক প্রযোজ্য। সাধারণ হাইড্রোজেন এবং ভারী হাইড্রোজেন (ডয়টেরিয়াম এবং ট্রাইটিয়াম) সংযোজনের পক্ষে আদর্শ। অধিক উচ্চ তাপমাত্রায় (প্রায় 10,00000°C) হাইড্রোজেন পরমাণুর গতিবেগ ভীষণভাবে বেড়ে যায়। গতিবেগবৃদ্ধির কারণে হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে সংঘাত ঘটে, ফলে দুটি নিউক্লিয়াস সংযোজিত হয়ে একটি নতুন নিউক্লিয়াস উৎপন্ন করে। উল্লেখ্য দুটি হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াসের মিলনে একটি হিলিয়ামের নিউক্লিয়াস উৎপন্ন হয়। তাপের প্রভাবে পরমাণুর



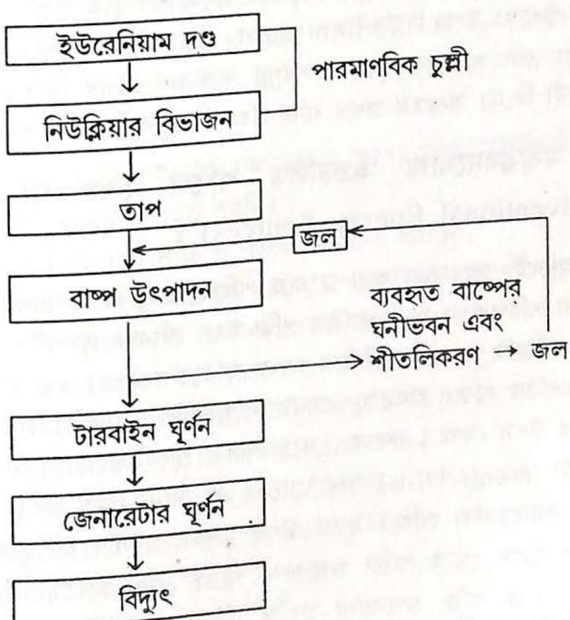
চিত্র 6.5 ঃ ডয়টেরিয়াম (^2_1H) এবং ট্রাইটিয়ামের (^3_1H) নিউক্লিয়ার সংযোজন-ক্রম দেখানো হয়েছে।

নিউক্লিয়াস দ্বয়ের সংযোজনকে **'তাপ-নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া'** (Thermonuclear Reaction) বলা হয়। সমুদ্রের জলে প্রাপ্ত ডয়টেরিয়াম এবং লিথিয়াম আকরিকে প্রাপ্ত টাইটিয়াম (^3H) থেকে সংযোজন পদ্ধতিতে পারমাণবিক শক্তি সংগ্রহের সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল।

c) পারমাণবিক শক্তি-উৎস এবং বিদ্যুৎ ঃ

পারমাণবিক শক্তিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়। নিউক্লিয়ার বিভাজন বা সংযোজন পদ্ধতিতে যে বিপুল তাপের উদ্ভব ঘটে, সেই তাপকে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে জলের বাষ্পীভবনের কাজে লাগানো হয়। উত্তপ্ত বাষ্প/স্টীম টারবাইনকে ঘোরায় এবং টারবাইন ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে সংযুক্ত জেনারেটারও ঘুরতে শুরু করে। জেনারেটার ঘোরার অর্থ বিদ্যুৎ উৎপাদন।

পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে পরমাণুর বিভাজন ঘটানো হয় **'পারমাণবিক চুল্লী' বা রি-অ্যাক্টরের** মধ্যে। পারমাণবিক চুল্লীর জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয় বিভাজনযোগ্য পরমাণু বিশিষ্ট মৌলের রড। এক্ষেত্রে ^{235}U (ইউরেনিয়ামের আইসোটোপ বা সমস্থানিক) রড ব্যবহৃত হয়। পারমাণবিক চুল্লীতে বিভাজনের সময় উদ্ভূত যেকোন ধরনের বিপদ এড়ানোর জন্য থাকে প্রতিরোধমূলক—**'নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা'** (Control System)। পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার শব্দচিত্র নিচে দেওয়া হল ঃ



চিত্র 6.6 ঃ পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে নিউক্লিয়ার বিভাজনে উৎপন্ন পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের শব্দ চিত্র দেখানে হয়েছে।

d) বিদ্যুৎ উৎপাদনে পারমাণবিক শক্তির উৎস ব্যবহারের সুবিধা এবং অসুবিধা ঃ

বিদ্যুৎ উৎপাদনে পারমাণবিক শক্তির উৎস ব্যবহারের অনেক সুবিধা আছে, যেমন— i) পারমাণবিক জ্বালানী নবীভবনযোগ্য অর্থাৎ বিশেষ পারমাণবিক চুল্লী (fast breeder reactor) ব্যবহার করে পারমাণবিক জ্বালানীকে বার বার ব্যবহার করা যায়। ii) প্রচলিত শক্তি-উৎস 'জীবাশ্ম জ্বালানী'র সঞ্চয় শেষ হয়ে গেলেও পারমাণবিক জ্বালানী নিঃশেষিত হওয়ার সম্ভাবনা কম। iii) স্বল্প জ্বালানী ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। সুবিধার সঙ্গে সঙ্গে কিছু অসুবিধাও আছে যেমন— (a) বিদ্যুৎ উৎপাদনে অতিরিক্ত সতর্কতার প্রয়োজন, তাছাড়া সমগ্র ব্যবস্থাটি অত্যন্ত জটিল এবং খরচসাপেক্ষ। (b) পারমাণবিক জ্বালানীকে ব্যবহারোপযোগী করে তোলা খুবই ব্যয়বহুল। (c) সমগ্র ব্যবস্থাটির উচ্চমানের সংরক্ষণ থাকা জরুরী। যেকোন ধরনের অসাবধানতা বা যান্ত্রিক ত্রুটি পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষিত করতে পারে। এতে মানুষের প্রাণনাশের বা স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনা থাকে।

e) পারমাণবিক শক্তিই আগামীদিনের সম্ভাব্য প্রচলিত শক্তির উৎস ঃ

যেভাবে দিনের পর দিন বিদ্যুতের চাহিদা বাড়ছে তাতে জীবাশ্ম জ্বালানী থেকে লাগামহীন ভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন হতে থাকলে আগামী দিনে বিশ্বে জীবাশ্ম জ্বালানীর সঞ্চয় অবশ্যই ফুরিয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে অদূর ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে পারমাণবিক শক্তি-উৎসের উপর নির্ভরশীলতা বাড়বে। পারমাণবিক শক্তির উৎস ব্যবহারে জটিলতা, সমস্যা এবং পরিবেশ দূষণের সমস্যা থাকলেও বিকল্প হিসেবে পারমাণবিক শক্তিই আগামী দিনের অন্যতম প্রধান শক্তি-উৎস হিসেবে বিবেচিত হবে।

6.7 নবীভবনযোগ্য অপ্রচলিত শক্তির উৎস (Renewable Non-Conventional Energy Sources) ঃ

আগেই আলোচনা করা হয়েছে শক্তিই আধুনিক মানবসভ্যতার চালক। শক্তির চাহিদা পরিপূরণের জন্য প্রচলিত শক্তি-উৎস **'জীবাশ্ম জ্বালানীর'** ক্রমবর্ধমান অপচয়ের ফলে জীবাশ্ম জ্বালানীর সীমিত সঞ্চয় ফুরিয়ে আসছে। এছাড়া শক্তির উৎস হিসেবে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার তেমনভাবে প্রসারলাভ করেনি। তাই আগামীদিনে প্রচলিত শক্তির উৎস (যথা ঃ কয়লা, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস) নিঃশেষিত হলে **'শক্তির সংকট'** (energy crisis) দেখা দেবে। এই সংকটজনক অবস্থা থেকে ভাবীপ্রজন্মকে রক্ষা করার জন্য শক্তির নূতন উৎস সন্ধান জরুরী। ইতিপূর্বেই বিভিন্ন অপ্রচলিত শক্তির উৎস থেকে শক্তি আহরণের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। নতুন অপ্রচলিত শক্তি-উৎস থেকে শক্তি আহরণের প্রযুক্তি উদ্ভাবনের প্রয়াস জোরদারভাবে শুরু হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অপ্রচলিত শক্তির উৎস অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

6.7.1 সৌরশক্তি (Solar Energy) ঃ

সূর্যই সকল শক্তির উৎস। জীবভরে নিহিত রাসায়নিক শক্তিও সৌরশক্তির রূপান্তরে সৃষ্টি। তাই কয়লা, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহারও পরোক্ষভাবে সৌরশক্তির ব্যবহার। বর্তমানে প্রচলিত শক্তি-উৎসের সংকটে নূতন বিকল্প শক্তি-উৎসের সন্ধানমূলক প্রয়াসের শুরুতেই বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েছে সূর্যরশ্মির মাধ্যমে পৃথিবীতে আগত বিপুল সৌরশক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করা যায় কিনা। সৌরবিকিরণের আলো এবং তাপকে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করা ছাড়াও এই উপাদানসমূহকে ব্যবহারোপযোগী অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তরের প্রয়াস এবং প্রয়োগ শুরু হয়েছে। বর্তমানে এই প্রয়াসগুলিকে বাণিজ্যিকভাবে সফল করার প্রয়াস চলছে।

সৌরশক্তি থেকে যে বিপুল পরিমাণ ব্যবহারোপযোগী শক্তি পাওয়া যাবে— তা দুএকটি উদাহরণ দিলে বোঝা যায়। পৃথিবীর প্রতিবর্গমিটার স্থানে যে পরিমাণ সৌরশক্তি পাওয়া যায় তার পরিমাণ প্রায় 1.36 কিলোওয়াট বিদ্যুতের সমান। তাই সমগ্র পৃথিবীতে আগত সৌরশক্তির সিংহভাগ ব্যবহারযোগ্য শক্তিতে রূপান্তরের প্রযুক্তি মানুষের হাতে থাকলে শক্তির এই সংকট নিয়ে চিন্তার কোন কারণ থাকবে না। আর একটি উদাহরণ দিলে সৌর বিকিরণ থেকে প্রাপ্ত সৌরশক্তির বিপুল সম্ভাবনা বোঝানো যাবে। সমগ্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের একবছরে যে শক্তির প্রয়োজন তা 32 মিনিটে যে পরিমাণ সৌর বিকিরণ ঐ দেশে পড়ে তার থেকে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব না হওয়ার কতকগুলি সম্ভাব্য কারণ আছে।

I) সৌর বিকিরণে প্রাপ্ত সৌরশক্তিকে (আলো ও তাপ) ব্যবহারোপযোগী করে তোলার উপযুক্ত প্রযুক্তি এখনও করায়ত্ত হয়নি।

II) পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত সৌরশক্তিকে কাজে লাগানো অসম্ভব।

III) সৌর বিকিরণের আলো ও তাপকে ব্যবহারোপযোগী অন্যান্য শক্তিতে (যথা বিদ্যুৎশক্তি) রূপান্তরের উপযুক্ত প্রযুক্তি এখনও অনাবিষ্কৃত।

IV) সৌরবিকিরণ অত্যন্ত অনিয়মিত। রাত্রে পাওয়া যায় না, শুধু দিনের বেলায় পাওয়া গেলেও মেঘলা আকাশে সৌরবিকিরণের তীব্রতা খুবই কম। এছাড়া কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে বছরের পুরো সময় সৌর বিকিরণের তীব্রতা সমান নয়।

সৌরশক্তি-উৎসের ব্যাপকতা অসীম হলেও সৌরশক্তির ব্যবহার এবং প্রয়োগের সীমাবদ্ধতাই সৌরশক্তি উৎসের প্রধান অন্তরায়। তাই সৌরশক্তি আহরণের উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবনই আগামী দিনের শক্তি সংকটের সম্ভাব্য সমাধান।

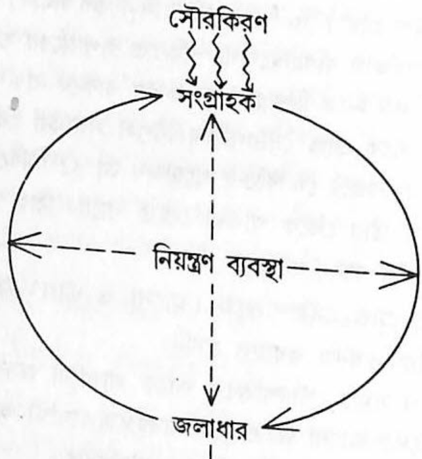
A. সৌরশক্তির প্রত্যক্ষ ব্যবহার ঃ

সৌরকিরণের তাপশক্তিকে বিভিন্নকাজে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার করা হয়। অতি সংক্ষেপে বিভিন্ন প্রয়োগ আলোচনা করা হল।

I. সৌর জল-উত্তাপক (Solar Water-heater) ঃ

শীতপ্রধান দেশে অপেক্ষাকৃত কম খরচে সৌর জল উত্তাপকের দ্বারা বাড়ি ঘর গরম রাখার কাজে জল গরম করার পদ্ধতি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। আমেরিকা, জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং ইসরায়েলে সৌরতাপীয় পদ্ধতির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। ভারতবর্ষেও সৌর জল-উত্তাপকের দ্বারা জল গরম করার প্রযুক্তি দ্রুত বিস্তার ঘটছে। বর্তমানে অসংখ্য হাসপাতাল এবং শিল্প কারখানায় প্রচুর পরিমাণ জল গরম করার কাজে 'সৌর-জল-উত্তাপক' ব্যবহার করা হচ্ছে।

কার্যপ্রণালী ঃ সৌর জল-উত্তাপকের প্রধান অংশ তাপশোষণকারী ধাতু দিয়ে তৈরি সমতল এবং চ্যাপ্টা **'কালেক্টর'** বা **'সংগ্রাহক'**। এই সংগ্রাহকের পশ্চাদ প্রান্ত তাপ-কুপরিবাহী পদার্থের আবরণে ঢাকা থাকে, ফলে সম্মুখের অংশ সৌর তাপ শোষণ করার পর তাপবিকিরণ করে (শোষক এবং বিকিরণ প্রান্ত)। উত্তাপকের অপর প্রধান অংশ



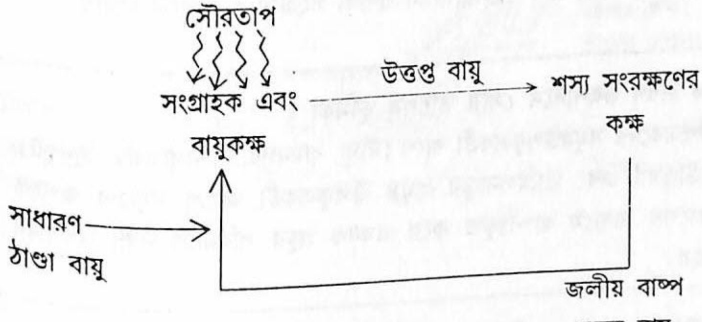
চিত্র 6.7 ঃ জল-উত্তাপকের সরল কার্যনীতি দেখানো হয়েছে।

তাপনিরোধক প্রাচীরে মোড়া জলাধার। জলাধারে তাপনিরোধ মোড়ক থাকায় জলাধারের সঞ্চিত জলে তাপ সংরক্ষিত থাকে। জলাধার থেকে জল একটি নল দিয়ে সংগ্রাহকে পরিবাহিত হয় এবং অপর নল দিয়ে জলাধারে ফিরে যায়। সংগ্রাহকের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত হওয়ার সময় উত্তপ্ত সংগ্রাহকের সংস্পর্শে জল গরম হয়। পরিবাহিত জলের পরিমাণ, গতি এবং সংগ্রাহকের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকে। এই ধরনের ব্যবস্থায় সংগ্রাহকের আয়তন 2-3 বর্গমিটার হলে প্রতিদিন 100 লিটার গরম জল (60^0C-80^0C) পাওয়া যেতে পারে।

II. সৌর নিরুদক বা সোলার ড্রায়ার (Solar Dryer) ঃ

বিভিন্ন কৃষিজাত দ্রব্য বা শস্য সংরক্ষণে সৌর নিরুদক ব্যবহার করা হয়। সৌর নিরুদকের দ্বারা উৎপন্ন উত্তপ্ত বায়ু কোন আবদ্ধ প্রকোষ্ঠে রাখা সংরক্ষিত শস্যের মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে শস্য শুষ্ক করা হয়। এক্ষেত্রে শস্যকে সরাসরি রৌদ্রের সংস্পর্শে আনার দরকার হয় না, ফলে বৃষ্টি, ধূলো এবং কীট-পতঙ্গের দ্বারা শস্যের ক্ষতি হয় না। শুষ্ককরণের সময় ধূলো এবং অন্য দূষকের সংক্রমণ থেকে খাদ্য-শস্যকে এই পদ্ধতিতে সহজেই সংরক্ষণযোগ্য করা যায়। অধুনা সৌর নিরুদককে উন্নত করার এবং বাণিজ্যিকভাবে সফল করার প্রয়াস চলছে।

কার্যপ্রণালী ঃ সৌর নিরুদকের প্রধান অংশ স্বচ্ছ আবরণী যুক্ত সংগ্রাহক এবং অভ্যন্তরের বায়ুকক্ষ। নিরুদকের নিম্ন অংশের নালীপথে ঠাণ্ডা বায়ু নিরুদকের কক্ষে প্রবেশ করে এবং সৌরতাপের ফলে উত্তপ্ত হয়ে উপরের নির্দিষ্ট নালীপথে সংযুক্ত শস্য সংরক্ষণের কক্ষে প্রবেশ করে। উত্তপ্ত বায়ু শস্যের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় শস্যের জলীয় অংশকে শোষণ করে নির্গমন পথ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এই জলীয় বাষ্প সমৃদ্ধ বায়ু এবং সাধারণ ঠাণ্ডা বায়ুকে নিরুদকের সাহায্যে পুনরায় শুষ্ক এবং উত্তপ্ত করে শস্যকক্ষে পাঠানো হয়। এই ক্রমান্বয়িক প্রক্রিয়ায় কক্ষে সঞ্চিত শস্য সংরক্ষণযোগ্য শুষ্কতা লাভ করে। উল্লেখ্য, কাঠ শুষ্ক করার কাজেও এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।



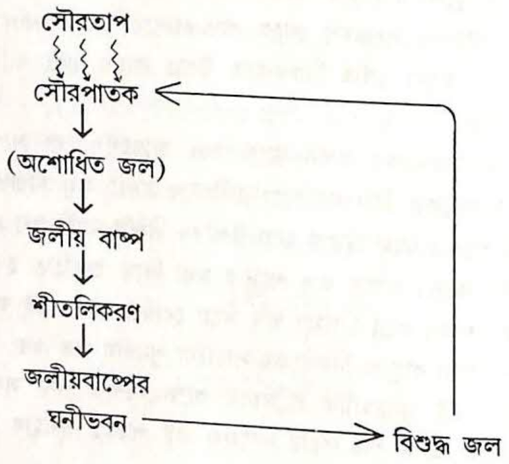
চিত্র 6.8 ঃ সৌর-নিরুদকের সহজ কার্যপ্রণালী দেখানো হয়েছে।

III. সৌর-পাতক (Solar Distillator) ঃ

অশোধিত জলকে সৌরতাপের দ্বারা ফুটিয়ে প্রথমে বাষ্পে পরিণত করা হয় এবং উৎপন্ন বাষ্পকে পরে শীতল ও ঘনীভূত করে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিকে 'সৌরপাতন' বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় জলের পাতনের কাজে প্রচলিত জ্বালানীর সাশ্রয় হয়।

কার্যপ্রণালী ঃ একটি তাপনিরোধক পাত্রে উপযুক্ত পরিমাণ অশোধিত জল নেওয়া

হয় এবং পাত্রের উপরের অংশ স্বচ্ছ-তাপভেদী আবরণে ঢেকে দেওয়া হয়। এর পর পাত্রটিকে রৌদ্রে রাখা হয় জল বাষ্পীভূত করার জন্য। জল সম্পূর্ণ বাষ্পীভূত হয়ে যাওয়ার পর সমগ্র ব্যবস্থাকে শীতলিকরণ করলে পাত্রের জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হয়ে পাত্রে জমা হয়। পাত্রে জমা হওয়া জল বিশুদ্ধ, কারণ এতে কোন অশুদ্ধি থাকে না।



চিত্র 6.9 : সৌরপাতন প্রণালী সহজভাবে দেখানো হয়েছে।

●● লবণ উৎপাদনে সৌর তাপের ভূমিকা ঃ

পশ্চিমবঙ্গের সমুদ্রউপকূলবর্তী অংশ (দীঘা, রামনগর, দাদনপাত্রবাড়, জুনপুট), অন্ধ্র, উড়িষ্যা এবং তামিলনাড়ুর সমুদ্র উপকূলবর্তী অংশে সমুদ্রের জলকে সৌরতাপের মাধ্যমে বাষ্পীভূত করে এখনও প্রচুর পরিমাণে লবণ উৎপাদন করা হয়।

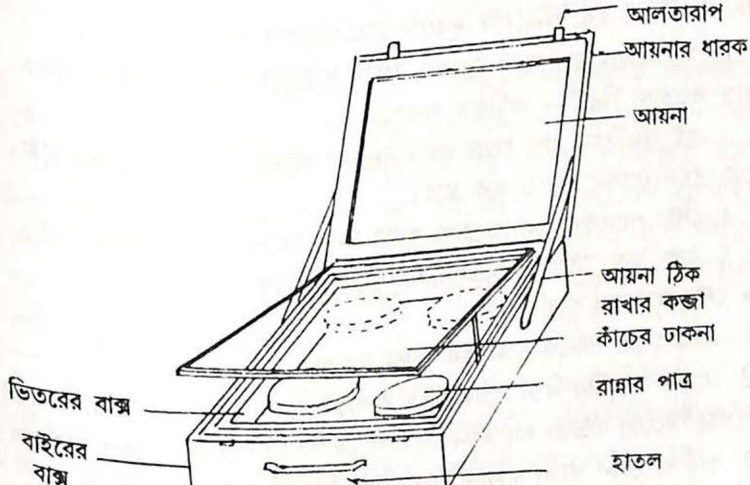
IV. সৌর-পাচক (বা পাচিকা) বা সোলার কুকার (Solar Cooker) ঃ

সৌর পাচক বা সোলার কুকার হচ্ছে সৌরকিরণ থেকে সংগৃহীত তাপশক্তির মাধ্যমে রান্না করার যান্ত্রিক ব্যবস্থা। এই পদ্ধতিতে রান্নার জন্য কোন প্রচলিত শক্তি-উৎসের (কয়লা, তেল, গ্যাস, বিদ্যুৎ প্রভৃতি) প্রয়োজন হয় না। প্রধানত দুধরনের সৌর-পাচক ব্যবহার করা হয়—(1) গরম বাক্স (hot box) সৌর পাচক এবং (2) কেন্দ্রাভিমুখী সৌর পাচক' (অবতল লেন্স ব্যবহার করে)। গরমবাক্স সৌরপাচকই অধিকতর জনপ্রিয়।

● গরমবাক্স সৌরপাচকের গঠন এবং কার্য-প্রণালী ঃ

i) দুটি সম্মুখ খোলা বাক্সের দ্বারা সৌর পাচকের ভিত্তি গঠিত হয়। বাইরের বাক্সটি

অপেক্ষাকৃত বড় (দৈর্ঘ্য- 60 সেমি, প্রস্থ- 60 সেমি এবং উচ্চতা 17 সেমি) এবং ফাইবার গ্লাস বা অ্যালুমিনিয়াম ও গ্যালভানাইজড্ লোহা দিয়ে তৈরি। বাইরের বাক্সের মধ্যে অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি অপেক্ষাকৃত একটি ছোট বাক্স (দৈর্ঘ্য- 50 সেমি, প্রস্থ- 50 সেমি এবং উচ্চতা- 10 সেমি) এমনভাবে বসান থাকে যাতে ভিতরের বাক্সের সঙ্গে বাইরের বাক্সের প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকে। সৌরকিরণ থেকে সংগৃহীত তাপ সংরক্ষণের জন্য ভিতরের বাক্সটিকে কালো রঙ করে দেওয়া হয়। বাক্সদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান তাপনিরোধক বস্তু (যথা-উল) রাখা হয় (200^0C পর্যন্ত তাপ সহনক্ষম) যাতে ভিতরের বাক্স থেকে তাপ বাইরের বাক্সে পরিচলিত হতে না পারে।



চিত্র 6.10 ঃ একটি গরমবাক্স 'সৌর-পাচকে'র গঠন দেখানো হয়েছে।

ii) ভিতরের বাক্সে 2-4 টি অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি ঢাকনা সহ রান্নার পাত্র রাখা হয় এবং পাত্রগুলির বাইরের দিক অবশ্যই কালো রঙ করা থাকে।

iii) বাইরের বাক্সের উপরের অংশে শক্ত কাঁচের ঢাকনা ব্যবহার করা হয় এবং ঢাকনার দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ বাইরের বাক্সের দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ অপেক্ষা একটু বড় হয়। প্রয়োজনমত ঢাকনা খোলা এবং বন্ধ করার জন্য ঢাকনাটিকে বাইরের বাক্সের সঙ্গে কব্জা দিয়ে সংযুক্ত রাখা হয়।

iv) অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণ সৌরকিরণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঢাকনার উপরে বাইরের বাক্সের সঙ্গে একটি আয়না স্থাপন করা হয় যাতে রৌদ্রকিরণ প্রতিফলিত হয়ে ঢাকনার মধ্য দিয়ে রান্নার পাত্রে আপতিত হয়।

v) খাদ্যদ্রব্য (যথা চাল, ডাল, মাছ, মাংস, সব্জি) যথাযথ জল বা মশলা সহযোগে পৃথক পৃথক রান্নার পাত্রে রেখে পাচককে প্রস্তুত করা হয়। এরপরে পাচককে বাড়ির সর্বাপেক্ষা রৌদ্রজ্জ্বল স্থানে বসানো হয় (পাচকের আয়না যেন অবশ্যই সূর্যের অভিমুখে থাকে)। সাধারণ আবহাওয়ায় রান্নার জন্য 4-5 ঘণ্টা সময় যথেষ্ট (চাল, ডাল রান্নার পূর্বে জলে ভিজিয়ে নিলে রান্নার জন্য কম সময় লাগে)।

- **সৌর পাচকের সুবিধা ঃ**

1. রান্নার জন্য প্রচলিত জ্বালানির দরকার হয় না। ফলে একদিকে যেমন জ্বালানির সাশ্রয় হয়, অন্যদিকে দূষণের মত মারাত্মক প্রভাবও থাকে না।
2. কম তাপমাত্রায় রান্না হওয়ার ফলে খাবারের পুষ্টি গুণ বজায় থাকে (তাপ সংবেদন ভিটামিন অবিকৃত থাকে)।
3. এই পদ্ধতিতে রান্না করার সময় মানুষের শ্রমের সাশ্রয় ঘটে। অন্য কাজ করার সময় যুগপৎ রান্নাও করা যায়।
4. সৌর পাচকের সাহায্যে রান্না করার সময় দুর্ঘটনা ঘটনার সম্ভাবনা নেই।
5. রান্না করা খাবার 4-5 ঘণ্টা পর্যন্ত গরম থাকে।

- **সৌর-পাচকের অসুবিধা ঃ**

1. রাত্রে সৌর পাচকে রান্না করা সম্ভব হয় না।
2. মেঘলা বা বৃষ্টির দিনে পাচক কাজ করতে পারে না। খুব সকালে বা বিকেলে যখন সৌর কিরণের তীব্রতা কম তখন সৌর-পাচক ভালোভাবে কাজ করতে পারে না।
3. রুটি বা কোন ভাজা জাতীয় খাদ্য সৌর পাচকে তৈরি করা যায় না।
4. সৌর পাচক আর্থিকভাবে এখনও ততটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেনি।

V. সৌর জলাশয় (বা পুকুর) (Solar Pond) ঃ

কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত সৌর জলাশয়ে জল এবং লবণের অসম্পৃক্ত দ্রবণ রাখা হয়। এই লবণের দ্রবণ সৌর কিরণ থেকে তাপ সংগ্রহ করে সংরক্ষণ করতে পারে। লবণ হিসেবে সোডিয়াম ক্লোরাইড বা অ্যামোনিয়াম সালফেট বা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বা ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের মিশ্রিত দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। সৌর-জলাশয়ে সংরক্ষিত তাপ (90^0C বা তার বেশি) জল গরম করার কাজে, বাড়ি গরম করার কাজে এবং বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ইটালী, ইসরায়েল এবং অস্ট্রেলিয়ায় সৌরতাপ সংরক্ষণের কাজে সৌর-জলাশয় (4-1000 বর্গমিটার) ব্যবহার করা হয়। ভারতের পণ্ডিচেরিতেও সৌরজলাশয় পরীক্ষামূলকভাবে সফল।

কার্যপ্রণালী : 1. সৌর জলাশয়ের তলদেশ কালো রঙ করা হয় যাতে তলদেশ থেকে তাপ বেরিয়ে না গিয়ে তাপ সংরক্ষিত থাকে। লবণের দ্রবণ সৌর জলাশয়ে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয় যাতে জলাশয়ের তলদেশে লবণের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি থাকে এবং উপরের দিকে লবণের ঘনত্ব ক্রমশ কম থাকে।

2) তাপশক্তি জলাশয়ের উপরের স্তর থেকে বায়ুতে যাতে পরিবাহিত হতে না পারে তার জন্য বায়ু এবং জলাশয়ের লবণ দ্রবণের আন্তরস্তরে একটি অপরিবাহী লবণ-দ্রবণের আস্তরণ রাখা হয়।

3) জলাশয়ের নীচ থেকে উপরে তাপের পরিচলনক্রিয়া স্বভাবতই ঘটে না। তার ফলে নীচের স্তরের দ্রবণে সবচেয়ে বেশি তাপ থাকে এবং উপরের দিকে তাপমাত্রা কম থাকে। নীচের স্তরে সংরক্ষিত তাপশক্তিকে বিভিন্ন কাজে লাগানো হয়।

- **ভারতে সৌর জলাশয়ের প্রয়োগ :**

পণ্ডিচেরী সরকারের **'বিদ্যুৎ-পর্ষৎ'** এবং **'পণ্ডিচেরী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের'** যৌথ প্রয়াসে দুটি সৌর জলাশয় সংস্থাপিত হয়েছে। একটি আয়তনে ছোট (500 বর্গমিটার) এবং অপরটি অপেক্ষাকৃত বড় (6000 বর্গমিটার)। ছোট জলাশয়টিতে অ্যামোনিয়াম সালফেট দ্রবণ এবং বড়টিতে সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ ব্যবহার করা হয়। বড় জলাশয়টি প্রধানত বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়। দেখা গেছে যে, এই সৌরতাপ সংরক্ষণ ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ 90 কিলোওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব।

B. **সৌরশক্তির পরোক্ষ ব্যবহার** (Indirect Use of Solar Energy) :

সৌর কিরণের আলোকশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ সৌরশক্তি বৈদ্যুতিক শক্তির একটি অপ্রচলিত শক্তি-উৎস।

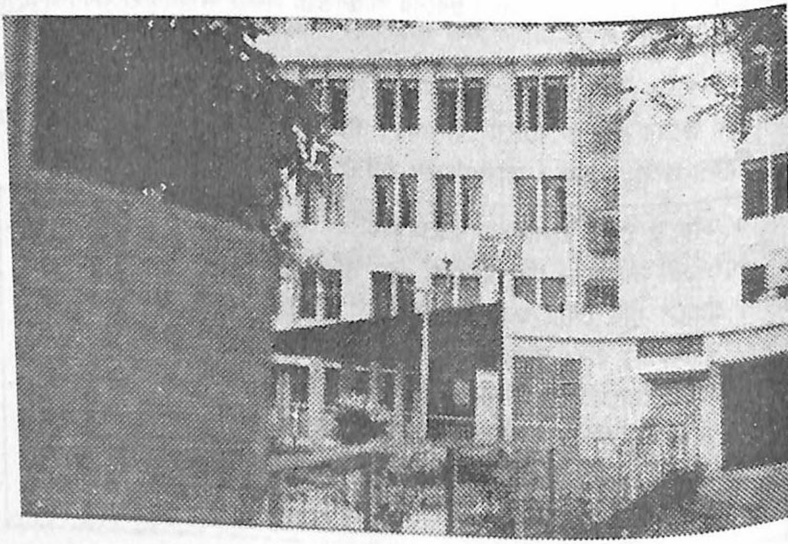
সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নীতি : সিলিকন, সেলেনিয়াম, ক্যাডমিয়াম-সালফাইড, গ্যালিয়াম আর্সেনাইড এবং অন্যান্য অর্ধপরিবাহীকে রৌদ্রে অনাবৃত করলে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে। উচ্চশক্তি সম্পন্ন ফোটন কণা যখন অর্ধপরিবাহীর কেলাসে আঘাত করে তখন পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে একটি ইলেকট্রন পৃথকিকৃত হয়। ফলে মুক্ত ইলেকট্রন স্থানে একটি গর্ত বা ফাঁকা স্থানের সৃষ্টি হয়। এই গর্তের স্থান পূরণ করার জন্য পার্শ্ববর্তী পরমাণুর ইলেকট্রন ছুটে আসে। এইভাবে ইলেকট্রনের গতি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়। আলোক কোষ একটি বিশেষ পদ্ধতিতে নির্মিত হয় যার ফলে অর্ধপরিবাহী কর্তৃক আলোক শোষণে ইলেকট্রনের প্রবাহ একদিকে ঘটে।

- **সৌরবিদ্যুৎ** (Solar Electricity) :

I) **সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎশক্তি আহরণ :** এস.পি.ভি. কোষের ভূমিকা

সৌরকিরণ থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সিলিকন (অর্ধপরিবাহী) কেলাস

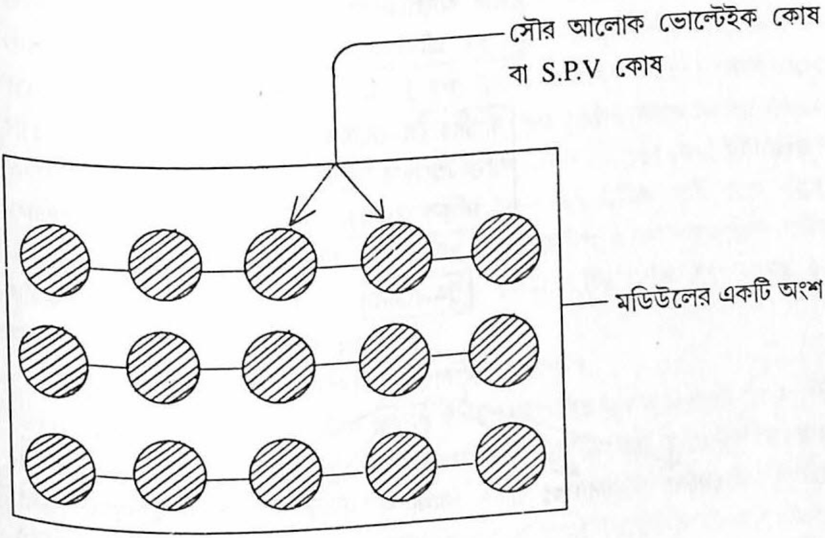
নির্মিত গোলাকার **'সৌর-আলোক ভোল্টেইক কোষ'** ((Solar Photo Voltaic cell বা S.P.V. cell) ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি সৌর-আলোক কোষের ব্যাস 10 সেমি এবং বিদ্যুৎ প্রবাহ উৎপাদনের ক্ষমতা 0.5 ভোল্ট চাপে '2' অ্যামপিয়ার। সৌর-আলোক



চিত্র 6.11 ঃ ময়ূখ ভবন প্রাঙ্গণে মডিউলের সাহায্যে সৌরবিদ্যুতের উৎপাদন এবং ব্যবহার দেখানো হয়েছে (স্থান-বিধাননগর, লেখকের তোলা ছবি)।

কোষকে বিচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করা হয় না, সৌর আলোক কোষের শ্রেণী-সংযোগে (series connection) তৈরী **'মডিউল'** (module) গঠন বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়। ভারতে 33 বা 36টি সৌর আলোক কোষকে 72 সেমি দৈর্ঘ্য, 60 সেমি প্রস্থ এবং 4.5 সেমি উচ্চতাবিশিষ্ট কাচের বাক্সে শ্রেণী সংযোগে বিন্যস্ত করে 'মডিউল' গঠন করা হয়। বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এরূপ একাধিক মডিউলকে পরস্পরের সমান্তরালে সংস্থাপন করে ব্যবহার করা হয়। মডিউল তন্ত্রকে বাড়ির ছাদে বা অপেক্ষাকৃত রৌদ্রজ্জ্বল স্থানে সূর্যের অভিমুখের ডানদিকে বসানো হয়। 36টি সৌর আলোক কোষসম্পন্ন একটি মডিউল 25^{0}C তাপমাত্রা, 1.5 বায়ুভর এবং প্রতি বর্গমিটারে 1 কিলোওয়াট সৌর বিকিরণের প্রভাবে 35 ওয়াট বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করতে পারে। বর্তমানে সিলিকন সৌর-আলোক কোষের কার্যকরী ক্ষমতা

12 থেকে 14 শতাংশ (সর্বাধিক 18 শতাংশ) হলেও উন্নত প্রযুক্তির দ্বারা কার্যকরী ক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রয়াস চলছে।



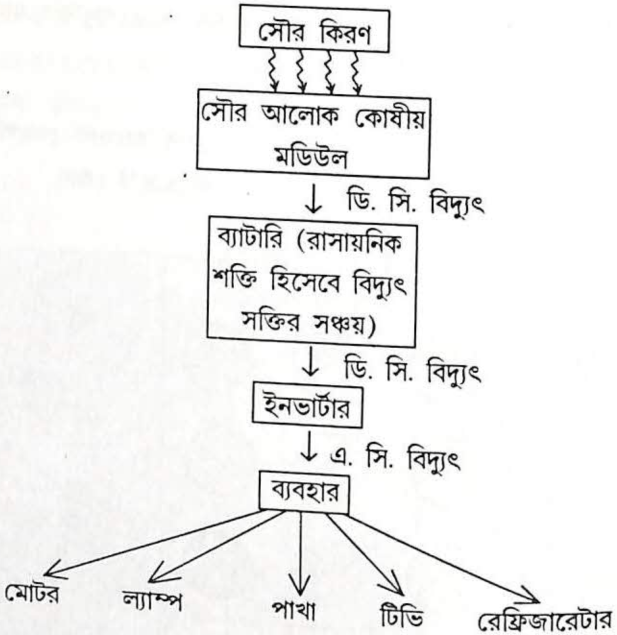
চিত্র 6.12 ঃ মডিউলের একটি অংশে সৌর আলোক ভোল্টেইক কোষের চিত্রানুপাতিক 'গঠন' এবং 'শ্রেণী সংযোগ বিন্যাস' দেখানো হয়েছে।

II) **সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার ঃ** সৌর আলোক কোষ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেবল দিনের বেলায় রৌদ্র কিরণের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়, তাই উৎপন্ন বিদ্যুতের সংরক্ষণ প্রয়োজন। এছাড়া কোষ থেকে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ ডি.সি প্রকৃতির, তই ডি.সি. বিদ্যুৎকে এ.সি. বিদ্যুতে রূপান্তরিত করার পর ব্যবহার করা হয়।

(a) 'সৌর আলোক কোষীয় 'মডিউল' থেকে প্রাপ্ত ডি. সি. বিদ্যুৎ প্রথমে পুনঅভিযোগ্য (rechargeable) ব্যাটারিতে (লেড অ্যাসিটেট গ্রুপের) সংরক্ষণ করা হয়। এক্ষেত্রে, বৈদ্যুতিক-শক্তি রাসায়নিক-শক্তি রূপে সংরক্ষিত থাকে।

(b) প্রয়োজনের সময় ব্যাটারি থেকেপ্রাপ্ত ডি.সি. বিদ্যুৎকে ইনভার্টার এর দ্বারা এ.সি. বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে তার সংযোগের মাধ্যমে ব্যবহার স্থলে পাঠানো হয়।

(c) এই উপায়ে প্রাপ্ত বিদ্যুৎ ল্যাম্প জ্বালিয়ে রাস্তাঘাট আলোকিত করার কাজে, টি.ভি, পাখা, রেফ্রিজারেটার এবং জল তোলার পাম্প চালানোর কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। **ভারতের লাদাখ** উপত্যকায় ফৌজি ছাউনিতে সৌর কোষ থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে।



চিত্র 6.13 ঃ সৌর কিরণ থেকে বিদ্যুৎ শক্তি আহরণ এবং প্রয়োগের নকশা চিত্র দেখানো হয়েছে।

● **পশ্চিমবঙ্গে সৌর-বিদ্যুতের ব্যবহার ঃ**

সমগ্র বিশ্ব তথা ভারতে বিকল্প শক্তির উৎস হিসেবে সৌরবিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহারিক প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও সৌরবিদ্যুতের ব্যবহার শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিভাগ' (Department of Science and Technology) এর প্রচেষ্টায় এবং অর্থানুকূল্যে মেদিনীপুর জেলার কুলাপাড়া গ্রামে (আদর্শ গ্রাম) সৌর বিদ্যুতের উৎপাদন এবং ব্যবহার সর্বাত্মকভাবে সফল হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিভাগের সৌজন্যে সুন্দরবনের বিস্তীর্ণ দ্বীপ অঞ্চলকে (যেখানে প্রচলিত প্রথায় উৎপাদিত বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি) সৌর-গ্রামের আওতায় আনা হয়েছে। এছাড়া হাসপাতাল এবং বিভিন্ন অফিসের ছাদে বসানো এস. পি. ভি মডিউল থেকে কিছু পরিমাণ সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাব, বিজ্ঞানসংস্থা এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বিকল্প শক্তি-উৎসের অনুসন্ধানমূলক প্রয়াসের প্রচারে এগিয়ে এসেছে।

6.7.2 ভূ-তাপীয় শক্তি (Geothermal Energy) ঃ

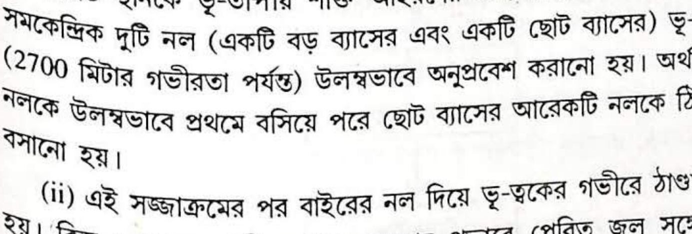
পৃথিবীর স্থলভাগের উপরিপৃষ্ঠ অপেক্ষা অভ্যন্তর ভাগ বেশি উত্তপ্ত হওয়ায় স্থলভাগের অভ্যন্তর থেকে বাইরে তাপের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ ঘটে। স্থলভাগের গভীরতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাপমাত্রা বৃদ্ধির সম্পর্ককে ভূ-তাপীয় নতিমাত্রা বলা হয়। এই ভূ-তাপীয় নতিমাত্রার মান 10^0C প্রতি কিমি (পুরনো প্রস্তরময় অঞ্চল যথা মধ্য এবং দক্ষিণ ভারত) থেকে 40^0C প্রতি কিমি এবং কখনো কখনো 100^0C প্রতি কিমি (সদ্য সক্রিয় আগ্নেয়গিরির ক্ষেত্রে) পর্যন্ত হতে পারে। পাহাড়ের অগভীর অঞ্চলে তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থের (যথা ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম এবং পটাশিয়াম) উপস্থিতির কারণেও 'ভূ-তাপীয় নতির' সৃষ্টি হতে পারে। এরূপ পাহাড়ের ফাটল বরাবর সংবাহিত উষ্ণ প্রস্রবণের মূল কারণ তেজস্ক্রিয় খনিজ ঘটিত উচ্চ ভূ-তাপীয় নতিমাত্রা। ভূ-তাপীয় শক্তি বর্তমানে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের এক অন্যতম অপ্রচলিত শক্তি-উৎস।

● **ভূ-তাপীয় শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের পদ্ধতি ঃ**

(i) ভূ-ত্বকের যে সব স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ বা আগ্নেয়গিরির মুখ বা তাপের প্রবাহ ঘটে ঐ সংশ্লিষ্ট স্থানকে ভূ-তাপীয় শক্তি আহরণের জন্য নির্ণীত করা হয়। নির্ণীত স্থানে সমকেন্দ্রিক দুটি নল (একটি বড় ব্যাসের এবং একটি ছোট ব্যাসের) ভূ-ত্বকের গভীরে (2700 মিটার গভীরতা পর্যন্ত) উলম্বভাবে অনুপ্রবেশ করানো হয়। অর্থাৎ বড় ব্যাসের নলকে উলম্বভাবে প্রথমে বসিয়ে পরে ছোট ব্যাসের আরেকটি নলকে ঠিক তার কেন্দ্রে বসানো হয়।

(ii) এই সজ্জাক্রমের পর বাইরের নল দিয়ে ভূ-ত্বকের গভীরে ঠাণ্ডা জল পাঠানো হয়। কিন্তু ভূ-ত্বকের গভীরে প্রচণ্ড তাপের প্রভাবে প্রেরিত জল সঙ্গে সঙ্গে বাষ্পে পরিণত হয় এবং উৎপন্ন বাষ্প ভিতরের কম ব্যাসের নল দিয়ে প্রচণ্ড চাপে ভূ-ত্বকের বাইরে বেরিয়ে আসে। ভূ-ত্বকের অভ্যন্তর থেকে উর্ধ্বমুখী উৎক্ষিপ্ত বাষ্পের পরিমাণ ঘণ্টায় 40,000-200,000 পাউণ্ড হতে পারে।

(iii) প্রচণ্ড চাপে নির্গত এই বাষ্পের সাহায্যে টারবাইন এবং জেনারেটার চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।



চিত্র 6.14 ঃ ভূ-তাপশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সরল শব্দচিত্র দেখানো হয়েছে।

● বর্তমানে বিশ্বের তিনটি দেশ যথেষ্ট পরিমাণ ভূ-তাপীয় শক্তি ব্যবহার করে। আইসল্যাণ্ড বিদ্যুৎ উৎপাদনে এবং ঘর গরম করার কাজে ব্যবহৃত শক্তির বেশির ভাগটাই সংগ্রহ করে ভূ-তাপীয় শক্তি-উৎস থেকে। নিউজিল্যাণ্ড এবং ইটালী মোট ব্যবহৃত শক্তির 11% এবং 3% সংগ্রহ করে ভূ-তাপীয় শক্তি থেকে। ভারতের লাদাখে পুগা উপত্যকায় বেশ কয়েকটি উষ্ণ-প্রস্রবণ থাকায় ভূ-তাপীয় শক্তিকে (কম পরিমাণে) ব্যবহার করা সম্ভব হয়। কোঙ্কন এবং মালাবারের পশ্চিম ঘাটে ভূ-তাপীয় শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা খুব উজ্জ্বল।

6.7.3 জোয়ার-ভাটা নির্ভরশীল শক্তি (Tidal Energy) ঃ

সমুদ্র বা নদীতে জোয়ার এবং ভাটার সময় নিম্ন উচ্চতার জলপ্রবাহের আঘাতে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টারবাইনকে ঘুরিয়ে তৎসংলগ্ন ঘূর্ণনশীল জেনারেটার থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব। যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রকল্প স্থাপনের খরচ উৎপাদন মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে জোয়ার-ভাটার বিপুল শক্তি-উৎসকে ব্যবহার করে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল।



চিত্র 6.15 ঃ জোয়ার-ভাটা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সরল শব্দ চিত্র দেখানো হয়েছে।

পদ্ধতি ঃ (i) সমুদ্র বা নদীর যে অংশে জোয়ার-ভাটা হয় ঐ অঞ্চলে উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন টারবাইন এবং জেনারেটারের কিছু অংশ জলনিরোধক বাল্বে ঢুকিয়ে ফেলে রাখা হয়। এক্ষেত্রে টারবাইন অপেক্ষাকৃত কম উচ্চতার জলপ্রবাহের সাহায্যে ঘূর্ণনক্ষম হয় এবং জলপ্রবাহের গতি-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে টারবাইনের ঘূর্ণনের অভিমুখও পরিবর্তিত হয়।

(ii) টারবাইনের সাহায্যে জেনারেটারকে ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

●● জোয়ার-ভাটার শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জল তোলার কাজ এবং কৃষিক্ষেতে জলসরবরাহের কাজ বহুদিনধরেই চলে আসছে। জোয়ার-ভাটাকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎপাদনে সর্বাধিক সাফল্য এসেছে ফ্রান্সে। ফ্রান্সে জোয়ার-ভাটা নির্ভরশীল বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি **'সেন্ট মার্লো বিদ্যুৎ প্রকল্প'** (9 মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন) এবং অপরটি **'র‍্যান্স বিদ্যুৎপ্রকল্প'** (240 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন)।

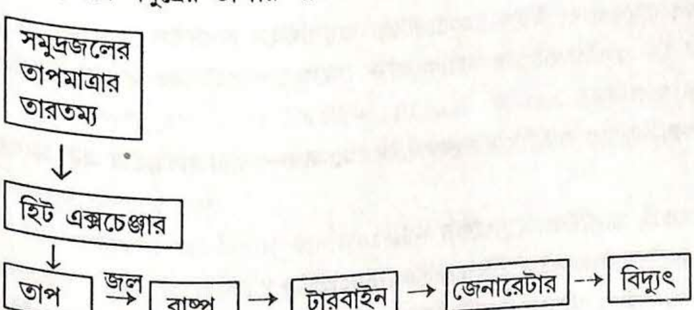
6.7.4. 'সমুদ্রের তাপীয় শক্তির পরিবর্তন প্রযুক্তি বা ওটেক (Ocean Thermal Energy Conversion Technology or OTEC) ঃ

সৌর কিরণের প্রভাবে সমুদ্রের উপরি এবং নিম্নভাগে জলের তাপমাত্রার পার্থক্য থেকে বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা সম্ভব। সামুদ্রিক জলের তাপীয় অসমতা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার প্রযুক্তিকে **'সমুদ্রের তাপীয় শক্তির পরিবর্তন প্রযুক্তি'** বা সংক্ষেপে ওটেক (OTEC) বলা হয়। সমুদ্রিক জলের তাপীয় তারতম্য ক্রান্তীয় অঞ্চলের সমুদ্রে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। 1930 খ্রীঃ বিজ্ঞানী 'ক্লাউড' (G. Cloud) কিউবার সমুদ্রতীরে এই প্রযুক্তি সর্বপ্রথম রূপায়িত করেন।

পদ্ধতি ঃ i) সৌরকিরণের প্রত্যক্ষপ্রভাবে সমুদ্রের উপরের স্তরের জল অতি উত্তপ্ত হয় (21°C-28°C), পক্ষান্তরে জলতাপের কুপরিবাহী হওয়ায় ভিতরের স্তরের জলের তাপমাত্রা খুব কম থাকে (1-3°C)।

ii) তাপের এই অসমতাকে 'হিট এক্সচেঞ্জারের' মাধ্যমে জল বাষ্পীভবনের কাজে লাগানো হয়। উত্তপ্ত বাস্পের প্রবাহ থেকে টারবাইন এবং জেনারেটার চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়।

ওটেক পদ্ধতির সম্ভাবনা থাকলেও প্রতিবন্ধকতা প্রচুর। যাইহোক অপ্রচলিত শক্তির উৎস হিসেবে সমুদ্রের তাপীয় শক্তির সম্ভাবনা বেশ উজ্জ্বল।



চিত্র 6.16 ঃ ওটেক পদ্ধতির সরল শব্দচিত্র দেখানো হয়েছে।

6.7.5. বায়ুশক্তি (Wind Energy) ঃ

প্রবহমান বায়ুর প্রভূত শক্তি সম্পর্কে প্রাচীনকালে মানুষের সম্যক ধারণা ছিল। প্রচলিত শক্তি-উৎস যথা কয়লা, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং বিদ্যুতের ব্যবহারের পূর্বে বায়ুশক্তির বহুল ব্যবহার ছিল। সমুদ্রে বাণিজ্য এবং রণতরীর সঞ্চালনে, জল তোলার কাজে, কাঠ চেরাই করতে এবং শস্য ভাঙ্গানোর কাজে বায়ুর প্রবাহজনিত শক্তি ব্যবহারের প্রচলন ছিল। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষপর্যায়ে প্রচলিত শক্তি-উৎসের সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে বায়ুর প্রবাহজনিত শক্তি থেকে যান্ত্রিক শক্তি এবং সর্বাধিক ব্যবহারোপযোগী বৈদ্যুতিক শক্তি আহরণের প্রবণতা উৎসাহজনকভাবে শুরু হয়েছে। বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশেই কম-বেশী 'বায়ু কল' বা 'উইণ্ড জেনারেটারের' দ্বারা যান্ত্রিক বা বৈদ্যুতিক শক্তি আহরণের প্রযুক্তির ক্রমবিকাশ বেশ আশাব্যঞ্জক।

● **বায়ুশক্তি থেকে বিদ্যুৎ আহরণের পদ্ধতি ঃ** i) যেসব স্থানে বছরের বেশিরভাগ সময় বায়ুপ্রবাহ পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে, ঐসবস্থানে এক বা একাধিক উঁচু স্তম্ভের (30-40 মিটার) উপর বায়ুকল বা সংশ্লিষ্ট জেনারেটার বসানো হয়। একাধিক বায়ুকল বা উইণ্ড জেনারেটার সহযোগে অধিক পরিমাণ বিদ্যুৎ-উৎপাদনের ব্যবস্থাকে 'উইণ্ড-ফার্ম' বলা হয়।

বায়ুপ্রবাহ
↓
টারবাইনের ঘূর্ণন
↓
জেনারেটারের ঘূর্ণন
↓
বিদ্যুৎ

চিত্র 6.17 ঃ বায়ুপ্রবাহ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের মূলনীতি দেখানো হয়েছে।

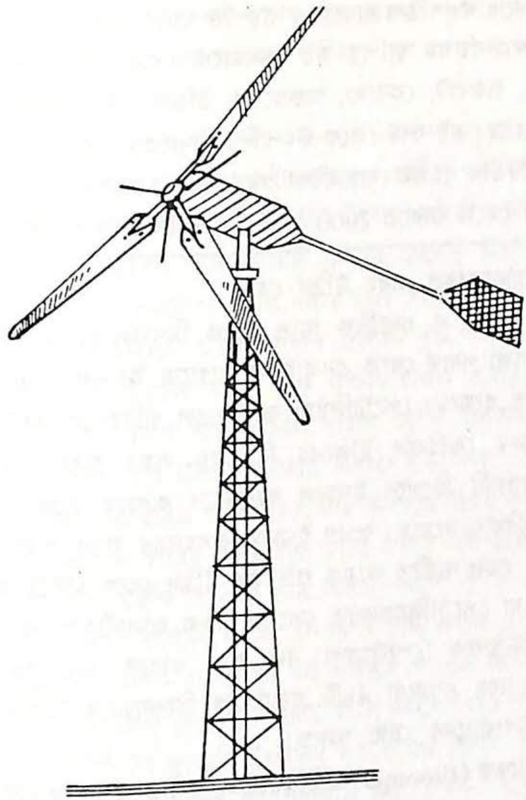
ii) এরূপ বায়ুকল বা উইণ্ড জেনারেটারে বায়ুশক্তিকে টারবাইন ঘোরানোর কাজে ব্যবহার করা হয় এবংটারবাইনের যান্ত্রিক শক্তি থেকে জেনারেটারের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা হয়।

iii) উৎপন্নবিদ্যুৎকে ব্যাটারিতে সংরক্ষণ করে প্রয়োজনকালীন ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয়।

● কয়েকটি আধুনিক বায়ুকলের নাম ঃ

i) ইলেকট্রো-জেনারেটার **(Electro-Generator)** ঃ

সুইজারল্যাণ্ডের প্রযুক্তিতে তৈরি তিন পাখা বিশিষ্ট বায়ুকল। সেকেণ্ডে 10 মিটার হাওয়ার গতিবেগে এই যন্ত্র 5000 ওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষম।



চিত্র 6.18 ঃ হাওয়া চালিত 'ইলেকট্রো-জেনারেটার' দেখানো হয়েছে।

ii) ডানলাইট (Dunlite) ঃ অস্ট্রেলিয়ার ডানলাইট ইলেকট্রিক্যাল কোম্পানীর তৈরি তিন পাখা বিশিষ্ট বায়ুচালিত জেনারেটারকে 'ডানলাইট' বলা হয়। এর সাহায্যে 1 থেকে 2 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা যায়।

iii) বাইসাইকেল হুইল টারবাইন (Bicycle Wheel Terbine) ঃ আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের 'উইণ্ড টারবাইন কোম্পানী' আবিষ্কৃত বাইসাইকেল হুইল টারবাইন বর্তমানে বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

iv) দারিয়াস ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিসরোটর (Darrius Vertical Axis Roter, DVAR) ঃ ফ্রান্সের বিজ্ঞানী দারিয়াস (1925) কর্তৃক আবিষ্কৃত বায়ুকলকে 'দারিয়াস ভার্টিক্যাল অ্যাক্সিস রোটর' বলা, হয়। বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে এই যন্ত্রটির বিপুল সম্ভাবনার কথা ভেবেই অধুনা কানাডা এবং আমেরিকায় বিস্তর গবেষণা চলছে।

● **ভারতে বায়ুশক্তির ব্যবহার :** বায়ুশক্তি থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের কেন্দ্র বিশ্বে সর্বপ্রথম স্থাপিত হয় ডেনমার্কে 1890 সালে। অধুনা ভারতের তামিলনাড়ু, গুজরাট, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, উড়িষ্যা এবং কর্ণাটকে উইণ্ড ফার্ম স্থাপিত হয়েছে। এই ফার্ম থেকে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ প্রায় 600 MW, যা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম (আমেরিকা প্রথম 1800 MW)। কিন্তু বায়ুশক্তি-চালিত উইণ্ড ফার্ম থেকে ভারতে 2000 MW বিদ্যুৎ উৎপাদনের সম্ভাবনা রয়েছে।

6.7.6. **অ্যালকোহল এবং উদ্ভিদ তেল :**

i) অধুনা কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে মিথানল (methanol) এবং কৃষিজ ও অরণ্যজাত বর্জ্য পদার্থ থেকে এনজাইমের সাহায্যে 'ইথানল' (ethanol) উৎপাদনের প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। পেট্রোলিয়াম জাত তেল ব্যতিরেকে মিথানল বা ইথানলের সাহায্যে কার্যক্ষম ভেহিকল ইঞ্জিনের বিবর্তনও সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে ব্রাজিলে যানবাহনের জ্বালানী হিসেবে ইথানল বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইথানল ব্যবহারে পরিবেশগত সুবিধাও রয়েছে। কারণ ইথানল ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষিত হয় না।

ii) ভোজ্য তেল ব্যতীত কয়েক প্রজাতির উদ্ভিদ থেকে হাইড্রোকার্বনজাতীয় তেল পাওয়া সম্ভব, যা পেট্রোলিয়ামজাত তেলের বিকল্প জ্বালানীরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। এই জাতীয় উদ্ভিদকে **'পেট্রোক্রপ'** বলা হয়। ভারতে 386 প্রজাতির **পেট্রোক্রপ** পাওয়া গেছে এবং এরমধ্যে 48টি প্রজাতিকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে বাণিজ্যিক ভাবে তেল উৎপাদনের চেষ্টা চলছে।

6.7.7. **জীবভর (Biomass) :** উদ্ভিদ এবং প্রাণীজ জীবভরে সৌরশক্তি রাসায়নিক শক্তিরূপে সঞ্চিত থাকে। তাই যেকোন জীবভর মাত্রেই বিপুল শক্তির আধার। বহু প্রাচীন কাল থেকে উদ্ভিদ জীবভর (যথা শুকনো পাতা, কাঠ, ডালাপালা ইত্যাদি) জ্বালানী হিসেবে অল্পবিস্তর ব্যবহৃত হলেও বর্তমানের শক্তিসংকটে উদ্ভিদ জীবভরকে ব্যাপকভাবে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করার প্রয়াস শুরু হয়েছে।

● **জীবভর থেকে শক্তি উৎপাদনের পদ্ধতি :** এক্ষেত্রে উদ্ভিদ জীবভরকে সরাসরি শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। জীবভরকে বায়ুশূণ্য স্থানে জীবাণু সহযোগে কম তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে মিথেন এবং কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস পাওয়া যায়। উৎপন্ন মিথেন জ্বালানি গ্যাস হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এইপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা 424 গ্রাম শুকনো পাতা থেকে 7 কিউবিক ফুট মিথেন উৎপন্ন করতে সমর্থ হয়েছেন। শুকনো কচুরীপানা, শৈবাল, আখের ছোবড়া এবং ইউক্যালিপটাস প্রভৃতি গাছ শক্তি উৎপাদনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। উদ্ভিদ জীব ভর থেকে আবার জ্বালানি তেলও সংগ্রহ করা যেতে পারে। 'উদ্ভিদ-লিটার'কে 380°C তাপমাত্রায় কার্বনমনোক্সাইড

গ্যাস সহযোগে উত্তপ্ত করলে লিটারের অর্ধেক ভর জ্বালানি তেলে রূপান্তরিত হয়। এরূপে উৎপন্ন জ্বালানি তেলে সালফারের পরিমাণ খুব কম থাকায় বায়ুদূষণের সম্ভাবনা প্রায় থাকেই না।

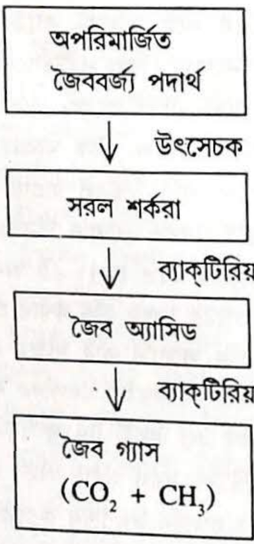
● **জ্বালানি কাঠের সাশ্রয় এবং নবীভবনতা ঃ** গ্রামীণ জীবনযাত্রায় রান্না এবং অন্যান্য কাজে জ্বালানি কাঠই শক্তির প্রধান উৎস। প্রচলিত জ্বালানি যথা—কয়লা, খনিজ তেল প্রভৃতির সঙ্গে জ্বালানি কাঠের উৎসও নিঃশেষের মুখে যদিও জ্বালানি কাঠ নবীভবনযোগ্য (কিন্তু নবীভবনের হার খুব কম)। তাছাড়া প্রচলিত চুল্লীর (উনুন) সাহায্যে রান্নার ফলেও জ্বালানি কাঠের ব্যাপক অপচয় ঘটে। রান্নার পাত্র এবং উনুনের মধ্যে ফাঁক থাকায় (ঝিক্ ব্যবহারের ফলে) জ্বালানি কাঠের 5-10 শতাংশ শক্তি কেবল রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয় এবং অবশিষ্ট অংশের অপচয় ঘটে (নির্গত ধোঁয়ায় বিষাক্ত CO এবং CO_2 প্রভৃতি গ্যাস থাকায় পাচিকার স্বাস্থ্যেরও ক্ষতি হয়)। এই অবস্থায় উন্নত ধূমহীন উনুন ব্যবহারের মাধ্যমে জ্বালানি কাঠের সঞ্চয় বৃদ্ধি করার প্রয়াস শুরু হয়েছে (একটি উন্নত উনুন বছরে 700 কেজি জ্বালানি কাঠ সাশ্রয় করতে পারে)।

এছাড়া পৃথিবীর সর্বত্র জ্বালানি কাঠের উৎপাদন বৃদ্ধি করার প্রয়াস চলছে। ভারতে প্রতিবছর আনুমানিক 40 কোটি টন জ্বালানি কাঠের প্রয়োজন, কিন্তু উৎপাদিত হয় মাত্র 15 কোটি টন, ফলে অরণ্য ধ্বংস ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এই অবস্থায় বছরে 40 কোটি টন জ্বালানি উৎপাদন করতে 40 কোটি হেক্টর জমির প্রয়োজন, কিন্তু বাস্তবে এই পরিমাণ জমি জ্বালানি কাঠের জন্য বন্দোবস্ত করা সম্ভব নয়। তাই জ্বালানি কাঠের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য দ্রুত বর্ধনশীল এবং উন্নত জ্বালানিমানের বনসৃজনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। একদিকে জ্বালানি কাঠের সঠিক ব্যবহার এবং অপরদিকে জ্বালানি কাঠের উৎপাদন বৃদ্ধিই শক্তির উৎস হিসেবে জ্বালানি কাঠ সাশ্রয়ের অন্যতম প্রধান উপায়।

6.7.8. **জৈব-গ্যাস (Bio-gas) ঃ** পৌরপ্রতিষ্ঠানের জৈব জঞ্জাল (উদ্ভিদ এবং প্রাণী অবশেষ), রান্নাঘরের ব্যবহৃত এবং অব্যবহৃত জৈব অবশেষ, কৃষি অবশেষ এবং প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ (waste product) যথা গবাদি পশুর মল-'গোবর' এবং মানুষের 'মল' থেকে বিশেষ জৈব রাসায়নিক প্রযুক্তির মাধ্যমে দাহ্য গ্যাস উৎপাদন করা হয়। জৈব আবর্জনা থেকে এইভাবে গ্যাস উৎপন্ন করার প্রযুক্তিকে **'জৈবগ্যাস প্রযুক্তি'** (Biogas technology) বলা হয় এবং উৎপন্ন গ্যাসকে 'জৈব গ্যাস' (Biogas) বলা হয়। জৈবগ্যাসকে রান্নার জ্বালানি রূপে, আলো জ্বালানোর কাজে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

I. **'জৈব-গ্যাস উৎপাদন প্রযুক্তির' নীতি ঃ** জৈব গ্যাস উৎপাদন প্রযুক্তির মূলে রয়েছে জৈব-বর্জ্য পদার্থের 'অবায়বীয় পাচন' (anaerobic digestion)। তিনটি অনুক্রমিকদশায় পাচন সম্পূর্ণ হয়।

i) প্রথমে অপরিমার্জিত জটিল জৈববর্জ্য পদার্থ বায়ুহীন পরিবেশে উৎসেচকের প্রভাবে অপেক্ষাকৃত সরল শর্করায় পরিণত হয়।



চিত্র 6.19 ঃ জৈবগ্যাস উৎপাদন প্রযুক্তির নীতি দেখানো হয়েছে।

ii) দ্বিতীয় দশায় সরল শর্করা অবায়বীয় ব্যাক্টিরিয়ার দ্বারা জৈব অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়।

iii) তৃতীয় এবং শেষ দশায় জৈব অ্যাসিড থেকে ব্যাক্টিরিয়ার সাহায্যে মিথেন (CH_3) এবং কার্বনডাইঅক্সাইড (CO_2) গ্যাস উৎপন্ন হয়। **কার্বনডাইঅক্সাইড এবং মিথেন গ্যাসের মিশ্রণকে জৈব গ্যাস** বা **বায়োগ্যাস** বলা হয়। জৈব গ্যাসে 60-70 শতাংশ মিথেন এবং 30-40 শতাংশ কার্বনডাইঅক্সাইড থাকে। জৈববর্জ্য পদার্থের অবায়বীয় পাচনে জৈবগ্যাস উৎপন্ন হতে এক থেকে দু-মাস সময়ের প্রয়োজন।

II. **'গোবর' থেকে জৈব-গ্যাস উৎপাদন ঃ** অন্যান্য জৈব বর্জ্য পদার্থ ছাড়া কেবল গোবর থেকে **'জৈব-গ্যাস'** উৎপাদন করা সম্ভব। গোবরকে অবায়বীয় অবস্থায় পাচন করলে উৎসেচক এবং অবায়বীয় ব্যাক্টিরিয়ার উপস্থিতিতেই জৈব-গ্যাস পাওয়া যায়। গোবর থেকে প্রাপ্ত জৈব-গ্যাস **'গোবর গ্যাস'** নামেও পরিচিত। গোবর সহযোগে অন্যান্য

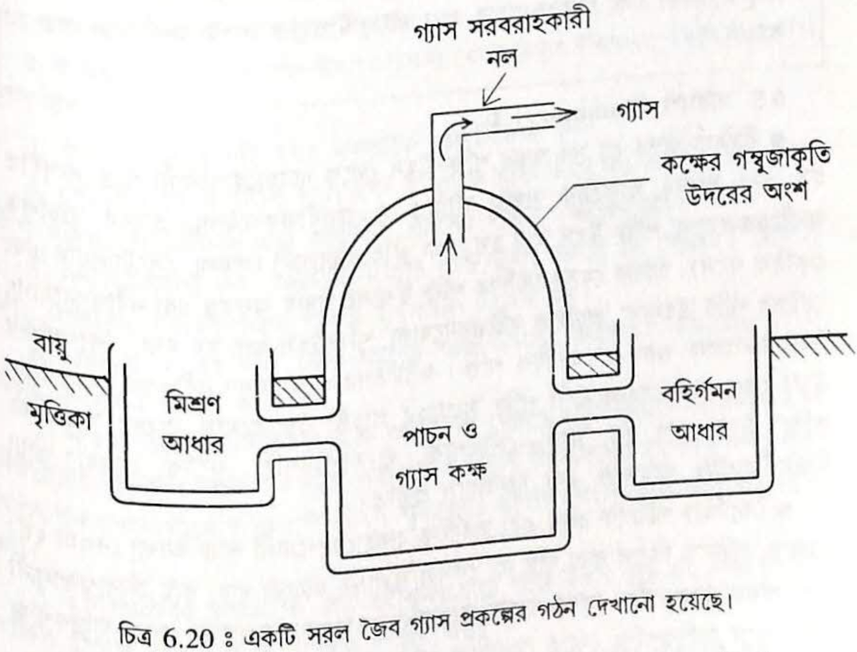
জৈব-পদার্থ থেকে জৈব-গ্যাস উৎপাদনে গোবর অনুঘটকের কাজ করে, কারণ গোবরের উপস্থিতিতে ব্যাক্টিরিয়ার ক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।

III. পায়খানা যুক্ত জৈব-গ্যাস প্রকল্প ঃ অধুনা গ্রামাঞ্চলে জৈব-গ্যাস প্রকল্পের সঙ্গে স্যানিটারী পায়খানা যুক্ত করা হয়—দূষণ রোধ করার জন্য। পায়খানা সংযুক্ত জৈব-গ্যাস প্রকল্পে প্রধানত গোবর ব্যবহার করা হয় এবং সহযোগী উপাদান হিসেবে মানুষের মল যুক্ত হয়। গোবর এবং মানুষের মলের সামগ্রিক অবায়বীয় পাচনেই মিথেন এবং কার্বনডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। এরূপ প্রকল্পে মলের সাহায্যে জলের দূষণ সীমায়িত হয় এবং উৎপাদিত জৈব গ্যাসের পরিমাণও বাড়ে।

IV. জৈবগ্যাস প্রযুক্তির কারিগরী অংশ ঃ একটি সরল জৈব গ্যাস-প্রকল্প নিম্নলিখিত কয়েকটি অংশ নিয়ে তৈরি ঃ

i) পাচন এবং গ্যাস কক্ষ ঃ

এটি মূলত মাটির গভীরে ইটের দেওয়াল সমন্বিত কক্ষ। দেওয়াল বায়ু এবং জল নিরোধক করার জন্য ভিতরের অংশ সিমেন্ট ও বালির প্লাস্টারসহ টারের আস্তরণ দেওয়া থাকে। কক্ষটি রড, সিমেন্ট এবং বালির গম্বুজাকৃতি ঢালাই দিয়ে ঢাকা থাকে। পাচন কক্ষ



চিত্র 6.20 ঃ একটি সরল জৈব গ্যাস প্রকল্পের গঠন দেখানো হয়েছে।

থেকে উৎপন্ন গ্যাস কক্ষের উপরে গম্বুজাকৃতি অংশে জমা হয় এবং গম্বুজের শীর্ষে সংযুক্ত সরবরাহকারী নলের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়।

ii) মিশ্রণ আধার ঃ

পাচন আধারের সঙ্গে নালীযোগে সংযুক্ত শীর্ষ—উন্মুক্ত ইট, বালি ও সিমেন্টের একটি আধার থাকে। এই অংশে জৈব পদার্থ বা গোবর উপযুক্ত পরিমাণ জলের সঙ্গে মিশিয়ে পাচনকক্ষে পাঠানো হয়।

iii) বহির্গমন আধার ঃ

পাচন কক্ষের সঙ্গে নালীযোগে বা সরাসরি ছিদ্রের দ্বারা সংযুক্ত মিশ্রণ আধারের অনুরূপ আধারকে বহির্গমন আধার বলা হয়। এই আধারটি মিশ্রণ আধারের বিপরীতে অবস্থান করে। পাচনকক্ষে উপস্থিত জলের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে এহং গ্যাসকক্ষে গ্যাসের সঞ্চয়ে এই আধারের ভূমিকা রয়েছে। গ্যাসকক্ষে গ্যাস জমা হলে গ্যাসের চাপে পাচন-কক্ষের বর্জ্যপদার্থসহ জলের কিছু অংশ বহির্গমন আধারে স্থানান্তরিত হয় এবং গ্যাস ব্যবহারের সময় গ্যাসীয় চাপ ধীরে ধীরে কমতে থাকলে জলও বহির্গমন আধার থেকে পাচনকক্ষে ধীরে ধীরে স্থানান্তরিত হয়। এই প্রক্রিয়া ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে।

● জৈবগ্যাস প্রযুক্তি ব্যতিরেকে **'ল্যাণ্ডফিল গ্যাস প্রযুক্তি'** এবং **তরলীকরণ প্রযুক্তির** মাধ্যমেও জৈব বর্জ্য পদার্থ থেকে জৈবগ্যাস উৎপন্ন করা যায়। তবে কিছু জটিলতা এবং প্রতিবন্ধকতার জন্য এই দুটি প্রযুক্তি ততটা জনপ্রিয়তা লাভ করেনি।

6.8. সারাংশ (Summary) ঃ

● রীতিগতভাবে যে সব প্রধান শক্তি-উৎস থেকে ব্যবহারোপযোগী শক্তি সংগৃহীত হয় এবং যাদের প্রাকৃতিক সঞ্চয় সীমিত ও অনবীভবনযোগ্য, তাদের **'প্রচলিত অনবীভবনযোগ্য'** শক্তি-উৎস বলা হয়, যথা জীবাশ্মজ্বালানী (কয়লা, পেট্রোলিয়াম এবং প্রকৃতিক গ্যাস)। আবার যেসব প্রচলিত শক্তি-উৎসের সঞ্চয় অফুরন্ত এবং নবীভবনযোগ্য, সেইসব শক্তি-উৎসকে **'প্রচলিত নবীভবনযোগ্য'** শক্তিউৎস বলা হয় যথা—বিদুৎশক্তির উৎস জলপ্রবাহ এবং পারমাণবিক শক্তি। অরীতিগতভাবে যেসব নবীভবনযোগ্য শক্তির উৎস থেকে ব্যবহারোপযোগী শক্তি সংগ্রহের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে, তাদের **'অপ্রচলিত শক্তি'** উৎস বলা হয়, যথা—সৌরশক্তি, ভূ-তাপীয়শক্তি, ওটেক, জোয়ার-ভাটা নির্ভরশীলশক্তি, বায়ুশক্তি এবং জৈবগ্যাস প্রভৃতি।

● বৈদ্যুতিক শক্তিকে বহুল এবং সর্বাধিক ব্যবহারোপযোগী শক্তি আখ্যা দেওয়া হয়। যেহেতু শক্তিকে বিনাশ করা যায় না, কেবল রূপান্তর ঘটানো যায়, তাই জীবাশ্মজ্বালানী এবং পারমাণবিক শক্তি থেকে প্রথমে তাপশক্তি, তারপরে তাপশক্তি থেকে যান্ত্রিকশক্তি এবং শেষে যান্ত্রিকশক্তি থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা হয়।

● সৌরশক্তিকে বিশেষ প্রযুক্তির মাধ্যমে সরাসরি রান্নার কাজে, জল গরম করার কাজে, অশোধিত জল থেকে বিশুদ্ধ জলউৎপাদনে এবং খাদ্য-শস্য শুষ্ককরণের কাজে

ব্যবহার করা হয় এবং পরোক্ষভাবে সৌর আলোক ভোল্টেইক কোষ' দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করে কাজে লাগানো হয়।

● ভবিষ্যতে অপ্রচলিত শক্তির উৎস হিসেবে বায়ুশক্তি, ওটেক (OTEC), জোয়ার ভাটার শক্তি এবং ভূ-তাপীয় শক্তির বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে।

● জৈব-বর্জ্যপদার্থ থেকে সংগৃহীত জৈব-গ্যাস বা বায়ো-গ্যাসও একটি সম্ভাবনাময় অপ্রচলিত শক্তি-উৎস। জ্বালানী হিসেবে, বাতি জ্বালানোর কাজে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে জৈব-গ্যাসের গুরুত্ব অপরিসীম।

নবীভবনতা এবং পরিবেশ অদূষক ক্রিয়াই অপ্রচলিত শক্তি-উৎসের জনপ্রিয়তার মূল কারণ।

● অনুশীলনী ●

A) রচনাভিত্তিক বা দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. প্রচলিত এবং অপ্রচলিত শক্তি বলতে কি বোঝায়? বিভিন্ন প্রকার প্রচলিত এবং অপ্রচলিত শক্তি-উৎসের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

2. কয়লা কোন ধরনের শক্তি-উৎস? কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

3. কয়লা কিভাবে সৃষ্টি হয়? কয়লাকে শ্রেণীবিভক্ত কর।

4. পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং কয়লাকে শক্তি-উৎস হিসেবে ধরা হয় কেন? বিশ্বে মজুত পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের পরিমাণ উল্লেখ কর।

5. নবীভবনযোগ্য এবং অনবীভবনযোগ্য শক্তি-উৎস বলতে কি বোঝায়? প্রচলিত এবং অপ্রচলিত নবীভবনযোগ্য শক্তির উৎসগুলি উল্লেখ কর।

6. প্রবাহিত জলের শক্তি কোন ধরনের শক্তি-উৎসের অন্তর্গত? জলপ্রবাহ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

7. পারমাণবিক বা নিউক্লিয়ার শক্তি বলতে কি বোঝায়? নিউক্লিয়ার সংযোজন এবং নিউক্লিয়ার বিভাজন পদ্ধতির মাধ্যমে পরমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের মূলনীতি বর্ণনা কর। বিদ্যুৎ উৎপাদনে পারমাণবিক শক্তি-উৎস ব্যবহারের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি আলোচনা কর।

8. সৌরশক্তিকে অপ্রচলিত এবং নবীভবনযোগ্য শক্তি-উৎস বলা হয় কেন? সৌর শক্তির প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ব্যবহার উল্লেখ কর।

9. সৌর-জল-উত্তাপক, সৌর-নিরুদক, সৌর-পাতক এবং সৌর-পাচকের গঠন এবং কার্যপ্রণালী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

10. সৌর জলাশয় কি? সৌর-জলাশয়ের কার্যপ্রণালী এবং ভারতে সৌর জলাশয়ের প্রয়োগ বর্ণনা কর।

11. 'মডিউল' কি? এস.পি.ভি. কোষের সাহায্যে সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি আহরণের মূল নীতি বর্ণনা কর। সৌর-বিদ্যুতের ব্যবহার উল্লেখ কর।

12. ভূ-তাপীয় শক্তি কাকে বলে? ভূ-তাপীয় শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

13. জোয়ার-ভাটা নির্ভরশীল শক্তি এবং সমুদ্রের তাপীয় শক্তির পরিবর্তন প্রযুক্তি (ওটেক) কি? এই দুই শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণনা কর।

14. বায়ুশক্তিকে অপ্রচলিত নবীভবনযোগ্য শক্তি-উৎস বলা হয় কেন? বায়ুশক্তি থেকে বিদ্যুৎ আহরণের পদ্ধতি আলোচনা কর। কয়েকটি আধুনিক বায়ুকলের নাম উল্লেখ কর।

15. অপ্রচলিত-নবীভবনযোগ্য শক্তি-উৎস হিসেবে অ্যালকোহল ও উদ্ভিদ তেল, জীব-ভর এবং জৈব-গ্যাসের সম্ভাব্যতা পর্যালোচনা কর।

B) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. অনবীভবনযোগ্য প্রচলিত শক্তি-উৎস বলতে কি বোঝায়?
2. জীবাশ্ম জ্বালানী কি?
3. কয়লা কাকে বলে? কয়লাকে শক্তি-উৎস হিসেবে ধরা হয় কেন?
4. কয়লার যোগান কি অফুরন্ত?
5. পেট্রোলিয়াম কি এবং কোথায় পাওয়া যায়?
6. টার-স্যাণ্ড বা অয়েল সেল কি?
7. 'প্রাকৃতিক গ্যাস' বলতে কি বোঝায়?
8. পারমাণবিক বা নিউক্লিয়ার শক্তি কি? নিউক্লিয়ার সংযোজন এবং নিউক্লিয়ার বিভাজন পদ্ধতি কাকে বলে? উদাহরণ দাও?
9. শক্তি-সংকট কি?
10. সৌর-পাচক কী? এর গঠন ও কার্যপ্রণালী বর্ণনা কর।
11. সৌর পাচক ব্যবহারের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি কি কি?
11. ভারতে সৌর-জলাশয়ের প্রয়োগ উল্লেখ কর।
12. মডিউল কি? পশ্চিমবঙ্গে সৌর-বিদ্যুতের ব্যবহার উল্লেখ কর।
13. ভূতাপীয় শক্তি কি? ওটেক (OTEC) কাকে বলে?
15. ভারতে বায়ুশক্তি থেকে বিদ্যুৎউৎপাদনের সম্ভাব্যতা উল্লেখ কর?
16. 'পেট্রোক্রপ' কাকে বলে? জ্বালানী কাঠের সাশ্রয় কিভাবে সম্ভব?
17. জৈব-গ্যাস উৎপাদন পদ্ধতির মূলনীতি উল্লেখ কর।

7 বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ

7.1. ভূমিকা (Introduction) ঃ

বিশ্বের উন্নত, উন্নয়নশীল এবং অনুন্নত রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে বহুবিধ রাসায়নিক পদার্থের উপর নির্ভরশীল। রাসায়নিক বস্তুর বেশীরভাগই 'খাদ্য-সংযোজনের বস্তু' (Food additives), 'সৌন্দর্যবর্ধক বস্তুর উপাদান' (Cosmetics ingradients) এবং 'কীটপতঙ্গাদির নাশক' (Pesticides) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিশ্বে বাণিজ্যকৃত রাসায়নিক পদার্থের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এমনকি প্রতিদিন 700-1000 নূতন রাসায়নিক পদার্থ বাজারে প্রবেশ করছে। এই বাণিজ্যকৃত রাসায়নিক পদার্থের প্রায় শতাধিক পরিবেশগতভাবে ভীষণ ক্ষতিকর। ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থগুলি উৎপাদনস্থলে (অর্থাৎ কর্মস্থলে), ঘরে এবং ঘরের বাইরে মানুষের স্বাস্থ্য এবং পরিবেশের উপর মন্দ প্রভাব (adverse effets) সৃষ্টি করে। এখনও বহু রাসায়নিক পদার্থের বিষক্রিয়া সম্বন্ধে মানুষের সম্যক ধারণা না

থাকায় অগোচরে জীব ও পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। ব্যবহৃত বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের চিহ্নিতকরণ এবং সম্ভাব্য প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এই মুহূর্তে অতীব জরুরী।

7.2. বিষাক্ত পদার্থ (Toxic Substance) বা টক্সিন বলতে কি বোঝায়?

যে সব রাসায়নিক পদার্থ (খাদ্যে সংযোজিত বস্তু বা সৌন্দর্যবর্ধক বস্তুর উপাদান পদার্থ বা কীটনাশক পদার্থ) জীবের (প্রাণী ও উদ্ভিদ) উপর ব্যাপক মন্দ প্রভাব (adverse effects) সৃষ্টি করে তাদের **'বিষাক্ত পদার্থ'** বা সহজভাষায় 'বিষ' বলা হয়। বিষাক্ত পদার্থের মন্দপ্রভাব বা বিষক্রিয়া সম্পর্কে অধ্যয়নকে **'বিষবিজ্ঞান'** (toxicology) বলা হয়।

7.3. বিষাক্ত পদার্থের জীবসম্পর্কীয় প্রভাব (Biological Effects Of Toxic Substance) ঃ

সাধারণত বাড়ি, কর্মস্থল বা বাড়ির বাইরের পরিবেশে মানুষ বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে আসে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিষাক্ত পদার্থের প্রকটে মানুষের স্বল্প নিয়ন্ত্রণ থাকে বা কোন নিয়ন্ত্রণ থাকে না। যেমন পার্শ্ববর্তী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে আসা দূষিত বায়ু বা সড়কপথে যানবাহনের ধোঁয়ায় মিশ্রিত দূষিত বায়ুর সংস্পর্শে মানুষ একডজনেরও বেশি মারাত্মক বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে। আবার কখনো কখনো ইচ্ছাকৃতভাবে মানুষ নিজেদেরকে বিষ-পদার্থের সংস্পর্শে অনাবৃত করে, যেমন একজনের সিগারেটের ধোঁয়ার সান্নিধ্যে থাকা সকল মানুষের উপরই বিরূপ প্রভাব পড়ে। এই অংশে কেবল মানুষের উপর বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের প্রভাব আলোচনা করা হল।

- **মানুষের উপর প্রভাব** (Effects on Human)

মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের প্রভাব নির্ভর করে কতটা পরিমাণ বিষপদার্থ মানুষের শরীরে প্রবেশ করেছে তার উপর। আবার মানুষের শরীরে বিষাক্ত পদার্থের সঞ্চয় নির্ভর করে দুটি 'ডি' চরিত্রের উপর— (two D's,—dose and duration) বিষাক্ত পদার্থের ঘনত্বের মাত্রা বা দাগ (dose) এবং বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে প্রকটের স্থায়িত্ব(duration of exposure)। মানুষের উপর বিষপদার্থের কতিপয় প্রভাব অস্পষ্ট যেমন, বায়ুদূষণের ফলে মাথাধরা (headache) বা হাল্কা কাশির (Slight Cough) সৃষ্টি হওয়া এবং কিছু প্রভাব আবার খুবই মারাত্মক বা গভীর যেমন, কতিপয় কীটনাশকের প্রভাবে দেহের পেশীর প্রবল আক্ষেপ (Violent Convulsions) সৃষ্টি হওয়া প্রভৃতি। মানুষের উপর বিষাক্ত পদার্থের প্রভাব মূলত দুধরনের—1) ক্ষণস্থায়ী বা তীক্ষ্ণ (Acute) এবং 2) দীর্ঘস্থায়ী (Chronic)।

7.3.1. ক্ষণস্থায়ী বা তীক্ষ্ণ প্রভাব (Acute Effects) ঃ

উচ্চঘনত্বের বিষাক্ত রাসায়নিকপদার্থের খুব স্বল্প সময়ে মানুষের উপর ক্রিয়ার ফলে ক্ষণস্থায়ী বা 'অ্যাকিউট' প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে প্রকট হওয়ার অব্যবহিত পরেই ক্ষণস্থায়ী প্রভাবের লক্ষণ (symptoms) প্রকাশ পায়। উদাহরণ হিসেবে ভূপাল দুর্ঘটনার কথা (Bhopal Tragedy, Dec. 3,1984) উল্লেখ করা যায়। ইউনিয়ন কার্বাইড-এর মিক্-প্লান্ট থেকে নির্গত 5 মিটার উঁচু মিক (MIC, Methylisocyanate) গ্যাসের সংস্পর্শে প্রকট হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কিছু মানুষ মারা যায় এবং কিছু মানুষ তীব্র ভাবে বুকের যন্ত্রণা ও চোখের জ্বালা অনুভব করে। ক্ষণস্থায়ী বা অ্যাকিউট প্রভাবের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিষপদার্থের প্রকট বন্ধ হয়ে গেলে প্রভাব আর অনুভূত হয় না।

7.3.2. দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব (Chronic Effects) ঃ

দীর্ঘ সময় স্বল্প মাত্রায় বিষপদার্থের অনাবরণে 'দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব' বা 'ক্রনিক ইফেক্ট' দেখা যায়। বিষপদার্থের সংস্পর্শে (বা অনাবরণে) আসার মাসাধিককাল বা বৎসরাধিককালের পরে মানুষের শরীরে প্রভাবের প্রতিক্রিয়া (response) বা লক্ষণ প্রকাশ প্রায় এবং বছরের পর বছর প্রভাব বিদ্যমান থাকে। যেমন 'এমফাইসিমা' (emphysema) সৃষ্টি হয় দীর্ঘদিন দূষিত বায়ু বা সিগারেটের ধোঁয়ার সংস্পর্শে আসার পর এবং রোগের প্রভাবও দীর্ঘস্থায়ী হয়। ভূপালে মিক্ দুর্ঘটনায় আক্রান্ত মানুষেরা যে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের শিকার হয় তার ফলস্বরূপ কয়েকসপ্তাহ পরে মানুষের মধ্যে পঙ্গুত্ব (paralysis) উপসর্গ প্রকাশ পায়।

জীবদেহের প্রতিটি কোষ বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তার ফলে সামাজিক অবক্ষয়কারী বিভিন্ন প্রভাবের সৃষ্টি হয়। বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা সৃষ্ট চারটি উল্লেখযোগ্য দীর্ঘস্থায়ীপ্রভাব হচ্ছে—ক্যানসার, মিউটেশান, জন্মগত ত্রুটি এবং জনন দৌর্বল্য।

7.3.2.1. কর্কটরোগ বা ক্যানসার (Cancer) ঃ

i) 'ক্যানসার' বলতে কি বোঝায়?

দেহের যে কোন অঙ্গের কলায় কোষপুঞ্জ (cell mass) বা প্রাথমিক টিউমার গঠনকারী কোষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি (সংখ্যা এবং আয়তন) বা প্রলিফারেশান-কে 'ক্যানসার' বলা হয়। ক্যানসেরাস কোষগুলি মূল টিউমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রক্ত এবং অন্যান্য দেহ তরলের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং দূরবর্তী কোন কলার অংশে 'গৌণ টিউমার' সৃষ্টি করতে পারে। দেহের বিভিন্ন অংশে এই ক্যানসেরাস কোষগুলির ছড়িয়ে পড়ার ঘটনাকে 'মেটাস্টেসিস' (metastasis) বলে।

ii) **ক্যানসার দেহের কোন কোন অংশে সৃষ্টি হয়?**

দেহের যে সমস্ত কলার কোষসমূহ দ্রুত বিভাজনক্ষম, সেই সমস্তকলায় সাধারণত ক্যানসার সৃষ্টি হয়, যথা—ফুসফুসীয় কলা, অস্থিমজ্জা, অন্ত্রের আবরণী কলাস্তর,ত্বক, শুক্রাশয় এবং ডিম্বাশয়। অবিভাজনক্ষম পেশী এবং নার্ভকোষে ক্যানসারের ঘটনা খুবই বিরল।

iii) **ক্যানসারের কারণ কি?**

ক্যানসারের কারণ নির্ণয়ে বহু গবেষণা হয়েছে এবং এখনোও চলছে, কিন্তু সঠিক কারণ এখনোও জানা সম্ভব হয় নি। তবে বহুক্ষেত্রে কোষীয় ক্রোমোজোমের 'মিউটেশান' বা বংশগতির উপাদান DNAএর পরিবর্তনের ফলে কোষের ক্যানসার সৃষ্টি হয়। মিউটেশান বা DNAএর পরিবর্তন বিভিন্ন কারণে ঘটতে পারে। কারণগুলির মধ্যে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, ভাইরাস, এবং ভৌতউপাদান X-রশ্মি ও UV-রশ্মি উল্লেখযোগ্য।

iv) **ক্যানসার এবং বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ঃ**

যেসব বস্তু ক্যানসার সৃষ্টির জন্য দায়ী তাদের **'কারসিনোজেন** (carcinogens) বলা হয়। বিষাক্ত-রাসায়নিক পদার্থের কিছু অংশ কারসিনোজেন হিসেবে কাজ করে। সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় জানা গেছে যে 90 শতাংশ ক্যানসার সৃষ্টির জন্য দায়ী পরিবেশ দূষক এবং অন্যান্য উপাদান যথা X রশ্মি, UV-রশ্মি এবং ভাইরাস। এই পরিবেশ দূষকের অধিকাংশই রাসায়নিক পদার্থ, যথা—কীটনাশক, সিগারেটের ধোঁয়া, কলকারখানার চিমনি এবং যানবাহন নিঃসৃত ধোঁয়া, কিছু প্লাস্টিক এবং অ্যাজবেসটাস (asbestos) প্রভৃতি। এছাড়া কিছু হরমোন, খাদ্যে সংযোজিত উপাদান (ফুড অ্যাডিটিভ), সৌন্দর্যবর্ধক বস্তুর উপাদান (কসমেটিক) প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থও ক্যানসার সৃষ্টির জন্য দায়ী। দেখা গেছে যে, 20-40 শতাংশ ক্যানসার সৃষ্টি হয় কর্মস্থলে এবং পরিবেশদূষণকারী বিষাক্ত-রাসায়নিক পদার্থের অনাবরণে এবং বাদবাকি সৃষ্টি হয় ধূমপান, খাদ্য-সংযোজনের বস্তু সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক উপাদান এবং প্রাকৃতিক কারণে।

7.3.2.2. মিউটেশান (Mutation) বা পরিবর্তন ঃ

i) **মিউটেশান কাকে বলে?**

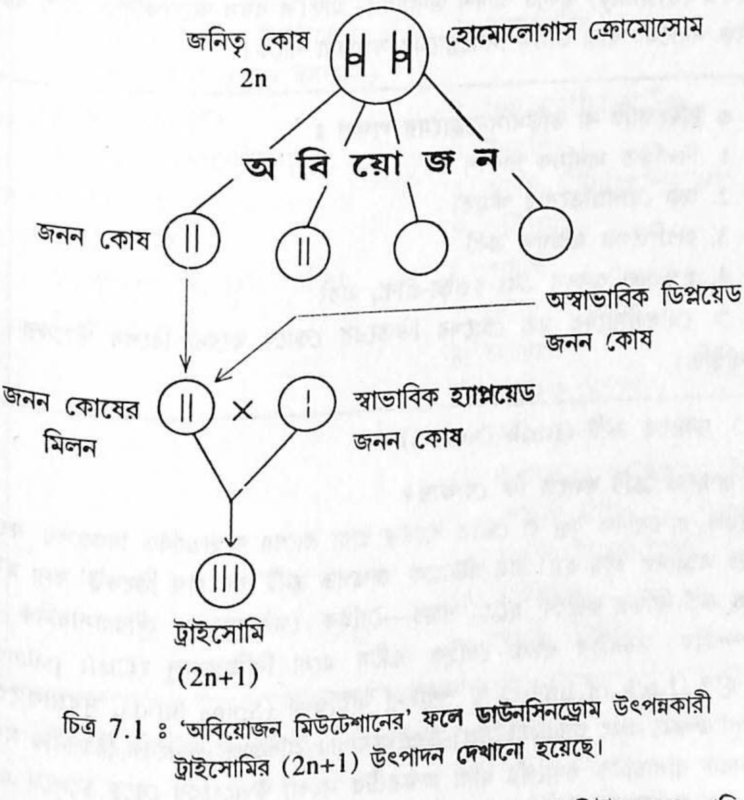
বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বা ভৌত শর্তের দ্বারা কোষে বংশগতির বস্তুর অনভিপ্রেত বা অস্বাভাবিক গঠনমূলক পরিবর্তনকে **'মিউটেশান'** বলা হয়। এবং মিউটেশানের উদ্দীপক পদার্থ বা শর্ত **'মিউটাজেন'** (Mutagen) নামে পরিচিত।

মিউটেশানে গঠনমূলক পরিবর্তন তিন ধরনের হতে পারে—(a) DNAএর নিজস্ব পরিবর্তন, (b) মাইক্রোস্কোপে দ্রষ্টব্য ক্রোমোসোমের গঠন পরিবর্তন (ক্রোমোসোমের উপাংশের হ্রাস বা পুনঃসজ্জা) এবং (c) স্বাভাবিক ক্রোমোসোম সংখ্যার হ্রাস বা বৃদ্ধি।

ii) মিউটাজেন ঃ যেসকল রাসায়নিক পদার্থ বা ভৌতশর্ত মিউটেশান সৃষ্টি করে তাদের মিউটাজেন বলা হয়। রাসায়নিক পদার্থ, যথা—ক্যাফেইন (Caffeine) এবং ভৌতশর্ত যথা অতি-বেগ্‌নী রশ্মি (UV-rays) এবং অন্যান্য উচ্চশক্তির বিকিরণ মিউটেশান সঙঘটনে সক্ষম।

iii) **মিউটেশানের পরম্পরা ঃ**

মানুষের ক্ষেত্রে মিউটেশান সাধারণত দেহকোষে (somatic cell) দেখা যায়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ত্বক এবং অস্থিকোষে মিউটেশান ঘটে। দেহকোষে মিউটেশানের হার অপেক্ষাকৃত অধিক হলেও বেশীরভাগক্ষেত্রে মিউটেশান পুনরুদ্ধারযোগ্য (repairable)। কোন কারণে পুনরুদ্ধার করা না গেলে মিউটেশান আক্রান্ত কোষ ক্যানসার কোষে রূপান্তরিত হতে পারে।



চিত্র 7.1 ঃ 'অবিয়োজন মিউটেশানের' ফলে ডাউনসিনড্রোম উৎপন্নকারী ট্রাইসোমির (2n+1) উৎপাদন দেখানো হয়েছে।

পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের যৌনাঙ্গের 'জননকোষ' (germ cell) মিউটাজেনের প্রতি কোন কোন ক্ষেত্রে অতিসংবেদনশীল। কোন কারণে জননকোষে অপুনরুদ্ধার কৃত মিউটেশান ঘটলে সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে মিউটেশান বংশানুসূত্রে বাহিত হয় (মিউটেন্ট স্পার্ম এবং

স্বাভাবিক ওভামের মধ্যে বা মিউটেন্ট ওভাম এবং স্বাভাবিক স্পার্মের মধ্যে নিষেক ঘটলে)। সন্তান-সন্ততিদের ভ্রূণে মিউটেন্টজিন বা লেথাল জিন এর উপস্থিতির কারণে জন্মগত ত্রুটি (birth defects), মৃত সন্তান প্রসব (still birth), স্বতঃস্ফূর্ত গর্ভপতন (spontaneous abortion), এবং জন্মানোর পরবর্তী অবস্থায় ক্যানসার, অস্বাভাবিক বিপাক [অস্বাভাবিক বিপাকজনিত অবস্থা যথা—অ্যালকেপটোনিউরিয়া (alkapto-nuria), ফিনাইলকিটোনিউরিয়া (phenylketonuria)] প্রভৃতি পরিলক্ষিত হয়। আবার মিউটেশানের ফলে কোষে ক্রোমোসোমের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটলেও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। মানুষের ক্ষেত্রে এরূপ একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে **'ডাউন সিনড্রোম'** (Down Syndrome)। এক্ষেত্র $2n = 47$ $(46 + 1)$ কারণ, জননকোষ উৎপাদনের সময় G-21তম ক্রোমোসোমের অবিয়োজন (non-disjunction) ঘটে। ডাউন সিমড্রোম ট্রাইসোমি'র (trisomy) একটি আদর্শ উদাহরণ। মাতা'র বয়স অপেক্ষাকৃত বেশি হলে রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা ডাউন সিনড্রোমের সম্ভাবনা থাকে।

- **ট্রাইজোমি বা ডাউনসিনড্রোমের লক্ষণ ঃ**

1. বিলম্বিত মানসিক বিকাশ
2. স্বল্প রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা
3. হৃৎপিণ্ডের জন্মগত ত্রুটি
4. হ্রস্ব-স্থূল অবয়ব এবং চওড়া-গ্রীবা, এবং
5. মোঙ্গলীয়দের মত চোখের ভিতরের কোণে ত্বকের বিশেষ ভাঁজের উপস্থিতি।

7.3.2.3. জন্মগত ত্রুটি (Birth Defects) ঃ

i) জন্মগত ত্রুটি বলতে কি বোঝায়?

বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তু বা ভৌত শর্তের দ্বারা ভ্রূণের অস্বাভাবিক বিকাশের ফলে ত্রুটিযুক্ত সন্তানের জন্ম হয়। এই ঘটনাকে **'জন্মগত ত্রুটি'** বা **'বার্থ ডিফেক্ট'** বলা হয়। জন্মগত ত্রুটি বিভিন্ন কারণে হতে পারে—দৈহিক (গঠনমূলক), জীবরাসায়নিক বা কার্যসম্পর্কীয়। সচরাচর দ্রষ্টব্য দৈহিক ত্রুটির মধ্যে **বিচ্ছিন্নতালু** (Cleft palate), **উপাঙ্গ-হ্রাস** (Lack of limbs) বা **স্পাইনা বাইফিডা** (Spina bifida, সুষুম্নাকাণ্ডের অসম্পূর্ণ-রুদ্ধতা এবং প্যারালাইসিস) উল্লেখযোগ্য। অধিকাংশ পরিবেশ বিজ্ঞানীর মতে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা জন্মত্রুটির সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে এবং বর্তমানে জন্মত্রুটির হার 10-12 শতাংশ বা তার বেশি।

ii) টেরাটোজেন (Teratogens) কি?

গ্রীক শব্দ 'টেরাটোজ' (terratos, কথার অর্থ বিকৃতাঙ্গ) থেকে টেরাটোজেন

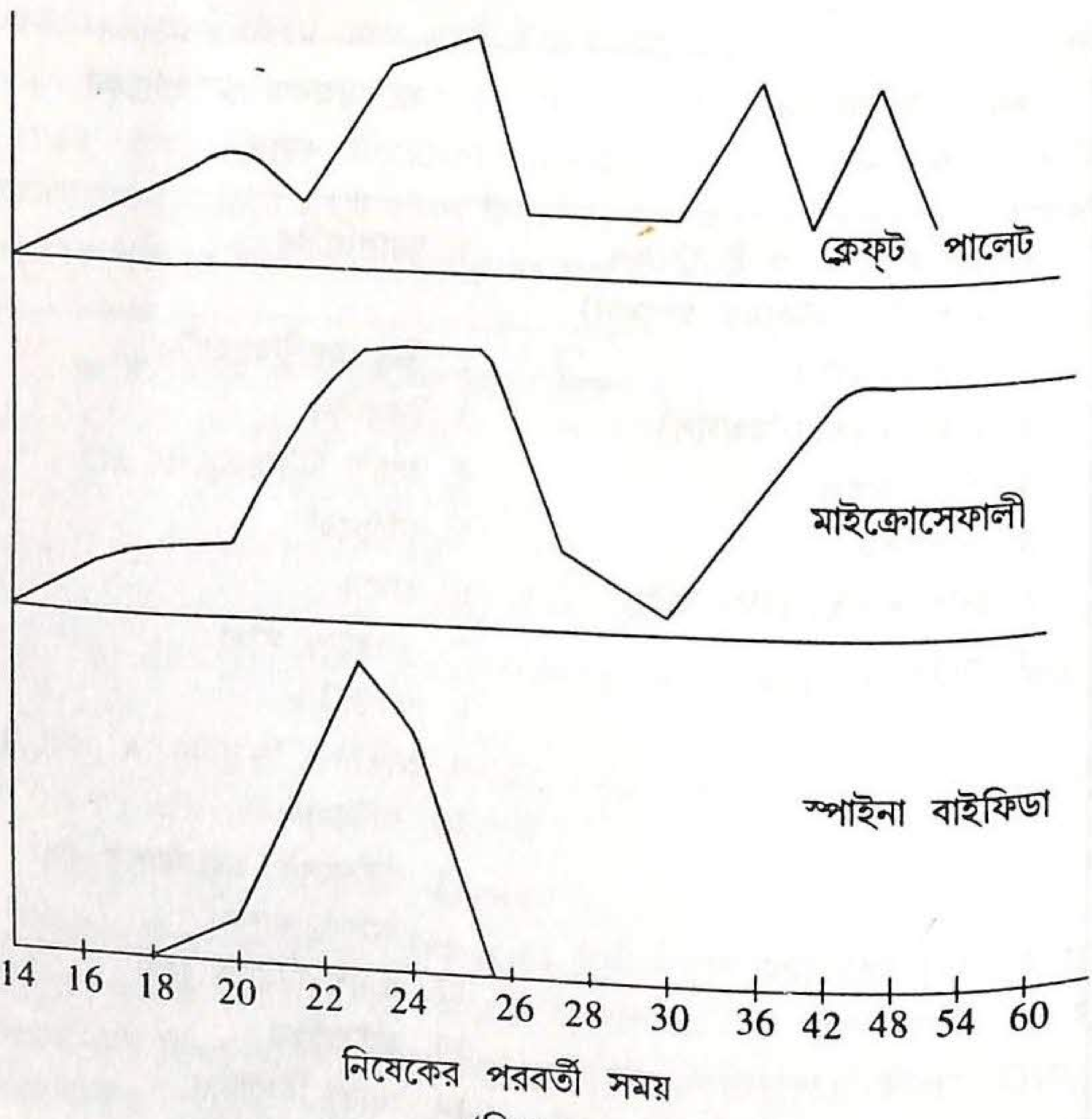
শব্দের উৎপত্তি। যেসব 'রাসায়নিক বস্তু' বা 'ভৌত শর্তের' দ্বারা জন্মত্রুটির ঘটনা ঘটে, তাদের **'টেরাটোজেন'** বলা হয়। মানুষের ক্ষেত্রে টেরাটোজেন হিসেবে কাজ করতে পারে বিভিন্ন ড্রাগ, পুষ্টি পদার্থ, মৌলিক উপাদান, কীটনাশক, অ্যালকোহল ও অন্যান্য বেভারেজ পানীয়, হরমোন, ভিটামিন, অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ; ভৌতশর্ত—UV এবং X বিকিরণ ; বা জৈবশর্ত ভাইরাস প্রভৃতি (তালিকা)। যদিও পরিবেশের রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা সৃষ্ট জন্মত্রুটির সঠিক পরিসংখ্যান এখনো'ও সুস্পষ্ট নয়।

জ্ঞাত টেরাটোজেন পদার্থ/শর্ত	সন্দেহজনক টেরাটোজেন পদার্থ/শর্ত
1. প্রোজেস্টেরন ও ইস্ট্রোজেন (স্ত্রীযৌন স্টেরয়েড হরমোন)	1. অ্যাসপিরিন
2. থ্যালিডোমাইড	2. কিছু অ্যান্টিবায়োটিক
3. ভাইরাস (যথা-মিজল্‌স)	3. ইনসুলিন
4. অ্যালকোহল	4. অ্যান্টি টিউবারকুলিন ড্রাগ
5. বেভারেজ	5. বার্বিচুরেট
6. বিকিরণ (X, UV– রশ্মি)	6. তামাক
7. পারদ	7. লোহা ও সীসা
	8. অ্যান্টাসিড
	9. অতিরিক্ত ভিটামিন 'A' এবং 'D'
	10. কর্টিসোন
	11. কীটনাশক, ছত্রাকনাশক এবং আগাছা-নাশক
	12. অ্যান্টি টিউমার ড্রাগ
	13. ডাইঅক্সিন
	14. অ্যান্টি হিস্টামিন

তালিকা 7.1 ঃ মানুষের জ্ঞাত এবং সন্দেহজনক টেরাটোজেন উল্লেখ করা হয়েছে।

iii) ভ্রূণবিকাশের কোন পর্যায়ে টেরাটোজেন সর্বাধিক ক্রিয়াশীল? ভ্রূণের বিকাশ তিনটি অনুক্রমিক পর্যায়ে সম্পন্ন হয় (a) প্রাথমিক অন্তঃজরায়ু দশায় ভ্রূণের বিকাশ (1–2 সপ্তাহ) ঃ নিষেকের পরবর্তী পর্যায়ে দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত জাইগোটের

প্রাথমিক বিকাশ ঘটে। (b) মূল বিকাশ বা অরগ্যানোজেনেসিস (3-8 সপ্তাহ) ঃ এই পর্যায়ে অঙ্গের বিকাশ ঘটে এবং (c) চূড়ান্ত বিকাশ (9-38 সপ্তাহ) ঃ এই পর্যায়ে অঙ্গের বিকাশ সম্পূর্ণ হওয়ার পর ভ্রূণের আকার বৃদ্ধি ঘটে। টেরাটোজেন ভ্রূণের দ্বিতীয় পর্যায়ের বিকাশের সময় অর্থাৎ অঙ্গবিকাশকালীন পর্যায়ে সর্বাধিক ক্রিয়াশীল। আবার ভ্রূণবিকাশের এই পর্যায়ে টেরাটোজেনের প্রতি বিভিন্ন অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে চূড়ান্ত সংবেদনশীলতা দেখায়।



চিত্র 7.2 ঃ অন্তঃজরায়ু দশায় টেরাটোজেনের প্রতি বিভিন্ন অঙ্গের সংবেদনশীলতা দেখানো হয়েছে। চূড়াযুক্ত চিত্র সংবেদনের পর্যায় নির্দেশ করছে।

অঙ্গ বিকাশের উপর টেরাটোজেনের প্রভাব ক্রিয়ার স্থায়িত্ব (অনাবরণের সময়) এবং টেরাটোজেনের রাসায়নিক প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। কয়েকপ্রকার বিশেষ টেরাটোজেন

আবার বিশেষ অঙ্গের বিকাশকে প্রভাবিত করে, যেমন মিথাইল-মারকারী (CH_3Hg) ভ্রূণের বিকাশশীল মস্তিষ্কের কোষ সমূহকে বিনষ্ট করে। অ্যালকোহল বিভিন্ন অঙ্গের বৃদ্ধির উপর প্রভাব ফেলতে পারে। অ্যালকোহলিক মাতার জাত সন্তানে বিভিন্ন অস্বাভাবিকতা দেখা যেতে পারে, যথা ঃ মুখমণ্ডলের বিকৃতি, হৃৎপিণ্ডের ত্রুটি এবং পেশীতন্ত্রের ত্রুটি।



চিত্র 7.3 ঃ শিশুর একপার্শ্বীয় অ্যামেলিয়া দেখানো হয়েছে
(মাতা গর্ভাবস্থায় থ্যালিডোমাইড নামক টেরাটোজেনের দ্বারা সংক্রমিত হলে
জাত শিশুর একপার্শ্বীয় অ্যামেলিয়া বা ম্যারোমেলিয়া সৃষ্টি হতে পারে)।

7.3.2.4. **জননসংক্রান্ত বিষক্রিয়া (Reproductive Toxicity) ঃ**

i) জননসংক্রান্ত বিষক্রিয়া বলতে কি বোঝায়?

বিভিন্ন ড্রাগ, ভৌতশর্ত এবং পরিবেশের বিষাক্ত-রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা জননপদ্ধতিতে বা জননকোষে অনভিপ্রেত পরিবর্তনের মাধ্যমে সন্তান উৎপাদনে বা সন্তানের জন্মোত্তর পর্যায়ে শারীরবৃত্তিয় ও গঠনমূলক অস্বাভাবিকতা, ক্যানসার এবং এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। ড্রাগ বা বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে জননসংক্রান্ত বিষক্রিয়ার এই ঘটনাকে 'জননসংক্রান্ত বিষক্রিয়া' বলা হয়।

ii) জনন সংক্রান্ত বিষক্রিয়ার কারণ এবং উপায়?

ঘরে, কর্মস্থলে বা বাইরের পরিবেশে মানুষ বিভিন্ন ধরনের বিষপদার্থের সংস্পর্শে আক্রান্ত

হয়। দেখা গেছে যে, যে সব পুরুষ-শ্রমিক কারখানায় DBCP (ডাইব্রোমোক্লোরোপ্রোপেন) সংশ্লিষ্ট কাজে লিপ্ত থাকে তারা সাময়িকভাবে বন্ধ্যা (sterile) হয়ে যায়। এছাড়া যে সকল শ্রমিক পেশাগত কাজে বিভিন্ন জৈব দ্রবণের সংস্পর্শে আসে তাদের বিভিন্ন পর্যায়ের বন্ধ্যাত্ব দেখা দিতে পারে যথা—অস্বাভাবিক শুক্রাণু, শুক্রাণুর সংখ্যার স্বল্পতা প্রভৃতি। অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ যথা—ডাইইথাইলস্টিলবেস্ট্রল (DES), বোরাক্স, ক্যাডমিয়াম, মিথাইল মারকারী এবং বিভিন্ন ড্রাগ যথা ক্যানসার প্রতিরোধকারী ড্রাগ, সিন্থেটিক ইস্ট্রোজেন প্রভৃতি পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের জননসংক্রান্ত বিষক্রিয়ায় সর্বাধিক ক্রিয়াশীল।

● বিদেশে একটি সমীক্ষায় জানা গেছে যে, ক্যানসারজনিত শিশু-মৃত্যুর প্রধান কারণ পিতা-মাতার সন্তান উৎপাদন কালে বিভিন্ন বিষক্রিয় রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে অনাবরণ। পাঁচ বছরের আগে ক্যানসারে মৃত এমন 386 জনশিশুর উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে অধিকাংশ শিশুর পিতারা কর্মস্থলে বিভিন্ন ধরনের হাইড্রোকার্বনের সংস্পর্শে আসত। কেউ কেউ রঙ তৈরির কারখানায় কাজ করত, আবার অনেকেই গাড়ী সারাই কারখানার মেকানিক ছিল। এক্ষেত্রে হাইড্রোকার্বন রক্তের মাধ্যমে শুক্রাশয়ে বাহিত হয়ে জননকোষের মিউটেশান ঘটায়। মিউটেন্ট জিন বংশানুক্রমে সন্তানে বাহিত হওয়ার ফলশ্রুতিতে ক্যানসারের সৃষ্টি হয়।

হাইড্রোকার্বন → রক্ত → শুক্রাশয় → শুক্রাণুর মিউটেশান → সন্তানের ক্যানসার

গণপ্রকৃতি	জননবিষ
রাসায়নিক পদার্থ—	ডাইব্রোমো ক্লোরোপ্রোপেন (DBCP) ডাইইথাইল স্টিলবেসস্ট্রল (DES) বোরাক্স, ক্যাডমিয়াম, মিথাইল মারকারী, জৈব দ্রাবক, হাইড্রোকার্বন
ড্রাগ—	ক্যানসারের ড্রাগ সিন্থেটিক ইস্ট্রোজেন

তালিকা 7.2 ঃ কতকগুলি জ্ঞাত জনন বিষের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

● **অ্যাজবেস্টাস এবং প্রভাব ঃ**

i) অ্যাজবেস্টাস কি ?

প্রকৃতিতে বিদ্যমান **'সিলিকেট খনিজ তন্তুর'** বর্গীয় নাম (generic name) **'অ্যাজবেস্টাস'**। তাপ, ঘর্ষণ, অ্যাসিড সহনশীলতা এবং উচ্চ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য অ্যাজবেস্টাসকে সিমেন্ট তৈরিতে, অট্টালিকার ইস্পাত গ্রিডারের অপরিবাহী আস্তরণের উপাদানরূপে, কারখানায় তাপীয় অপরিবাহী রূপে, ব্রেক প্যাডে এবং হেয়ার ড্রায়ারে ব্যবহার করা হয়।

ii) মানুষের উপর অ্যাজবেস্টাসের প্রভাব ঃ

অ্যাজবেস্টাস একটি বিপজ্জনক রাসায়নিক বস্তু। বায়ুর মাধ্যমে প্রশ্বাসের সময় অ্যাজবেস্টাস এর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তু বা দানা মানুষের ফুসফুসে ঢুকে পড়তে পারে। একবার ফুসফুসে ঢুকে গেলে জৈবিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লিষ্ট না হয়ে বা বেরিয়ে না গিয়ে সারা জীবন ফুসফুসে বাসা বাঁধে। অনাবরণের কিছুদিন পরে বা 10-20 বছর পরেও অ্যাজবেস্টাসের প্রভাবে বিভিন্ন বিপজ্জনক রোগের প্রকাশ ঘটে। অ্যাজবেস্টাস ঘটিত অধিকাংশ রোগই ফুসফুস ঘটিত যথা ঃ (a) **পালমোনারী ফাইব্রোসিস** (pulmonary fibrosis) বা অ্যাজবেস্টোসিস (asbestosis), (b) **ফুসফুসীয় ক্যানসার** এবং (c) **মেসোথেলিওমা** (mesothelioma)।

সাধারণ ফুসফুসীয় ক্যানসার ব্যতিরেকে **'মেসোথেলিওমা'** ক্যানসারের একমাত্র কারণ অ্যাজবেস্টাস। মেসোথেলিওমা হচ্ছে ফুসফুসের আবরণী বা প্লুরা (pleura) ঘটিত একমাত্র ক্যানসার যার প্রভাবে আক্রান্ত হওয়ার একবছরের মধ্যে আক্রান্ত মানুষ মারা যায়।

iii) অ্যাজবেস্টাস ঘটিত ক্যানসারের কারণ ঃ

অ্যাজবেস্টাস ঘটিত ফুসফুসীয় ক্যানসারের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন মতভেদ রয়েছে। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন অ্যাজবেস্টাস কোষে ঢুকে বৃদ্ধি সহায়ক জিন এর ক্রিয়াকে নষ্ট করে দেয়, ফলে কোষের বৃদ্ধিজনিত ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় এবং কোষ অনিয়মিত হারে বিভাজিত হতে থাকে। আবার অনেক বিজ্ঞানীর মতে অ্যাজবেস্টাস কোষের ক্যানসারসৃষ্টিকারী জিনকে সক্রিয় করে তোলে, ফলে কোষ বিভাজন অধিকতর মাত্রায় উদ্দীপ্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, আমেরিকায় 1979 সাল থেকে অ্যাজবেস্টাসের ব্যবহারের উপর বিধি নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। 1986 সালে আমেরিকার 'এনভিরনমেন্টাল প্রোটেকশান এজেন্সি' (EPA) দ্বারা চূড়ান্তভাবে সমস্ত প্রকার অ্যাজবেস্টাসের নূতন ব্যবহারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই বিধিনিষেধ মূলক—সতর্কীকরণের আগে বলা হয়েছে যে, 1996 সালের মধ্যে ধীরে ধীরে সকল প্রকার অ্যাজবেস্টাসের উৎপাদন এবং ব্যবহার বন্ধ করা হবে।

7.4. টক্সিন (বা বিষ) কিভাবে কাজ করে?

বিষাক্ত পদার্থ বা টক্সিন প্রধানত তিন উপায়ে কোষীয় স্তরে কাজ করে ঃ

a) কোষের রাসায়নিক বিক্রিয়া অনুঘটনকারী উৎসেচক-প্রোটিনের কাজকে বাধাদান করে বা উৎসেচককে নিষ্ক্রিয় করে টক্সিন কাজ করতে পারে। এক্ষেত্রে বিশেষ অঙ্গ বা কলার ক্রিয়ার অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। যেমন পারদ এবং আর্সেনিক বিশেষ উৎসেচকের কার্যকরী গঠনবিন্যাসকে পরিবর্তিত করে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

$$Enz - SH + CH_3Hg$$
$$\downarrow$$
$$Enz - S - Hg + CH_4$$

Enz – SH ঃ সালফ্‌হাইড্রিল গ্রুপযুক্ত উৎসেচক। এই গ্রুপ উৎসেচকের 'সক্রিয় অংশে' অবস্থান করে।

(b) যেকোন কোষ বা কোষীয় অণুর সঙ্গে টক্সিন সরাসরি যুক্ত হয়ে রাসায়নিক ভারসাম্যের অস্থিতিকরণের মাধ্যমে কাজ করতে পারে। উদাঃ বিষাক্ত কার্বনমনোক্সাইড গ্যাস (CO) রক্তের লোহিত কণিকা স্থিত হিমোগ্লোবিনের (Hb) সঙ্গে যুক্ত হয়ে অক্সিজেন পরিবহনে বাধা দেয়। এক্ষেত্রে 'কার্বনমনোক্সাইড' হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে স্থায়ী 'কার্বামিনো যৌগ' উৎপন্ন করে।

$$Hb - NH_2 + CO \rightarrow Hb - N \begin{cases} CO \\ H \end{cases}$$

c) কিছু টক্সিন দেহের মধ্যে কোষীয় রাসায়নিক পদার্থের নিঃসরণ অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি করে কাজ করতে পারে। এক্ষেত্রে নিঃসৃত রাসায়নিক বস্তু মন্দ প্রভাব সৃষ্টি করে। যেমন, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4) অ্যাড্রিনালিন গ্রন্থি থেকে **'এপিনেফ্রিনের'** ক্ষরণ বহুগুণ বৃদ্ধি করতে পারে। এর ফলে যকৃতের ক্যানসার ঘটার সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে যায়।

7.5. টক্সিক পদার্থের বিষক্রিয়ায় বিভিন্ন শর্তের প্রভাব ঃ

নিম্নলিখিত বিভিন্ন শর্ত টক্সিক রাসায়নিক পদার্থের বিষক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। শর্তগুলির মধ্যে প্রথমোক্ত দুটি শর্তই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

i) মাত্রা এবং ক্রিয়াকাল (Dose and Duration)

ii) জৈব সক্রিয়তা (Biological Activity)

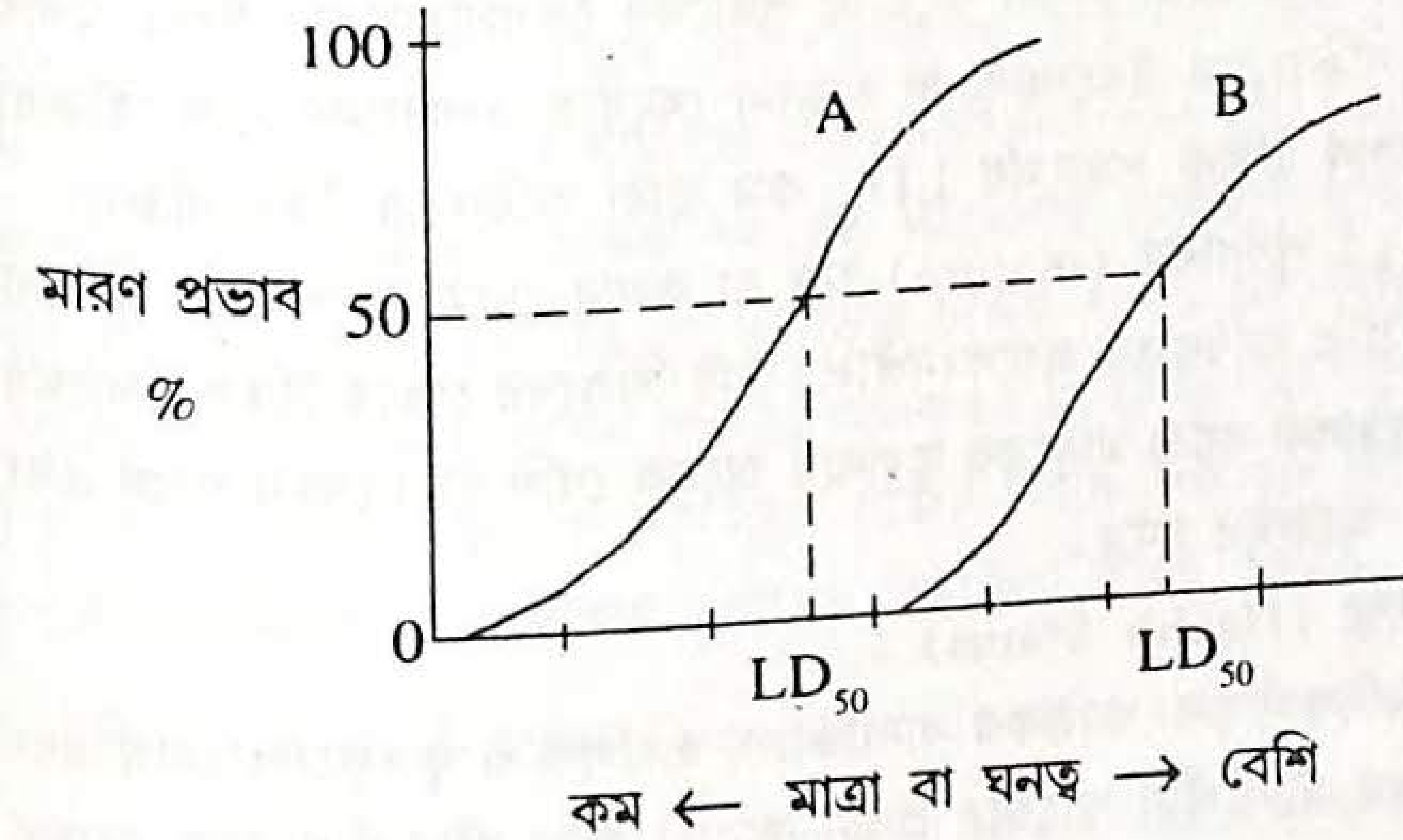
iii) বয়স (Age)

iv) স্বাস্থ্যের অবস্থা (Health Status)

এবং v) সহযোগিতা ও বিরোধিতা (Synergy and Antagonism)

i) মাত্রা এবং ক্রিয়াকাল (Dose and Duration) ঃ

টক্সিক পদার্থের মাত্রা বেশি এবং প্রকটকাল দীর্ঘ হলে বিষক্রিয়া অপেক্ষাকৃত বেশি হয়। কোন টক্সিক পদার্থের মাত্রার প্রভাব পর্যবেক্ষণ করার জন্য ঐ টক্সিক পদার্থের বিভিন্ন মাত্রা পরীক্ষা-প্রাণীর উপর প্রয়োগ করে প্রতিক্রিয়া দেখা হয়। পরীক্ষালব্ধ ফল



চিত্র 7.4 ঃ 'A' এবং 'B' দুটি ভিন্ন টক্সিক পদার্থের 'মাত্রা-প্রতিক্রিয়া লেখ' দেখানো হয়েছে।

থেকে যে রেখা-লেখচিত্র পাওয়া যায় তাকে **'মাত্রা-প্রতিক্রিয়া লেখ'** বা 'ডোজ রেসপনস্ কার্ভ' (Dose Response Curve) বলে (চিত্র ঃ 7.4)। টক্সিকপদার্থের বা টক্সিনের যে মাত্রায় অর্ধেক পরীক্ষাপ্রাণী মারা যায়, সেই মাত্রাকে LD_{50} বা 50 শতাংশ পরীক্ষাপ্রাণীর

টক্সিক পদার্থ	LD_{50} (mg/kg)
মরফিন সালফেট	900
DDT	100
ফেনোবার্বিটাল সোডিয়াম	150
পিক্রোটক্সিন	5
নিকোটিন	1
d-টিউবোকিউরারিন	0.5
টেট্রোডোটক্সিন	0.10
বটুলিনাস টক্সিন	0.00001

তালিকা 7.3 ঃ কয়েকটি টক্সিক পদার্থের অ্যাকিউট LD_{50} দেখানো হয়েছে।

'মারণমাত্রা' (lethal dose) বলা হয়। এই LD_{50} তুলনা করে যে কোন দুটি টক্সিক পদার্থের মধ্যে বিষক্রিয়ার মাত্রা বিবেচনা করা হয়। ধরা যাক, 'A' এবং 'B' দুটি টক্সিক পদার্থ, 'A' টক্সিক পদার্থের LD_{50} = 50 mg/kg দেহ ওজন, এবং 'B' পদার্থের LD_{50} = 100 mg/kg দেহ ওজন। এক্ষেত্রে 'A' পদার্থ 'B' পদার্থ অপেক্ষা অধিকতর টক্সিক। অর্থাৎ কোন রাসায়নিকের LD_{50} কম হলে ঐ রাসায়নিক পদার্থ অধিকতর টক্সিক হয়।

ii) **জৈবসক্রিয়তা** (Biological Activity) ঃ

কোন টক্সিক পদার্থের তীব্রতা নির্ভর করে ঐ পদার্থের জৈবসক্রিয়তার উপর অর্থাৎ টক্সিক পদার্থ কতটা সক্রিয়তায় উৎসেচক বা অন্যান্য কোষীয় উপাদানের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তার উপর। যেসব টক্সিক পদার্থের LD_{50} কম তারা অধিকতর জৈব-সক্রিয়।

iii) **বয়স** (Age) ঃ পূর্ণবর্ধিত (mature) অঙ্গ বা কলার চেয়ে অপূর্ণবর্ধিত অঙ্গ বা কলা টক্সিক পদার্থের প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল। তাই শিশুদের ক্ষেত্রে টক্সিক পদার্থের দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা বয়স্ক মানুষের তুলনায় অনেক বেশি হয়। যেমন পারদ এবং সীসা শিশুদের বেশি আক্রমণ করে।

iv) **স্বাস্থ্যের অবস্থা** (Health Status) ঃ

ত্রুটিপূর্ণ পুষ্টি, মানসিকপীড়ন, ক্ষতিকর খাদ্যাভ্যাস, হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের রোগ এবং ধূমপান প্রভৃতি মানুষের জীর্ণ-শীর্ণ স্বাস্থ্যের প্রধান কারণ। স্বাস্থ্য জীর্ণ-শীর্ণ হলে দেহের অনাক্রম্য তন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে টক্সিক পদার্থের প্রতি অধিক সংবেদনশীলতা সৃষ্টি হয়। স্বাস্থ্যের ক্ষতিকারক যে কোন কারণই টক্সিক পদার্থের দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে।

v) **সহযোগিতা এবং বিরোধিতা** (Synergism and Antagonism) ঃ

দুই বা ততোধিক টক্সিক পদার্থ একত্রে ক্রিয়াকরে বিষক্রিয়ার মাত্রাকে যখন অভিপ্রেত মাত্রার তুলনায় অনেক বেশি বিবর্ধিত করে, তখন সেই ঘটনাকে **'সহযোগিতা'** বলা হয়। এক্ষেত্রে দুটি টক্সিক পদার্থের পৃথকক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট বিষক্রিয়ার যোগফলের চেয়ে টক্সিক পদার্থদ্বয়ের একত্রে ক্রিয়ার ফলে বিবর্ধিত বিষক্রিয়ার মাত্রা অনেক বেশি হয়। যেমন অ্যালকোহল এবং বার্বিচুরেট ট্রাঙ্কুইলাইজার একত্রে খেলে বিষক্রিয়ার ফলে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে, কিন্তু পৃথকভাবে পৃথকসময়ে খেলে বার্বিচুরেট বা অ্যালকোহলের প্রভাবে তেমন বিষক্রিয়া ঘটার সম্ভাবনা নেই।

আবার বিপরীত ঘটনাও সম্ভব। একটি ট্রক্সিক পদার্থের সঙ্গে কোন বিশেষ টক্সিক পদার্থের একত্রে প্রয়োগে বিষক্রিয়ার মাত্রা পৃথক ক্রিয়ার তুলনায় অনেক কম হয়। এই ঘটনাকে **'বিরোধিতা'** বলা হয়। এইক্ষেত্রে একে অপরের বিষক্রিয়াকে অকার্যকর (negating) করে। যেমন নাইট্রাস অক্সাইড (NO) গ্যাসের প্রভাবে মাইসের (mice) মৃত্যুহার অনেক কমে যায়, যদি নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাসের সঙ্গে বিশেষ দানাকৃতি বা পার্টিকুলেট দূষক মিশ্রিত থাকে।

7.6. জীবকেন্দ্রীভবন (Bioconcentration) এবং জীববিবর্ধন (Bio-magnification) ঃ

উপরিউক্ত পাঁচটি শর্ত ছাড়া টক্সিক পদার্থের বিষক্রিয়া প্রভাবনকারী দুটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে 'জীবকেন্দ্রীভবন' এবং 'জীববিবর্ধন' (তৃতীয় অধ্যায়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে)। বিভিন্ন উদ্ভিজ ও প্রাণীজ খাদ্য এবং পানীয় দ্রব্যের মাধ্যমে ধাতব এবং জৈব টক্সিক রাসায়নিক পদার্থ যথা ঃ দস্তা, সীসা, পারদ, অ্যাজবেস্টাস এবং DDT মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। এইসব উপাদান জীবকোষে অবিনষ্ট (Non-biodegradable) এবং লিপিড দ্রাব্য হওয়ায় কোষে (বিশেষ করে চর্বি কোষে) স্থায়ীভাবে বাসা বাঁধে এবং পুঞ্জীভূত হয় (এই ঘটনাকে জীবকেন্দ্রীভবন বলা হয়)। মানুষের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোষে পুঞ্জীভূত টক্সিক পদার্থের পরিমাণও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায় (এই ঘটনা জীববিবর্ধন নামে পরিচিত)। এছাড়া পুঞ্জীভূত টক্সিক পদার্থ যদি অধিকতর জীবসক্রিয় হয় তাহলে কোষীয় উৎসেচকের প্রভাবে অধিকতর ক্রিয়াশীল বা সক্রিয় টক্সিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। এই সক্রিয় বা অধিকতর সক্রিয় টক্সিক পদার্থের জীবকেন্দ্রীভবন এবং জীবপুঞ্জীভবন যতই বাড়ে টক্সিক পদার্থের বিষক্রিয়া ততই বাড়ে।

7.7. টক্সিক পদার্থের নিয়ন্ত্রণ (Control of Toxic Substance) ঃ

টক্সিক পদার্থের বিষক্রিয়া থেকে মানুষ তথা জীব সম্প্রদায়কে রক্ষার জন্য আইনানুগ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। টক্সিক পদার্থের নিয়ন্ত্রণে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

i) কোন নতুন রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন বা আমদানীর আগে সংশ্লিষ্ট দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থাকে অবহিত করা উচিত।

ii) সমস্ত প্রকার টক্সিক পদার্থের পুনঃউৎপাদন বন্ধ করা এবং পর্যায়ক্রমে টক্সিক পদার্থগুলিকে সরিয়ে ফেলা উচিত।

iii) প্রচলিত সবধরনের রাসায়নিক পদার্থের বিষক্রিয়া সম্পর্কীয় পুনর্বিবেচনা এবং অনুসন্ধান জরুরী।

iv) খাদ্য এবং পানীয়ের সঙ্গে টক্সিক পদার্থের সংক্রমণ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ অত্যন্ত জরুরী। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, খাদ্য বা পানীয়ের সঙ্গে মিশ্রিত কোন টক্সিক খাদ্য-সংযোজিত বস্তুর মাত্রা খাদ্য বা পানীয়ের পাত্রে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকা জরুরী। যদি টক্সিক খাদ্য-সংযোজিত বস্তুর মাত্রা ন্যূনতম সহ্যমাত্রার থেকে বেশি হয়, তাহলে বাজার থেকে সেগুলিকে অবিলম্বে প্রত্যাহার করা এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তুতকারক সংস্থার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা উচিত।

v) টক্সিক পদার্থ সমৃদ্ধ খাদ্য, পানীয় এবং বেভারেজের ব্যবহার বন্ধ হওয়া উচিত।

vi) টক্সিক পদার্থ যুক্ত আবর্জনা বা জঞ্জালের সঠিক প্রক্রিয়াকরণ জরুরী।

vii) যানবাহন, শিল্প-কারখানা প্রভৃতিতে টক্সিক পদার্থের ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণের সঠিক ও উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কীয় ছাড়পত্র থাকা জরুরী।

7.8. খাদ্য-সংযোজিত বস্তু (Food Additives) ঃ

খাদ্যের রঙ এবং অপমিশ্র বা ভেজাল রূপে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ মানুষের শরীরে প্রতিনিয়ত প্রবেশ করছে, এই সমস্ত খাদ্য-সংযোজিত রাসায়নিক পদার্থের অধিকাংশই ভয়ানক বিপজ্জনক। কিন্তু মানুষের স্বাস্থ্য বা জীবন এবং সামগ্রিকভাবে পরিবেশকে উপেক্ষা করেই একশ্রেণীর অসৎ, লোভী ব্যবসায়ীর চক্রান্তে খাদ্যে-সংযোজিত রাসায়নিক টক্সিক পদার্থের পরিমাণ উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। কয়েকটি বিশেষ খাদ্য রঙ এবং খাদ্য ভেজালের কথা উল্লেখ করা হল।

i) মেটানিল ইয়ালো (Metanil yellow) ঃ মেটানিল ইয়ালো হচ্ছে কমলা বা কিশোরী বর্ণের অ-অনুমোদিত (non-permitted) কোলটার রঙ। অতি উচ্চ ক্যানসারকারক (carcinogenic) ক্রিয়ার জন্যই খাদ্যের রঙ হিসেবে মেটানিল ইয়ালোর ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আইনকে তোয়াক্কা না করে এখনোও বিভিন্ন খাদ্য যথা—মিঠাই (বোঁদে, অমৃতি এবং অন্যান্য কমলা বা হলুদ রঙের মিষ্টি), আইসক্রিম, বেভারেজ, ডাল প্রভৃতিতে মেটানিল ইয়ালো নিয়মিত ব্যবহার করা হচ্ছে।

ii) রোডামিন-বি (Rhodamin-B) ঃ রোডামিন-'B' একধরনের নিষিদ্ধ গোলাপী বর্ণের কোলটার-রঙ। বিভিন্ন মিষ্টি, আইসক্রিম এবং বেভারেজে এই রঙের অবাধ ব্যবহার।

> ● দোকান থেকে খাদ্যে সংযোজনশীল রঙ কেনা বা সংগ্রহ করার পূর্বে দুটি বিষয়ে অবহিত থাকা অত্যাবশ্যক ঃ
>
> a) রঙের প্যাকেটের উপর ISI চিহ্ন আছে কিনা এবং b) প্যাকেটের উপর 'মানুষের খাদ্যোপযোগী' কথাটি (Fit for Human Consumption) লেখা আছে কিনা।

iii) অ্যারাকোলিন (Aracolin) ঃ পান মশলা এবং সুপারিতে যে রঙ দেওয়া হয় তাতে 'অ্যারাকোলিন' নামক অতি বিপজ্জনক রাসায়নিক বস্তু থাকে, যা কারসিনোজেন রূপে কাজ করে।

iv) অ্যালুমিনিয়াম পাত (Aluminium foil) ঃ অ্যালুমিনিয়াম একটি টক্সিক ধাতু। কিন্তু সন্দেশ ও অন্যান্য মিঠাই এর ঔজ্জ্বল্যকরণে অ্যালুমিনিয়ামের অতি পাতলা শ্বেত-ধূসর ফয়েল ব্যবহার করা হয়।

v) স্যাকারিন (Saccharin) ঃ স্যাকারিন একটি পেট্রোলিয়াম জাত অতি মিষ্টি রাসায়নিক পদার্থ, যার অতি-ব্যবহারে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কিন্তু চিনির বিকল্প হিসেবে মিঠাই, আইসক্রিম, বেভারেজ তৈরি করতে এবং পান মশলায় মাত্রাধিক স্যাকারিনের ব্যবহার ঘটে।

vi) ট্রাই-অর্থো-ক্রিসাইল ফসফেট (TOCP, Tri-O-cresyl Phosphate) ঃ
TOCP একধরনের মারাত্মক বিষক্রিয়া সৃষ্টিকারী রাসায়নিক পদার্থ যা ভোজ্য তেলে কখনো কখনো ভেজাল দেওয়া হয়। এই রাসায়নিকের প্রকটের অতি-অল্পসময়ের মধ্যে পঙ্গুত্ত (Paralysis) এবং মৃত্যু অবধারিত।

vii) খেসারী ডালের গুঁড়ো (Khesari Flour) ঃ
অধুনা খেসারী ডাল খাদ্য হিসেবে নিষিদ্ধ হয়েছে। কারণ খেসারী ডালে রয়েছে পঙ্গুত্ব সৃষ্টিকারী একধরনের মারাত্মক জৈব-যৌগ—BOAA (β-N-oxalyl amino α-alanine)। কিন্তু 'বেসনে' (Besan) খেসারী ডালের গুঁড়ো ভেজাল হিসেবে ব্যবহার করা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা, যদিও বেসন শুধুমাত্র ছোলার ছাতু থেকে তৈরি হওয়ার কথা।

viii) উপরিউক্ত খাদ্য-সংযোজিত বস্তু ছাড়া দুধে জল ও শ্বেতসার (starch) দ্রবণ, ঘি এবং মাখনে **বনস্পতি বা মার্জারিন**, চিনিতে **'চক'** পাউডার, ভোজ্যতেলে **খনিজ তেল** এবং **রেড়ির তেল**, লঙ্কার পাউডারে **ইঁটের** এবং **লবণের পাউডার**, সাধারণ নুনে **সাদা নুড়ি পাউডার** এবং ভিনিগারে **'খনিজ অ্যাসিড'** ভেজাল বা অপমিশ্রণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

খাদ্যের নাম	অপমিশ্রিত বস্তু	সনাক্তকরণের পদ্ধতি
1. মিঠাই, আইসক্রিম	মেটানিল ইয়ালো	কিছু পরিমাণ খাদ্য নমুনা এবং বেভারেজ পরীক্ষানলে সংগ্রহ করার পর জল মিশিয়ে ভালোভাবে ঝাঁকানো হয়। এই অবস্থায় কয়েকফোঁটা লঘু HCl যোগ করা হয়। জলীয় অংশে ফেকাশে লাল রঙ (Pink)-এর আবির্ভাব মেটানিল ইয়ালোর উপস্থিতি প্রমাণ করে।
	স্যাকারিন	দু চা-চামচ তরল খাদ্য নমুনা বা 5-10 গ্রাম কঠিন খাদ্য-নমুনা অল্প পরিমাণ জল সহযোগে একটি পরীক্ষা নলে নেওয়া হয়। পরীক্ষা নলে কয়েক ফোঁটা HCl এবং 10 ml ইথার দ্রাবক যোগ করে উত্তম রূপে

খাদ্যের নাম	অপমিশ্রিত বস্তু	সনাক্তকরণের পদ্ধতি
		ঝাঁকানো হয় এবং ইথার অপসারণের জন্য (বাষ্পীভবনের মাধ্যমে) কিছু সময় অপেক্ষা করা হয়। ইথার বাষ্পীভবনের পরে অবশেষে একফোঁটা উষ্ণ জল মিশিয়ে অবশেষের স্বাদ (taste) নেওয়া হয়। মিষ্টি স্বাদ স্যাকারিনের উপস্থিতি প্রমাণ করে।
2. মিঠাই	অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল	অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল (পাতলা শ্বেত ধূসর রঙের পাত) ঘন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে (HCl) দ্রাব্য কিন্তু খাঁটি অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল ঘন HCl-এ দ্রাব্য নয়।
3. বেসন	খেসারী ডালের গুঁড়ো	একটি বিকারে 10 গ্রাম বেসন নমুনায় 50 ml লঘু HCl মিশিয়ে বিকারটিকে টগবগে ফুটন্ত জলে 15 মিনিট রাখার পর যদি ফ্যাকাশে লাল রঙের সৃষ্টি হয় তাহলে বেসনে খেসারী ডালের উপস্থিতি নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়।
4. ঘি এবং মাখন	বনস্পতি বা মার্জারিন	একটি ছিপিযুক্ত পরীক্ষানলে এক চা-চামচ ঘি বা মাখন এবং একই পরিমাণ ঘন HCl ও অল্পপরিমাণ চিনি নিয়ে উত্তমরূপে একমিনিট মেশান হয় এবং পাঁচ মিনিট মিশ্রণটিকে স্থিরভাবে রাখা হয়। পরীক্ষা-নলের নীচের স্তর (অ্যাসিড স্তর) গাঢ় লাল বর্ণধারণ করলে ঘি বা মাখনে বনস্পতি বা মার্জারিনের নিশ্চিত ভাবে উপস্থিতি প্রমাণিত হয়।

খাদ্যের নাম	অপমিশ্রিত বস্তু	সনাক্তকরণের পদ্ধতি
5. দুধ	জল	i) ল্যাকটোমিটারের পাঠ (reading) কখনোই 26-এর কম হয় না। ii) এক ফোঁটা দুধকে মসৃণ আনত মেঝে বা তলে ফেললে দুধের ফোঁটা যদি গড়িয়ে না পড়ে বা গড়িয়ে পড়লেও দুধের অবশিষ্ট অংশ গড়িয়ে যাওয়ার পশ্চাৎ পথে লেগে থাকে, তাহলে দুধ খাঁটি। কিন্তু দুধে জল থাকলে ফোঁটা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে গড়িয়ে পড়ে এবং গড়িয়ে পড়ার পথে দুধের অবশিষ্টাংশ লেগে থাকে না।
6. চিনি	চক্ পাউডার	10 গ্রাম চিনির নমুনাকে এক গেলাস জলে দ্রবীভূত করে কিছুক্ষণ রাখার পর চকের পাউডার গেলাসের দ্রবণের নিম্ন অংশে থিতিয়ে পড়ে।

তালিকা 7.4 : খদ্যের অপমিশ্রণ (ভেজাল) সনাক্তকরণের পদ্ধতি।

তথ্যসূত্র : Adulterants in food, simple tests for Consumers,
Compiled by : Central food laboratory, Calcutta.

7.9. পেস্টিসাইড (Pesticides) বা কীট-পতঙ্গাদির নাশক :

7.9.1. পেস্টিসাইড কাকে বলে?

যে সব বিষাক্ত জৈব রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন অবাঞ্ছিত জীবকে ধ্বংস করতে বা নিয়ন্ত্রণ করতে (যথা—জনন পদ্ধতিতে ব্যতিচার বা পথিমধ্যে বাধা দিয়ে) **ব্যবহার করা হয়, তাদের পেস্টিসাইড বলা হয়।** অবাঞ্ছিত জীব বলতে মানুষের রোগজীবাণুর বাহক বিভিন্নপতঙ্গ এবং কাঙ্খিত উদ্ভিদ বা শস্যের রোগসৃষ্টিকারী বা ক্ষতিসাধনকারী প্রাণী ও উদ্ভিদ যথা পতঙ্গ, পাখি, ইঁদুরজাতীয় প্রাণী, মাছ, নিমাটোড, মলাস্কা, লার্ভা, শৈবাল, ছত্রাক, আগাছা এবং ব্যাক্টিরিয়া প্রভৃতিকে বোঝায়।

7.9.2. পেস্টিসাইডের প্রকারভেদ :

মুখ্যত তেরো প্রকারের পেস্টিসাইড ব্যবহার করা হয় (তালিকা 7.5)। ব্যবহৃত মোট পেস্টিসাইডের প্রায় অর্ধেক ইনসেক্টিসাইড, হার্বিসাইড এবং ফাংগিসাইড।

ইনসেক্টিসাইড পতঙ্গ এবং হার্বিসাইড উদ্ভিদ ধ্বংস করতে ব্যবহার করা হয়। ফাঙ্গি-সাইড বিভিন্ন ছত্রাক ধ্বংস এবং নিয়ন্ত্রণে করতে ব্যবহার করা হয়।

পেস্টিসাইডের প্রজাতি	অভীষ্ট জীব
ইনসেক্টিসাইড (পতঙ্গ নাশক)	পতঙ্গ
হার্বিসাইড (উদ্ভিদ নাশক)	উদ্ভিদ
ফাংগিসাইড (ছত্রাকনাশক)	ছত্রাক
অ্যাকারিসাইড (মাকড়নাশক)	উইপোকা
অ্যালগিসাইড (শৈবালনাশক)	শৈবাল
অ্যাভিসাইড (পাখিনাশক)	পাখি
ব্যাক্টেরিসাইড (ব্যাক্টিরিয়া নাশক)	ব্যাক্টিরিয়া
ডিসইনফেকটেন্ট (অসংক্রামক)	আণুবীক্ষণিক জীব
লার্ভিসাইড (লার্ভা নাশক)	পতঙ্গের লার্ভা
মলাস্কিসাইড (মলাস্কা নাশক)	শামুক
নিমাটিসাইড (নিমাটোড নাশক)	নিমাটোড
পিসিসাইড (মাছ নাশক)	মাছ
রডেনটিসাইড (ইঁদুর নাশক)	ইঁদুর জাতীয় প্রাণী

তালিকা 7.5 : পেস্টিসাইডের প্রজাতি এবং প্রতিটি প্রজাতির অভীষ্ট জীব দেখানো হয়েছে।

7.9.3. ইনসেক্টিসাইড (Insecticides) :

বিশ্বে ইনসেক্টিসাইডের জনপ্রিয়তার মূল কারণ পতঙ্গ (যথা মশা, মাছি) এবং ইঁদুরজাতীয় প্রাণীর মাধ্যমে সংক্রামিত রোগ যথা : ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর, বিউবোনিক প্লেগ এবং স্লিপিং সিক্‌নেস প্রভৃতি রোগে মানুষের মৃত্যুকে রোধ করা এবং শস্যের উৎপাদন, সংগ্রহ ও সঞ্চয়কালে পতঙ্গের দ্বারা খাদ্য-শস্যের বিনাশকে বাধা দেওয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ এবং গ্রীষ্মমণ্ডলে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৈনিকদের পতঙ্গ-সংক্রামিত রোগের মড়ক থেকে রেহাই এবং অধিক পরিমাণ খাদ্য-শস্য উৎপাদনে বিভিন্ন ইনসেক্টিসাইডের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

7.9.3.1. অর্গ্যানোক্লোরিন ইনসেক্টিসাইড (Organo Chlorine Insecticides) :

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রোগ সৃষ্টিকারী এবং শস্য বিনাশকারী পতঙ্গ ধ্বংস করার জন্য অর্গ্যানোক্লোরিন ইনসেক্টিসাইড প্রথম আবিষ্কৃত হয়। বহুল ব্যবহৃত এই শ্রেণীর ইনসেক্টিসাইডের মধ্যে ডি.ডি.টি (DDT), লিনডেন, টক্সাফিন, ডায়েলড্রিন উল্লেখযোগ্য

(তালিকা 7.6)। অর্গ্যানোক্লোরিন ইনসেক্টিসাইডের পরিবেশ বিষক্রিয়ার মূলে রয়েছে কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঃ

i) জলে অদ্রাব্যতা (বা খুব কম দ্রাব্যতা),

ii) হাইড্রোকার্বন পরিবেশ যথা জীবের লিপিড উপাদানে অধিক দ্রাব্যতা,

iii) পরিবেশে বা জীবপরিবেশে অবিনষ্টতা,

এবং iv) পতঙ্গ এবং মানুষের প্রতি অধিক এবং অল্পবিষক্রিয়া।

এই ধরনের ইনসেক্টিসাইড লিপিড দ্রাব্য হওয়ায় খুব সহজেই সজীব জীব তথা মানুষের দেহে ঢুকে পড়ে এবং জীবদেহে অবিনষ্ট হওয়ায় ক্রমপুঞ্জীভূত হয়। এই পুঞ্জীভবনের মাত্রা খাদ্যশৃঙ্খলের উপরের ট্রফিক লেভেলের জীবে সর্বাপেক্ষা বেশি হয়। জীবপুঞ্জীভবনের ফলে সৃষ্ট বিষক্রিয়ায় মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হওয়ায় অধিকাংশ অর্গ্যানোক্লোরিন ইনসেক্টিসাইডের ব্যবহার (বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া) নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কয়েকটি ইনসেক্টিসাইডের প্রকৃতি, ব্যবহার এবং পরিবেশগত প্রভাব আলোচনা করা হল।

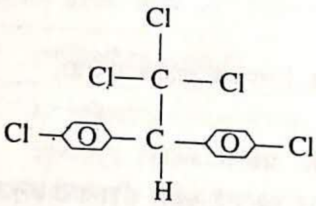
অর্গ্যানোক্লোরিন ইনসেক্টিসাইড	LD_{50} (mg/kg)
1. DDT (ডিডিটি)	115
2. টক্সাফিন	85
3. লিনডেন (গামা BHC)	
4. সাইক্লোপেন্টাডিয়েন	
a) অলড্রিন	40
b) ডায়েলড্রিন এবং এনড্রিন	46
c) মাইরেক্স	700
d) এণ্ডোসালফান	

তালিকা 7.6 ঃ অর্গ্যানোক্লোরিন ইনসেক্টিসাইড এবং তাদের LD_{50} দেখানো হয়েছে।

1. ডিডিটি (DDT) ঃ

a) রাসায়নিক প্রকৃতি ঃ DDT হচ্ছে প্রতিস্থাপিত ইথেন। পুরো নাম (প্যারা) 'ডাইক্লোরো ডাইফিনাইল ট্রাইক্লোরোইথেন'। DDT অণুর একটি কার্বনের তিনটি

হাইড্রোজেন তিনটি ক্লোরিন পরমাণুর দ্বারা এবং অপর কার্বনের তিনটি হাইড্রোজেনের দুটি ফিনাইল রিং (বেঞ্জিন) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।



DDT

প্রতিটি ফিনাইল রিং-এর প্যারা-স্থানে একটি ক্লোরিন পরমাণু যুক্ত। 1939 খ্রীষ্টাব্দে পল মুলার (Paul Muller) ইনসেক্টি-সাইড হিসেবে DDT আবিষ্কার করেন এবং এই অবদানের জন্য 1948 খ্রীঃ মেডিসিন এবং শারীরবিজ্ঞানে নোবেল প্রাইজ লাভ করেন।

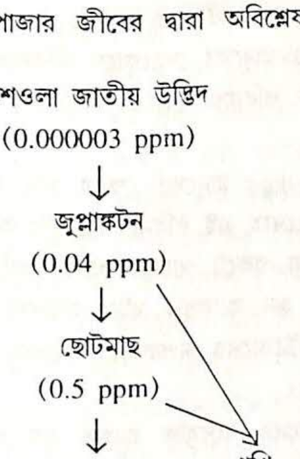
b) ব্যবহার ঃ DDT প্রথম ব্যবহৃত হয় রোগসংক্রমণে সাহায্যকারী পতঙ্গ ধ্বংস করার কাজে। যেমন ম্যালেরিয়া জীবাণুর বাহক মশা, টাইফাস জীবাণুর বাহক উকুন (lice) এবং প্লেগ জীবাণুর বাহক মাছিকে ধ্বংস করতে DDT খুবই উপযোগী। WHO-এর একটি সমীক্ষায় জানা গেছে যে, শুধুমাত্র DDT ব্যবহার করেই 50 লক্ষ মানুষকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পর্যায়ে ম্যালেরিয়ার মারণ থাবা থেকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পরবর্তীসময়ে কৃষিক্ষেত্রে (শস্য হানিকারক পতঙ্গ ধ্বংস করার কাজে) DDT-র অপব্যবহার ঘটে। মোট উৎপাদিত DDT-র 40 শতাংশ ব্যবহৃত হয় কৃষিক্ষেত্রে। ফলস্বরূপ পরিবেশে DDT জমতে শুরু করে এবং জীবজগতের উপর তার বিরূপ প্রভাব পড়ে। 1962 খ্রীঃ **রাকেল কারসনের** (Rachael Carson) যুগান্তকারী গ্রন্থ **'সাইলেন্ট স্প্রিং'** (Silent Spring)-এ DDT দূষণের কারণে পাখির (যথা রবিন এবং বল্ড ঈগল) জনন অক্ষমতার তথ্য প্রথম প্রকাশিত হয়। পরবর্তী সময়ে জীবজগৎ তথা মানুষের উপর DDT'র বিষক্রিয়া বিশদভাবে জানা যায়। এই কারণে হাঙ্গেরী, নরওয়ে, জার্মানী, সুইডেন, আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে DDT'র উৎপাদন এবং ব্যবহার কঠোরভাবে নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। DDT'র পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতার কথা মাথায় রেখে অধিকাংশ উন্নত দেশে DDT'র ব্যবহার নিষিদ্ধ হলেও ভারতসহ উন্নয়নশীল দেশসমূহে রোগের দমনে এবং কৃষিক্ষেত্রে পতঙ্গের নিয়ন্ত্রণে DDT'র বাধাহীন ব্যবহার এখনোও অব্যাহত রয়েছে।



চিত্র 7.5 ঃ 'সাইলেন্ট স্প্রিং' গ্রন্থের লেখিকা **রাকেল কারসন**।

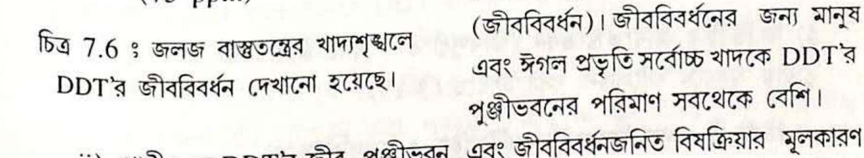
c) পরিবেশসম্পর্কীয় প্রভাব ঃ i) DDT জলে অদ্রাব্য এবং ডেট্রিটাস ও

ডিকম্পোজার জীবের দ্বারা অবিশ্লেষ্য হওয়ায় দীর্ঘদিন স্থায়ী অবস্থায় পরিবেশে (জলে, স্থলে) উপস্থিত থাকতে পারে। তার ফলে DDT'র ক্রমবর্ধমান ব্যবহারে পরিবেশে DDT'র পুঞ্জীভবন বাড়ে। এছাড়া সঞ্চিত DDT'র কিছু অংশ ক্ষারীয় পরিবেশে অধিকতর বিষক্রিয় DDE (Dichlorodiphenyldichloroethane)তে রূপান্তরিত হতে পারে। জলজ এবং স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পরিবেশ থেকে DDT এবং DDE উদ্ভিদ এবং প্রাণীদেহে পুঞ্জীভূত হয়। জীবদেহে DDT নন-ডিগ্রেডেবল্ (Non biodegradable) হওয়ায় খাদ্যশৃঙ্খল সম্পর্কীয় সদস্য প্রাণীদেহে ক্রমসঞ্চারিত হয়। এরূপ ক্রমসঞ্চারণে (বা ক্রমপ্রবাহে) সর্বোচ্চ ট্রাফিকলেভেলের প্রাণীদেহে DDT'র পুঞ্জীভবনের পরিমাণ সর্বাধিক হয় (জীববিবর্ধন)। জীববিবর্ধনের জন্য মানুষ এবং ঈগল প্রভৃতি সর্বোচ্চ খাদকে DDT'র পুঞ্জীভবনের পরিমাণ সবথেকে বেশি।



চিত্র 7.6 ঃ জলজ বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশৃঙ্খলে DDT'র জীববিবর্ধন দেখানো হয়েছে।

ii) প্রাণীদেহে DDT'র জীব- পুঞ্জীভবন এবং জীববিবর্ধনজনিত বিষক্রিয়ার মূলকারণ অধিক লিপিড দ্রাব্যতা এবং জীবসক্রিয়তা (bio-activation)। DDT সহজে চর্বি এবং অন্যান্য কোষে প্রবেশ করতে পারে। এছাড়া নিম্নতর প্রাণী, পাখি এবং মানুষের দেহে DDT অধিকতর লিপিড দ্রাব্য এবং টক্সিক DDEতে রূপান্তরিত হয়। এই বিক্রিয়ায় DDT জারিত হয়ে DDE এবং HCl উৎপন্ন করে। বিক্রিয়াটি অক্সিডেজ উৎসেচক দ্বারা অনুঘটিত হয়। এই DDEই DDTর বিষক্রিয়ার জন্য মূলত দায়ী।



DDT

iii) খাদ্যের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবিষ্ট DDT ধীরে ধীরে অপসারিত হলেও

DDT'র সঙ্গে গৃহীত DDE অপসারিত হয় না। স্থায়ীভাবে (অর্ধায়ু 3-10 বছর) কোষে পুঞ্জীভূত থাকে। এছাড়া DDT থেকেও মানুষের দেহকোষে জীবসক্রিয়করণ প্রক্রিয়ায় DDE উৎপন্ন হয়। DDE'র মোট পরিমাণ কোষে বিষক্রিয়ার তীব্রতা নির্ধারণ করে।

ইঁদুরের ক্ষেত্রে DDT'র LD_{50}=115 mg/kg। মানুষের ক্ষেত্রে যদি DDT'র LD_{50}=115 mg/kg ধরা হয়, তাহলে মানুষের দেহে এই পরিমাণ DDT'র অ্যাকিউট বিষক্রিয়ায় মৃত্যু না হলেও দীর্ঘদিন স্বল্পমাত্রার প্রকটে স্বাস্থ্যের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। স্ত্রীলোকের রক্তে DDE'র ঘনত্ব বেশি হলে স্তন ক্যানসার ঘটার সম্ভাবনা থাকে। DDT'র ক্রনিক প্রভাবে **পেশীর শৈথিল্য, নিউরোনের অপজনন, স্নায়বিক দৌর্বল্য** এবং **স্বয়ংক্রিয় পেশীর অক্রিয়তা** দেখা যায়।

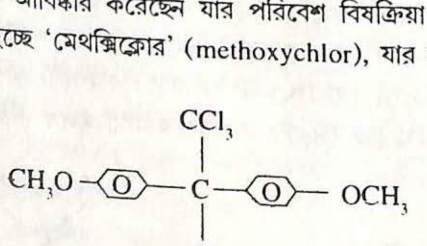
iv) বিভিন্ন মাছশিকারী পাখি এবং ঈগলের বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হয় পুঞ্জীভূত DDT এবং DDE'র বিষক্রিয়ায়। এক্ষেত্রে ডিমের খোলক (shell) নরম হওয়ায় ভ্রূণের বিকাশ ঘটে না। খোলক নরম হওয়ার অন্যতম কারণ ক্যালসিয়াম কার্বনেটের স্বল্পতা। DDT এবং DDE'র প্রভাবে ক্যালসিয়াম বিপাক নিয়ন্ত্রণকারী হরমোনের মাত্রার তারতম্য ঘটায় খোলক তৈরি হওয়ার সময় ক্যালসিয়াম ডিপোজিশান অস্বাভাবিকভাবে কমে যায়।

d) ডি.ডি.টি.র জীবকেন্দ্রীভবন (জীবপুঞ্জীভন) এবং জীববিবর্ধন ঃ

তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে (3-13)।

e) ডি.ডি.টি. সদৃশ বিকল্প ইনসেক্টিসাইড ঃ 'মেথক্সিক্লোর'

ডি.ডি.টি.'র পরিবেশ-বিষক্রিয়া থাকার ফলে বিজ্ঞানীরা ডিডিটি সদৃশ (analog) বিকল্প ইনসেক্টিসাইড আবিষ্কার করেছেন যার পরিবেশ বিষক্রিয়া নেই। এরূপ একটি ডিডিটি 'অ্যানালগ' হচ্ছে 'মেথক্সিক্লোর' (methoxychlor), যার সাধারণ আকার এবং



মেথক্সিক্লোর

আয়তন ডিডিটি'র অনুরূপ এবং পতঙ্গ নাশক ক্ষমতাও ডিডিটি'র মত। কিন্তু মেথক্সিক্লোর বায়োডিগ্রেডেবল হওয়ায় জীবকোষে পুঞ্জীভূত হয় না, ফলে বিষক্রিয়াও ঘটে না। মেথক্সিক্লোরে প্যারাফিনাইল স্থানে ক্লোরিনের পরিবর্তে মেথক্সি গ্রুপ থাকে।

ডিডিটি'র ইতিহাস ঃ

1. 1939 খ্রীষ্টাব্দে পল মুলার ডিডিটিকে ইনসেক্টিসাইড হিসেবে আবিষ্কার করেন।

2. 1941 খ্রীঃ সুইজারল্যাণ্ডের বাজারে ডিডিটি সর্বপ্রথম বাণিজ্যকৃত হয়।

3. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং যুদ্ধত্তোর সময়ে ইটালী, ইউরোপ এবং আমেরিকায় ম্যালেরিয়ার সংক্রামক 'মশা' দমনে ডিডিটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়।

4. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ক্রান্তীয় অঞ্চলে সামরিক এবং অসামরিক মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষায় এবং উন্নতদেশে কৃষিকাজে ডিডিটির ব্যাপক প্রচলন ঘটে।

5. DDT ব্যবহারের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে লক্ষ লক্ষ অসামরিক মানুষের জীবনরক্ষা হওয়ায় পলমুলার 1948 খ্রীঃ শারীরবিজ্ঞান এবং মেডিসিনে নোবেলপ্রাইজ লাভ করেন।

6. 1955 খ্রীঃ WHO'র প্রচেষ্টায় বিশ্বব্যাপী ম্যালেরিয়ার নিয়ন্ত্রণে ডিডিটির ব্যবহার জনপ্রিয় হয়।

7. 1962 খ্রীঃ রাকেল কারসন তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ 'সাইলেন্ট স্প্রিং' এ ডিডিটি এবং অন্যান্য পেস্টিসাইডের পরিবেশ সম্পর্কীয় বিষক্রিয়া সম্পর্কে বিশ্বের মানুষকে সজাগ করেন। তিনি দেখান যে, আমেরিকার বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে 'রবিন' পাখির বিলুপ্তির মূলে রয়েছে DDT জনিত বিষক্রিয়া।

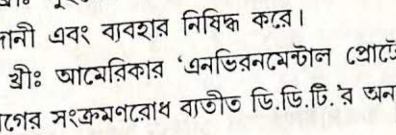
8. এরপরেই আমেরিকার 'এনভিরনমেন্টাল ডিফেন্স ফাণ্ড' বিজ্ঞানীদের চাপে ডিডিটি'র ব্যবহারের উপর কঠোরভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করে।

9. 1969 খ্রীঃ সুইডেন এবং পরবর্তী সময়ে অন্যান্য উন্নত দেশ ডিডিটি'র উৎপাদন, আমদানী এবং ব্যবহার নিষিদ্ধ করে।

10. 1973 খ্রীঃ আমেরিকার 'এনভিরনমেন্টাল প্রোটেকশান এজেন্সী' (EPA) পতঙ্গবাহিত রোগের সংক্রমণরোধ ব্যতীত ডি.ডি.টি.'র অন্যান্য সবধরনের ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

2. **টক্সাফিন** (Toxaphenes) ঃ

প্রাকৃতিক হাইড্রোকার্বন 'ক্যামফিন' (Camphene)এর আংশিক ক্লোরিনেশানে উদ্ভূত কতকগুলি একই প্রকৃতির রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণকে টক্সাফিন বলা হয়। 1970 খ্রীষ্টাব্দের পর অর্থাৎ DDT নিষিদ্ধ হবার পর ক্যামফিনই ছিল কৃষিশস্য উৎপাদনের কাজে (যথা পাট,



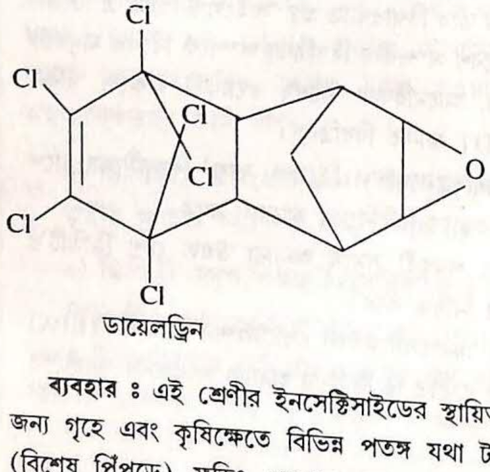
টক্সাফিন

সয়াবিন) প্রধান ব্যবহৃত ইনসেক্টিসাইড। DDT'র অনুরূপ টক্সাফিনের লিপিড দ্রাব্যতা, জীবপুঞ্জীভূতা এবং বিষক্রিয়ার কারণে বর্তমানে এটি নিষিদ্ধ হয়েছে। দেখা গেছে যে, মাছের ক্ষেত্রে টক্সাফিন অধিকতর বিষক্রিয়। এছাড়া পরীক্ষা প্রাণীর দেহে জীবপুঞ্জীভূত হয়ে ক্যানসার সৃষ্টি করতেও সক্ষম। টক্সাফিনের ক্রনিক প্রভাবে মানুষের দৌর্বল্য, স্নায়বিক বিকার, বমি ভাব, মাথাধরা এবং মাথাঘোরা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়।

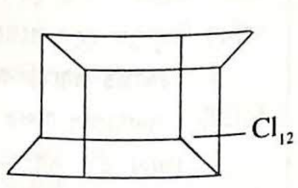
3. সাইক্লোপেন্টাডিয়েন উদ্ভূত ইনসেক্টিসাইড ঃ

সাইক্লোপেন্টাডিয়েন হচ্ছে পেট্রোলিয়াম বিশোধনের একটি উপজাত। ক্লোরিনেটেড সাইক্লোপেন্টাডিয়েনের সঙ্গে বিভিন্ন জৈবযৌগের বিষক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত স্থায়ী এবং লিপিড দ্রাব্য কতকগুলি যৌগ উদ্ভূত হয় যা ইনসেক্টিসাইড হিসেবে কাজ করে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সাইক্লোপেন্টাডিয়েন ইনসেক্টিসাইডের নাম দেওয়া হল ঃ

i) অলড্রিন, ii) ডায়েলড্রিন, এণ্ড্রিন, iii) মাইরেক্স, iv) হেপ্টাক্লোর, v) ক্লোরডেন এবং vi) এণ্ডোসালফান



ডায়েলড্রিন



মাইরেক্স

ব্যবহার ঃ এই শ্রেণীর ইনসেক্টিসাইডের স্থায়িত্ব, লিপিড দ্রাব্যতা এবং বিষক্রিয়ার জন্য গৃহে এবং কৃষিক্ষেতে বিভিন্ন পতঙ্গ যথা টারমাইট, আরশোলা, ফায়ার অ্যান্ট (বিশেষ পিঁপড়ে), ফড়িং, পঙ্গপাল এবং অন্যান্য পতঙ্গ ধ্বংস করতে ব্যবহৃত হয়। ক্রান্তীয় অঞ্চলে মাছি, টারমাইট এবং মৃত্তিকার পতঙ্গ বিনাশে এই জাতীয় ইনসেক্টিসাইড বিশেষ উপযোগী। পরিবেশ বিষক্রিয়ার কারণে অধিকাংশ দেশে অলড্রিন, ডায়েলড্রিন, ক্লোরডেন এবং হেপ্টাক্লোর নিষিদ্ধ হলেও অপেক্ষাকৃত কম বিষাক্ত এণ্ডোসালফান গৃহস্থালি এবং কৃষিক্ষেতের প্রয়োগে এখনও যথেষ্ট জনপ্রিয়।

পরিবেশসংক্রান্ত প্রভাব ঃ

A) অলড্রিন, ডায়েলড্রিন এবং এণ্ড্রিনের প্রভাব ঃ

জলে অদ্রাব্যতা এবং স্থায়িত্বের কারণে প্রয়োগের পরে মৃত্তিকা, বায়ু এবং জলে নির্বিঘ্নেই বহুবছর (15-25 বছর) ক্রিয়াশীল থাকে। পরিবেশ থেকে জৈবিক প্রক্রিয়ায় জীবদেহে প্রবেশ

করে এবং লিপিড দ্রাব্য হওয়ায় সহজেই পুঞ্জীভূত হয়। পুঞ্জীভূত ইনসেক্টিসাইড খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের প্রাণীদেহে প্রবাহিত হয়। খাদ্য এবং প্রশ্বাসবায়ুর মাধ্যমে মানুষও ডায়েলড্রিন, অলড্রিন বা এণ্ড্রিনের সংস্পর্শে প্রকট হয়। বর্তমানে সবধরনের খাদ্য-বস্তুতে এই প্রজাতির ইনসেক্টিসাইডের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। 1971 খ্রীঃ আমেরিকায় একটি সমীক্ষা থেকে জানা গেছে যে ইনসেক্টিসাইড উৎপাদনের কাজে লিপ্ত শ্রমিকের চর্বিকলায় গড়ে 0.29 ppm ডায়েলড্রিন সঞ্চিত আছে। পরিবেশ বিষক্রিয়ার কারণে ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়া, লাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে ডায়েলড্রিন এবং এণ্ড্রিনের উৎপাদন, ব্যবহার এবং আমদানী কঠোরভাবে নিষিদ্ধ বা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

i) মানুষের ক্ষেত্রে এইজাতীয় ইনসেক্টিসাইডের দীর্ঘস্থায়ী বিষক্রিয়ায় স্নায়বিক বিকার, দৌর্বল্য, পেটের যন্ত্রণা, বমি এবং মাথাঘোরা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়।

ii) পাখির বংশবৃদ্ধি রোধে এই জাতীয় ইনসেক্টিসাইডের প্রভাব প্রমাণিত হয়েছে। ঈগল, হাঁস বা মুরগীর ডিমের খোলক (ক্যালসিয়াম হ্রাসের ফলে) ইনসেক্টিসাইডের প্রভাবে পাতলা হওয়ায় ভ্রূণের বিকাশ ব্যাহত হয়।

B) 'ক্লোরডেন' ও 'হেপ্টাক্লোর' এর প্রভাব ঃ

ক্লোরডেন এবং হেপ্টাক্লোরের পরিবেশ সংক্রান্ত প্রভাব খুবই উদ্বেগজনক। প্রয়োগ করার পর প্রয়োগস্থলের মৃত্তিকা, জল এবং বাতাসে দীর্ঘদিন স্থিতিশীল থাকতে পারে। জলে এই জাতীয় ইনসেক্টিসাইডের পরিমাণ 300 ppmএর বেশি হলে জলজ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। আমেরিকার বেশকিছু দূষিত হ্রদ এবং নদীর মাছে ক্লোরডেন এবং হেপ্টাক্লোরের পরিমাণ 3.55 ppm এবং 33.5 ppm যা খাদ্য-সহনশীল সীমার তুলানায় অনেক বেশি (3 ppm)। খাদ্য শৃঙ্খল, প্রশ্বাসবায়ু এবং ত্বকীয়স্পর্শজনিত কারণে মানুষ তথা অন্যান্য প্রাণী এই জাতীয় ইনসেক্টিসাইডের সংস্পর্শে প্রকট হতে পারে। দেখা গেছে, ক্লোরডেন অপেক্ষা হেপ্টাক্লোর অনেক বেশি বিষক্রিয়।

i) ক্রনিক প্রভাবজনিত কারণে মানুষের বিভিন্ন উপসর্গ যথা ঃ পেশীর খিঁচুনি, মাথাধরা, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ছন্দপতন, দৃষ্টি বিভ্রম, স্নায়বিক দৌর্বল্য ও বুদ্ধি-হ্রাস, বমি প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। এছাড়া যকৃৎ, বৃক্ক এবং ফুসফুস-ক্রিয়ারও বিঘ্ন ঘটে। হেপ্টাক্লোর এবং ক্লোরডেন উৎপাদনের কাজে লিপ্ত শ্রমিকদের লিউকেমিয়া (রক্ত ক্যানসার), মস্তিষ্কের টিউমার (মস্তিষ্কের ক্যানসার), ফুসফুস ও পাকস্থলীর ক্যানসারের সম্ভাবনা থাকে। হেপ্টাক্লোর এবং ক্লোরডেন টেরাটোজেন হিসেবেও (ভ্রূণের বিকাশ ব্যাহত করে) কাজ করে।

ii) পাখি এবং বন্য-প্রাণীদের বংশবৃদ্ধি রোধে হেপ্টাক্লোরের ভূমিকা প্রমাণিত। উপরিউক্ত পরিবেশ সংক্রান্ত বিষক্রিয়ার কারণে জাপান, নরওয়ে, ফিনল্যাণ্ড এবং আমেরিকায় ক্লোরডেন এবং হেপ্টাক্লোরের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

4. লিনডেন (Lindane) ঃ

অবাঞ্ছিত পতঙ্গ বিনাশে সক্ষম 'হেক্সাক্লোরোসাইক্লোহেক্সেন' এর গামা আইসোমারকে

লিনডেন (আবিষ্কারক Vander Lindane-এর নাম অনুসারে) বলা হয় (কখনও কখনও ভুল করে লিনডেনকে BHC বা বেঞ্জিনহেক্সাক্লোরাইড বলা হয়)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ম্যালেরিয়া দমনে DDT'র সহযোগী হিসেবে মশা ধ্বংস করার কাজে লিনডেনের ব্যবহার শুরু হয়। কিন্তু পরিবেশে বিষক্রিয়া জন্য 1970 খ্রীঃ থেকে লিনডেনের ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফ্যাট দ্রাব্য হওয়ায় সহজেই চর্বি এবং অন্যান্য কোষে পুঞ্জীভূত থেকে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম। এছাড়া লিনডেনকে **'কারসিনোজেন'** হিসেবেও সন্দেহ করা হয়।

মানুষের উপর প্রভাব : লিনডেন লিপিড দ্রাব্য হওয়ায় সরাসরি ত্বকের মাধ্যমে কোষে প্রবেশ করতে সক্ষম। তাই লিনডেনের সংস্পর্শে মানুষের প্রকটে বিভিন্ন ধরনের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। লিনডেনের প্রভাবে পরীক্ষাপ্রাণীর যকৃতের অক্রিয়তা এবং বিনষ্টতা প্রমাণিত। অধুনা ফিনল্যাণ্ডে একটি গবেষণায় স্ত্রীলোকের স্তন ক্যানসারে লিনডেনের ভূমিকা প্রমাণিত হয়েছে।

7.9.3.2. আধুনিক ইনসেক্টিসাইড (Modern Insecticides) :

A) অর্গ্যানোফসফেট ইনসেক্টিসাইড (Organophosphate Insecticides) :

অর্গ্যানোফসফেট ইনসেক্টিসাইড জলে দ্রাব্য হওয়ায় পরিবেশে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। দীর্ঘস্থায়ী ধর্ম না থাকার ফলে এই জাতীয় ইনসেক্টিসাইড অধিকতর বিষক্রিয় হয় এবং মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ীর উপর তীব্র ক্ষণস্থায়ী বিষক্রিয়া (acute toxicity) সৃষ্টি করে। প্রশ্বাস বায়ুর মাধ্যমে, গলাধঃকরণে বা ত্বকীয় প্রকটে অর্গ্যানোফসফেট ইনসেক্টিসাইড মানুষের স্বাস্থ্যের উপর লেথাল প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। চর্বিকোষে এই শ্রেণীর ইনসেক্টিসাইড পুঞ্জীভূত হলেও কয়েকদিন বা কয়েকসপ্তাহের মধ্যে বিশ্লেষণের মাধ্যমে অপসারিত হয়, ফলে খাদ্য-শৃঙ্খলে কদাচিৎ পাওয়া যায়।

a) অর্গ্যানোফসফেট ইনসেক্টিসাইডের শ্রেণী এবং রাসায়নিক প্রকৃতি :

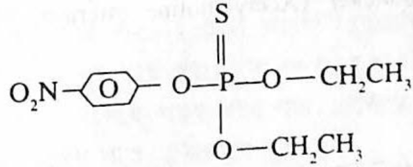
প্রধানত তিনশ্রেণীর অর্গ্যানোফসফেট ইনসেক্টিসাইড ব্যবহৃত হয়—(i) ফসফোনেটস, যথা—ডাইক্লোরভোস (Dichlorvos), (ii) ফসফোরোথিওয়েটস, যথা—প্যারাথিয়ন (Parathion) এবং (iii) ফসফোরোডাইথিওয়েটস, যথা : ম্যালাথিয়ন (Malathion)।

● **ডাইক্লোরভোস :** অণুতে সালফার পরমাণু থাকে না, অক্সিজেন পরমাণু দ্বি-বন্ধনীর মাধ্যমে ফসফরাস পরমাণুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। দুটি মেথক্সি ($-O-CH_3$) গ্রূপ একক বন্ধনীর মাধ্যমে এবং 'R'-গ্রূপ অক্সিজেনের মাধ্যমে ফসফরাসের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।

$$\begin{array}{c} \qquad\qquad\qquad O \\ \qquad\qquad\qquad \| \\ CCl_2 = CH-O-P-O-CH_3 \\ \qquad\qquad\qquad \| \\ \qquad\qquad\qquad\quad O-CH_3 \end{array}$$

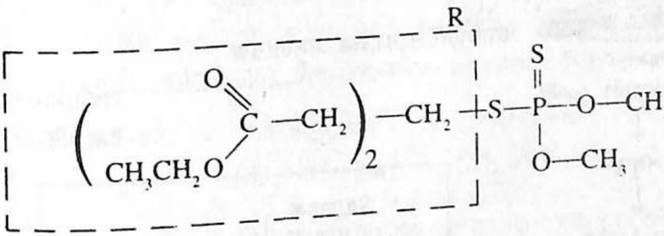
ডাইক্লোরভোস

● **প্যারাথিয়ন ঃ** সালফার পরমাণু দ্বি-বন্ধনীর দ্বারা, দুটি ইথোক্সি ($-O-CH_2CH_3$) গ্রুপ একক বন্ধনীর দ্বারা এবং 'R'- গ্রুপ অক্সিজেন পরমাণুর মাধ্যমে ফসফরাস পরমাণুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।



প্যারাথিয়ন

● **ম্যালাথিয়ন ঃ** সালফার পরমাণু দ্বি-বন্ধনীর দ্বারা, দুটি মেথোক্সি গ্রুপ একক বন্ধনীর দ্বারা এবং জটিল 'R'-গ্রুপ সালফার পরমাণুর দ্বারা ফসফরাসের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে।



ম্যালাথিয়ন

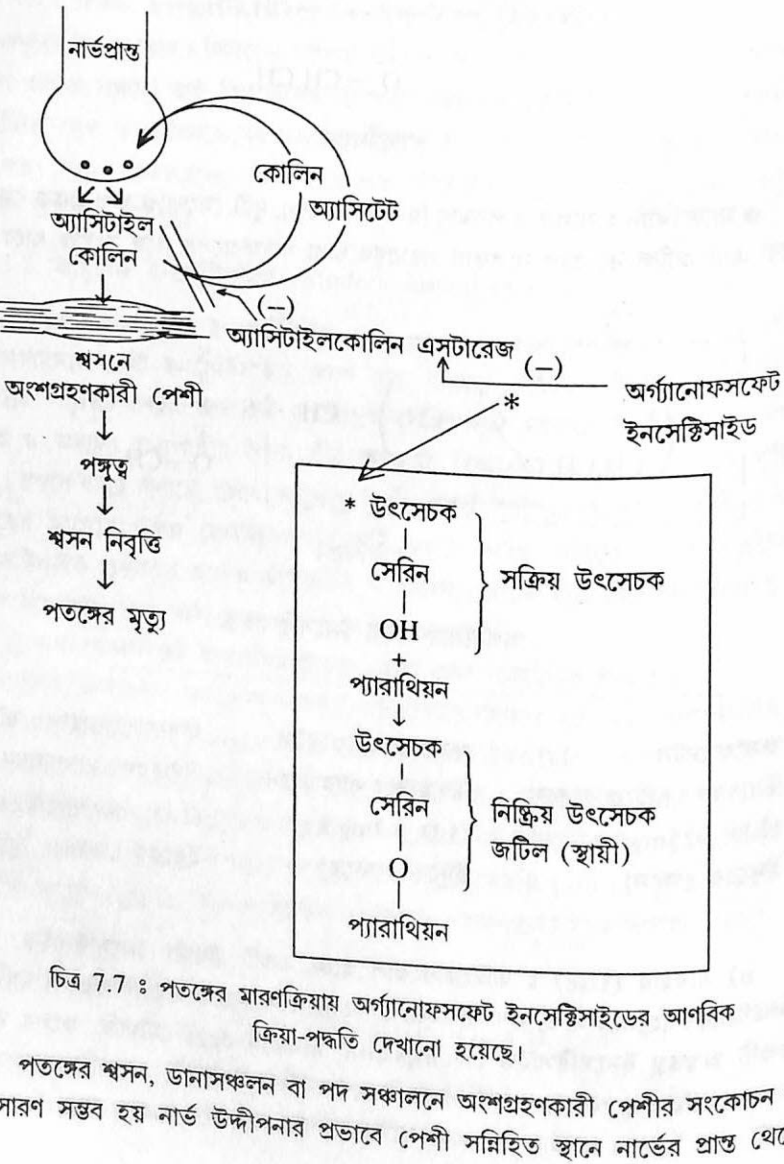
অর্গ্যানোফসফেট ইনসেক্টিসাইড

- ফসফোনেটস
  উদাহরণ ঃ ডাইক্লোরভোস
  (LD_{50}=25mg/kg
  ইঁদুরের ক্ষেত্রে)
- ফসফোরোথিওয়েটস
  উদাহরণ ঃ প্যারাথিয়ন
  (LD_{50}=3mg/kg
  ইঁদুরের ক্ষেত্রে)
- ফসফোরোডাইথিওয়েটস
  উদাহরণ ঃ ম্যালাথিয়ন
  (LD_{50}=885mg/kg
  ইঁদুরের ক্ষেত্রে)

b) **ব্যবহার (Use) ঃ** ডাইক্লোরভোস হচ্ছে একটি উদ্বায়ী ইনসেক্টিসাইড, ঘরে ফিউমিগ্যান্ট হিসেবে মাছি, মশা বা অন্যান্য পতঙ্গ ধ্বংস করতে ব্যবহৃত হয়। প্যারাথিয়ন একটি অস্বতন্ত্র ইনসেক্টিসাইড (Nonspecific insecticide)। মৌমাছি, ফলের মাছি, সাধারণ মাছি এবং অন্যান্য ধরনের পতঙ্গ বিনাশে সর্বাধিক উপযোগী। ম্যালাথিয়ন বাসস্থানে ফ্লাই স্প্রে হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং কৃষিজাত শস্য সংরক্ষণে সাহায্য করে।

● কি উপায়ে কাজ করে?

পতঙ্গ বিনাশে ডাইক্লোরভোস, প্যারাথিয়ন এবং ম্যালাথিয়ন নার্ভ-বিষ (Nerve-poison) রূপে কাজ করে। এক্ষেত্রে নার্ভের সঙ্গে পেশীর রাসায়নিক যোগাযোগে কার্যকরী উৎসেচক 'অ্যাসিটাইলকোলিন এসটারেজ' (Acetylcholine esterase, সংক্ষিপ্ত ACh. ase) স্থায়ীভাবে নিষ্ক্রিয় হয়।



চিত্র 7.7 ঃ পতঙ্গের মারণক্রিয়ায় অর্গ্যানোফসফেট ইনসেক্টিসাইডের আণবিক ক্রিয়া-পদ্ধতি দেখানো হয়েছে।

পতঙ্গের শ্বসন, ডানাসঞ্চলন বা পদ সঞ্চালনে অংশগ্রহণকারী পেশীর সংকোচন ও প্রসারণ সম্ভব হয় নার্ভ উদ্দীপনার প্রভাবে পেশী সন্নিহিত স্থানে নার্ভের প্রান্ত থেকে

নিঃসৃত অ্যাসিটাইলকোলিনের পেশীর উপর ক্ষণিক ক্রিয়া এবং ক্রিয়ার অব্যবহিত পরেই বিনাশের জন্য। অ্যাসিটাইলকোলিনের আর্দ্রবিশ্লেষণে সাহায্য করে অ্যাসিটাইলকোলিন এসটারেজ নামক উৎসেচক। কিন্তু অর্গ্যানোফসফেট ইনসেক্টিসাইডের প্রভাবে অ্যাসিটাইল কোলিন এসটারেজ নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার ফলে অ্যাসিটাইলকোলিন দীর্ঘক্ষণ পেশীর উপর কাজ করে, ফলে পেশী পঙ্গু হয়ে যায়। পঙ্গুত্বের ফলে শ্বসন ব্যাহত হয়, পদ ও ডানা অবশ হয়ে যায় এবং অবশেষে পতঙ্গ মারা যায়। এক্ষেত্রে অর্গ্যানোফসফেটের 'ফসফরাস' পরমাণু উৎসেচকের সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত হয়।

c) পরিবেশ সংক্রান্ত প্রভাব ঃ

অর্গ্যানোফসফেট ইনসেক্টিসাইড বাসস্থানে এবং কৃষিক্ষেতে বিভিন্ন অবাঞ্ছিত পতঙ্গ ধ্বংস করতে ব্যবহৃত হলেও বিভিন্ন বন্ধু পতঙ্গ (যথা মৌমাছি), পাখি, মাছ এবং মানুষ আক্রান্ত হয়। অত্যধিক বিষক্রিয়ার কারণে মৌমাছি, মাছ এবং পাখি মারা যায় এবং মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। ইঁদুরের উপর প্রয়োগ করে দেখা গেছে উক্ত তিনটি ইনসেক্টিসাইডই বিষক্রিয় এবং যৌগত্রয়ের মধ্যে প্যারাথিয়ন সর্বাপেক্ষা বিষক্রিয়। LD_{50}-এর মান অনুযায়ী যৌগ তিনটির বিষক্রিয়াজনিত ক্রমঅবস্থান নিম্নলিখিত ঃ

প্যারাথিয়ন	>	ডাইক্লোরভোস	>	ম্যালাথিয়ন
LD_{50}=3mg/kg		LD_{50}=25mg/kg		LD_{50}=250mg/kg

বিশ্বের পেস্টিসাইড ঘটিত বিষক্রিয়ার প্রায় অর্ধেক অর্গ্যানোফসফেট ইনসেক্টিসাইড সংক্রান্ত। এই শ্রেণীর ইনসেক্টিসাইডের তীব্র বিষক্রিয়ার কারণে ভারত, ব্রিটেন, ডেনমার্ক, সুইডেন এবং সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ায় ব্যবহার এবং উৎপাদন সীমিত এবং নিষিদ্ধ হলেও কতিপয় উন্নত দেশ যথা ঃ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানিতে উৎপাদন এবং ব্যবহার এখনও অব্যাহত রয়েছে। অর্গ্যানোফসফেট ইনসেক্টিসাইডের ক্রনিক বিষক্রিয়ায় মানুষের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপসর্গ দেখা দিতে পারে ঃ

i) কেন্দ্রীয় এবং বাহ্যিক স্নায়ুতন্ত্রের সুসংহত শারীরবৃত্তিয় ক্রিয়া ব্যাহত হয়।

ii) চোখের ছানি পড়ে, রেটিনার অক্রিয়তায় দৃষ্টিহীনতা দেখা দিতে পারে।

iii) বমি এবং ডায়েরিয়া ক্রনিকপ্রভাবের প্রাথমিক লক্ষণ।

iv) স্নায়বিক বা মানসিক বিকার এবং স্মৃতিবিলোপ (amnesia) ঘটতে পারে।

v) শ্বসনক্রিয়া ব্যাহত হয়, ফলে মাথাধরা এবং অন্যান্য অ্যানোক্সিক প্রভাব (যথা ত্বকের রঙ নীল হয়ে যাওয়া) দেখা দেয়।

vi) গর্ভবতী মায়েরা সরাসরি প্রকট হলে গর্ভপাত ঘটতে পারে। ইত্যাদি।

B) কার্বামেট ইনসেক্টিসাইড (Carbamate insecticides) ঃ

কার্বামিক অ্যাসিড (H_2N COOH) উদ্ভূত যৌগ 1951 খ্রীষ্টাব্দে ইনসেক্টিসাইড হিসেবে প্রথম বিপণন শুরু হয়। এই ধরনের ইনসেক্টিসাইডের আণবিক ক্রিয়া পদ্ধতি

অর্গ্যানোফসফেটের অনুরূপ অর্থাৎ কার্বামেট দ্বারা অ্যাসিটাইলকোলিন এসটারেজ উৎসেচকের নিষ্ক্রিয়তার ফলে অবাঞ্ছিত পতঙ্গের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু এক্ষেত্রে ফসফরাসের পরিবর্তে কার্বামেটের কার্বন পরমাণু কোলিন এস্টারেজের সঙ্গে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত হয়। এই যৌগগুলি স্বল্পস্থায়ী এবং জলের সঙ্গে বিক্রিয়ায় সহজেই অবিষপদার্থে রূপান্তরিত হয়ে অপসারিত হতে পারে।

$$CH_3-\overset{\displaystyle H\atop |}{N}-\overset{\displaystyle O\atop \|}{C}-O-R$$

কার্বামেটের সাধারণ সংকেত

● **উদাহরণ, ব্যবহার এবং পরিবেশগত প্রভাব ঃ**

কার্বামেট পেস্টিসাইড (ইনসেক্টিসাইড) শ্রেণীর সর্বাধিক কার্যক্ষম যৌগত্রয় হচ্ছে—

i) কার্বোফিউরান (Carbofuran) LD_{50}=8mg/kg, ইঁদুরের

ii) কার্বারিল (Carbaryl) LD_{50}=307 mg/kg এবং

iii) অলডিকার্ব (Aldicarb) LD_{50}=0.9 mg/kg

উপরিউক্ত তিনটি কার্বামেট ইনসেক্টিসাইডের মধ্যে অলডিকার্বই সর্বাধিক বিষক্রিয় (এমনকি স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রেও)। কিন্তু কার্বারিলের বিষক্রিয়তা কম হওয়ায় বাগানে বা লনে ইনসেক্টিসাইড হিসেবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে কার্বারিল স্তন্যপায়ীদের উপর অপেক্ষাকৃত লঘু প্রভাব সৃষ্টি করলেও মৌমাছির উপর তীব্র বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। বাগানে বা লনে ইনসেক্টিসাইড হিসেবে ব্যবহৃত কার্বারিলের বাণিজ্যিক নাম **'সেভিন'** (Sevin) (ভূপালের ইউনিয়ন কার্বাইড কেমিক্যালস সেভিন তৈরি করত।)

● **প্রাকৃতিক পেস্টিসাইড** (Natural Pesticides) **ঃ**

প্রাচীনকালে অবাঞ্ছিত পতঙ্গ ধ্বংস করতে বিভিন্ন উদ্ভিদ ব্যবহার করা হত। অধুনা সেইসব উপকারী উদ্ভিদ থেকে পৃথকিকৃত প্রাকৃতিক যৌগ রাসায়নিক ইনসেক্টিসাইডের বিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যথা ঃ **রোটিনন, নিকোটিন, ফেরোমোনস্** এবং **জুভেনাইল হরমোন**। এছাড়া এক শতাব্দীরও আগে থেকে **ক্রাইজেনথিমাম** প্রজাতির ফুল থেকে পৃথকিকৃত যৌগ **পাইরেথিন** (Pyrethin) প্রাকৃতিক ইনসেক্টিসাইড রূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এই যৌগের দ্বারা পতঙ্গ মরে না, কিন্তু পঙ্গু বা অক্ষম হয়ে যায়। কিন্তু পাইরেথিন যৌগের প্রধান সীমায়ন হচ্ছে—সৌর আলোকের উপস্থিতিতে নিষ্ক্রিয়তা বা কাজ করতে না পারা।

7.9.4. হার্বিসাইড (Herbicides) ঃ

যেসব জৈব রাসায়নিক পদার্থ বাগানে বা লনে, কৃষিক্ষেতে, পথ-পার্শ্বে, ট্রেনলাইনের দুধারে এবং পাওয়ার লাইন সন্নিহিত স্থানে অবাঞ্ছিত উদ্ভিদ ধ্বংস করার কাজে ব্যবহার

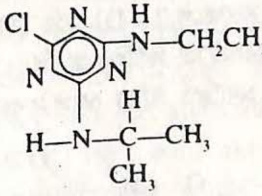
করা হয়, তাদের হার্বিসাইড বলা হয়। বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বিভিন্ন অজৈব যৌগ যথা—সোডিয়াম আর্সেনাইট (Na_3AsO_3), সোডিয়াম ক্লোরেট ($NaClO_3$) এবং কপার সালফেট (তুঁতে, $CuSO_4$) প্রভৃতি হার্বিসাইড হিসেবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই হার্বিসাইড হিসেবে বিভিন্ন জৈবযৌগের প্রচলন ঘটে। অধুনা বহুল ব্যবহৃত এবং জনপ্রিয় হার্বিসাইডগুলির মধ্যে অ্যাট্রাজিন, মেটোলাক্লোর, ডাই এবং ট্রাইক্লোরোফেনোক্সিঅ্যাসিটিক অ্যাসিড উল্লেখযোগ্য।

শ্রেণী	উদাহরণ
i) ট্রায়াজিন হার্বিসাইড	অ্যাট্রাজিন
ii) ক্লোর অ্যাসিটিক অ্যাসিড হার্বিসাইড	মেটোলাক্লোর, প্যারাকুয়াট
iii) ফেনোক্সি হার্বিসাইড	ডাইক্লোরোফেনোক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড, ট্রাইক্লোরোফেনোক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড, সিলভেক্স, MCPA, ডাইক্লোরপ্রপ ইত্যাদি।

তালিকা 7.7 ঃ হার্বিসাইডের শ্রেণী এবং উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

1. অ্যাট্রাজিন (Atrazine) ঃ

অ্যাট্রাজিন হচ্ছে ট্রায়াজিন নামক আধুনিক হার্বিসাইড শ্রেণীর একটি সদস্য যৌগ। সাধারণত তৃণজাতীয় অবাঞ্ছিত উদ্ভিদ বিনাশ করতে অ্যাট্রাজিন ব্যবহার করা হয়। 'অ্যাট্রাজিন' সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতি ব্যাহত করে উদ্ভিদ বিনাশ করতে সক্ষম।



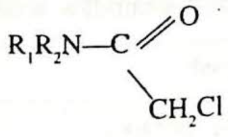
অ্যাট্রাজিন

পরিবেশ সম্পর্কীয় বিষক্রিয়া ঃ সঠিক মাত্রার প্রয়োগে বিভিন্ন অবাঞ্ছিত উদ্ভিদকূল বিনষ্ট হলেও অধিকমাত্রার প্রয়োগে অ্যাট্রাজিন সমস্ত উদ্ভিদ অর্থাৎ বাঞ্ছিত এবং অবাঞ্ছিত উভয় প্রকার উদ্ভিদকেই বিনষ্ট করে। এছাড়া অ্যাট্রাজিনের জলীয় দ্রাব্যতার কারণে কৃষিজমির নিষ্কাশিত জলের মাধ্যমে পুকুর, খাল এবং নদীর জল দূষিত হয়। বিশেষ ক্ষেত্রে গ্রাউণ্ড ওয়াটারও অ্যাট্রাজিনের সংস্পর্শে আসে। এইসব অঞ্চলে কূপ থেকে সংগৃহীত পানীয় জলে অ্যাট্রাজিন পাওয়া যায় (কানাডায় পানীয় জলে অ্যাট্রাজিনের সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য মাত্রা হচ্ছে 60 ppb)। অ্যাট্রাজিন মৃদু বিষক্রিয় (LD_{50}=1870 mg/kg) হওয়ায় মানুষের স্বাস্থ্যের উপর অ্যাট্রাজিনের বিশেষ ক্ষতিকর প্রভাব এখনও সেভাবে ধরা পড়েনি। কিন্তু কৃষিক্ষেতে অধিকমাত্রার

অ্যাট্রাজিনের দীর্ঘ সংস্পর্শে মানুষের ক্যানসার এবং জন্মত্রুটির সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে প্রমাণ পাওয়া গেছে।

2. মেটোলাক্লোর (Metolachlor) এবং প্যারাকুয়াট (Paraquat) ঃ

মেটোলাক্লোর এবং প্যারকুয়াট হার্বিসাইড ক্লোরোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড উদ্ভূত যৌগ। মেটোলাক্লোর বিশেষ করে ভুট্টা এবং সয়াবিন ক্ষেতে এবং প্যারাকুয়াট মারিজুয়ানা (marijuana) ক্ষেতে অবাঞ্ছিত উদ্ভিদ ধ্বংস করতে ব্যবহার করা হয়।

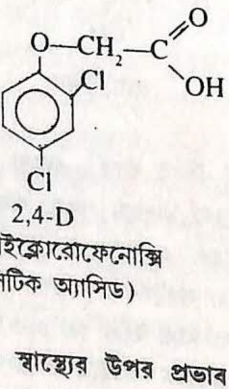


মেটোলাক্লোর

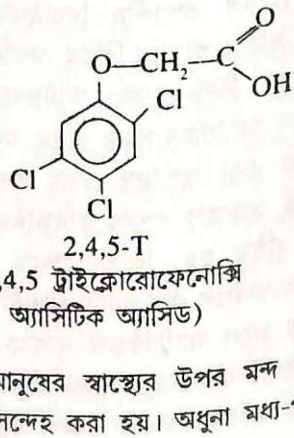
পরিবেশ সম্পর্কীয় বিষক্রিয়া ঃ মেটোলাক্লোর এবং প্যারাকুয়াট জলে দ্রাব্য হওয়ায় এই শ্রেণীর হার্বিসাইড সংক্রমিত কৃষিজাত সামগ্রীর মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়। বিশেষ করে মারিজুয়ানা ধূমপায়ীদের ফুসফুস প্যারাকুয়াট দ্বারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অধুনা প্যারাকুয়াট সংক্রমিত মানুষের স্বাস্থ্য সমস্যা উন্নতদেশগুলিতে ভয়াবহ সমস্যার সৃষ্টি করেছে।

3. ডাই এবং ট্রাইক্লোরোফেনোক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড (Di and Trichlorophenoxyacetic acid) ঃ

ফেনোক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিডের ক্লোরিন প্রতিস্থাপিত যৌগ হার্বিসাইড রূপে ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য দুটি হার্বিসাইড হচ্ছে—**'ডাইক্লোরোফেনোক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড'** (সংক্ষেপে 2,4-D) এবং **'ট্রাইক্লোরোফেনোক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড'** (2,4,5-T)। 2,4-D হার্বিসাইডই সর্বাধিক জনপ্রিয়। বাগানে, লনে, কৃষিক্ষেতে এবং গল্‌ফ-মাঠে চওড়া-পাতাযুক্ত অবাঞ্ছিত উদ্ভিদ ধ্বংস করতে 2,4-D ব্যবহার করা হয়।



2,4-D
(2,4 ডাইক্লোরোফেনোক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড)

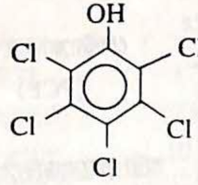


2,4,5-T
(2,4,5 ট্রাইক্লোরোফেনোক্সি অ্যাসিটিক অ্যাসিড)

মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ঃ 2,4-D মানুষের স্বাস্থ্যের উপর মন্দ প্রভাব বিস্তার করে। 2,4-Dকে কারসিনোজেন হিসেবে সন্দেহ করা হয়। অধুনা মধ্য-পশ্চিম

আমেরিকায় অধিক হারে 'নন-হজকিন লিম্ফোমা' (Non-Hodgkin's Lymphoma) শ্রেণীর ক্যানসার সৃষ্টির জন্য শস্যক্ষেতে অধিকমাত্রায় 2,4-D প্রয়োগকেই সম্ভাব্য কারণ মনে করা হয়। এছাড়া এইজাতীয় ক্যানসারে আক্রান্ত মানুষের মধ্যে AIDS সংবেদনশীলতা অনেক বেশি হয়।

7.9.5. ফাংগিসাইড (Fungicides) ঃ



পেন্টাক্লোরোফেনল (PCP)

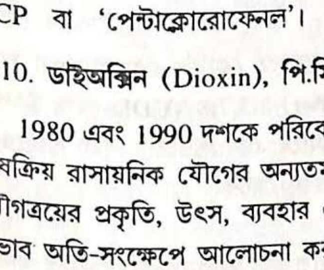
বিভিন্ন ধরনের ক্লোরোফেনল উদ্ভুত যৌগ ফাংগিসাইড হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সর্বাধিক উপযোগী ক্লোরোফেনল ফাংগিসাইড হচ্ছে— PCP বা 'পেন্টাক্লোরোফেনল'। কাঠ সংরক্ষণে PCP ব্যবহার করা হয়।

7.10. ডাইঅক্সিন (Dioxin), পি.সি.বি. (P.C.B.) এবং ফিউরান (Furan) ঃ

1980 এবং 1990 দশকে পরিবেশ এবং মানুষের স্বাস্থ্যের উপর মন্দ প্রভাব সৃষ্টিকারী বিষক্রিয় রাসায়নিক যৌগের অন্যতম হচ্ছে ডাইঅক্সিন, PCB এবং ফিউরান। বিষক্রিয় যৌগত্রয়ের প্রকৃতি, উৎস, ব্যবহার এবং পরিবেশ তথা মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব অতি-সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

7.10.1. ডাইঅক্সিন (Dioxin) ঃ

প্রকৃতি এবং উৎস ঃ a) ডাই-অক্সিন একশ্রেণীর অতি-বিষক্রিয় জৈব-রাসায়নিক পদার্থ। একটি কেন্দ্রীয় ছয়সদস্য বিশিষ্ট বলয় (বা রিং) দ্বারা দুটি ক্লোরিনেটেড বেঞ্জিন বলয়ের সংযুক্তির ফলে **'ডাই-অক্সিন'** গঠিত হয়। ডাই-অক্সিনের কেন্দ্রীয় বলয়ের 1নং এবং 4নং অবস্থানে (পরস্পরের প্যারা অবস্থান) অক্সিজেন পরমাণু অবস্থান করে। ডাই-অক্সিন যৌগের সঠিক রাসায়নিক নাম **'টেট্রাক্লোরোডাইবেঞ্জো-p-ডাইঅক্সিন'**।



ডাই-অক্সিন

b) ফেনোক্সি হার্বিসাইডের উপজাত হিসেবে 'ডাইঅক্সিন' উৎপন্ন হয়। ডাইঅক্সিন সংক্রমিত ফেনোক্সিহার্বিসাইড অবাঞ্ছিত উদ্ভিদ ধ্বংস করার কাজে ব্যবহারের ফলে অজীব পরিবেশ (বিশেষ করে জল) ডাইঅক্সিন দ্বারা দূষিত হয়। ডাই-অক্সিন সংক্রমিত পরিবেশে মানুষ তথা সমগ্র জীব জগৎ প্রকট হয়। এছাড়া 'পেন্টাক্লোরোফেনল' নামক ফাংগিসাইড প্রযুক্ত কাঠের দহনেও প্রচুর পরিমাণ ডাই-অক্সিন (প্রকৃত OCDD, বা 'অক্টাক্লোরোডাইবেঞ্জো—p—ডাইঅক্সিন')—উপজাত হিসেবে উৎপন্ন হয়।

ট্রাইক্লোরোফেনল + ট্রাইক্লোরোফেনল

↓ তাপ

টেট্রাক্লোরোডাইবেঞ্জে-p-ডাইঅক্সিন

(ডাই-অক্সিন)

পেন্টাক্লোরোফেনল (PCP) + পেন্টাক্লোরোফেনল (PCP)

↓ তাপ

অক্টাক্লোরোডাইবেঞ্জো -p- ডাইঅক্সিন (OCDD)

(ডাই-অক্সিন)

c) উপরিউক্ত উৎসদ্বয় ব্যতিরেকে মণ্ড (Pulp) এবং কাগজ প্রস্তুতীকরণ শিল্পে কাগজ এবং মণ্ড সাদা করার কাজে (bleaching) ব্যবহৃত ক্লোরিন এবং অশুদ্ধির সঙ্গে বিক্রিয়ায় অতি-টক্সিক ডাই-অক্সিন গোত্রীয় (congener) 2,3,7,8-TCDD যৌগ উৎপন্ন হয়। কাগজ শিল্প থেকে নিষ্কাশিত দূষিত জলের মাধ্যমে এবং পরিবেশে বর্জ্য কাগজের বিশ্লেষণের মাধ্যমে TCDD যৌগ জল এবং মৃত্তিকায় মেশে।

● **পরিবেশ সম্পর্কীয় প্রভাব :**

পরিবেশের উপস্থিতি এবং লিপিড দ্রাব্যতার কারণে ডাই-অক্সিন অতি-সহজেই খাদ্য-শৃঙ্খলে জীবপুঞ্জীভূত হয়। মানুষের শরীরে জীবপুঞ্জীভূত ডাইঅক্সিনের 90 শতাংশ আসে সংগৃহীত মাছ, মাংস এবং ডেয়ারী খাদ্য উৎসের মাধ্যমে (তালিকা)। এই সঞ্চিত ডাই-অক্সিন মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বিভিন্ন প্রকার বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।

তালিকা : A

খাদ্য উৎস	ডাইঅক্সিনের ঘনত্ব (pg/g)	গড় গৃহীত ডাই-অক্সিন (pg/gm/ব্যক্তি/দিন)
সামুদ্রিক মাছ	500	8.6
মাংস	35	6.6
চিজ	16	0.31
দুধ	1.8	0.20
আইসক্রিম	5.5	0.04
ক্রিম	7.2	0.01
কফি	0.1	0.04
কমলালেবুর রস	0.2	0.01

তালিকা ঃ B

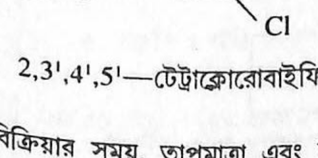
ডাই অক্সিন গোত্রের সদস্য	গড় ঘনত্ব (pg/দিন)
2,3,7,8 টেট্রাক্লোরো	11
1,2,3,7,8 পেন্টাক্লোরো	24
1,2,3,6,7,8 হেক্সাক্লোরো	172
1,2,3,4,6,7,8 হেপ্টাক্লোরো	232
1,2,3,4,5,6,7,8অক্টাক্লোরো	1037

তালিকা 7.9 ঃ A— আমেরিকার বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্যে TCDD'র (ডাইঅক্সিন) গড় ঘনত্ব এবং প্রতিদিনের সংগৃহীত ডাইঅক্সিনের গড় মান দেওয়া হয়েছে। B— মানুষের চর্বিকোষে সঞ্চিত ডাইঅক্সিন গোত্রীয় সদস্যের গড় মান দেখানো হয়েছে।

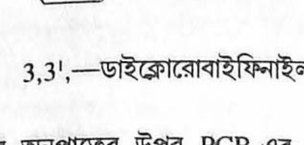
● **মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ডাই-অক্সিনের প্রভাব ঃ** ডাই-অক্সিন সংক্রান্ত পরিবেশ বিষক্রিয়া বিশ্বের জনসমক্ষে সর্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হয় 1976 খ্রীঃ ইটালির 'সিভেসো' (Seveso) কারখানার দুর্ঘটনাক্রমে (সিভেসো কারখানায় ফেনোক্সি-হার্বিসাইড উৎপাদন করা হত)। দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই আক্রান্ত মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ প্রভাব না পড়লেও পরবর্তী দীর্ঘ প্রকট পর্যায়ে দেখা যায় যে দুর্ঘটনায় আক্রান্ত মানুষের মধ্যে ক্যানসার সংক্রমণের ঘটনা অনেক বেশি (প্রাণীর উপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে প্রতি কিলোগ্রাম দেহ ওজনে এক ন্যানোগ্রাম TCDD-এর দীর্ঘস্থায়ী প্রকট ক্যানসার সৃষ্টিতে সক্ষম)। সম্প্রতি কানাডা সরকার মানুষের ডাইঅক্সিন সহনশীলতার চরমমাত্রা ঘোষণা করেছে—0.010 ng/kg/দিন। এই মাত্রায় বা তার কমমাত্রায় ডাইঅক্সিনের প্রকটে ক্যানসার ঘটার সম্ভাবনা খুবই কম।

7.10.2. পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল বা পি.সি.বি. (P.C.B.) ঃ

● **প্রকৃতি ঃ** পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল বা PCB একশ্রেণীর বহুল ব্যবহৃত জৈব রাসায়নিক পদার্থ। বাইফিনাইল এবং ক্লোরিনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় PCB উৎপন্ন হয়।



2,3',4',5'—টেট্রাক্লোরোবাইফিনাইল



3,3',—ডাইক্লোরোবাইফিনাইল

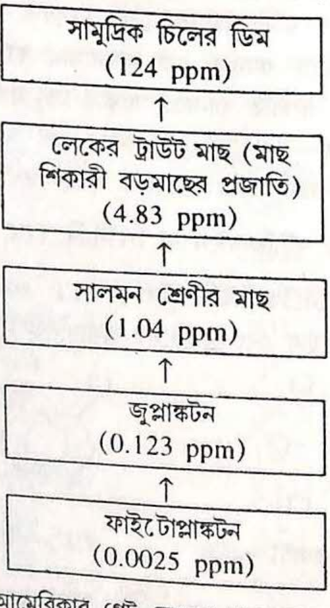
বিক্রিয়ার সময়, তাপমাত্রা এবং বিকারক দ্বয়ের অনুপাতের উপর PCB-এর প্রকৃতি

নির্ভর করে। উৎপাদিত PCB মিশ্রণে প্রায় 209টি স্বগোত্রীয় সদস্য পাওয়া যায়। বাণিজ্যকৃত PCB সদস্যের মধ্যে 3,3′ ডাইক্লোরোবাইফিনাইল এবং 2,3′,4′,5′—'টেট্রাক্লোরোবাইফিনাইল' উল্লেখযোগ্য। PCB—জলে খুব কম দ্রাব্য এবং হাইড্রোকার্বন দ্রাবকে অধিক দ্রাব্য। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় PCB তরল অবস্থায় থাকে।

● **ব্যবহার** ঃ PCB তরল নিষ্ক্রিয় এবং সহজ দাহ্য না হওয়ায় ইলেকট্রিক্যাল ইনস্যুলেটার হিসেবে কাজ করতে পারে। এই বিশেষ ধর্মের জন্য PCB তরলকে 'পাওয়ার ট্রান্সফর্মার' (Power transformer) এবং ক্যাপাসিটরে (Capacitors) কুল্যান্ট লিকুইড বা শীতলিকারক তরল রূপে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া প্লাসটিসাইজার হিসেবে PVC দ্রব্যকে নমনীয় রাখতে, কার্বনহীন কপিপেপার সংরক্ষণে এবং নিউজপ্রিন্ট পুনরাবর্তনের জন্য কালি দূরীভূত করতে PCB ব্যবহার করা হয়।

● **পরিবেশ সংক্রান্ত প্রভাব** ঃ a) উৎপাদন, ব্যবহার, সঞ্চয় এবং ব্যবহারের পর অসতর্ক বিস্তারের ফলে PCB অতি সহজেই পরিবেশে মুক্ত হয়। যেমন, PCB যুক্ত ট্রান্সফর্মার বিকল হয়ে যাওয়ার পর মৃত্তিকায় অসাবধানভাবে স্তূপীকৃত করে ফেলে রাখা হয়, ফলে PCB তরল লিক্ করে মৃত্তিকায় সংক্রমিত হয়। এছাড়া PCB তরলের দহনের ফলে কিছু পরিমাণ PCB বায়ুতে মেশে। PCB নিষ্ক্রিয় পদার্থ হওয়ায় জৈবিক বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় বিশ্লেষিত না হয়ে পরিবেশে কয়েক দশক অবিকৃত থাকতে পারে।

b) PCB-এর জল—দ্রাব্যতা খুব কম হলেও জলে দ্রাব্য স্বল্প পরিমাণ PCB জলের



চিত্র 7.8 ঃ আমেরিকার গ্রেট লেকের খাদ্য-শৃঙ্খলে PCB যৌগের জীবপুঞ্জীভবন এবং জীববিবর্ধন দেখানো হয়েছে।

উপরিতল থেকে সহজেই বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুতে মেশে। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যে বায়ু থেকে পুনরায় জলে এবং স্থলে অধঃক্ষিপ্ত হয়। এইভাবে জল, বায়ু এবং স্থলের মধ্যে PCB যৌগের স্থায়ী আবর্তন চলে। PCB যৌগের স্থায়িত্ব এবং লিপিড দ্রাব্যতার কারণে খাদ্যশৃঙ্খলে জীবপুঞ্জীভূত এবং জীববিবর্ধিত হয়। আমেরিকার 'গ্রেট লেকে' (Great lakes) খাদ্যশৃঙ্খল অনুশীলন করে দেখা গেছে যে, 'ফাইটোপ্লাঙ্কটনের' তুলনায় সামুদ্রিক চিলের ডিমে PCB'র ঘনত্ব প্রায় 50 হাজার গুণ বেশি (চিত্র 7.7)। খাদ্য-শৃঙ্খল সম্পর্কীয় কারণে মানুষের চর্বিকোষে PCB পুঞ্জীভূত হয় এবং তারফলে স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় বিভিন্ন মন্দ প্রভাবের সৃষ্টি হয়।

● **মানুষের স্বাস্থ্যসম্পর্কীয় প্রভাব ঃ** PCB-যৌগের LD_{50} খুব বেশি হওয়ায় মানুষের উপর অ্যাকিউট প্রভাব না থাকলেও দীর্ঘস্থায়ী (বা ক্রনিক) প্রভাব যথেষ্ট ক্ষতিকারক। মানুষের স্বাস্থ্যের উপর PCB যৌগের ক্রনিক প্রভাব অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

a) ক্রনিক প্রভাবের প্রধান উপসর্গ হচ্ছে মুখমণ্ডলে অতি-যন্ত্রণাদায়ক স্থায়ী ক্লোর-অ্যাকনি (Chloracne) এবং দেহ-ত্বকের অন্যান্য হানিকারক সমস্যা। PCB সংক্রমিত মাতার সন্তানের ত্বকে অস্বাভাবিক রঞ্জন (pigmentation) সৃষ্টি হয়।

b) গর্ভবতী মাতা PCB'র সংস্পর্শে প্রকট হলে ভ্রূণের বৃদ্ধি ও বিকাশ ব্যাহত হয়। এক্ষেত্রে জাত সন্তানের ওজন কম হয় এবং মৃত্যুর হার অনেক বেশি হয়।

c) PCB-এর প্রকটে শিশুদের সামগ্রিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং দাঁতের বিকাশ বিঘ্নিত হয়।

d) প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ PCB দ্বারা সংক্রমিত হলে ক্লোর অ্যাকনি ছাড়া ত্বকের চুলকানি, ত্বকের স্বাভাবিক ক্রিয়াহীনতা এবং ব্রঙ্কিয়াল সমস্যা দেখা দেয়।

e) কর্মসূত্রে PCB'এর প্রকটে যৌন হরমোনের তারতম্যের ফলে সাধারণ মানুষের বন্ধ্যাত্ব দেখা যায়।

> 1968 খ্রীঃ জাপানে এবং 1969 খ্রীঃ তাইওয়ানে রান্নার তেলে সংক্রমিত PCBএর দ্বারা বিশ্বের প্রথম PCB সম্পর্কীয় দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনায় জাপান এবং তাইওয়ানের বেশকিছু মানুষ মারাত্মকভাবে PCB যৌগের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়।

7.10.3. পলিক্লোরিনেটেড ডাইবেঞ্জোফিউরান (Polychlorinated Dibenzofurans, PCDF'S) ঃ

● **প্রকৃতি ঃ** অতি উচ্চ তাপমাত্রায় অক্সিজেন উৎসের উপস্থিতিতে PCB-কে উত্তপ্ত করলে PCDF বা 'পলিক্লোরিনেটেড ডাইবেঞ্জোফিউরান' উৎপন্ন হয়। এক্ষেত্রে দুটি ক্লোরিনেটেড বেঞ্জিন বলয় কেন্দ্রীয় ফিউরান বলয় দ্বারা সংযুক্ত থাকে। PCDF যৌগের শ্রেণীকে সংক্ষেপে 'ফিউরান' বলা হয়। ফিউরান যৌগে ক্লোরিনের সংখ্যা নির্ভর করে উৎস

PCB যৌগে উপস্থিত ক্লোরিন পরমাণুর সংখ্যার উপর। ক্লোরিন পরমাণুর সংখ্যা অনুসারে ফিউরান ক্লোরো, ডাইক্লোরো এবং ডাইক্লোরো-ডাইবেঞ্জোফিউরান ইত্যাদি নামে পরিচিত।

● **পরিবেশ সম্পর্কীয় প্রভাব ঃ** পরিবেশ এবং মানুষের উপর ফিউরানের প্রভাব ডাই-অক্সিনের অনুরূপ।

7.11. পলিনিউক্লিয়ার অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (PAH) ঃ

i) PAH বলতে কি বোঝায়?

যে সব হাইড্রোকার্বন বেঞ্জিনের অনুরূপ ধর্ম প্রদর্শন করে, তাদের 'অ্যারোমেটিক' (aromatic) বলা হয় এবং একাধিক একীভূত (fused) বেঞ্জিন বলয় দ্বারা গঠিত হাইড্রোকার্বনকে '**পলিনিউক্লিয়ার (বা পলিসাইক্লিক) অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন**' বলা হয়। 'পলিনিউক্লিয়ার অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন' সংক্ষেপে PAH নামে পরিচিত। বাণিজ্যকৃত সরল PAH-এর উদাহরণ হচ্ছে ন্যাপথলিন (naphthalene)। ন্যাপথলিন একটি উদ্বায়ী কঠিন পদার্থ। ন্যাপথলিনের বাষ্প কতিপয় পতঙ্গের বিনাশে কার্যক্ষম।

ii) পরিবেশ দূষণে PAHএর ভূমিকা ঃ

ন্যাপথলিন ব্যতিরেকে অন্যান্য PAH বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন না করা হলেও মানুষের অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপের ফলস্বরূপ জীবজগতের উপর মন্দ প্রভাব সৃষ্টিকারী অসংখ্য বিষক্রিয় PAH পরিবেশে সংক্রমিত হয়। বিষক্রিয় PAHএর অধিকাংশই ক্যানসার সৃষ্টিকারী বা কারসিনোজেনিক। পরিবেশে এই অবাঞ্ছিত উপাদানের উপস্থিতিতে যে দূষণ ঘটে জীবজগৎ তথা মানুষের স্বাস্থ্যের উপর তার প্রভাব খুবই উদ্বেগজনক।

(a) বায়ুদূষণকারী PAH ঃ

সচরাচর দ্রষ্টব্য বায়ুদূষণকারী বস্তুর অন্যতম হচ্ছে PAH। শহরের বায়ুতে PAHএর ঘনত্ব বেশ উদ্বেগজনক (কয়েক ন্যানোগ্রাম/কিউবিক মিটার বায়ু)। অধিকতর দূষিত বায়ুতে PAHএর ঘনত্ব এই ঘনত্বের প্রায় 10 গুণ বেশি। বেশির ভাগ বায়ুদূষণকারী PAH সৃষ্টি হয় কার্বন সমৃদ্ধ যৌগের অসম্পূর্ণ দহনের ফলে। বিভিন্ন উৎস থেকে PAH বায়ুতে মেশে, যথা—

i) ডিজেল এবং গ্যাসোলিন জ্বালানিযুক্ত ইঞ্জিন থেকে নির্গত গ্যাস,

ii) সিগারেটের দহনে নির্গত ধোঁয়ার আলকাতরা (বা টার),

iii) খাদ্যদ্রব্যের উপরিপৃষ্টের অঙ্গারিভবন বা দহন,

iv) কয়লা বা কাঠের দহনে উদ্‌গত ধোঁয়া,

এবং v) অন্যান্য কার্বনসমৃদ্ধ জ্বালানির অসম্পূর্ণ দহন (অর্থাৎ জ্বালানি যেখানে সম্পূর্ণরূপে CO এবং CO_2তে রূপান্তরিত হয় না)।

জীবাশ্ম জ্বালানি, জৈববস্তু (জঞ্জাল সহ) এবং কাঠের অসম্পূর্ণ দহনে উৎপন্ন সমধিক পরিচিত কুখ্যাত PAH-এর অন্যতম হচ্ছে '**বেঞ্জোপাইরিন**' এবং '**বেঞ্জোঅ্যানথ্রাসিন**'। এই PAHদ্বয় পরীক্ষা প্রাণী এবং খুব সম্ভবত মানুষের কারসিনোজেন হিসেবে কাজ করে।

যেসব PAH দূষক চার বা চারের কমসংখ্যক বলয় দ্বারা গঠিত, সেই সব PAH বায়ুতে গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে, কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে পর্যায়ক্রমিক মুক্ত-মূলক বিক্রিয়ার দ্বারা বায়ু থেকে অপসারিত হয়। বিপরীত ক্রমে চারের অধিক একীভূত বলয় দ্বারা গঠিত PAH দীর্ঘ সময় গ্যাসীয় অবস্থায় থাকতে পারে না। এই সব যৌগের বাষ্পীয় চাপ অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় উৎপন্ন হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যে ঘনীভূত হয়ে বায়ুতে বিচরণশীল ভুসা (soot) বা ছাই (ash) কণার গায়ে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থেকে বাতাসে ভেসে বেড়ায়।

b) **জলদূষণকারী (PAH) ঃ**

জলের পরিবেশও PAH দ্বারা দূষিত হয়। বিশেষ প্রজাতির PAH জলজ বাস্তুতন্ত্রে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম। বিভিন্ন উৎস থেকে নির্গত PAH-এর দ্বারা জল দূষিত হতে পারে।

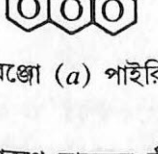
i) ফিসিং ডকে ব্যবহৃত কাঠের খণ্ড বা কাঠের পাটাতন পচনের হাত থেকে সংরক্ষণের জন্য কয়লা সৃষ্ট আলকাতরা—উদ্ভূত যৌগ **'ক্রিওসোট'** (creosote) ব্যবহার করা হয়। এই ক্রিওসোট PAH থেকে নিষ্কাশিত হয়ে জলে মুক্ত হয়।

ii) পরিবহনের সময় তেলের ট্যাঙ্কার থেকে, রিফাইনারী থেকে এবং অফ্-শোর অঞ্চলে তৈল উত্তোলনে ড্রিলিং জনিত কারণে কিছু পরিমাণ তেল সমুদ্রের জলে মিশে যায় (এই ঘটনাকে 'অয়েল-স্পিলিং' (oil spilling) বলা হয়)। সমুদ্রের জলে মিশে যাওয়া হাইড্রোকার্বন জাতীয় তেলের মাধ্যমে বেশ কিছু পরিমাণ PAH জলজ পরিবেশে মুক্ত হয়। এছাড়া পানীয় জলে PAH-এর উপস্থিতি বেশ উদ্বেগজনক (প্রতি-লিটারে কয়েক ন্যানোগ্রাম)।

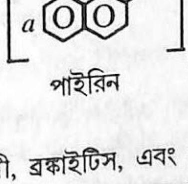
iii) **মানুষের স্বাস্থ্যের উপর**

PAH-এর মন্দ প্রভাব ঃ

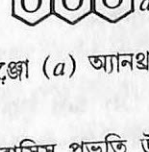
a) বাতাসে ভেসে থাকা ভুসা এবং ছাইকণা সংলগ্ন PAH প্রশ্বাস বায়ুর মাধ্যমে মানুষের ফুসফুসে প্রবেশ করে। এছাড়া গৃহে তামাকের ধোঁয়া, কয়লা ও কাঠের দহনে উৎপন্ন ধোঁয়ার মাধ্যমেও যথেষ্ট পরিমাণ PAH ফুসফুসে প্রবেশ করে। তার ফলে ফুসফুসীয় কোষ PAHএর দ্বারা প্রত্যক্ষ ভাবে আক্রান্ত হয়। PAHএর প্রভাবজনিত



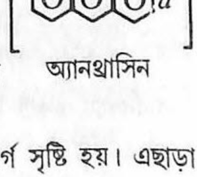
বেঞ্জো (*a*) পাইরিন



পাইরিন



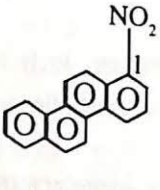
বেঞ্জো (*a*) অ্যানথ্রাসিন



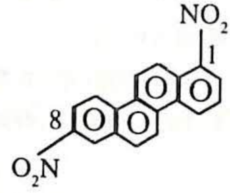
অ্যানথ্রাসিন

কারণে মানুষের হাঁপানী, ব্রঙ্কাইটিস, এবং প্লুরোসিস প্রভৃতি উপসর্গ সৃষ্টি হয়। এছাড়া কতিপয় কারসিনোজেনিক PAH যথা ; বেঞ্জোপাইরিন এবং বেঞ্জো-অ্যানথ্রাসিন ফুসফুসের ক্যানসার সৃষ্টির জন্য দায়ী।

b) ডিজেল ইঞ্জিন থেকে নির্গত ধোঁয়া বা গ্যাস কে সম্ভাব্য 'মনুষ্য কারসিনোজেন' (human carcinogen) রূপে চিহ্নিত করা হয়। ডিজেল ইঞ্জিন একঝসট্ এ (diesel engine exhanust) PAH ছাড়া কয়েক প্রকার নাইট্রোগ্রুপ সম্পন্ন উদ্ভূত যৌগ উপস্থিত থাকে। PAH উদ্ভূত নাইট্রোযৌগ যথা **'নাইট্রোপাইরিন'** (nitropyrene) এবং **'ডাইনাইট্রোপাইরিন'** (dinitropyrene) সক্রিয় কারসিনোজেন রূপে পরিচিত। নাইট্রো



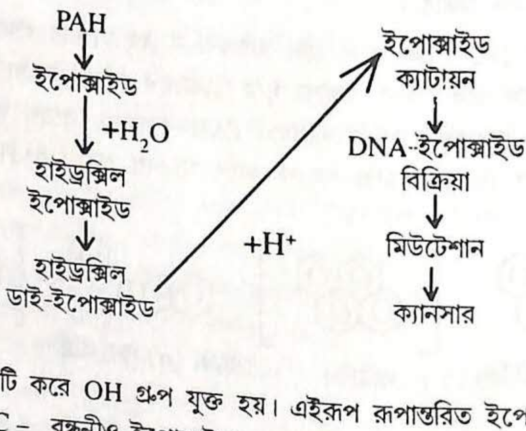
1- নাইট্রোপাইরিন



1, 8 - ডাইনাইট্রোপাইরিন

এবং ডাই-নাইট্রোপাইরিন DNA-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে জিনের মিউটেশান ঘটায় এবং এই মিউটেন্ট জিন ক্যানসার সৃষ্টি করে।

PAH- অণু নিজে ক্যানসার সৃষ্টি করতে পারে না। PAH দেহকোষে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভিন্নধর্মী অণুতে রূপান্তরিত হয়ে ক্যানসার সৃষ্টি করে। এইরূপ আণবিক রূপান্তরে PAH অণুর যেকোন একটি – C = C – বন্ধনীর সাহায্যে ইপোক্সাইড বলয় উৎপন্ন হয়। কিছু সংখ্যক ইপোক্সাইড অণু জলের সঙ্গে যুক্ত হয়, ফলে ইপোক্সাইড



কার্বনদ্বয়ে একটি করে OH গ্রুপ যুক্ত হয়। এইরূপ রূপান্তরিত ইপোক্সাইড অণুর অপর – C = C – বন্ধনীও ইপোক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। ইপোক্সাইড অণু পরবর্তী পর্যায়ে H^+ এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইপোক্সাইড ক্যাটায়ন উৎপন্ন করে। ইপোক্সাইড ক্যাটায়ন DNA-এর মিউটেশান ঘটায়। DNA-এর মিউটেশান থেকে ক্যানসার সৃষ্টি হয়।

c) PAH লিপিড দ্রাব্য হওয়ায় জলজ এবং স্থলজ খাদ্য-শৃঙ্খলে জীবপুঞ্জীভূত হয়, ফলে খাদ্য-শৃঙ্খল সম্পর্কীয় কারণে মানুষের চর্বিকোষে PAH পুঞ্জীভূত হয়। পুঞ্জীভূত PAH এর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবে যকৃতের অক্রিয়তা, এবং শুক্রাশয়ের ক্যানসার প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। অধুনা মাছ, মাংস, পালং এবং অন্যান্য শাক ও সব্জীতে যথেষ্ট পরিমাণ কারসিনোজেনিক PAH এর উপস্থিতি মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে একটি উদ্বেগজনক ঘটনা।

7.12 সারাংশ (Summary)

● যে সব রাসায়নিক পদার্থ জীবের ক্ষতি করে সেই সব পদার্থ 'বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ' বা 'টক্সিক পদার্থ নামে পরিচিত। ঘরে, ঘরের বাইরে এবং কর্মস্থলের পরিবেশে মানুষ টক্সিক পদার্থের সংস্পর্শে প্রকট হয়। মানুষের স্বাস্থ্যের উপর টক্সিক পদার্থের প্রভাব মূলত দুপ্রকার—'অ্যাকিউট' (ক্ষণস্থায়ী) এবং ক্রনিক (দীর্ঘস্থায়ী)। ক্রনিক উপসর্গের অন্যতম হচ্ছে **ক্যানসার**, **মিউটেশান**, **জন্মত্রুটি** এবং **জননসম্পর্কীয় বিষক্রিয়া**।

● কোষের অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি কে ক্যানসার বলা হয়। টক্সিক পদার্থের বিষক্রিয়ায় ফুসফুস, শুক্রাশয় এবং পাকস্থলীর ক্যানসারই বেশি ঘটে। 20-40 শতাংশ ক্যানসার ঘটে কর্মস্থলে পরিবেশের দূষণজনিত কারণে।

● কোষের জননবস্তু DNA-এর গঠনমূলক পরিবর্তনকে **'মিউটেশান'** বলা হয়। মিউটেশান সংঘটনকারী শর্তকে **মিউটাজেন** বলে। টক্সিক পদার্থ **'মিউটাজেন'** হিসেবে কাজ করে। মিউটেশান অসংশোধনযোগ্য হলে, ক্যানসার সৃষ্টি হয়। জনন কোষে মিউটেশান অপত্য বংশধরে বাহিত হয়, ফলস্বরূপ জন্ম-ত্রুটি, গর্ভপতন এবং মৃতসন্তান জন্মানোর মত ঘটনা ঘটতে পারে।

● যে সব রাসায়নিক পদার্থ জন্মত্রুটি সৃষ্টি করে, তাদের **'টেরাটোজেন'** বলা হয়। মানুষের ক্ষেত্রে কয়েকটি পদার্থ (যথা অ্যালকোহল, প্রোজেস্টেরন) টেরাটোজেন রূপে নিশ্চিতভাবে ক্রিয়া করলেও কিছু রাসায়নিক পদার্থ সন্দেহের তালিকায় রয়েছে (যথা ভিটামিন, আয়রন, টোব্যাকো, অ্যাসপিরিন ইত্যাদি)।

● বিভিন্ন রাসায়নিক এবং ভৌত পদার্থের প্রভাবে জনন প্রক্রিয়ায় বিষক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার ঘটনাকে **'জনন-বিষক্রিয়া'** বলা হয়। জনন-বিষক্রিয় পদার্থ জনন প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করে।

● টক্সিক পদার্থ উৎসেচকের ক্রিয়াকে বাধাদান করে। কোষের অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে এবং কিছু কোষীয় প্রাকৃতিক পদার্থের ক্ষরণ বৃদ্ধি করে টক্সিক পদার্থ কোষীয় স্তরে কাজ করতে পারে। বিভিন্ন শর্ত যথা ঃ টক্সিনের মাত্রা ও ক্রিয়াকাল, জৈব সক্রিয়তা, বয়স, স্বাস্থ্যের অবস্থা, সহযোগিতা এবং বিরোধিতা প্রভৃতি শর্ত টক্সিক পদার্থের বিষক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এইসব শর্ত ব্যতিরেকে টক্সিক পদার্থের জীবকেন্দ্রীভবন ও জীব বিবর্ধনও টক্সিক পদার্থের বিষক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

• বিভিন্ন অঅনুমোদিত রঙ এবং অপমিশ্র খাদ্যের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। এই সব খাদ্য-সংযোজিত বস্তুর বেশিরভাগই তীব্র কারসিনোজেন, যথা মিঠাই, আইসক্রিম, বেভারেজ পানীয় এবং ডালে সংযোজিত মেটানিল ইয়ালো নামক কমলা বা কিশোরী রঙ, রোডামিন- 'B' নামক গোলাপী কোল-টার রঙ, পানমশলার অ্যারাকোলিন রাসায়নিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

• কৃষিক্ষেতে, বাগানে এবং বাসস্থানে বিভিন্ন অবাঞ্ছিত জীব ধ্বংস করতে পেষ্টিসাইড ব্যবহার করা হয়। ব্যবহৃত পেস্টিসাইডের প্রায় অর্ধেক **ইনসেক্টিসাইড, হার্বিসাইড** এবং **ফাংগিসাইড**। পেস্টিসাইডের বেশিরভাগই জলে অদ্রাব্য এবং লিপিড দ্রাবকে দ্রাব্য। এছাড়া পেস্টিসাইড অণু ননবায়োডিগ্রেডেবল হওয়ায় পরিবেশে বহুবছর অবিকৃত অবস্থায় থাকতে পারে। লিপিড দ্রাব্যতা এবং পরিবেশ স্থায়িত্বের কারণে পেস্টিসাইড অণু খাদ্য-শৃঙ্খলে জীব কেন্দ্রীভূত এবং জীববিবর্ধিত হয়ে জীব কোষে বিষক্রিয়া সৃষ্টিতে সক্ষম। বিষক্রিয়াজনিত কারণে অধিকাংশ উন্নত দেশে ক্ষতিকারক পেস্টিসাইডের উৎপাদন, ব্যবহার এবং আমদানী নিয়ন্ত্রিত বা নিষিদ্ধ হলেও ভারতসহ তৃতীয়বিশ্বের দেশসমূহে পেস্টিসাইডের ব্যবহার এখনও বাধাহীন।

• পেস্টিসাইড ব্যতিরেকে পরিবেশ এবং মানুষের স্বাস্থ্যের উপর মন্দ প্রভাব সৃষ্টিকারী বিষক্রিয় রাসায়নিক পদার্থের অন্যতম হচ্ছে **ডাইঅক্সিন, পি. সি. বি** এবং **ফিউরান**। মানুষের প্রয়োজনে এই সব পদার্থের উৎপাদনের সময় বা ব্যবহারের পরে এইসকল বিষক্রিয় পদার্থ পরিবেশে সংক্রমিত হয়। লিপিড দ্রাব্যতা এবং স্থায়িত্বের কারণে পরিবেশ থেকে খাদ্য শৃঙ্খলে পুঞ্জীভূত এবং বিবর্ধিত হয়ে মানুষের শরীরে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।

• জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা, গ্যাসোলিন, ডিজেল, পেট্রোল, কেরোসিন, গ্যাস), জৈব বস্তু এবং কাঠের অসম্পূর্ণ দহনে উৎপন্ন **'পলিনিউক্লিয়ার অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন'** (PAH) হচ্ছে একটি পরিচিত বায়ুদূষক। PAH শ্রেণীর যৌগই পরিবেশ তথা মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকারক। ডিজেল ইঞ্জিনের একঝসট্ থেকে নির্গত PAH-এর সদস্য যৌগ **'নাইট্রোপাইরিন'** এবং **'ডাইনাইট্রোপাইরিন'** মনুষ্য কারসিনোজেন রূপে পরিচিত।

• অনুশীলনী •

A) রচনাভিত্তিক বা দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. টক্সিন (বিষাক্ত পদার্থ) বলতে কি বোঝ? মানুষের উপর টক্সিনের অ্যাকিউট এবং ক্রনিক প্রভাব সংক্ষেপে বর্ননা কর।
2. টক্সিন কিভাবে কাজ করে? টক্সিক পদার্থের বিষক্রিয়ায় বিভিন্ন শর্তের প্রভাব বিবৃত কর।

3. জীবকেন্দ্রীভবন এবং জীববিবর্ধন কি? টক্সিক পদার্থের নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।
4. খাদ্য-সংযোজিত বস্তু কাকে বলে? কয়েকটি উল্লেখযোগ্য খাদ্যরং এবং খাদ্য ভেজাল সম্পর্কে আলোচনা কর। খাদ্যে অপমিশ্রণ (ভেজাল) সনাক্তকরণের পদ্ধতি বর্ণনা কর।
5. পেস্টিসাইড কাকে বলে? বর্তমানে কত প্রকার পেস্টিসাইড ব্যবহার করা হয়? পেস্টিসাইডের পরিবেশ সম্পর্কীয় প্রভাব বর্ণনা কর।
6. ডি ডি টি কি? ডি ডি টি-এর রাসায়নিক প্রকৃতি, ব্যবহার এবং পরিবেশ সম্পর্কীয় প্রভাব বর্ণনা কর।
7. ডি.ডি.টি'-র জীবকেন্দ্রীভবন (জীবপুঞ্জীভবন) বর্ণনা কর।
8. অর্গ্যানো-ফসফেট ইনসেক্টিসাইড কি? উদাহরণ দাও। এই প্রকার ইনসেক্টি সাইডের ব্যবহার এবং পরিবেশগত প্রভাব বর্ণনা কর।
9. হার্বিসাইড কাকে বলে? বিভিন্ন হার্বিসাইডের ব্যবহার এবং পরিবেশ সম্পর্কীয় বিষক্রিয়া বর্ণনা কর।
10. ডাই-অক্সিন কি? ডাই-অক্সিনের ব্যবহার এবং পরিবেশ সম্পর্কীয় প্রভাব বর্ণনা কর। মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ডাই অক্সিনের প্রভাব আলাচনা কর।
11. PCB-র প্রকৃতি, ব্যবহার এবং পরিবেশ সম্পর্কীয় প্রভাব বর্ণনা কর।
12. PAH বলতে কি বোঝ? পরিবেশ দূষণে PAH-র ভূমিকা উল্লেখ কর। মানুষের স্বাস্থ্যের উপর PAH-র প্রভাব বর্ণনা কর।

B) সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. টক্সিন কি? উদাহরণ দাও। মেটাস্টেসিস কি?
2. ক্যানসার বলতে কি বোঝ? ক্যানসারের কারণ কি? ক্যানসার (কর্কট রোগ) সৃষ্টিকারী কয়েকটি টক্সিক পদার্থের নাম উল্লেখ কর।
3. মিউটেশান কাকে বলে? মিউটাজেন বলতে কি বোঝায়? মানুষের ক্ষেত্রে মিউটেশানের উদাহরণ দাও।
4. ডাউনসিনড্রোম (ট্রাইজোমি) কি? ডাউন সিনড্রোম কেন হয়? এর বাহ্যিক লক্ষণ কি কি?
5. জন্মত্রুটি বলতে কি বোঝ? উদাহরণ দাও,
6. টেরাটোজেন কি? কয়েকটি জ্ঞাত এবং সন্দেহজনক টেরাটোজেনের নাম উল্লেখ কর।
7. ভ্রূণ বিকাশের কোন্ পর্যায়ে টেরাটোজেন সর্বাধিক ক্রিয়াশীল? 'মিথাইল মার্কারি' এবং 'অ্যালকোহল' ভ্রূণ বিকাশের উপর কি রূপ প্রভাব বিস্তার করে?

8. জননসংক্রান্ত বিষক্রিয়া বলতে কি বোঝ? এই বিষক্রিয়ার কারণ এবং উপায় বর্ণনা কর।
9. অ্যাজবেস্টাস কি? মানুষের উপর অ্যাজবেস্টাসের প্রভাব উল্লেখ কর। অ্যাজবেস্টাস ঘটিত ক্যান্সারের কারণ কি?
10. টক্সিন কিভাবে কাজ করে?
11. টক্সিক পদার্থের বিষক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারকারী বিভিন্ন শর্তগুলি উল্লেখ কর। LD_{50} বলতে কি বোঝ?
12. জীব-কেন্দ্রীভবন এবং জীব-বিবর্ধন কি? DDT-র জীব-বিবর্ধন উল্লেখ কর।
13. খাদ্য-সংযোজিত বস্তু কি? মেটানিল ইয়ালো, রোডামিন-বি, অ্যারাকোলিন এবং অ্যালুমিনিয়াম পাতের ব্যবহার এবং প্রভাব উল্লেখ কর।
14. পেস্টিসাইড কাকে বলে? DDT-র পরিবেশ সম্পর্কীয় প্রভাব বর্ণনা কর।
15. অর্গ্যানো-ফসফেট-ইনসেক্টিসাইডের ক্রিয়া পদ্ধতি বর্ণনা কর।
16. প্রাকৃতিক পেস্টিসাইড বলতে কি বোঝ? মানুষের স্বাস্থ্যের উপর অর্গ্যানো-ফসফেট-ইনসেক্টিসাইডের প্রভাব বর্ণনা কর
17. 'PCB' কি? 'PCB'-র পরিবেশ সংক্রান্ত প্রভাব বর্ণনা কর।
18. 'PAH' কি? মানুষের স্বাস্থ্যের উপর 'PAH'-এর প্রভাব বর্ণনা কর।
19. ডাইঅক্সিন বলতে কি বোঝায়? মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ডাইঅক্সিনের প্রভাব বর্ণনা কর।

8 বায়ু দূষণ

8.1. ভূমিকা (Introduction) :

পৃথিবীতে জীবের সৃষ্টি তথা অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে বায়ুর উপস্থিতির জন্যই। নাইট্রোজেন (78.09%), অক্সিজেন (20.94%), কার্বনডাইঅক্সাইড (0.03%) এবং স্বল্প পরিমাণ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের (যথা : আর্গন, হিলিয়াম, জেনন এবং ক্রিপটন প্রভৃতি) মিশ্রণকে বায়ু বলা হয়। জীবের বৃদ্ধি এবং বিকাশের জন্য বিশুদ্ধ বায়ু ও বায়ুর উপাদানের স্বাভাবিক মাত্রা অত্যাবশ্যক। বায়ুর বিশুদ্ধতা এবং উপাদানের মাত্রার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রিত হয় বায়ুর 'নিজস্ব-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার' মাধ্যমে। যদি কোন কারণে 'প্রাকৃতিক' এবং মনুষ্যসৃষ্ট উৎস থেকে ভারসাম্য বিঘ্নিতকারী কোন কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় অবাঞ্ছিত বহিঃস্থ পদার্থ (foreign substance) বা নিজ উপাদানের মাত্রাধিক অনুপ্রবেশ ঘটে, তাহলে স্ব-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে বহিঃস্থ পদার্থ বা নিজ উপাদানের 'অতিরিক্ত পরিমাণ' বায়ু থেকে অচিরেই অপসারিত হয়, ফলে বায়ুর স্বাভাবিক ভারসাম্য নিয়ন্ত্রিত হয়। ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণকারী বায়ুর 'নিজস্ব-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা'র একটি 'চরম-সহনশীল-সীমা' (Critical Tolerance Limit)

রয়েছে। এই সীমার বাইরে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কাজ করে না, ফলে বায়ুতে বহিঃস্থ বস্তু ও নিজ উপাদানের মাত্রাধিক সঞ্চয় ঘটে। **বায়ুতে বহিঃস্থ উপাদানের উপস্থিতি ও সঞ্চয় এবং নিজ উপাদানের অতিরিক্ত সঞ্চয়ে জীবজগৎ এবং সম্পত্তির উপর মন্দ প্রভাব বিস্তারের ঘটনাকে বায়ুদূষণ বলা হয়।** বর্তমানে জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি, অরণ্যধ্বংস, নগরায়ন, শিল্পায়ন, কৃষিপদ্ধতির পরিবর্তন এবং জীবাশ্ম জ্বালানির অধিক ব্যবহার জনিত কারণে বায়ুতে বহিঃস্থ অবাঞ্ছিত পদার্থের উপস্থিতি ও সঞ্চয় এবং নিজ উপাদানের মাত্রাধিক সঞ্চয়ে বায়ুর নিজস্ব 'নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার' ক্রিয়াশক্তি বিনষ্টের মুখে। মানুষের এই অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপে পৃথিবীর সর্বজনীন বায়ুসম্পদ আজ বিপন্ন এবং মানুষ তথা সমগ্র জীবজগৎ সম্ভাব্য বিপদে আতঙ্কিত।

8.2. দূষক (Pollutant), দূষণ (Pollution) এবং বায়ুদূষণ (Air Pollution) ঃ

প্রাকৃতিক বা মনুষ্য সৃষ্ট প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বহিঃস্থ অবাঞ্ছিত বস্তুর অংশ বা পরিবেশের নিজস্ব উপাদানের অতিরিক্ত অংশ যদি পরিবেশের সঙ্গে মিথস্ক্রিয়ায় পরিবেশ বিষক্রিয়া, রোগ সৌন্দর্যহানি, শারীরবৃত্তিয় মন্দ প্রভাব সৃষ্টি করে বা পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট করে তাহলে সেইসব সংক্রামক বস্তুর অংশ বা অংশসমূহকে **'দূষক'** বা **'পলিউটেন্ট'** (Pollutant) বলা হয় এবং পলিউটেন্ট দ্বারা পরিবশে ভারসাম্য বিনাশের ঘটনাক্রম বা ঘটনাকে **'দূষণ (Pollution)** বলা হয়।

প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন বহিঃস্থ বস্তুর অংশ বা বায়ুর স্ব-উপাদানের অতিরিক্ত অংশ বায়ু-পরিবেশে (ambient air) উপস্থিত থেকে যখন মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদের সুস্থ বৃদ্ধি, বিকাশ এবং বংশবিস্তার বা প্রাণপ্রবাহ বিঘ্নিত করে বা সম্পত্তির ক্ষতি করে, তখন তাকে **বায়ুদূষণ** (Air Pollution) বলা হয়।

● **বায়ু দূষণের ইতিহাস ঃ** বায়ুদূষণ সম্পর্কীয় ধারণা মানুষের মনে দাগ কেটেছিল বহু আগে থেকেই। কয়লা দহনে উৎপন্ন ধোঁয়ায় বায়ুর দূষণ রোধ করার জন্য 1273 খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি আইন বলবৎ করা হয়। 1300 খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট এডওয়ার্ড-I একটি রাজ-ঘোষণায় প্রচার করেন যে, কয়লা দহনে বায়ুদূষণ সংঘটনকারী ব্যক্তির শিরচ্ছেদ করা হবে। 1306 খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনায় এক দোষী ব্যক্তির শিরঃচ্ছেদ করা হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের সময় উপরিউক্ত আইন অমান্য করা হয়।

8.3. বায়ুদূষণের উৎস (Sources of Air Pollution) ঃ

বায়ুদূষণ সৃষ্টিকারী সংক্রামক বস্তু প্রধানত দুটি উৎস থেকে উৎপন্ন হয়—**'প্রাকৃতিক উৎস'** এবং **'মনুষ্যসৃষ্ট উৎস।**

8.3.1. **প্রাকৃতিক উৎস** (Natural Sources) ঃ

প্রাকৃতিক উৎস থেকে উৎপন্ন বায়ুর সংক্রামককে '**প্রাকৃতিক দূষক**' বা '**ন্যাচার‍্যাল পলিউটেন্ট**' বলা হয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস থেকে বায়ুদূষক উৎপন্ন হতে পারে, যথা : আগ্নেয়গিরির অগ্নুৎপাত, অরণ্য অগ্নিকাণ্ড (forest fire), বায়ু ঝড়, জীবন্ত এবং মৃত পচনশীল উদ্ভিদ, মৃত্তিকা এবং সমুদ্র (বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস এবং উৎস থেকে উৎপন্ন দূষকের নাম তালিকায় উল্লেখ করা হয়েছে)।

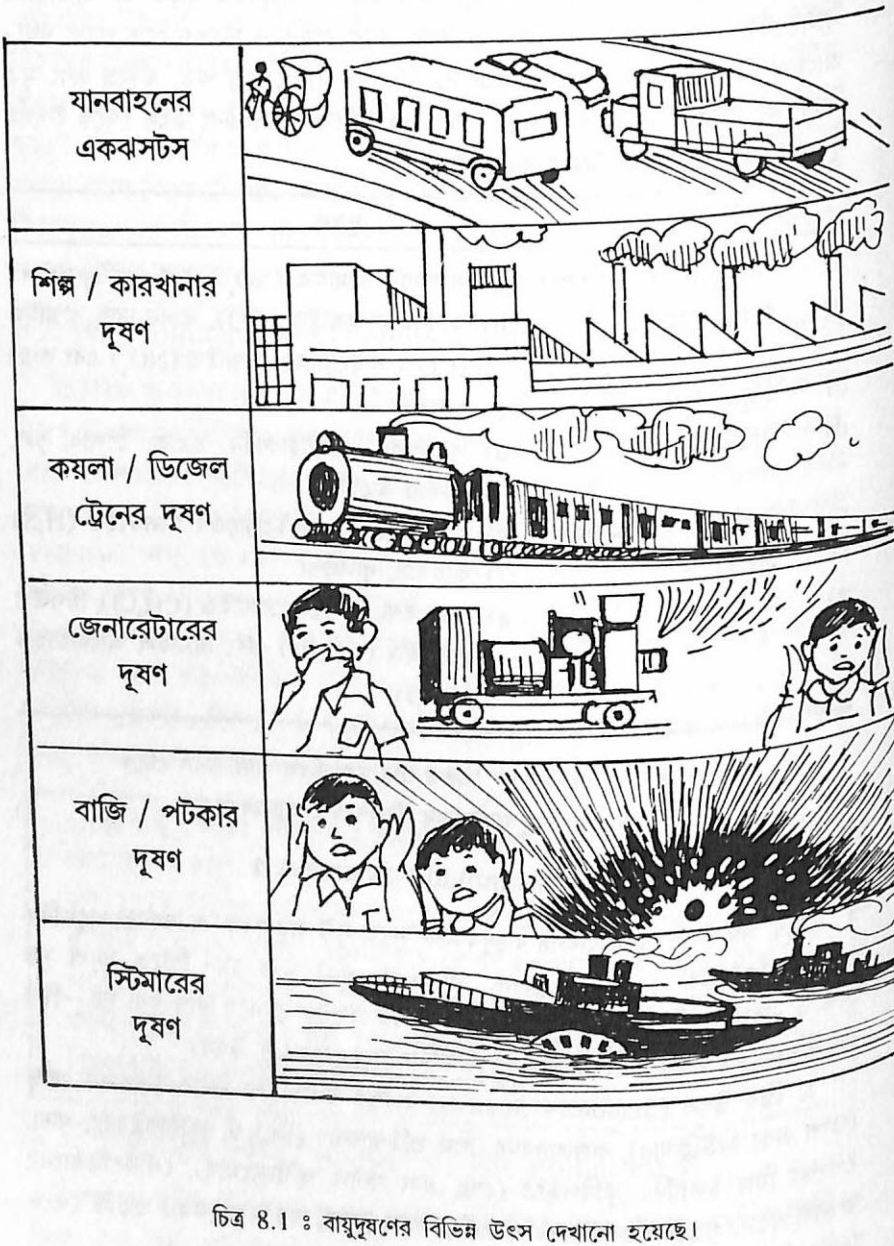
উৎস	দূষক
a) আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত	a) সালফার অক্সাইড (SO_x), কণা (পার্টিকুলেটস)
b) অরণ্য অগ্নিকাণ্ড	b) কার্বনমনোঅক্সাইড (CO), কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2), নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO_x) এবং কণা।
c) বায়ুঝড়	c) ধুলিকণা
d) উদ্ভিদ (জীবিত)	d) পরাগরেণু, হাইড্রোকার্বন, ছত্রাক, স্পোর, চুল, ফেদার ইত্যাদি।
e) উদ্ভিদ (মৃত পচনশীল)	e) মিথেন (CH_4), হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S)
f) মৃত্তিকা	f) ভাইরাস, ধুলিকণা
g) সমুদ্র	g) লবণ কণা, মিথাইল ক্লোরাইড (CH_3Cl), মিথাইল ব্রোমাইড (CH_3Br) এবং মিথাইল আয়োডাইড (CH_3I)।

তালিকা 8.1 ঃ বায়ু দূষণের বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস এবং উৎস থেকে উৎপন্ন বায়ুদূষকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

8.3.2. **মনুষ্য সৃষ্ট উৎস** (Manmade Sources) ঃ

মনুষ্য সৃষ্ট উৎস থেকে উৎপন্ন বায়ুদূষককে '**মনুষ্য-সৃষ্ট বায়ু দূষক**' বা '**আনথ্রপোজেনিক এয়ার পলিউটেন্ট**' (anthropogenic air pollutant) বলা হয়। বিভিন্ন মনুষ্য সৃষ্ট পদ্ধতি বায়ুদূষণে সাহায্য করে। মনুষ্যসৃষ্ট উৎসকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয়—স্থির (stationary) উৎস এবং সচল বা পরিবর্তনশীল (mobile) উৎস।

1. **স্থির উৎস** (Stationary Sources) ঃ স্থির উৎস যথা বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র (তাপ এবং নিউক্লিয়ার), কলকারখানা, শিল্প প্রক্রিয়াকরণ (সিমেন্ট, ফার্টিলাইজার, খাদ্য, পেপার মিল ইত্যাদি), কৃষিপদ্ধতি (স্প্রে এবং ফসল অগ্নিসংযোগ), পৌরপ্রতিষ্ঠানের জঞ্জাল দহন, গৃহস্থকাজে জীবাশ্ম জ্বালানির দহন (রান্না, ঘর গরম করা) প্রভৃতি থেকে বিভিন্ন দূষক বায়ুতে সংক্রমিত হয়।



চিত্র ৪.1 ঃ বায়ুদূষণের বিভিন্ন উৎস দেখানো হয়েছে।

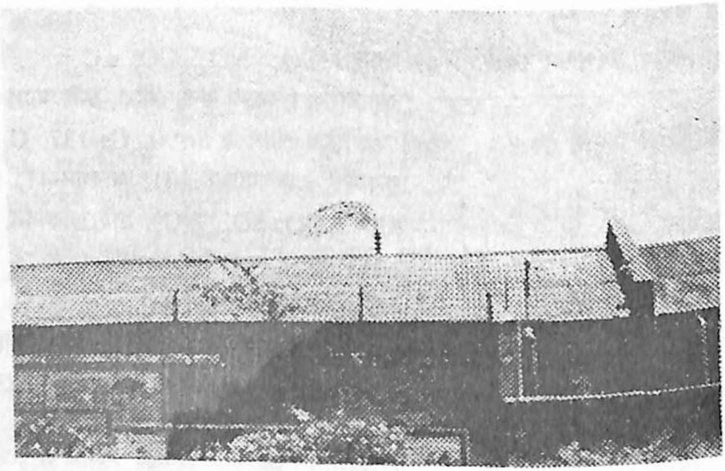
2. **সচল উৎস** (Mobile Sources) ঃ বায়ুদূষণকারী প্রধান সচল উৎস হচ্ছে পরিবহন (সড়ক পরিবহন—বাস, ট্রাক, কার প্রভৃতি; রেলপরিবহন; আকাশ পরিবহন—এরোপ্লেন, কংকর্ড এবং জল পরিবহন—জাহাজ, লঞ্চ এবং মোটর চালিত নৌকা)।

উৎস	দূষক
1. **স্থির উৎস ঃ**	
a) তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র	a) গ্যাস ঃ SO_x, NO_x, CO, CO_2 অ্যারোসল ঃ কয়লা কণা, ধোঁয়া, ফ্লাই-অ্যাশ (ভুসা)
b) নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্র	b) তেজস্ক্রিয় গ্যাস ঃ Sr-90, Cs-137, C-14, ফ্লুরাইড ; আয়োডিন-131, আরগন-41, রেডন
c) কারখানা	গ্যাস ঃ CO, SO_x, NO_x, হাইড্রোকার্বন, H_2S, NH_3, বাস্প, গন্ধ অ্যারোসল ঃ ধুলিকণা, ধোঁয়া
d) শিল্পপ্রক্রিয়াকরণ	d) গ্যাস ঃ CO, SO_x, NO_x, NH_3, জৈব ফসফেট অ্যারোসল ঃ ধুলিকণা, বাষ্প, কুয়াশা, অ্যাজবেস্টাস
e) কৃষিপ্রক্রিয়া	e) গ্যাস ঃ SO_x, ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন অ্যারোসল ঃ ধুলিকণা, কুয়াশা, ধোঁয়া, ফ্লাই-অ্যাশ
f) রেফ্রিজারেটার শিল্প	f) গ্যাস ঃ ফ্রেয়ন গ্যাস (ক্লোরোফ্লুরোকার্বন), ক্লোরিন, ব্রোমিন
g) পৌরপ্রতিষ্ঠান—জঞ্জাল দহন	g) গ্যাস ঃ CO, CO_2, SO_x, NO_x, NH_3 অ্যারোসল ঃ ধোঁয়া, কণা, জৈব ফসফেট, ফ্লাই-অ্যাশ।
h) গৃহস্থ জ্বালানি (কয়লা, গ্যাস, কেরোসিন)	h) গ্যাস ঃ CO_2, CO, H_2S অ্যারোসল ঃ কণা—(সীসা ও পারদ), ধোঁয়া, কুয়াশা
2. **সচল উৎস ঃ**	
পরিবহন ঃ স্থল, জল এবং আকাশ (কার, ট্রাক, রেলগাড়ি, জাহাজ, এরোপ্লেন এবং কংকর্ডের জ্বালানির দহন)।	গ্যাস ঃ CO_2, CO, H_2S, SO_x, NO_x, হাইড্রোকার্বন অ্যারোসল ঃ ধোঁয়া, কণা—পারদ ও সীসা।

তালিকা 8.2 ঃ বায়ুদূষণের বিভিন্ন মনুষ্য-সৃষ্ট উৎস এবং উৎস থেকে উৎপন্ন বায়ুদূষকের নাম দেওয়া হয়েছে

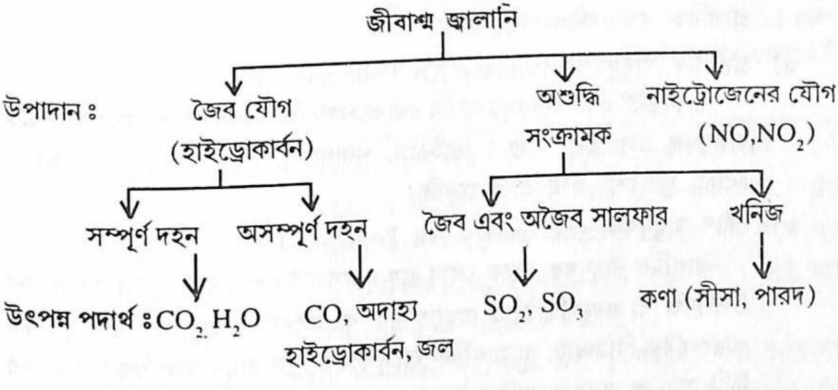
• মনুষ্য-সৃষ্ট বায়ুদূষকের উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

মনুষ্যসৃষ্ট বায়ুদূষক উৎপন্ন হয় প্রধানত তিন প্রক্রিয়ায়— a) **ঘর্ষণ** (friction) b) **বাষ্পীভবন** (evaporation or vaporization) এবং c) **দহন**। দহনজনিত কারণই বায়ুমণ্ডলে বিষাক্ত গ্যাসীয় বায়ুদূষকের উপস্থিতির প্রধান কারণ। শিল্পকারখানা,

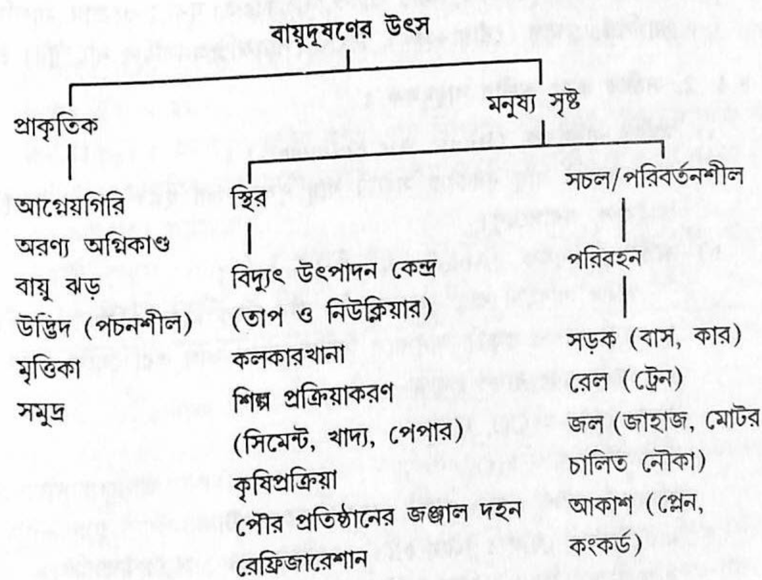


চিত্র 8.2 ঃ কারখানা নিঃসৃত ধোঁয়া বায়ু-দূষণের একটি অন্যতম প্রধান কারণ (লেখকের তোলা ছবি)।

গৃহস্থ কাজ এবং পরিবহনে ব্যবহৃত জীবাশ্ম জ্বালানির (যথা ঃ কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, কেরোসিন, ডিজেল, পেট্রোল, গ্যাসোলিন প্রভৃতি) অসম্পূর্ণ দহন বায়ুদূষণের অন্যতম প্রধান কারণ। জীবাশ্ম জ্বালানির সম্পূর্ণ দহনে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2) এবং জল (H_2O) উৎপন্ন হয়, কিন্তু অসম্পূর্ণ দহনে অত্যন্ত ক্ষতিকারক **কার্বনমনোক্সাইড গ্যাস** (CO) এবং অদাহ্য **হাউড্রোকার্বন** উৎপন্ন হয়। জীবাশ্ম জ্বালানিতে উপস্থিত খনিজ সংক্রামক—'সীসা' এবং 'পারদ' দহনকালীন উদ্‌গত উত্তপ্ত গ্যাসের মাধ্যমে কণারূপে বায়ুমণ্ডলে মুক্ত হয়। অশুদ্ধি সংক্রামক—সালফারের (S) সঙ্গে অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় সালফার অক্সাইড (SO_x) যথা—সালফার ডাই অক্সাইড (SO_2) এবং সালফার ট্রাইঅক্সাইড গ্যাস (SO_3) উৎপন্ন হয়। দহনের সময় বায়ুর নাইট্রোজেনের অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় **'নাইট্রিক অক্সাইড'** (NO) গ্যাস উৎপন্ন হয়। নাইট্রিক অক্সাইড অতিদ্রুত বাদামী কমলা বর্ণের **নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড** গ্যাসে (NO_2) পরিবর্তিত হয়।



চিত্র 8.2 ঃ জীবাশ্ম জ্বালানির দহনে উৎপন্ন পদার্থের প্রকৃতি দেখানো হয়েছে।



চিত্র 8.3 ঃ বায়ুদূষণের উৎস উল্লেখ করা হয়েছে।

8.4. বায়ুদূষকের শ্রেণী বিভাগ (Classification of Air Pollutants) ঃ

উৎস থেকে বায়ুদূষকের সৃষ্টি পদ্ধতি বা বায়ু দূষকের প্রকৃতি অনুসারে বায়ুদূষককে নিম্ন উল্লিখিত শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে।

8.4.1. **প্রাথমিক এবং গৌণ বায়ুদূষক ঃ**

a) **প্রাথমিক বায়ুদূষক** (Primary Air Pollutants) **ঃ**

প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট উৎস থেকে সরাসরি উৎপন্ন বায়ুদূষককে **প্রাথমিক বায়ুদূষক** বলা হয়। যথা ঃ ভাইরাস, পরাগরেণু, CO, CO_2, SO_x, NO_x, ধোঁয়া, ধুলিকণা, ফ্লাই-অ্যাশ প্রভৃতি।

b) **গৌণ বায়ুদূষক** (Secondary Air Pollutants) **ঃ**

প্রাথমিক বায়ুদূষক থেকে গৌণ বায়ু দূষকের উৎপত্তি ঘটে। সৌর আলোকের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতিতে বায়ুতে দুই বা ততোধিক প্রাথমিক বায়ু দূষকের পারস্পরিক বিক্রিয়ায়, বা প্রাথমিক বায়ুদুষকের সঙ্গে বায়ুর স্বাভাবিক উপাদানের বিক্রিয়ায়, বা বায়ুর স্বাভাবিক উপাদানদ্বয়ের পারস্পরিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন নতুন প্রকৃতির বায়ুদূষককে **'গৌণ বায়ুদূষক'** বলা হয়। গৌণ বায়ুদূষক—উৎপাদক প্রাথমিক বায়ু দূষকের তুলনায় অধিক ক্ষতিকারক। যথা ঃ **ওজোন, সালফিউরিক অ্যাসিড, স্মোগ (ধোঁয়া+ফগ্), PAN (পারঅক্সিঅ্যাসাইল নাইট্রেট) প্রভৃতি।**

8.4. 2. **সজীব এবং অজীব বায়ুদূষক ঃ**

a) **সজীব বায়ুদূষক** (Biotic Air Pollutants) **ঃ**

প্রাণ সম্পন্ন বায়ু দূষককে সজীব বায়ু দূষক বলা হয়। যথা ঃ ব্যাক্টিরিয়া, ভাইরাস, পরাগরেণু।

b) **অজীব বায়ুদূষক** (Ablotic Air Pollutant) **ঃ**

সমস্ত প্রাণহীন বায়ু দূষক অজীব বায়ু দূষক নামে পরিচিত। অজীব বায়ু দূষককে আবার প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

i) **গ্যাস এবং বাষ্প ঃ** যথা—

কার্বন যৌগ ঃ CO, CO_2

অক্সিজেন যৌগ ঃ O_3

সালফার যৌগ ঃ SO_2, SO_3, H_2S, মারক্যাপট্যান

নাইট্রোজেন যৌগ ঃ NO, NO_2, NO_3, NH_3, N_2O ইত্যাদি

হ্যালোজেন যৌগ ঃ HF, HCl

জৈব যৌগ ঃ হাইড্রোকার্বন, HCHO

তেজস্ক্রিয় যৌগ ঃ তেজস্ত্রিয় গ্যাস (Sr-90, Cs-134, C-14)

আলোক রাসায়নিক জারক

ii) অ্যারোসল (Aerosol) ঃ যথা—

ধুলিকণা, ধোঁয়া, মিষ্ট (কুয়াশা), ফগ্ (ঘন কুয়াশা), উদ্বায়ী পদার্থ।

iii) কণা (Particle) ঃ যথা—সীসা, পারদ।

অ্যারোসল ঃ বায়ু বিসরণ মাধ্যমে (dispersion medium) আণুবীক্ষণিক (0.01 মাইক্রণ বা তার কম থেকে 100 মাইক্রণ পর্যন্ত) কঠিন বা তরল বিসরণ দশার কোলয়ডীয় দ্রবণকে অ্যারোসল বলা হয়। অ্যারোসল বিভিন্ন প্রকার হতে পারে।

a) **ডাস্ট বা ধুলিকণা** (Dust) ঃ জৈব এবং অজৈব পদার্থের ঘর্ষণ এবং চূর্ণীভবনে ডাস্ট উৎপন্ন হয়। 5 মাইক্রণ বা তার ছোট ডাস্ট কণা বায়ুতে স্থায়ী সাসপেনশান সৃষ্টি করে কিন্তু অপেক্ষাকৃত বড় ডাস্টকণা অভিকর্ষের ফলে স্থলে এবং জলে অধঃক্ষিপ্ত হয়। ডাস্টকণা বিভিন্ন প্রকৃতির হতে পারে যথা ঃ ফ্লাই অ্যাশ (1-200 মাইক্রণ), সিমেন্ট (50-150 মাইক্রণ) ইত্যাদি।

b) **ধোঁয়া** (Smoke) ঃ কয়লা বা অন্যান্য দাহ্য বস্তুর অসম্পূর্ণ দহনে উৎপন্ন অতি সূক্ষ্ম কণার (1 মাইক্রণের কম) বায়ু বিসরণে ধোঁয়া উৎপন্ন হয়। উদাহরণ ঃ কয়লার ধোঁয়া কণা (0.01-0.2 মাইক্রণ), তেলের ধোঁয়া কণা (0.01-1.0 মাইক্রণ)।

c) **মিস্ট** (Mist) ঃ অপেক্ষাকৃত বড় আয়তনের তরল কণার লঘু বায়ু বিসরণে মিস্ট উৎপন্ন হয়। প্রাকৃতিক মিস্ট (40-500 মাইক্রণ) জলীয় বাষ্প থেকে উৎপন্ন হয়।

d) **ফগ** (Fog) ঃ তরল বা কঠিন কণার বায়ু বিসরণে সৃষ্ট দ্রষ্টব্য অ্যারোসলকে ফগ্ বলা হয়। প্রাকৃতিক ফগ্ হচ্ছে ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুতে জলকণা বা বরফ কণার (1-40 মাইক্রণ) অ্যারোসল।

e) **উদ্বায়ী পদার্থ** (fume) ঃ গলিত বস্তুর উদ্বায়ীকৃত গ্যাসের ঘনীভবনে উৎপন্ন কঠিন কণাকে ফিউম বা উদ্বায়ী পদার্থ (0.01-1 মাইক্রণ) বলা হয়।

তালিকা 8.3 ঃ অ্যারোসলের প্রকৃতি দেওয়া হয়েছে।

8.5. প্রধান বায়ুদূষক গ্যাস (Principal Air Polluting Gases) এবং উৎস (Sources) ঃ

প্রধান বায়ু দূষণকারী গ্যাস এবং তাদের উৎস উল্লেখ করা হল।

a) **কার্বনমনোক্সাইড** (CO) ঃ বর্ণহীন, গন্ধহীন অত্যন্ত বিষাক্ত গ্যাস। কার্বন সমৃদ্ধ যৌগের (যথা—জীবাশ্ম জ্বালানি) অসম্পূর্ণ দহনে কার্বনমনোক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়।

প্রধান উৎস ঃ

i) অটোমোবাইল একঝসট্স,
ii) ইলেকট্রিক এবং ব্লাস্ট ফার্নেস,
iii) পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী,
iv) কোল মাইন,
v) গ্যাস ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট।

b) **সালফার অক্সাইড (SO_x) ঃ** প্রধানত সালফারডাই অক্সাইড (SO_2) এবং সালফার ট্রাই অক্সাইড (SO_3)। সালফার যুক্ত কয়লা, গ্যাস এবং হাইড্রোকার্বন তেলের দহনে সালফার ডাইঅক্সাইড এবং সালফার ট্রাই অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

প্রধান উৎস ঃ

i) তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।
ii) অটোমোবাইল একঝসট্স।
iii) মেটালার্জিক্যাল (Zn,Cu,Pb) অপারেশান।
iv) সালফিউরিক অ্যাসিড প্লান্ট।
v) পেপার ম্যানুফ্যাকচারিং প্লান্ট।

c) **হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S) ঃ** পচা ডিমের মত দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস।

প্রধান উৎস ঃ

i) অবায়বীয় জীবের পচন, সমুদ্র, আগ্নেয়গিরি, প্রাকৃতিক ঝরণা বা প্রস্রবণ।
ii) পাল্প শিল্প।
iii) পেট্রোলিয়াম রিফাইনারী।
iv) কোক ওভেন প্লান্ট।
v) রেওন প্লান্ট, ইত্যাদি।

H_2S ব্যতিরেকে অন্যান্য দুর্গন্ধযুক্ত সালফার দূষক বায়ুদূষণ সৃষ্টি করে—যথা **মিথাইল মারক্যাপট্যান** (CH_3SH), **ডাইমিথাইল সালফাইড** ($CH_3S\ CH_3$) এবং **ডাইমিথাইল ডাইসালফাইড** ($CH_3\ SS\ CH_3$)।

d) **নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO_x) ঃ** বায়ুদূষণকারী নাইট্রোজেন অক্সাইড গ্যাস সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড (NO_2) এবং নাইট্রোজেন ট্রাই অক্সাইড (NO_3)।

প্রধান উৎস ঃ

i) নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদনকারী বা ব্যবহারকারী প্লান্ট।
ii) অটোমোবাইল একঝসট্স।
iii) পাওয়ার প্লান্ট।
iv) ফার্নেস এবং হিটবার্নার।

e) **ক্লোরিন (Cl_2) এবং হাইড্রোজেন ক্লোরাইড (HCl) ঃ**

প্রধান উৎস ঃ ক্লোরিন গ্যাস—

i) ক্লোরিন উৎপাদনকারী বা ব্যবহারকারী প্লান্ট।
ii) জল বিশোধন প্লান্ট।
iii) সিউয়েজ (Sewage) প্লান্ট।
iv) সুইমিং পুল।

হাইড্রোজেন ক্লোরাইড—

i) রাসায়নিক শিল্প।

f) **ওজোন (O_3) ঃ** বিষাক্ত এবং গন্ধযুক্ত গ্যাস।
প্রধান উৎস ঃ দহনজনিত দূষক—নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড এবং সূর্যালোকের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া।

g) **অ্যালডিহাইড (–CHO) ঃ** বায়ুদূষণকারী প্রধান অ্যালডিহাইড হচ্ছে ফরম্যালডিহাইড (HCHO)।

প্রধান উৎস ঃ

i) গ্যাসোলিন, ডিজেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাসের দহন।

ii) লুব্রিকেটিং অয়েল এবং মোটর জ্বালানির অসম্পূর্ণ দহন।

iii) দিবালাকে বায়ুতে আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়া।

8.6. রূপালী এবং বাদামী বায়ুযুক্ত নগর (Gray and Brown Air City) ঃ

জলবায়ু এবং বায়ু দূষণের প্রকারভেদ অনুযায়ী সমস্ত নগরকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয় ঃ

i) রূপালী বায়ুযুক্ত নগর (Gray air city)

ii) বাদামী বায়ুযুক্ত নগর (Brown air city)

i) **রূপালী বায়ুযুক্ত নগর** (Gray air city) ঃ

a) শীতল এবং আর্দ্র জলবায়ু সম্পন্ন প্রাচীন শিল্পনগরী 'রূপালী বায়ুযুক্ত নগরের' অন্তর্ভুক্ত (যথা ঃ নিউইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া এবং পিটার্সবুর্গ)।

b) এই শ্রেণীর শহরের প্রধান বায়ুদূষক হচ্ছে **'সালফার অক্সাইড'** এবং **'পার্টিকুলেটস'**। কারণ এই শ্রেণীর নগর শিল্প-সমৃদ্ধ এবং প্রধানত কয়লা ও পেট্রোলিয়াম জাত তেলের উপর নির্ভরশীল।

c) সালফার অক্সাইড এবং পার্টিকুলেটস বায়ুর আর্দ্রতার উপস্থিতিতে স্মোগ (Smog) নামক রূপালী-কুয়াশা সৃষ্টি করে (Smog = Smoke + Fog)। শীতকালে রূপালী বায়ুযুক্ত শহরের বায়ুতে অধিক আর্দ্রতা থাকায় অপেক্ষাকৃত বেশি পরিমাণ স্মোগ উৎপন্ন হয়, ফলে বায়ুদূষণের মাত্রাও অপেক্ষাকৃত বাড়ে।

ii) **বাদামী-বায়ুযুক্ত নগর** (Gray air city) ঃ

a) বাদামী বায়ুযুক্ত নগরের বায়ু উষ্ণ, শুষ্ক এবং জলবায়ু রৌদ্রজ্জ্বল। এছাড়া এই শ্রেণীর নগরের দূষণ সৃষ্টকারী শিল্পের সংখ্যা অনেক কম।

b) বাদামী নগরে বায়ু দূষণের প্রধান উৎস অটোমোবাইল এবং তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এই শ্রেণীর নগরের প্রাথমিক বায়ু দূষক হচ্ছে—**কার্বনমনোক্সাইড, হাইড্রোকার্বন এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড।**

c) অটোমোবাইল ও তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্গত বায়ুদুষক—হাইড্রোকার্বন এবং

নাইট্রোজেন অক্সাইড সৌর আলোকের উপস্থিতিতে পরস্পরের সঙ্গে বিক্রিয়া করে গৌণ দূষক যথা ঃ ওজোন, ফরম্যালডিহাইড এবং পারঅক্সিঅ্যাসাইল নাইট্রেট (PAN) উৎপন্ন করে। বায়ুদূষক এবং সৌর আলোকের উপস্থিতিতে এই ধরনের বিক্রিয়াকে **আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া** (Photochemical Reaction) বলা হয়। আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন ঈষৎ বাদামী—কমলা বর্ণের দূষিত বায়ুর আবরণকে **আলোক-রাসায়নিক স্মোগ** (Photochemical Smog) বলে। সকালের দিকে আলোক রাসায়নিক স্মোগের পরিমাণ কম থাকে এবং বিকেলে স্মোগের পরিমাণ সর্বাধিক মাত্রায় পৌঁছায়। গ্রীষ্মকালে সৌর আলোকের তীব্রতা বেশি হওয়ায় আলোক রাসায়নিক স্মোগের পরিমাণ ঐ সময়ে অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে।

- বর্তমানে রূপালী এবং বাদামী বায়ুযুক্ত নগরের পার্থক্য ক্রমশ বিলীন হচ্ছে। অধিকাংশ নগর গ্রীষ্মকালে (যখন সৌর আলোক এবং অটোমোবাইলের বায়ুদূষক বেশি থাকে) বাদামী এবং শীতকালে (যখন সৌর আলোকের তীব্রতা কম এবং কাঠ, তেল নিঃসৃত বায়ুদূষক এবং বায়ুর আর্দ্রতা বেশি থাকে) রূপালী বায়ুযুক্ত হয়।

8.7. জলবায়ু (আবহাওয়া), ভূ-সংস্থান এবং বায়ুদূষণ (Climates, Topography and Air Pollution) ঃ

জলবায়ুগত শর্ত (জলবায়ু, ভূ-সংস্থান) কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের বায়ুদূষণকে প্রভাবিত করে। অর্থাৎ কোন অঞ্চলে বায়ুদূষকের পরিমাণ ঐ অঞ্চলের জলবায়ুগত শর্তের উপর নির্ভর করে। আবার বিপরীত ঘটনাও সম্ভব। বায়ুদূষণ জলবায়ুর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বায়ুদূষণের প্রভাবে সৌর-বিকিরণ হ্রাস পায়, দৃশ্যমান (visibility) কমে যায় এবং ফগ উৎপাদনের দ্রুততা (বা সংখ্যা) এবং স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়। যে-সব জলবায়ুগত শর্ত বায়ুদূষণকে প্রভাবিত করে তাদের প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয়—'প্রাথমিক শর্ত' এবং 'গৌণ শর্ত'। বায়ুদূষণ প্রভাবণকারী বিভিন্ন প্রাথমিক এবং গৌণ শর্ত নিম্নলিখিত :

A. **প্রাথমিক শর্ত** (Primary factors)
   1. বায়ু প্রবাহের গতিবেগ এবং অভিমুখ
   2. তাপমাত্রা
   3. বায়ুমণ্ডলীয় স্থিরতা
   4. বায়ুদূষকের বিস্তৃতিজনিত উচ্চতা বা মিশ্রণ উচ্চতা

B. **গৌণ শর্ত** (Secondary factors)
   1. অধঃক্ষেপণ
   2. আর্দ্রতা

3. সৌর-বিকিরণ
4. দৃষ্টিমান

A. **প্রাথমিক শর্ত (Primary factors) ঃ**

1. **বায়ু প্রবাহের গতিবেগ এবং অভিমুখ ঃ** বায়ুপ্রবাহের অভিমুখ এবং গতিবেগের দ্বারা বায়ুতে উপস্থিত দূষকের ব্যাপন এবং প্রবাহ নিয়ন্ত্রিত হয়। দূষক নিক্ষিপ্ত স্থানে বা কাছাকাছি অংশে বায়ুর গতিবেগ বেশি হলে অপেক্ষাকৃত অধিক দ্রুততায় **'দূষক'** উৎসস্থান থেকে দূরবর্তী অউৎস স্থানের বায়ুতে ছড়িয়ে পড়ে। উৎস স্থানের বায়ুতে দূষকের যে ঘনত্ব থাকে বিস্তৃতির সময় ঐ ঘনত্ব হ্রাস পায়, কারণ অধিক অধিক পরিমাণ বায়ুতে দূষকের লঘুভবন ঘটে। কিন্তু বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ কম হলে উৎস স্থানে বা উৎস স্থানের সন্নিকটস্থ বায়ুতে দূষক দীর্ঘসময় অধিক ঘনত্বে উপস্থিত থাকে। এছাড়া উৎস স্থান থেকে কোন দিকে বায়ুদূষকের ব্যাপন এবং প্রবাহ ঘটবে তা নির্ভর করে বায়ুপ্রবাহের অভিমুখের উপর।

পাহাড়ের উপস্থিতি বায়ুপ্রবাহকে আনুভূমিক, উলম্ব বা উভয় অভিমুখে ভিন্নমুখী করতে পারে। ভিন্নপথে চালিত বায়ুপ্রবাহের পরিমাণ নির্ভর করে বায়ুমণ্ডলের উলম্ব স্থিরতার উপর। উপত্যকা অঞ্চলে দূষক প্রবাহকারী বায়ুর উভয়মুখী উলম্ব প্রবাহ (উপরে বা নীচে) ঘটে। এই ধরনের ঘটনাকে **'চ্যানেলিং ইফেক্ট** (Channelling Effect) বলা হয়। উপত্যকার গভীরতা যত বেশি হয় **"চ্যানেলিং ইফেক্ট"** তত বেশি হয়।

2. **তাপমাত্রা ঃ** বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা বায়ুদূষণের মান তথা দূষকের বিস্তৃতিকে প্রভাবিত করে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ক্রমশ হ্রাস পায়। শুষ্ক বায়ুমণ্ডলের প্রতি 100 ফুট (300 মিটার) উচ্চতায় 3.3°F (প্রায় 1.8°C) তাপমাত্রা হ্রাস পায়। এই ঘটনাকে **উচ্চতা অনুপাতে তাপের পরিবর্তন হ্রাস বা 'ল্যাপস্ রেট'** (Lapse Rate) বলা হয়। এই কারণে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ু উপরের বায়ুস্তরের তুলনায় অধিক উষ্ণ থাকে। উষ্ণতাজনিত কারণে লঘুবায়ু যখন উপরের দিকে প্রবাহিত হয় তখন উৎস থেকে উৎসস্থল বা পার্শ্বস্থ বায়ুতে নিক্ষিপ্ত দূষক উপরের অংশের বায়ুমণ্ডলে ব্যাপিত এবং প্রবাহিত হয়। বায়ুদূষকের এরূপ উলম্ব বিস্তৃতির ফলে উৎস স্থানের বায়ুতে দূষকের লঘুভবন ঘটে, ফলে উৎসস্থানে দূষণের প্রভাব হ্রাস পায়।

3. **বায়ুমণ্ডলীয় স্থিরতা ঃ** বায়ুমণ্ডলীয় স্থিরতা বায়ুদূষকের বিস্তৃতিকে প্রভাবিত করে। বায়ুমণ্ডলীয় স্থিরতা আবার তাপমাত্রার দ্বারা প্রভাবিত হয়। স্বাভাবিক ল্যাপস রেট-এ বায়ুর উষ্ণতাজনিত প্রবাহের ফলে দূষকের উলম্ব বিস্তৃতি ঘটে, কিন্তু তাপমাত্রার বিপরীত ক্রমে বা ল্যাপস রেট-এর অনুপস্থিতিতে বায়ুর উষ্ণতাজনিত উলম্ব বিস্তৃতি ঘটেনা, এইক্ষেত্রে দূষক উৎসস্থলের বায়ুতে ঘনীভূত থাকে।

•• **তাপমাত্রার বৈপরীত্য (Temperature Inversions) ঃ**

উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রার হ্রাস (প্রতি 1000 ফুট [300মিঃ] উচ্চতায় 3.3°F [1.8°C]) ঘটে। এই উলম্ব 'তাপমাত্রা-নতি'কে **'ল্যাপস রেট'** বলা হয়। কোন কোন সময় ঠিক বিপরীত ঘটনাও সম্ভব, অর্থাৎ 'ল্যাপস্ রেট' ঋণাত্মক বা বিপরীত (negative or inverse) হতে পারে। ল্যাপস্ রেট ঋণাত্মক বা বিপরীত হলে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন ঘন-শীতল বায়ু-স্তর উপরের অপেক্ষাকৃত উষ্ণ হালকা বায়ুস্তর দ্বারা আবৃত থাকে। এরূপ ঘটনা **'তাপমাত্রার বৈপরীত্য' বা 'টেমপারেচার ইনভারসান'** নামে পরিচিত।

টেমপারেচার ইনভারসানের সময় বায়ুর উলম্ব চলাচল সম্ভব হয় না, ফলে 'ইনভারসান স্তরের' নীচে (অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন ঘন-শীতল বায়ুস্তরে) দূষণের ঘনীভবন ঘটে। টেমপারেচার-ইনভারসানের ফলে বায়ু-স্থির থাকে, ফলে উৎস থেকে বায়ুতে নিক্ষিপ্ত দূষকের বিস্তৃতি ঘটে না। শীত এবং শরৎ ঋতুতে সাধারণত বায়ুমণ্ডলের টেমপারেচার ইনভারসানের ঘটনা ঘটে। এই অবস্থায় ধোঁয়া এবং অন্যান্য দূষকের উপস্থিতিতে দূষণের প্রকোপ অধিকতর বৃদ্ধি পায়, কারণ সূর্যালোক ধোঁয়া এবং দূষকের স্তর ভেদ করে ভূ-পৃষ্ঠ এবং ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুকে উত্তপ্ত করতে পারে না। টেমপারেচার ইনভারসানের ফলে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুর তাপমাত্রা বায়ুতে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের 'শিশির বিন্দু'র তুলনায় কম হওয়ায় টেমপারেচার ইনভারসানের সময় ফগ্ সৃষ্টি হয়। ফগ্ সৃষ্টির ফলে দৃষ্টিমান হ্রাস পায়। পাহাড় ঘেরা সংকীর্ণ উপত্যকায় বায়ুর আনুভূমিক চলাচল সম্ভব না হওয়ায় সংকীর্ণ উপত্যকা অঞ্চলে টেমপারেচার ইনভারসানের ঘটনা সব চেয়ে বেশি ঘটে।

তাপমাত্রা—বৈপরীত্যের প্রকারভেদ ঃ

তাপমাত্রার বৈপরীত্য বা টেমপারেচার ইনভারসান তিন প্রকারের হতে পারে—

a) **বিকিরণ-বৈপরীত্য বা র‍্যাডিয়েশান ইনভারসান** (Radiation inversion) :

রাত্রিবেলা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপ হ্রাসের ফলে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তরের শীতলিকরণ জনিত ইনভারসানকে **'র‍্যাডিয়েশান ইনভারসান'** বলা হয়। এক্ষেত্রে শীতল বায়ুস্তর উপরের উষ্ণ বায়ুস্তর দ্বারা আবৃত থাকে এবং শীতল বায়ুস্তরে ফগ্ সৃষ্টি হয়। সকালে সৌর আলোকের উপস্থিতিতে ভূ-পৃষ্ঠ এবং ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ু গরম না হওয়া পর্যন্ত 'র‍্যাডিয়েশান-ইনভারসান' স্থায়ী হয়। শীতের রাতে গ্রীষ্মকালীন রাতের তুলনায় রেডিয়েশান ইনভারসানের ঘটনা বেশি ঘটে কারণ, শীতের রাত অপেক্ষাকৃত বেশি দীর্ঘ। ভারতের জলবায়ুতে সূর্যোদয়ের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সৌর আলোকের দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠ অতি উত্তপ্ত হওয়ার কারণে 'র‍্যাডিয়েশান ইনভারসান' ভেঙে যায়। উপত্যকা অঞ্চলে এই প্রকার ইনভারসান সবচেয়ে বেশি ঘটে। এক কথায় রেডিয়েশান ইনভারশান 'স্থানীয় এবং ক্ষণস্থায়ী'।

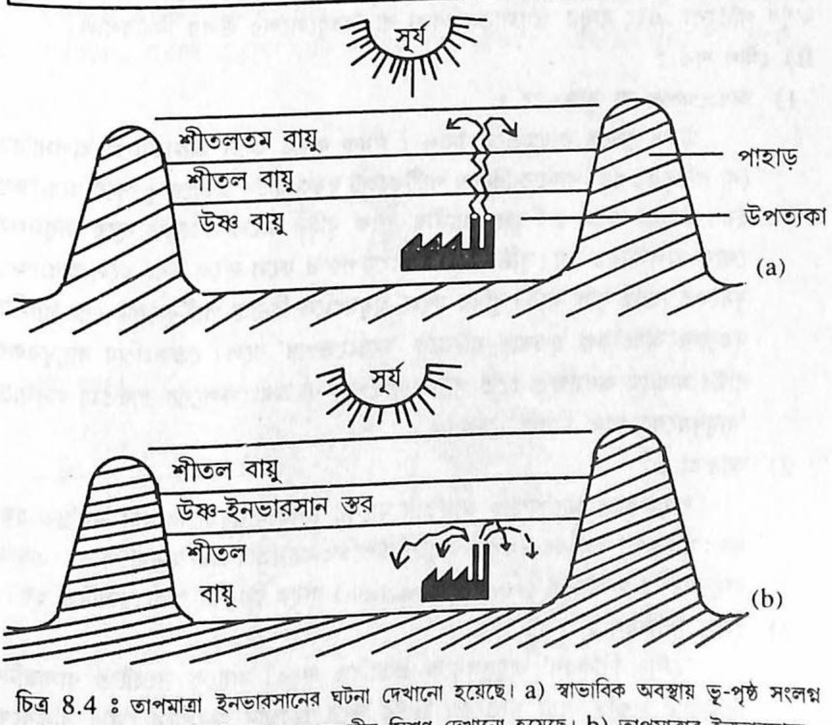
b) অধোগমন বৈপরীত্য বা **'সাবসিডেন্স ইনভারসান'** (Subsidence inversion) ঃ

মাঝামাঝি উচ্চতার ভূ-সংস্থানে এই শ্রেণীর ইনভারসান সংঘটিত হয়। অধোগমন

বৈপরীত্য বা সাবসিডেন্স ইনভারসান বিস্তীর্ণ অঞ্চল (কয়েক হাজার বর্গ কিমি অঞ্চল) জুড়ে হয় এবং বেশ কয়েকদিন স্থায়ী থাকে।

অ্যান্টি সাইক্লোন অঞ্চলে (নিম্নচাপ অঞ্চল দ্বারা আবৃত উচ্চচাপ অঞ্চল) বায়ুর অধোগমনের ফলে উক্ত ইনভারসান সংঘটিত হয়। অ্যান্টি সাইক্লোন অঞ্চলে আবর্তিত বায়ু ধীরে ধীরে (1000 মিটার/দিন) নীচে নামার ফলে অধোগামী বা ডুবে যাওয়া বায়ু চাপে পাতলা হয় এবং উত্তপ্ত হয়ে উষ্ণ ঘন স্তর সৃষ্টি করে। এই স্তরের ঢাকনী ক্রিয়ার ফলে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন শীতল বায়ু স্তরে দূষক বা সংক্রামকের উর্ধ্ব বিস্তৃতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ইনভারসান উচ্চতার বিস্তৃতি 200—1600 মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু এই উচ্চতা 200 মিটারের কম হলে দূষকের তীব্রতা চূড়ান্ত মাত্রায় পৌঁছায়।

•• 1969 খ্রীঃ আগস্ট মাসে নিউওরলিন্স, জ্যাকসন, ব্রিমিংহাম, আটলান্টা, পিটসবার্গ, বালটিমোর, ওয়াশিংটন ডি. সি. প্রভৃতি অঞ্চলে যে বৃহৎ সাবসিডেন্স—ইনভারসান সৃষ্টি হয়েছিল, তার ফলে উক্ত অঞ্চলে দূষণের তীব্রতা ভয়াবহ মাত্রায় পৌঁছেছিল।



চিত্র 8.4 ঃ তাপমাত্রা ইনভারসানের ঘটনা দেখানো হয়েছে। a) স্বাভাবিক অবস্থায় ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন দূষিত বায়ুর উর্ধ্ব বিস্তৃতি এবং বায়ুমণ্ডলীয় মিশ্রণ দেখানো হয়েছে। b) তাপমাত্রার ইনভারসানে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন শীতল বায়ুস্তরের উপরে অবস্থিত উষ্ণবায়ু স্তর ঢাকনী হিসেবে কাজ করে, ফলে দূষক ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন শীতল বায়ুস্তরে আবদ্ধ থাকে।

c) **তাপাভেদ্য (বা রুদ্ধতাপ) বৈপরীত্য বা অ্যাডিয়াবেটিক ইনভারসান (Adiabatic inversion) ঃ**

ল্যাপস্-রেট জনিত কারণে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন দূষক সমৃদ্ধ উষ্ণবায়ু যখন উপরের জলসাম্যগতভাবে স্থায়ী পরিবেশে প্রবেশ করে তখন উষ্ণবায়ু পুনরায় উপরের দিকে অগ্রসর হতে না পেরে নীচের পরিবেশীয় চাপে ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়। এই প্রসারণে কোন তাপের বিনিময় ঘটে না। এই ঘটনাকে **তাপাভেদ্য ল্যাপস-রেট** বলা হয় (শুষ্ক তাপাভেদ্য ল্যাপসরেট 0.98°C/100 মিটার)। এই অবস্থায় বায়ুমণ্ডল সাম্যাবস্থায় থাকে এবং বায়ুর উলম্ব বিস্তৃতি ঘটে না। ফলে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুর দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি ঘটে।

4) **বায়ুদূষকের বিস্তৃতি জনিত উচ্চতা বা মিশ্রণ উচ্চতা ঃ**

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে যে উচ্চতায় বায়ুমণ্ডলীয় আলোড়নের (বা টারবুলেন্স) ফলে বায়ুমণ্ডলে দূষক ছড়িয়ে পড়ে বা বিস্তৃত হয়, সেই বায়ুমণ্ডলীয় উচ্চতাকে **বায়ুদূষকের বিস্তৃতি জনিত উচ্চতা বা মিশ্রণ উচ্চতা** বলা হয়। মিশ্রণ উচ্চতার মান বায়ু প্রবাহের অভিমুখ, বায়ুর গতিবেগ এবং বায়ুর আলোড়নপূর্ণতা বা টারবুলেন্সের উপর নির্ভরশীল।

B) **গৌণ শর্ত ঃ**

1) **অধঃক্ষেপণ বা বৃষ্টিপাত ঃ**

উৎস থেকে বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত দূষক বৃষ্টির ফলে অনেকাংশে অপসারিত (বা পরিষ্কৃত) হয়। বায়ুতে বিন্যস্ত পার্টিকুলেট দূষক বৃষ্টির প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠে অধঃক্ষিপ্ত হয়। এছাড়া জলে দ্রবীভূত গ্যাসীয় দূষক বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডল থেকে অপসারিত হয়। বৃষ্টিজনিত অধঃক্ষেপণের ফলে জলে এবং স্থলে অধঃক্ষিপ্ত দূষকের সঞ্চয় বৃদ্ধি ঘটে। বৃষ্টির ফলে বায়ুমণ্ডলে বিন্যস্ত পার্টিকুলেট এবং গ্যাসীয় দূষকের অধঃক্ষিপ্ত হওয়ার ঘটনাকে **'অধঃক্ষেপণ'** বলে। তেজঃস্ক্রিয় বায়ুদূষকও বৃষ্টির মাধ্যমে অধঃক্ষিপ্ত হতে পারে। বৃষ্টিপাত বা অধঃক্ষেপণের তারতম্য অনুসারে **'বায়ুদূষণের মান'** নিয়ন্ত্রিত হয়।

2) **আর্দ্রতা ঃ**

বায়ুমণ্ডলে আপেক্ষিক আর্দ্রতার মানের উপর বায়ুদূষণের মান নিয়ন্ত্রিত হয়। দূষণ সৃষ্টিকারী ফগ্ এর উৎপত্তি বায়ুতে উপস্থিত আর্দ্রতার দ্বারা অনুঘটিত হয়। এছাড়া বায়ুদূষকের ক্ষয়ক্রিয়া (corrosive action) বায়ুর আর্দ্রতা দ্বারা ত্বরান্বিত হয়।

3) **সৌর বিকিরণ ঃ**

'সৌর বিকিরণ' বায়ুদূষণকে প্রভাবিত করে। বায়ুতে সংঘটিত রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রকৃতি এবং গতিবেগ নির্ভর করে অবস্থান অনুসারে সৌর-বিকিরণের তীব্রতার উপর। লস-অ্যাঞ্জেলস্ এ **'আলোক রাসায়নিক-স্মোগ'** উৎপাদন বায়ু দূষণের উপর সৌর-বিকিরণের প্রভাব জনিত ঘটনার একটি বিশেষ উদাহরণ।

8.8 বায়ু-দূষণের প্রভাব (Effects of Air Pollution) ঃ

বায়ুর দূষণজনিত প্রভাবকে মূলত দুটি বিভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হয় ঃ

1. জীব সম্পর্কীয় প্রভাব (Biological Effects)

এবং 2. অজীববস্তুর উপর প্রভাব (Effect on Nonliving Materials)

জীব সম্পর্কীয় প্রভাবকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়—

A. মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব (Effects on Human Healths)

B. প্রাণীর উপর প্রভাব (Effects on Animals)

এবং C. উদ্ভিদের উপর প্রভাব (Effects on Plants)

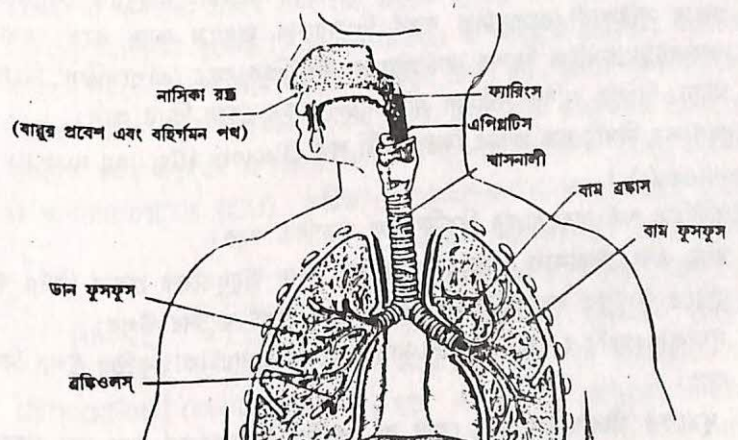
8.8.1. বায়ুদূষণের জীব সম্পর্কীয় প্রভাব ঃ

8.8.1. 1) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ঃ

মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বায়ুদূষণের প্রভাবকে চারটি পর্যায়ে আলোচনা করা হল ঃ

1) মানুষের সান্নিধ্যে বায়ুদূষকের প্রকট (Exposure of Air Pollutants to Human)

i) শ্বসনজনিত প্রকট ঃ প্রশ্বাস বায়ুর মাধ্যমে বায়ুতে বিন্যস্ত দূষক গ্যাস, পার্টিকুলেট, ডাস্ট, পরাগরেণু, ছত্রাক প্রভৃতি দূষক নাসিকারন্ধ্র, শ্বাসনালী, ব্রঙ্কাই, ব্রঙ্কিওলস্ হয়ে



চিত্র 8.5 ঃ মানুষের শ্বসন-তন্ত্রের ছবি দেখানো হয়েছে। এই তন্ত্রের মাধ্যমে বায়ুদূষকের শ্বসন এবং আঘ্রাণজনিত প্রকট ঘটে।

উদাহরণ হিসেবে 'অ্যাজবেস্টাস' (asbestos) প্রভাবিত ফুসফুস ক্যানসারের কথা উল্লেখ করা যায়। কর্মস্থলে বা বাড়িতে অ্যাজবেস্টাসের স্বল্পমাত্রায় ক্ষণস্থায়ী প্রকটে ফুসফুসের 'মেসোথ্যালিওমা' (mesothelioma) ক্যানসার (প্লুরায়) সৃষ্টি হয়। এই জাতীয় ক্যানসার ম্যালিগন্যেন্ট প্রকৃতির। কারণ অতিদ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং রোগ-সনাক্তকরণের এক বছরের মধ্যে আক্রান্ত মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়। অ্যাজবেস্টাসের প্রভাবে প্লুরাল কোষের বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রক DNA-এর মিউটেশানই মেসোথ্যালিওমা ক্যানসারের প্রধান কারণ।

iv) **অ্যাজবেস্টোসিস (Asbestosis) বা পালমোনারী ফাইব্রোসিস (Pulmonary Fibrosis)** ঃ উৎপাদন স্থলে বা অট্টালিকা নির্মাণের সময় অ্যাজবেস্টাসের প্রকটে ফুসফুসীয় কলা অমসৃণ হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রকটে ফুসফুসে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ফুসফুসের এরূপ অস্বাভাবিক অবস্থাকে **অ্যাজবেস্টোসিস** বা **ফুসফুসীয় ফাইব্রোসিস** বলে।

সকল মানুষ বায়ুদূষণ দ্বারা সমানভাবে আক্রান্ত হয় না। বৃদ্ধ ও অসমর্থ এবং বিশেষ করে ফুসফুস ও হৃদপিণ্ড সম্পর্কীয় আক্রান্তরা বায়ুদূষণের প্রতি অধিক সংবেদনশীল। হৃদপিণ্ড সম্পর্কীয় ব্যাধিগ্রস্ত মানুষের হৃদপিণ্ড কার্বনমনোক্সাইডের প্রকটে অচল (heart fail) হতে পারে। কারণ, কার্বনমনোক্সাইড অক্সিজেন পরিবহনকারী রঞ্জক হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত হয়। এই সংযুক্তির ফলে রক্তের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা কমে যায়। এই ক্ষেত্রে কোষে যথোপযুক্ত পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহের জন্য হৃদপিণ্ড একটি নির্দিষ্ট সময়ে অধিক পরিমাণ রক্ত নিক্ষেপ করে। এই কারণে হৃদপিণ্ডের উপর প্রচণ্ড পীড়ন (স্ট্রেস) পড়ে এবং কখনো কখনো হৃদপিণ্ড অচল হয়ে যায়। এই ঘটনা **হার্ট অ্যাটাক** নামে পরিচিত। সুস্থ, সবল এবং পূর্ণাঙ্গ মানুষের তুলনায় শিশুরা বায়ুদূষণের প্রতি অধিক সংবেদনশীল। শিশুদের অধিক সক্রিয়তা এবং শ্বসন হার—অধিক দূষক সংবেদনশীলতার প্রধান কারণ।

দূষক	ক্রনিক ইফেক্ট
CO	হৃদসংবহন তন্ত্রের উপর অধিক পীড়ন, হার্ট অ্যাটাক
SO_x	এমফাইসিমা, ব্রঙ্কাইটিস
NO_x	ব্রঙ্কাইটিস
HCHO	এমফাইসিমা

তালিকা 8.6 ঃ কয়েকটি প্রধান বায়ুদূষকের ক্রনিক ইফেক্ট উল্লেখ করা হয়েছে।

v) বন্ধ্যাত্ব এবং জন্মত্রুটি (Sterility and Birth defects) ঃ

বায়ুতে বিভিন্ন ধরনের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের (যথা ঃ আয়োডিন-131, ফসফরাস-32, রেডিয়াম-226, কার্বন-14, সালফার-35, ক্যালসিয়াম-45 এবং ইউরেনিয়াম) উপস্থিতির কারণে অতিশয় মন্দ প্রভাব যথা—অ্যানিমিয়া, লিউকেমিয়া এবং ক্যানসার সৃষ্টি হতে পারে। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের প্রভাবে DNA-এর মিউটেশান, বন্ধ্যাত্ব, ভ্রূণের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং জন্মত্রুটি ঘটতে পারে।

c) বিশেষ বায়ুদূষণ প্রকট এবং মানুষের স্বাস্থ্য ঃ

i) সিগারেট ধূমপান (Cigarette Smoking) ঃ

ধূমপানসৃষ্ট বায়ুদূষণে মানুষের (intermittent) প্রকট সবিরাম কিন্তু বায়ুর দূষণে মানুষের প্রকট অবিরাম (continuous)। ধূমপান সৃষ্ট দূষণ প্রকট সবিরাম হলেও ধূমপানে মন্দ প্রভাবের মাত্রা অনেক বেশি। সিগারেট ধূমপানে যেসব পদার্থ মানুষের ক্ষতি করে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কার্বনমনোক্সাইড (CO), নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO_x), লেড (সীসা), টার কারসিনোজেন, অ্যালডিহাইড এবং হাইড্রোজেন সায়ানাইড।

প্রচলিত পদ্ধতিতে পাঁচ মিনিট সবিরাম সিগারেট ধূমপানে মানুষের শরীরে প্রবিষ্ট কার্বনমনোক্সাইডের পরিমাণ বা মাত্রা প্রায় 400ppm, কিন্তু অবিরাম পরিবেশীয় বায়ুদূষণে গৃহীত কার্বনমনোক্সাইডের পরিমাণ বা মাত্রা মাত্র 10-30ppm। সিগারেট ধূমপান বা পরিবেশীয় CO দূষণে 5% হিমোগ্লোবিন অক্রিয় হলেও যৌথ প্রভাবে হিমোগ্লোবিন অক্রিয়তার মাত্রা অনেক বেশি। ঠিক একইভাবে 5 মিনিট সিগারেট ধূমপানে গৃহীত নাইট্রোজেন অক্সাইডের মাত্রা 100ppm, কিন্তু অতিদূষিত বায়ুতে 1 ঘন্টার প্রকটে গৃহীত নাইট্রোজেন-অক্সাইডের মাত্রা মাত্র 1ppm। তাই স্বাস্থ্যের উপর ধূমপানের প্রভাব বায়ুদূষণের তুলনায় অতিশয় মারাত্মক। কিন্তু বায়ুদূষণ ও ধূমপানের যৌথ প্রভাব সর্বাধিক ক্ষতিকর। সেই কারণে দূষণযুক্ত বায়ুতে বসবাসকারী ধূমপায়ী মানুষের ফুসফুস ঘটিত রোগের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি।

• **ধূমপান ও ভিটামিন-সি** : অধুনা গবেষণায় জানা গেছে যে, 'ভিটামিন-সি' মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ধূমপানজনিত বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করতে সক্ষম।

ii) গার্হস্থ্য দূষণ (Domestic Pollution) ঃ

রান্না এবং ঘর গরম করার কারণে সৃষ্ট দূষণকে গার্হস্থ্য দূষণ হলা হয়। রান্না এবং ঘর উত্তাপ করার সময় যে-সব দূষক উপজাত হিসেবে উৎপন্ন হয় তাদের মধ্যে CO, NO_x , SO_x, ভুসা এবং অ্যারোসল উল্লেখযোগ্য। এইসব গার্হস্থ্য দূষক স্বাস্থ্যের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। গার্হস্থ্য পরিবেশে NO_x এবং CO-এর

অবশেষে ফুসফুসে প্রবেশ করে। ফুসফুসে প্রবেশ করার পর দূষক ফুসফুসে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে বা রক্ত ও অন্যান্য কোষে প্রবেশ করে মন্দ প্রভাব বিস্তার করে।

ii) **আঘ্রাণজনিত প্রকট ঃ** দূষক গ্যাস, গন্ধসৃষ্টিকারী কণা এবং ফিউম ন্যাজাল মিউকাস আবরণীর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে পারে।

iii) **সংস্পর্শ জনিত প্রকট ঃ** অনাবৃত দেহত্বক, মুখমণ্ডল, ঠোঁট এবং চোখ বায়ুদূষকের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে প্রকট হয়।

2) বায়ুদূষক কিরূপে কাজ করে? (How do air pollutants work?)

বায়ুদূষক কোষীয় স্তরে তিন উপায়ে কাজ করতে পারে—

i) **উৎসেচকের সক্রিয়তা পরিবর্তন করে ঃ** কোষে রাসায়নিক বিক্রিয়া অনুঘটনকারী উৎসেচকের সক্রিয়তা পরিবর্তন করে বায়ুদূষক কাজ করতে পারে। এক্ষেত্রে কলাকোষের স্বাভাবিক কার্য বিঘ্নিত হয়।

ii) **কোষীয় অণু বা কোষের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ঃ** কিছু বায়ুদূষক কোষ বা কোষীয় অণুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে দেহের রাসায়নিক ভারসাম্য বিঘ্নিত করে। যথা—কার্বনমনোক্সাইড (CO) লোহিত রক্তকণিকার হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত হয়ে অক্সিজেন পরিবহনে বাধাদান করে।

iii) **ক্ষতিকারক রাসায়নিক নিঃসরণ করে ঃ** বিশেষ কয়েকটি বায়ুদূষক কোষে মন্দ প্রভাব সৃষ্টিকারী রাসায়নিক বস্তুর নিঃসরণের মাধ্যমে কাজ করে। যথা—কার্বনটেট্রাক্লোরাইড বিশেষ নার্ভকোষকে উদ্দীপিত করে **'এপিনেফ্রিন'** নিঃসরণ ঘটায়। নিঃসৃত অধিক পরিমাণ এপিনেফ্রিন যকৃত কোষ বিনষ্ট করে।

3) বায়ুদূষকের বিষক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারকারী শর্ত (Factors affecting toxicity of air pollutants) ঃ

নিম্নলিখিত শর্ত বায়ুদূষকের বিষক্রিয়াকে প্রভাবিত করে।

i) **ঘনত্ব এবং ক্রিয়াকাল ঃ** মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বায়ুদূষকের প্রভাব নির্ভর করে বায়ুতে উপস্থিত দূষকের ঘনত্ব এবং দূষকের প্রকট কালের উপর।

ii) **দূষকের প্রকৃতি ঃ** দূষণের প্রভাব-মাত্রা দূষকের রাসায়নিক প্রকৃতির উপর নির্ভর করে।

iii) **দূষকের জীব-সক্রিয়তা ঃ** কোষ বা কোষীয় উৎসেচকের সঙ্গে বায়ু দূষকের রাসায়নিক সংবেদনশীলতাকে জীব-সক্রিয়তা বলা হয়। যে দূষক যত বেশি জীব-সক্রিয়, সেই দূষক তত বেশি ক্ষতিকারক।

iv) **মানুষের বয়স এবং লিঙ্গ ঃ** দূষণজনিত প্রভাবমাত্রা বয়সের উপর নির্ভর করে। শৈশব অবস্থায় বা বৃদ্ধি এবং বিকাশশীল অবস্থায় বায়ুদূষক পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তির তুলনায় বেশি মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে। যেমন—ওজোন (O_3) এবং সালফারডাই অক্সাইড (SO_2) গ্যাস বয়স্ক মানুষের তুলনায় শিশুর উপর 2/3 গুণ বেশি মন্দ প্রভাব

ফেলে। লিঙ্গ বায়ুদূষকের ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোক বায়ুদূষকের প্রতি অধিকতর সংবেদনশীল।

v) **স্বাস্থ্যের অবস্থা :** নিম্নমানের পুষ্টি, মন্দ খাদ্যাভ্যাস ; পীড়ন ; হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের রোগ ; এবং ধূমপান মন্দ স্বাস্থ্যের জন্য দায়ী। মন্দ স্বাস্থ্য বায়ুদূষকের প্রতি সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করে। যেমন ধূমপান জনিত বায়ুদূষণের প্রভাবে ফুসফুস-ক্যানসারের সম্ভাবনা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

vi) **যৌথক্রিয়া (বা সহযোগিতা) এবং বিরোধিতা :** একাধিক বায়ুদূষকের যৌথক্রিয়ায় বিষক্রিয়ার মাত্রা বৃদ্ধির ঘটনাকে যৌথক্রিয়া বলা হয়। ঠিক বিপরীত ঘটনাও ঘটতে পারে। কোন বায়ুদূষকের উপস্থিতিতে অপর বায়ুদূষকের মন্দ প্রভাব হ্রাস পেতে পারে। এই ঘটনা বিরোধিতা নামে পরিচিত।

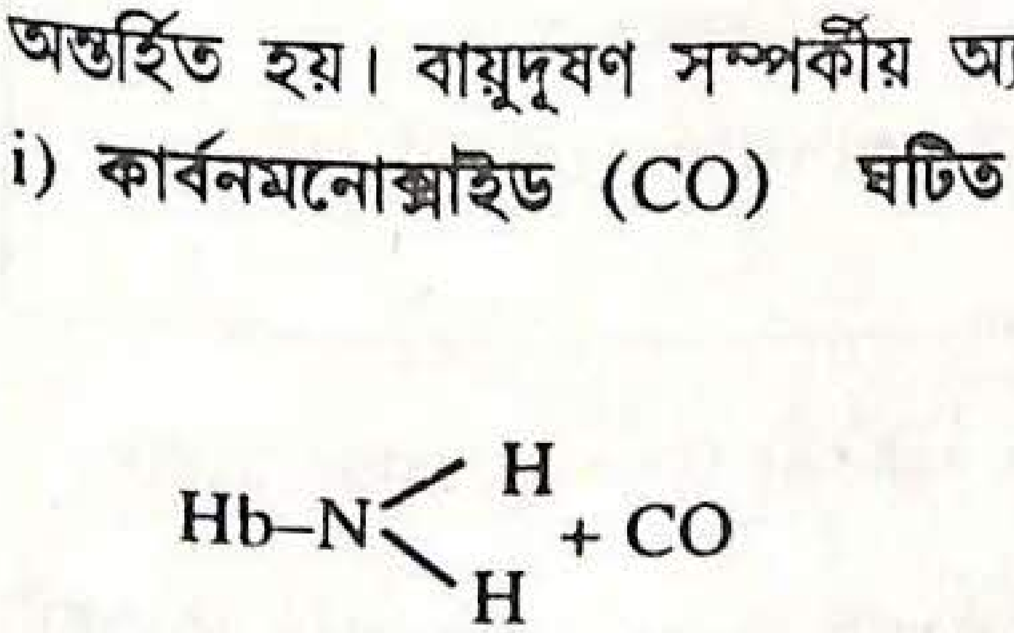
vii) **পেশাগত প্রকট :** পেশাগত কারণে কর্মস্থলের শ্রমজীবী মানুষ বায়ুদূষকের দ্বারা অপেক্ষাকৃত বেশি আক্রান্ত হয়। সিলিকোসিস একটি উল্লেখযোগ্য পেশাগত দূষণ সৃষ্ট ব্যাধি।

4) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব (Effects on Human Healths)

মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বায়ুদূষণের প্রভাবকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়—(a) **অ্যাকিউট ইফেক্ট** বা ক্ষণস্থায়ী প্রভাব এবং (b) **ক্রনিক ইফেক্ট** বা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব।

(a) **অ্যাকিউট ইফেক্ট** (Acute Effects) **বা ক্ষণস্থায়ী প্রভাব ঃ** অ্যাকিউট ইফেক্ট বাতাসে দূষকের স্বল্পকালীন উপস্থিতির ফলে উদ্ভব হয়। অর্থাৎ দূষক যতক্ষণ বাতাসে উপস্থিত থাকে ততক্ষণ প্রভাব বর্তমান থাকে, কিন্তু দূষক অপসারিত হলেই মন্দ প্রভাব অন্তর্হিত হয়। বায়ুদূষণ সম্পর্কীয় অ্যাকিউট ইফেক্টের উপসর্গ উল্লেখ করা হল।

i) **কার্বনমনোক্সাইড (CO) ঘটিত :** কার্বনমনোক্সাইড গ্যাস দেহের প্রত্যন্ত কোষে অক্সিজেন সরবরাহকারী লোহিত রক্তকণিকার **হিমোগ্লোবিনের** সঙ্গে এবং লোহিত অস্থিপেশীকোষে অক্সিজেন সরবরাহকারী **মায়োগ্লোবিনের** সঙ্গে স্থায়ীভাবে ভাবে যুক্ত হয়ে কলা-কোষে অক্সিজেন পরিবহন বিঘ্নিত করে। কারণ, অক্সিজেনের তুলনায় কার্বন-মনোক্সাইডের হিমোগ্লোবিন আসক্তি বেশি হওয়ায় অক্সিজেন কার্বামিনোহিমোগ্লোবিন যৌগ থেকে কার্বনমনোক্সাইড প্রতিস্থাপিত করতে পারে না। ফলস্বরূপ মাথাধরা, ঝিমুনি, শারীরিক শক্তি হ্রাস প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। অ্যাকিউট ইফেক্টের ফলে মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।



ii) **সালফার অক্সাইড (SO_x) ঘটিত ঃ** সালফার-ডাই-অক্সাইডের (SO_2) অ্যাকিউট

প্রকটে শ্বসননালীর স্ফীতি-জ্বালা (respiratory tract inflammation), অ্যাজ্মা, কাশি, রাইনাইটিস (rhinitis) বা নাসিকার জ্বালা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়।

iii) নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO_x) ঘটিত ঃ নাইট্রোজেন অক্সাইড গ্যাসের অ্যাকিউট প্রকটে ফুসফুসীয় জ্বালার (lung irritation) সৃষ্টি হয়।

iii) কণা ঘটিত ঃ অ্যাকিউট প্রকটে শ্বসনতন্ত্রের জ্বালা অনুভূত হয়।

iv) আলোক-রাসায়নিক জারক ঘটিত ঃ আলোক-রাসায়নিক জারকের অ্যাকিউট প্রকটে শ্বসনতন্ত্রের এবং চোখের জ্বালা অনুভূত হয়। অ্যাকিউট উপসর্গ উদ্রেককারী উল্লেখযোগ্য আলোক-রাসায়নিক জারকের উদাহরণ হল 'ফরম্যালডিহাইড'।

v) ওজোন (O_3) গ্যাস ঘটিত ঃ ওজোন গ্যাস শ্বাসনালীর জ্বালা সৃষ্টি করে।

vi) হাইড্রোজেন সালফাইড এবং মারক্যাপট্যান ঘটিত ঃ পচা ডিমের মত দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S), গন্ধযুক্ত মিথাইল মারক্যাপট্যান (CH_3SH) এবং ইথাইলমারক্যাপট্যান (C_2H_5SH) আঘ্রাণ অবসাদের সৃষ্টি করে।

দূষক	মনুষ্যসৃষ্ট উৎস	স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব
CO	পরিবহন শিল্প	মাথাধরা, ঝিমুনি, দৈহিক সামর্থ্য হ্রাস, মৃত্যু।
SO_x	স্থির দহন উৎস, শিল্প	শ্বাসনালীর স্ফীতি জ্বালা, অ্যাজমা, কাশি, নাসিকার জ্বালা।
পার্টিকুলেট	শিল্প, স্থির দহন উৎস	শ্বসনতন্ত্রের জ্বালা।
আলোক-রাসায়নিক জারক	পরিবহন, স্থির দহন উৎস	শ্বাসজ্বালা, চোখের জ্বালা

তালিকা 8.5 ঃ মুখ্য বায়ুদূষক, উৎস এবং তাদের অ্যাকিউট উপসর্গ দেখানো হয়েছে।

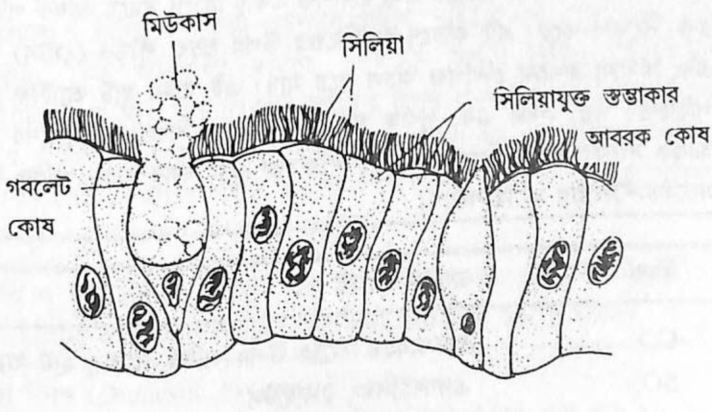
(b) ক্রনিক ইফেক্ট (Chronic Effects) বা দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ঃ বায়ুদূষণে দীর্ঘস্থায়ী প্রকটের ফলে ক্রনিক ইফেক্ট সৃষ্টি হয়। বায়ুদূষণজনিত কারণে বিভিন্ন ক্রনিক রোগ, অঙ্গ—সংস্থানিক বিকৃতি এবং জন্মগত ত্রুটি দেখা দিতে পারে। বিভিন্ন ক্রনিক প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

i) ব্রঙ্কাইটিস (Bronchitis) ঃ সিগারেট ধূমপান এবং বায়ুদূষক যথা ঃ সালফার-ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড এবং ওজোন গ্যাস ব্রঙ্কাইটিস সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে ফুসফুসে বায়ু পরিবহনকারী ব্রঙ্কাই এবং ব্রঙ্কিওল নালীর (শ্বাসনালী) স্থায়ী স্ফীতি বা প্রদাহ ঘটে। ব্রঙ্কাইটিসের প্রধান উপসর্গ—দীর্ঘস্থায়ী কাশি, অত্যধিক মিউকাস ক্ষরণ ও সঞ্চয় এবং বিঘ্নিত শ্বসন।

ii) **এমফাইসিমা (Emphysema) ঃ** এমফাইসিমা হচ্ছে বায়ুদূষণজনিত একটি অনারোগ্য (incurable) ব্যাধি। সিগারেট ধূমপানই এমফাইসিমার প্রধান কারণ। এছাড়া শহরাঞ্চলে ওজোন, নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড এবং সালফার-অক্সাইড ঘটিত বায়ুদূষণের কারণেও এমফাইসিমা হতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ফুসফুস ক্যানসার এবং টিউবারকিউলোসিসে মৃতের সংখ্যার তুলনায় এমফাইসিমায় মৃতের সংখ্যা অনেক বেশি।

এমফাইসিমায় আক্রান্ত মানুষের বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই ফুসফুসে গ্যাসীয় ব্যাপনে অংশগ্রহণকারী অ্যালভিওলি (alveoli) ধীরে ধীরে বিনষ্ট হয়। ব্যাপন তলের আয়তন হ্রাস পাওয়ার ফলে ফুসফুস থেকে রক্তে ব্যাপিত বায়ুর পরিমাণ কমে যায়। ফলে শ্বসনক্রিয়ায় দুঃসহ কষ্ট হয়। বিশেষ করে দৈহিক পরিশ্রমকালে শ্বাসকষ্ট মানুষকে অতীষ্ঠ করে তোলে।

iii) **ফুসফুস-ক্যানসার (Lung Cancer) :** বায়ুদূষণ এবং ধূমপান ফুসফুস ক্যানসারের প্রধান কারণ। শহরের বায়ুদূষণ তীব্র হওয়ায় গ্রামের তুলনায় শহরে ফুসফুস ক্যানসারে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা অনেক বেশি। ধূমপান অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরাসরি ক্যানসার সৃষ্টি না করলেও কারসিনোজেনের প্রতি মানুষের সংবেদনশীলতা বহুগুণ বৃদ্ধি করে। তাই ধূমপায়ী ক্যানসার রুগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি।



চিত্র 8.6 ঃ ফ্যারিংস এবং ট্রাকিয়ার মিউকাস ঝিল্লির স্তম্ভাকার আবরণী কোষের সিলিয়া এবং গবলেট কোষের মিউকাস ঝিল্লীগাত্রে বায়ুদূষকের স্পর্শজনিত প্রকটে বাধা দেয়।

বিষক্রিয়া খুবই মারাত্মক। মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ধূমপান এবং গার্হস্থ্য দূষণ এর যৌথ প্রভাবের ফল অতিশয় ক্ষতিকারক।

iii) **পেশাজনিত প্রকট (Occupational Exposure) ঃ**

পেশাজনিত কারণে মানুষ ধোঁয়া, ধুলিকণা, কার্বনমনোক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফার অক্সাইড এবং সীসা প্রভৃতি বায়ুদূষকের সান্নিধ্যে আসে। জনবহুল নগরে ট্রাফিক পুলিশ, অটোমোবাইল মেকানিক এবং বাস ও ট্রাকের ড্রাইভার পেশাজনিত কারণে কার্বনমনোক্সাইড এবং সীসার সান্নিধ্যে প্রকট হয়। সেই কারণে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষ সাধারণ মানুষের তুলনায় বায়ুদূষণে অধিক সংবেদনশীল।

• মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বায়ুদূষকের প্রভাব সম্পর্কীয় অনুশীলন ঃ

মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বায়ুদূষকের প্রভাব তিনটি উপায়ে অনুশীলন করা যায়—

i) প্রাণীর উপর পরীক্ষা ঃ বিভিন্ন মাত্রা এবং ঘনত্বের বায়ুদূষক পরীক্ষা প্রাণীর উপর প্রয়োগ করে।

ii) ক্লিনিক্যাল স্টাডি ঃ বায়ুদূষণে আক্রান্ত মানুষের উপসর্গ, ঘটনা সংগ্রহ করে।

এবং iii) এপিডেমিওলজিক্যাল স্টাডি ঃ জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশে বিশেষ রোগের প্রাদুর্ভাব এবং রোগসৃষ্টিকারী বিভিন্ন শর্তের প্রভাব সম্পর্ক অনুশীলন করে।

8.8.1.2. প্রাণীর উপর প্রভাব (Effects on Animals) ঃ

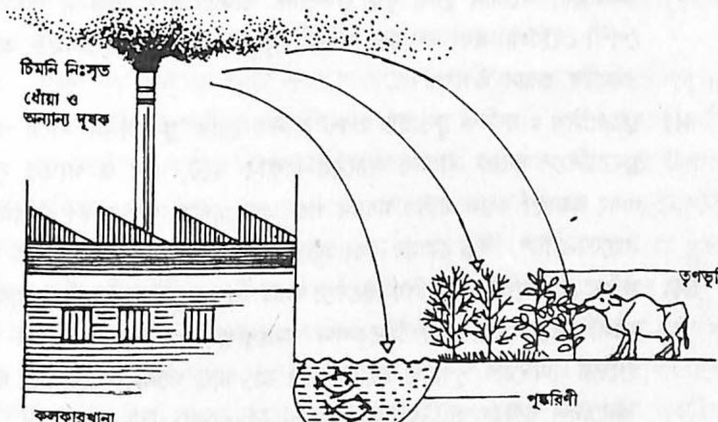
প্রাণীর উপর বায়ুদূষণের প্রভাব মানুষের মতই। প্রাণীর (গবাদি পশু এবং বন্যপ্রাণী) উপর বায়ুদূষণ সৃষ্ট মন্দ প্রভাবের প্রমাণ পাওয়া গেছে বিভিন্ন বায়ুদূষণের দুর্ঘটনায় (বা এপিসোডে)। 1950 খ্রীঃ নভেম্বর মাসে 'পোজা-রিকা-এপিসোডে' (Poza-rica episode) হাইড্রোজেন সালফাইডের দ্বারা অসংখ্য গবাদি পশু, শুকর, কুকুর, এবং মুরগী মারা যায়। 1952 খ্রীঃ ডিসেম্বর মাসের 'লণ্ডন এপিসোডে' (London episode) 5টি গবাদি পশু মারা যায় এবং 52টি গবাদি পশু মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয় এবং 1948 খ্রীঃ এর অক্টোবর মাসে ডোনোরা (পেনসিলভানিয়া) এপিসোডে 15 শতাংশ গৃহপালিত কুকুর আক্রান্ত হয়।

a) কি উপায়ে প্রাণী বায়ুদূষকের দ্বারা আক্রান্ত হয়?

প্রধানত দু-উপায়ে প্রাণী বায়ু দূষণে প্রকট হয়।

i) অ্যাকিউট প্রকট ঃ ধাতু নিষ্কাশনের কারখানা, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, বয়লার এবং

অটোমোবাইল একঝসট্ থেকে নির্গত বায়ুদূষক সরাসরি প্রাণীর উপর স্বল্পস্থায়ী প্রভাব বিস্তার করতে পারে।



চিত্র 8.7 ঃ প্রাণীর উপর বায়ুদূষকের প্রকট উপায় দেখানো হয়েছে।

ii) **ক্রনিক প্রকট ঃ** উৎস থেকে নির্গত বায়ুদূষক অধঃক্ষিপ্ত হয়ে উদ্ভিদের পাতা এবং গবাদি পশুর খাদ্য-উপাদানের উপর সঞ্চিত হয়। দূষক সংক্রমিত খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে গবাদি পশু এবং অন্যান্য প্রাণী পরোক্ষভাবে দূষকের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

b) প্রাণীর উপর বায়ুদূষণের প্রভাব ঃ

মানুষের উপর প্রভাব বিস্তারকারী সমস্ত বায়ুদূষকই প্রাণীর উপর ক্রিয়াশীল এবং সম্ভাব্য মন্দ প্রভাবও পায় একই ধরনের। প্রাণীর উপর মন্দ প্রভাব বিস্তারকারী সংক্রামকের অন্যতম হচ্ছে ফ্লুরাইড, আর্সেনিক, সীসা, মলিবডেনাম এবং ওজোন।

i) **সালফিউরিক এবং নাইট্রিক অ্যাসিড** : সালফার অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড থেকে উৎপন্ন গৌণ বায়ুদূষক **সালফিউরিক** এবং **নাইট্রিক অ্যাসিড** বন্যপ্রাণীর বৃদ্ধি, বিকাশ এবং বংশবিস্তার ব্যাহত করে এবং বিশেষ করে মাছের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

ii) **ওজোন ঃ** বায়ুতে ওজোন গ্যাসের সংক্রমণে কুকুর, বিড়াল এবং খরগোশের ফুসফুসীয় কলার পরিবর্তন, ইডিমা বা স্ফীতি (oedema) এবং রক্তক্ষরণ ঘটে।

iii) **ফ্লুরাইড ঃ** ফ্লুরাইড সংক্রমিত ফোরেজ বা উদ্ভিদ খাদ্য উৎসের মাধ্যমে গবাদি পশু ফ্লুরাইড সংগ্রহ করে। ধাতু নিষ্কাশনের কারখানা বা মেটাল স্মেলটার থেকে উৎপন্ন ফ্লুরাইড বায়ুর মাধ্যমে ফোরেজ (forage) বা উদ্ভিদ খাদ্য উৎসের সংস্পর্শে আসে। ফ্লুরাইডের মন্দ প্রভাব সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

I) উদরাময়, ওজোন হ্রাস, দুগ্ধ উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস, প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস, পেশী-দৌর্বল্য এবং কখনো কখনো মৃত্যু—ফ্লুরাইড সংক্রমিত অ্যাকিউট প্রকটের প্রধান উপসর্গ।

II) ফ্লুরোসিস ঃ ক্রনিক ফ্লুরাইড প্রকট জনিত রোগ 'ফ্লুরোসিস' নামে পরিচিত। ফ্লুরোসিসে কৃন্তক দাঁতের গঠনের বিকৃতি ঘটে, দাগ ও গর্তের সৃষ্টি হয় এবং বহুবর্ণে রঞ্জন ঘটে। গবাদি পশু এবং ভেড়া ফ্লুরোসিস রোগে অধিক সংবেদনশীল, কিন্তু ঘোড়া এবং মুরগী ফ্লুরোসিস প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন।

III) ফ্লুরিন প্রোটোপ্লাজমিক বিষ হিসেবে কাজ করে। ফ্লুরিনের অধিক ক্যালসিয়াম আসক্তির ফলে ক্যালসিফিকেশান বাধাপ্রাপ্ত হয়। ক্যালসিয়ামের অভাবে দাঁতের এনামেল সুগঠিত হতে পারে না। এই ঘটনাকে ফ্লুরাইড প্রভাবিত **'এনামেল হাইপোপ্লাসিয়া'** (Enamel Hypoplasia) বলা হয়।

IV) দীর্ঘকাল উচ্চমাত্রায় ফ্লুরাইড গ্রহণের ফলে অস্থিতে ফাটল দেখা দেয়। এছাড়া পায়ের ও চোয়ালের অস্থি এবং পাঁজরের অধি-বৃদ্ধি ঘটে। সন্ধির কাঠিন্য এবং পায়ের অস্থির অস্বাভাবিক বৃদ্ধিই ফ্লুরাইড প্রভাবিত পঙ্গুত্বের কারণ।

iv) **আর্সেনিক ঃ** আর্সেনিক কয়লা এবং ধাতব আকরিকে অশুদ্ধি হিসেবে উপস্থিত থাকে। মেটাল স্মেলটার এবং তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের চিমণি নিঃসৃত আর্সেনিক কণা বায়ুপ্রবাহের দ্বারা বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। উদ্ভিদ বা উদ্ভিদ উপাংশে অধঃক্ষিপ্ত আর্সেনিক গবাদি পশুর উপর অ্যাকিউট এবং ক্রনিক বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।

I) আর্সেনিকের অ্যাকিউট বিষক্রিয়ায় লালানিঃসরণ, বমি, ডাইরিয়া, তৃষ্ণা, অস্বাভাবিক দেহ-তাপমাত্রা, খিঁচুনি, দৌর্বল্য ও অনিয়মিত পালস্ এবং অনিয়মিত অগভীর শ্বসন দেখা যায়।

II) আর্সেনিকের ক্রনিক বিষক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র অবদমিত হয়, প্রাণীর খাদ্য-স্পৃহা অবলুপ্ত হয় (এবং ফলশ্রুতিতে ওজন হ্রাস ঘটে), দীর্ঘস্থায়ী কাশি ও ডাইরিয়া সৃষ্টি হয়। এছাড়া ত্বক পুরু হয়ে যায়, অ্যানিমিয়া সৃষ্টি হয় এবং গর্ভপতন ঘটে। কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের বিষক্রিয়ার কারণে প্যারালাইসিস শুরু হয় এবং চূড়ান্ত অবস্থায় প্রাণী মারা যায়।

v) **সীসা (Lead) ঃ** স্মেলটার, কোক ওভেন এবং কয়লার দহন ক্রিয়ায় সীসা বায়ুতে সংক্রমিত হয়। এছাড়া লেড আর্সেনেট যুক্ত পাউডার এবং স্প্রে থেকেও সীসা

বায়ুতে সংক্রমিত হয়। বায়ুতে উপস্থিত সীসা প্রাণীর উপর অ্যাকিউট এবং ক্রনিক বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।

I) অ্যাকিউট সীসা বিষক্রিয়ায় প্রাণীর (গবাদি পশু, ঘোড়া) খাদ্য-স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়, পাচনতন্ত্রের প্যারালাইসিস ঘটে ও ডাইরিয়া দেখা দেয়। নার্ভীয় অবদমন, লেথার্জি, দ্রুত এবং দুর্বল পালস্, পায়ের কাঠিন্য এবং খিঁচুনি প্রভৃতি সহযোগী উপসর্গ দেখা যায়।

I) ঘোড়া এবং অন্যান্য গবাদি পশুর স্বরযন্ত্রের (ল্যারিংস এর) প্যারালাইসিস এবং দুঃসাধ্য শ্বসন ক্রনিক বিষক্রিয়ার প্রধান উপসর্গ। এছাড়া কণ্ঠনালীর প্যারালাইসিস জনিত খিঁচুনি ক্রনিক বিষক্রিয়ার অন্যতম সহযোগী উপসর্গ।

vi) **স্থূলাণু বিকিরণ** (Ionizing Radiation) : বায়ুমণ্ডলে নিউক্লিয়ার বা পারমাণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের ফলে যে আয়নাইজিং রেডিয়েশান বা স্থূলাণু বিকিরণ ঘটে, জীবজগতের উপর তার বিষক্রিয়া সন্দেহাতীত। বিস্ফোরণ স্থলে বা সন্নিহিত অঞ্চলে এবং বিস্ফোরণের কয়েক ঘণ্টা বা কয়েক সপ্তাহের মধ্যে মানুষসহ সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর মারণ ক্রিয়া শুরু হয়। প্রাণীর উপর স্থূলাণু বিকিরণের দীর্ঘস্থায়ী বা ক্রনিক প্রভাব মানুষের মতই। প্রাণীর উপর দীর্ঘস্থায়ী বিষক্রিয়া জনিত উপসর্গের অন্যতম হচ্ছে

i) ক্যানসার—(লিউকেমিয়া সহ)
ii) সংক্ষিপ্ত আয়ুকাল,
এবং iii) জিনের মিউটেশান।

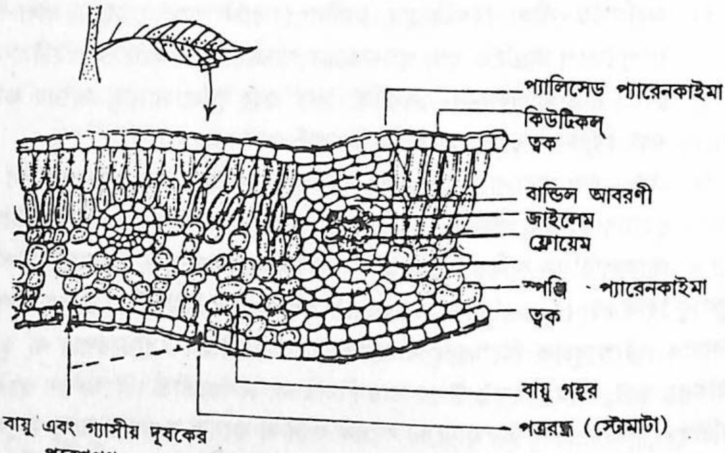
8.8.1.3. উদ্ভিদের উপর প্রভাব (Effects on Plants) ঃ

বায়ুদূষণ উদ্ভিদের বৃদ্ধি, বিকাশ এবং বংশবিস্তারের উপর মন্দ প্রভাব বিস্তার করে। কৃষির ক্ষতিকারক প্রধান তিনটি বায়ুদূষক হচ্ছে—সালফার-ডাই-অক্সাইড, ফ্লুরিন যৌগ এবং স্মোগ। ইতঃপূর্বে উদ্ভিদের উপর সালফার-ডাই-অক্সাইডের মন্দ প্রভাব নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত। উপরিউক্ত দূষকত্রয় ব্যতিরেকে ওজোন, পারঅক্সিঅ্যাসাইল নাইট্রেট (PAN), ফরম্যালডিহাইড, ক্লোরিন, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন-সালফাইড এবং ইথিলিন উদ্ভিদের ক্ষতি করে।

i) বায়ুদূষক কি উপায়ে উদ্ভিদের উপর ক্রিয়া করে?

বায়ুদূষক বিভিন্ন উপায়ে উদ্ভিদ কোষের সংস্পর্শে আসতে পারে। অধিকাংশ গ্যাসীয়— ক্ষতিকারক বায়ুদূষক উদ্ভিদের পত্ররন্ধ্র বা স্টোমাটার মাধ্যমে প্যারেনকাইমা কোষের সংস্পর্শে আসে। কয়েকটি লিপিড দ্রাব্য পার্টিকুলেট দূষক পাতার কিউটিকল্ ভেদ করে প্যারেনকাইমা কোষের সংস্পর্শে আসে। এছাড়া জলে দ্রাব্য কণা দূষক এবং গ্যাসীয় দূষক জলে দ্রবীভূত অবস্থায় উদ্ভিদ কোষের সংস্পর্শে আসতে পারে।

বায়ুদূষক কোষীয় স্তরে উৎসেচকের ক্রিয়াকে বাধা দেয় বা উৎসেচককে নিষ্ক্রিয় করে। উৎসেচক ক্রিয়ার অভাবে কোষের জৈবিক প্রক্রিয়া যথা—প্রোটিন সংশ্লেষ, কোষ



চিত্র 8.8 ঃ পাতার কলাস্থানিক গঠন দেখানো হয়েছে।

বিভাজন, সালোক সংশ্লেষ, ক্লোরোফিল সংশ্লেষ এবং শ্বসন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। ফলস্বরূপ শারীরবৃত্তিয় অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি হয় বা কোষের মৃত্যু (নেক্রোসিস) ঘটে।

বায়ুদূষক (গ্যাসীয়) → স্টোমাটা

বায়ুদূষক (গ্যাসীয় ও কণাকার) → ব্যাপন

↓

উদ্ভিদ কোষ
(পাতার প্যারেনকাইমা কোষ)

↓

উৎসেচক নিষ্ক্রিয়করণ

↓

শারীরবৃত্তিয় অস্বাভাবিকতা বা কোষের মৃত্যু

চিত্র 8.9 ঃ উদ্ভিদের উপর বায়ু দূষকের ক্রিয়াপদ্ধতি দেখানো হয়েছে।

ii) **উদ্ভিদের উপর বায়ুদূষকের ক্রিয়ায় প্রভাব সৃষ্টিকারী শর্ত ঃ**

সব বায়ুদূষক উদ্ভিদের উপর সমানভাবে ক্রিয়া করে না। আবার কোন একটি বিশেষ উদ্ভিদ সকল বায়ুদূষকের প্রতি সমানভাবে সংবেদনশীল নয়। জৈবিক শর্ত ব্যতিরেকে জলবায়ুগত শর্ত উদ্ভিদের বিষক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। যেমন সূর্যালোকের উপস্থিতিতে দিনের বেলায় পাতার স্টোমাটা উন্মুক্ত থাকে, এবং রাত্রে স্টোমাটা রুদ্ধ থাকে। স্টোমাটা যেহেতু গ্যাসীয় দূষকের প্রকট পথ তাই স্টোমাটার উন্মুক্তি উদ্ভিদের উপর বায়ুদূষকের বিষক্রিয়ার একটি অন্যতম প্রধান শর্ত। উদ্ভিদের উপর বায়ুদূষকের ক্রিয়ায় প্রভাব সৃষ্টিকারী শর্তসমূহ নিম্নলিখিত ঃ

i) দূষকের প্রকৃতি এবং ঘনত্ব,
ii) দূষকের প্রকটকাল,
iii) আলোর তীব্রতা এব্ং গুণমান (বর্ণ, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য),
iv) স্টোমাটার উন্মুক্তি,
v) তাপমাত্রা,
vi) জৈব সক্রিয়তা বা সংবেদনশীলতা,
vii) আর্দ্রতা,
এবং viii) উদ্ভিদের স্বাস্থ্য।

iii) **উদ্ভিদ-স্বাস্থ্যের উপর বায়ুদূষণের প্রভাব ঃ**

1. **সালফার-ডাই-অক্সাইডের মন্দ প্রভাব ঃ** সালফার-ডাই-অক্সাইড একটি অতি পরিচিত উদ্ভিদ বিষ বা **'ফাইটোটক্সিন'** (Phytotoxin)। অধিক ঘনত্বে সালফার-ডাই-অক্সাইড বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। সালফার-ডাই-অক্সাইডের কম ঘনত্বের (0.4ppm এর কম) দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবে ক্রনিক বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয় কিন্তু অধিক ঘনত্বের (0.4ppmএর বেশি) ক্ষণস্থায়ী প্রভাবে অ্যাকিউট বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়। সালফার-ডাই-অক্সাইড গ্যাস স্টোমাটার মাধ্যমে 'মেসোফিল' (mesophyll) কোষের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে এবং পরবর্তী পর্যায়ে কোষে প্রবেশ করে। কোষে প্রবিষ্ট সালফার-ডাই-অক্সাইড উদ্ভিদ কোষে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। সালফারডাই অক্সাইডের বিষক্রিয়াজনিত উপসর্গগুলি নিম্নরূপ ঃ

I) ক্লোরোসিস (Chlorosis) ঃ সালফার-ডাই-অক্সাইডের ক্রনিক ইফেক্টের প্রধান উপসর্গ হচ্ছে—'ক্লোরোসিস'। এই গ্যাসের প্রভাবে পাতার আন্তর শিরাস্থানের স্থানে স্থানে কোষের সবুজ রঞ্জক—'ক্লোরোফিলের' অপনোদন (bleaching) ঘটে বা পরিমাণ কমে যায়। ক্লোরোফিল হ্রাসপ্রাপ্ত বা অপনোদিত স্থানে সাদা বা ফ্যাকাশে সবুজ বা হলদু বর্ণের দাগ সৃষ্টি হয়। তুলা, গম, বার্লি এবং আপেল প্রভৃতি উদ্ভিদ সালফার-ডাই-অক্সাইডের প্রতি খুবই সংবেদনশীল।

II) নেক্রোসিস (Necrosis) ঃ সালফার-ডাই-অক্সাইডের অ্যাকিউট প্রকটে (0.4ppm

এর বেশি মাত্রায়) পাতার কোষে গ্যাসের শোষণ বহুগুণ বেড়ে যায়। এই অবস্থায় কোষগুলি প্রথমে নিষ্ক্রিয় হয় এবং পরে মারা যায়। ফলে পাতার কলাসংস্থান পুরোপুরি বিনষ্ট হয়। অবশেষে পাতা শুকিয়ে যায়। পাতার এই পরিবর্তনকে 'নেক্রোসিস' বলা হয়।

III) **বৃদ্ধি এবং উৎপাদন হ্রাস ঃ** সালফার-ডাই-অক্সাইড গ্যাস শ্বসন এবং সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতিতে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। ফলে উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়।

2. **হাইড্রোজেন ফ্লুরাইডের মন্দ প্রভাব ঃ** গ্যাসীয় হাইড্রোজেন ফ্লুরাইডের স্পর্শ জনিত প্রকট উদ্ভিদের উপর মন্দ প্রভাব সৃষ্টি করে। ফ্লুরাইডের প্রভাব অনেকটা সালফার-ডাই-অক্সাইডের মত। পাতায় গ্যাসীয় এবং কণাকার ফ্লুরাইডের সঞ্চিত ঘনত্ব 50–200ppm হলেই উদ্ভিদে বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

I) হাইড্রোজেন ফ্লুরাইডের স্পর্শজনিত প্রকটে উদ্ভিদের পাতা এবং কাণ্ডে দাগ সৃষ্টি হয়।

II) পাতায় সঞ্চিত কণাকার এবং গ্যাসীয় ফ্লুরাইডের ঘনত্ব 50–200ppmএর অধিক হলে পাতার ক্লোরোসিস হয়। ফ্লুরাইডের প্রভাবে ভুট্টা পাতার বহুবর্ণযুক্ত চিত্র-বিচিত্র ক্লোরোসিসের ঘটনা ইতিপূর্বেই বহু জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। আপেল, আঙুর, লেবু এবং জাম জাতীয় উদ্ভিদের পাতা ফ্লুরাইডের প্রতি সংবেদনশীল।

III) ফ্লুরাইডের প্রভাবে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ এবং শ্বসন বিঘ্নিত হয়।

3. **ওজোন গ্যাসের মন্দ প্রভাব ঃ** ওজোন গ্যাস একটি পরিচিত ফাইটোটক্সিন। দেখা গেছে যে, 0.2ppm ঘনত্বে কয়েক ঘণ্টার প্রকটে ওজোন গ্যাস বিষক্রিয়া সৃষ্টিতে সক্ষম। ওজোন গ্যাসের স্পর্শ জনিত প্রকটে পাতার উপরিতলে দাগ সৃষ্টি হয়। দাগের চরিত্র বিভিন্ন প্রকার হতে পারে—

I) পাতার উপরিতলে সমভাবে বিন্যস্ত সাদা বা বাদামী অতি-সরু ডোরা দাগ।

II) ফুটকি চিহ্ন অঙ্কিত চিত্র।

বা III) অসমভাবে বিন্যস্ত কালো দাগ।

আঙুর, লেবু এবং তামাক গাছের পাতায় ওজোনসৃষ্ট দাগ কখনো কখনো দেখা যায়।

4. **স্মোগের মন্দ প্রভাব ঃ** স্মোগ উদ্ভিদের ক্ষতি করে। স্মোগে ওজোন, PAN (পারঅক্সি অ্যাসাইল নাইট্রেট) এবং আলোক রাসায়নিক জারক উপস্থিত থাকলে উদ্ভিদের প্রাক-পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তি ঘটে বা বার্ধক্য ত্বরান্বিত হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, 0.01 ppm এর কম ঘনত্বে 6 ঘণ্টা বা তার কম সময়ে PAN পালং, বিন এবং জামজাতীয় উদ্ভিদের ক্ষতি করে।

5. **উদ্ভিদের উপর অন্যান্য বায়বীয় দূষকের মন্দ প্রভাব ঃ** অন্যান্য বায়বীয় দূষক যথা ক্লোরিন গ্যাস, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং ইথিলিন উদ্ভিদের ক্ষতি করে। ক্লোরিন সালফার-ডাই-অক্সাইড অপেক্ষা তিনগুণ বেশি বিষক্রিয়।

ক্লোরিনের প্রভাবে প্রান্তীয় বা আন্তর শিরাস্থানে দাগের সৃষ্টি হয়। উচ্চমাত্রায় (40 ppmএর বেশি) অ্যামোনিয়ার উপস্থিতিতে টম্যাটো গাছের ক্ষতি হয়। হাইড্রোজেন সালফাইড অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকারক। হাইড্রোজেন সালফাইডের অতি উচ্চমাত্রায় মুলো, কুমড়ো জাতীয় উদ্ভিদ এবং সয়াবিনের ক্ষতি হয়। ইথিলিনের প্রভাবে **'এপিন্যাস্টি (epinasty), বক্রতা, ক্লোরোসিস** এবং **'পত্র-মোচন'** প্রভৃতি উপসর্গ দেখা যায়। এছাড়া পাতার বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং টম্যাটো ও মটর জাতীয় উদ্ভিদের **ন্যুটেশান** (nutation) বিঘ্নিত হয়।

দূষক		মন্দ প্রভাব
সালফার-ডাই-অক্সাইড	ঃ	ক্লোরোসিস, নেক্রোসিস, বৃদ্ধিহ্রাস, উৎপাদন হ্রাস।
ফ্লুরাইড	ঃ	পাতার দাগ, বহুবর্ণে চিত্র-বিচিত্র ক্লোরোসিস
ওজোন	ঃ	পাতার পৃষ্ঠতলে সাদা বা বাদামী ডোরা দাগ, ফুটকি চিহ্ন অঙ্কিত চিত্র বা কালো দাগ।
স্মোগ	ঃ	অকাল বার্ধক্য, পাতার দাগ
ক্লোরিন	ঃ	পাতার প্রান্তীয় বা আন্তর শিরাস্থানে দাগ
ইথিলিন	ঃ	এপিন্যাস্টি, পত্রমোচন, বক্রতা, ক্লোরোসিস এবং বিঘ্নিত ন্যুটেশান।

তালিকা 8.7 ঃ উদ্ভিদের উপর মন্দ প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রধান বায়ুদূষক এবং তাদের বিশেষ মন্দ প্রভাব দেখানো হয়েছে।

8.8.2. **অজীব বস্তুর উপর বায়ুদূষণের প্রভাব ঃ** বায়ুদূষণের প্রভাবে অজীব বস্তু এবং সম্পদের ক্ষতি হয়। বস্তু এবং সম্পদের ক্ষতিকারক বায়ুদূষকগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ধোঁয়া, ধুলিকণা, সালফার অক্সাইড, ওজোন, হাইড্রোজেন ফ্লুরাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড। বস্তু এবং সম্পদের সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক বায়ুদূষক হচ্ছে **'সালফার-ডাই-অক্সাইড** (SO_2)। বিভিন্ন প্রাকৃতিক ভৌত শর্ত যথা ঃ **আর্দ্রতা, তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ** এবং **সূর্যালোক** অজীববস্তু এবং সম্পদের উপর বায়ুদূষকের প্রভাবকে নিয়ন্ত্রিত করে। বিভিন্ন বস্তু এবং সম্পদের উপর বায়ুদূষণের বিশেষ বিশেষ প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

i) **ধাতু (Metals) ঃ** বায়ুদূষণের প্রভাবে লোহা, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা এবং তামার ক্ষয় (corrosion) ঘটে। এছাড়া কয়েকটি ক্ষেত্রে ধাতু মরচে ধরে বিবর্ণ (tarnishing) হয়। ধাতুর ক্ষয় এবং বিবর্ণতা সৃষ্টিকারী প্রধান বায়ুদূষক হচ্ছে সালফার-ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং পার্টিকুলেট।

সালফার-ডাই-অক্সাইড বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় সালফারট্রাই অক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। সালফার-ট্রাই-অক্সাইড পরবর্তী পর্যয়ে বায়ুর আর্দ্রতার সঙ্গে বিক্রিয়ায় সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। উৎপন্ন সালফিউরিক অ্যাসিড ধাতুর উপর ক্রিয়া করে ক্ষয় এবং অনুজ্জ্বলতা সৃষ্টি করে। রেল, ট্রাম ট্র্যাক, ছাদ ও অন্যান্য অংশে ব্যবহৃত ধাতব অংশ বায়ুদূষকের দ্বারা আক্রান্ত হয়।

ii) **নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত বস্তু (Building Materials)** ঃ সালফার-ডাই-অক্সাইড, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং পার্টিকুলেট—এই তিনটি বায়ুদূষকের প্রভাবে নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত বস্তু যথা—পাথর এবং কংক্রিট, ইঁট, মার্বেল প্রভৃতি বিবর্ণ হয়, পৃষ্ঠতল ক্ষয়ে যায় এবং অপনোদিত হয়। সালফার-ডাই-অক্সাইড উদ্ভূত সালফিউরিক অ্যাসিডের প্রভাবে চুনাপাথর (limestone, $CaCO_3$) অপনোদিত হয়ে **ক্যালসিয়াম সালফেট** ($CaSO_4$) এবং **জিপসাম** ($CaSO_4$, $2H_2O$) উৎপন্ন করে। উভয় যৌগ জলদ্রাব্য হওয়ায় চুনাপাথর বৃষ্টির জলে অপনোদিত হয়। এছাড়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড উদ্ভূত কার্বনিক অ্যাসিডের প্রভাবে জলে দ্রাব্য বাইকার্বোনেট উৎপন্ন হওয়ার কারণে চুনাপাথর অপনোদিত হয়। বর্তমানে বিশ্ববিখ্যাত আগ্রার তাজমহলের মার্বেল বায়ুদুষণ জনিত ক্ষয় এবং অপনোদনের শিকার।

iii) **রঙ (Paints)** ঃ সালফার-ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড, পার্টিকুলেট এবং ওজোন প্রভৃতি বায়ুদূষকের প্রভাবে পেন্ট (বা রঙ) বিবর্ণ, অমসৃণ এবং অপনোদিত হয়। রঙের অপসারণে রঙের নীচে অবস্থিত বস্তু জলবায়ুকৃত (বা ক্ষয়িত) হয়। হাইড্রোজেন সালফাইডের উপস্থিতিতে সাদা সীসা বা লেডযুক্ত পেন্টেড তল কালো হয়ে যায়। কারণ লেড হাইড্রোজেন সালফাইডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় কালো **লেড সালফাইড** (PbS) উৎপন্ন করে।

iv) **রবার (Rubber)** ঃ ওজোন গ্যাস এবং ফটোকেমিক্যাল অক্সিডেন্ট রবারের চিড়ধরা (cracking) এবং দুর্বল হওয়ার জন্য দায়ী। গাড়ির টায়ারের পার্শ্ব-প্রাচীর এবং ইলেকট্রিক ইনস্যুলেটারের কাজে ব্যবহৃত রবার ওজোন দ্বারা আক্রান্ত হয়।

v) **চামড়া (Leather)** ঃ দূষিত বায়ুতে চামড়ার ক্ষয় ঘটে। চামড়ার ক্ষয়কারী বায়ুদুষকের অন্যতম হচ্ছে সালফার-ডাই-অক্সাইড। এই গ্যাসের প্রভাবে চামড়ার পৃষ্ঠতল ক্রমশ ক্ষয়ে যায়, ফলে চামড়া দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়। চামড়ার বাঁধাই বই দূষিত বায়ুর সংস্পর্শে দীর্ঘদিন অরক্ষিত রাখার ফলে বইয়ের ক্ষতি হয়। এক্ষেত্রে চামড়া ক্ষয়িত হয়ে লালাভ বাদামী বর্ণের পাউডার উৎপন্ন করে এবং কিছুদিন পর বই চামড়া থেকে অনাবৃত হয়।

vi) **কাগজ (Paper)** ঃ সালফার-ডাই-অক্সাইড যুক্ত বায়ুতে কাগজের স্বাভাবিক চরিত্র বিনষ্ট হয়। অত্যাধুনিক রাসায়নিক প্রযুক্তিতে প্রস্তুত কাগজে সামান্য পরিমাণ ধাতব অশুদ্ধি থাকে। এই ধাতব অশুদ্ধির উপস্থিতিতে কাগজে শোষিত সালফার-ডাই-

অক্সাইড আর্দ্রতা সহযোগে সালফিউরিক অ্যাসিডে রূপান্তরিত হয়। উৎপন্ন সালফিউরিক অ্যাসিডের প্রভাবে কাগজ অধিকতর ভঙ্গুর হয়।

vii) **বোনা কাপড় (Textiles) ঃ** বায়ুদূষণের প্রভাবে বোনা কাপড় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সালফার-ডাই-অক্সাইডের প্রভাবে কিছু প্রাকৃতিক এবং সিন্থেটিক বয়ন-তন্তুর ক্ষতি হয়। সূতীবস্ত্রের সেলুলোজ তন্তু সালফার-ডাই-অক্সাইড দ্বারা দুর্বল হয়। নাইলনের তৈরি আঁটো পাজামা এবং মোজা প্রভৃতি সালফার-ডাই-অক্সাইড দ্বারা স্থায়ীভাবে বিনষ্ট হয়। এছাড়া পর্দার কাপড় এবং অন্যান্য উজ্জ্বল বর্ণের বোনা কাপড় নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং ওজোন দ্বারা বিবর্ণ হয়।

viii) **কাচ এবং সিরামিক (Glass and Ceramics) ঃ** দূষিত বায়ুতে মাত্রাধিক হাইড্রোজেন ফ্লুরাইডের উপস্থিতিতে কাচ এবং সিরামিক বস্তু ক্ষয়িত হয়। কাচ এবং সিরামিক্সে উপস্থিত সিলিকন যৌগের সঙ্গে হাইড্রোজেন ফ্লুরাইডের বিক্রিয়ার ফলশ্রুতিতে দূষিত বায়ুতে দীর্ঘদিন অনাবৃত কাচ এবং সিরামিক্স বস্তু ক্ষয়িত হয়। পোর্সেলিন এনামেল দূষিত বায়ুর দ্বারা সররাচর আক্রান্ত না হলেও দীর্ঘদিন অম্ল বায়ু-দূষকের সান্নিধ্যে পোর্সেলিন এনামেলের মসৃণ পৃষ্ঠতল ক্ষয়িত হয়।

বায়ুদূষক	বস্তু	দূষণজনিত ক্ষতির প্রকৃতি
• সালফার-ডাই-অক্সাইড হাইড্রোজেন সালফাইড, পার্টিকুলেট	ধাতু	ক্ষয় (করোসান), দৃঢ়তা হ্রাস এবং বিবর্ণতা
• সালফার-ডাই-অক্সাইড, পার্টিকুলেট	পাথর এবং কংক্রিট	অপনোদন (লিচিং), ক্ষয় এবং বিবর্ণতা
• সালফার-ডাই-অক্সাইড, ওজোন, হাইড্রোজেন সালফাইড, পার্টিকুলেট	পেন্ট (রঙ)	ক্ষয়, ঔজ্জ্বল্য হ্রাস, অপনোদন, বিবর্ণতা
• ওজোন, ফটোকেমিক্যাল অক্সিডেন্ট	রবার	দৌর্বল্য, হওয়া, চিড় ধরা
• সালফার-ডাই-অক্সাইড	চামড়া	দৃঢ়তা হ্রাস, তলের ক্ষয়
• সালফার-ডাই-অক্সাইড	কাগজ	ভঙ্গুরতা
• সালফার-ডাই-অক্সাইড, ওজোন, নাইট্রোজেন অক্সাইড, পার্টিকুলেট	বোনা কাপড়	বিবর্ণতা, ক্ষয় এবং মালিন্য
• হাইড্রোজেন ফ্লুরাইড	কাচ এবং সিরামিক্স	ক্ষয়

তালিকা 8.8 ঃ বিভিন্ন বস্তুর বায়ুদূষণজনিত ক্ষয় দেখানো হয়েছে।

• **শিল্প সম্পদের উপর বায়ুদূষণের প্রভাব** (Effect of Air Pollutions on Art Treasures) ঃ

বিশ্বের কতিপয় অমূল্য শিল্প সম্পদ বায়ুদূষণের করাল গ্রাসে বর্তমানে বিপন্ন। উদাহরণ হিসেবে ভারতের তাজমহল, রোমের কলোসিয়াম, ভেনিসের সানমার্কো বাসিলিকা এবং অ্যাথেনস্ এর পার্থেনন প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। বায়ুদূষণের প্রভাবে শিল্প সম্পদগুলি বর্তমানে অবক্ষয়ের শিকার।

আগ্রার তাজমহল মার্বেলের একটি বিস্ময় এবং অমূল্য ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ। তাজমহলের অদূরে ঢালাই কারখানা (ফাউন্ড্রি), পাওয়ার হাউস, রেলওয়ে ইয়ার্ড এবং অন্যান্য কারখানা থেকে উৎপন্ন বায়ুদূষকের দ্বারা তাজমহল আক্রান্ত হচ্ছে। কয়েকজন পরিবেশ বিজ্ঞানীর মতে তাজমহল থেকে মাত্র 40 কিমি দূরে অবস্থিত মথুরা তৈল শোধনাগার (Mathura Oil Refinery) তাজমহলের বায়ুদূষণজনিত অবক্ষয়ের প্রকোপ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ। যদিও এই-সম্পর্কে বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। প্রকাশিত খবরে জানা গেছে বায়ুদূষণের প্রভাবে সৃষ্ট কালো এবং বাদামী প্রলেপের দ্বারা তাজমহলের দীপ্ত-শুভ্র চেহারা কিছুটা বিকৃত হয়েছে। এছাড়া SO_2 উদ্ভূত সালফিউরিক অ্যাসিডের ক্ষয়জনিত কারণে মার্বেলের আঁশ এবং অনুস্তর অপসারিত হচ্ছে। বায়ুদূষণের করাল গ্রাস থেকে তাজমহলের মত অমূল্য শিল্প সম্পদের সংরক্ষণ একান্ত প্রয়োজন।

8.9. বায়ুদূষণের ফলে আর্থিক ক্ষতি (Economic Loss due to Air Pollution) ঃ

সজীব এবং অজীব সম্পদের উপর বায়ুদূষণের প্রভাব থেকে আর্থিক ক্ষতির মূল্যায়ন করা যেতে পারে। বায়ুদূষণজনিত আর্থিক ক্ষতির হিসাব কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে পরোক্ষ উপায়ে সম্ভব যদিও বায়ুদূষণের মন্দ প্রভাব থেকে আর্থিক হিসাব অনুবাদ (translation) একটি দুরূহ বিষয়। আর্থিক ক্ষতির মূল্যায়ন দুটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়।

a) **আর্থিক ক্ষতি নির্ণয়ের ক্ষেত্র নির্বাচন ঃ** বায়ুদূষণের ফলে যে আর্থিক ক্ষতি হয় তা নির্ণয়ের জন্য নিম্নলিখিত ক্ষেত্র নির্বাচন করা যেতে পারে।

i) **মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বায়ুদূষণের মন্দ প্রভাবের ফলে আর্থিক ক্ষতি** (বায়ুদূষণের ফলে আক্রান্তদের অ্যাজমা, ব্রঙ্কাইটিস, এমফাইমিসা, ক্যানসার, হৃদপিণ্ডের সমস্যা, এবং দৃষ্টি সমস্যা হতে পারে। এই কারণে একদিকে শ্রমদিবস নষ্ট হওয়ার জন্য আর্থিক ক্ষতি এবং অপরদিকে রোগাক্রান্তদের চিকিৎসার জন্য আর্থিক ক্ষতি হয়)।

ii) খামার-প্রাণীর উপর বায়ু দূষণের প্রভাব জনিত কারণে আর্থিক ক্ষতি।

iii) উদ্ভিদের উপর বায়ু দূষণের প্রভাবজনিত কারণে আর্থিক ক্ষতি।

iv) কৃষিতে প্রভাবের ফলে আর্থিক ক্ষতি।

v) সম্পদ এবং বস্তুর (যথা ধাতু, বস্ত্র, রবার, সিরামিক্স, কাগজ, চামড়া, পেন্ট এবং পাথর) উপর বায়ুদূষণের প্রভাব জনিত কারণে আর্থিক ক্ষতি।

vi) শিল্প সম্পদের এবং পর্যটন কেন্দ্রে দূষণ জনিত কারণে পর্যটক হ্রাসের ফলে আর্থিক ক্ষতি।

vii) ধোঁয়ার ফলে অকাল গোধুলির (Premature Twilight) কারণে আলো জ্বালাতে যে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ ব্যয় হয় তার ফলে আর্থিক ক্ষতি।

viii) স্মোগ থাকাকালীন পরিবহণ ব্যয় বৃদ্ধির ফলে আর্থিক ক্ষতি।

ix) যানবাহন এবং কারখানার ধোঁয়া এবং অন্যান্য দূষক নিয়ন্ত্রণের জন্য আর্থিক ক্ষতি।

x) জীবাশ্ম জ্বালানির আংশিক দহনের ফলে জ্বালানি বস্তুর অপচয়ে সৃষ্ট আর্থিক ক্ষতি।

xi) বায়ু-দূষক পরিমাপ এবং নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য, কৃষি, রাসায়নিক এবং ভৌত রাসায়নিক গবেষণা চালানোর জন্য আর্থিক ক্ষতি।

xii) দূষণ নিয়ন্ত্রণের প্রশাসনিক সংস্থা (যথা : পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ) চালানোর জন্য আর্থিক ক্ষতি।

b) **আর্থিক ক্ষতি নির্ণয়ের হিসাব** (Calculation for Economic Loss) ঃ বায়ুদূষণের প্রভাবে প্রত্যক্ষ আর্থিক ক্ষতির সঙ্গে পরোক্ষ ক্ষতি যোগ করা হয়। বস্তু এবং সম্পদ ক্ষয়ের ফলে যে পরোক্ষ আর্থিক ক্ষতি হয় তা নিম্নলিখিত উপায়ে হিসাব করা হয়।

i) ক্ষতিগ্রস্ত বস্তুর প্রকৃতি (উদ্ভিদ, ধাতু, পেন্ট, পাথর প্রভৃতি)।

ii) ক্ষতির মাত্রা (পূর্ণ বা আংশিক)।

উদাহরণ ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্মোক্ নুইস্যানস্ সংক্রান্ত প্রধান পরিদর্শকের অফিস (Office of the Chief Inspector of Smoke Nuisance) (60 বি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-20) থেকে প্রকাশিত সার্ভে রিপোর্টে জানা গেছে যে, বায়ুদূষণের ফলে পশ্চিমবঙ্গের বাৎসরিক আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ প্রায় 33 কোটি (সার্ভের অঞ্চল ছিল বৃহত্তর কলকাতা এবং কয়েকটি জেলা)।

কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে ক্ষতির মোট পরিমাণ নীচে দেওয়া হল ঃ

1. কৃষির ক্ষতি	11	কোটি / বছর
2. ধাতুর ক্ষয়	05	,, / ,,
3. চিকিৎসা জনিত ব্যয়	6.75	,, / ,,
4. নির্মিত অট্টালিকার ক্ষতি এবং মেরামতের জন্য ব্যয়	2	,, / ,,
5. বোনা বস্ত্রের ক্ষতি	5	,, / ,,
6. লন্ড্রি ব্যয়	3	,, / ,,

• হুগলী জেলা ঃ হুগলী জেলায় ব্যাপক নিরীক্ষণে (survey) জানা গেছে বায়ুদূষণের ফলে প্রতি একর কৃষিজমিতে উৎপাদন হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে ভূগর্ভস্থ জলের গুণমান কমেছে, গবাদি পশু এবং পশুসম্পত্তির (live stock) উৎপাদন কমেছে এবং মানুষের দূষণজনিত রোগের সংক্রমণ বেড়েছে।

8.10. **আলোক-রাসায়নিক বায়ুদূষণ** (Photo Chemical Air Pollution) ঃ স্মোগ (Smog)

a) **আলোক-রাসায়নিক বায়ুদূষণ বলতে কি বোঝায়?**

দিনের বেলায় সৌর-আলোকের উপস্থিতিতে স্থির ট্রপোস্ফেরিক বায়ুমণ্ডলে (তাপমাত্রার বৈপরীত্য হলে ভূমিসংলগ্ন বায়ুমণ্ডল স্থির থাকে) দুই বা ততোধিক বিশেষ প্রাথমিক বায়ুদূষকের পারস্পরিক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন গৌণ বায়ুদূষকের উপস্থিতিতে সৃষ্ট বায়ুদূষণকে **'আলোক-রাসায়নিক বায়ুদূষণ'** বলা হয়। মেট্রোপলিটান শহরে দিনের যে সময়ে যানবাহনাদির চলাচল সর্বাধিক সেই সময় আলোক-রাসায়নিক বায়ুদূষণের পরিমাণ বেশি হয়। 'স্মোগ' উৎপাদনই অলোক-রাসায়নিক বায়ুদূষণের অন্যতম প্রধান কারণ। **আলোক রাসায়নিক স্মোগ** (Photo Chemical Smog) লস অ্যাঞ্জেলস (Los Angeles) শহরে সচরাচর দেখা যায় (1940 খ্রীঃ প্রথম দেখা যায়)। লস অ্যাঞ্জেলস্ শহরে আলোক রাসায়নিক স্মোগ উৎপত্তির প্রধান কারণ হচ্ছে যানবাহনের একঝসট্ গ্যাসে নির্গত **হাইড্রোকার্বন** এবং **নাইট্রোজেন অক্সাইড** এর পারস্পরিক বিক্রিয়ায় সূর্যালোকের প্রভাব।

b) **আলোক-রাসায়নিক স্মোগ কি?** (What is Photo-Chemical Smog) ঃ

ধোঁয়া (Smoke) এবং ফগ্ (Fog) এর সমন্বয়কে স্মোগ (Smog) বলা হয়। আলোক রাসায়নিক স্মোগ উৎপন্ন হয়—**'হাইড্রোকার্বন এবং 'নাইট্রোজেন অক্সাইডের' 'আলোক-রাসায়নিক জারণে।** আলোক-রাসায়নিক স্মোগ বিবিধ জারক বস্তুর মিশ্রণে গঠিত। আলোক-রাসায়নিক স্মোগ এর সংযোগী উপাদানের অন্যতম হচ্ছে ওজোন, ফরম্যালডিহাইড, অ্যাক্রোলিন, পারঅক্সাইড, পারঅক্সি অ্যাসাইল নাইট্রেট (PAN), নাইট্রিক অ্যাসিড, সালফিউরিক অ্যাসিড এবং ফ্রি-র্যাডিকল্।

c) **আলোক-রাসায়নিক স্মোগ উৎপাদন ঃ**

A. আলোক-রাসায়নিক স্মোগ উৎপাদনের শর্ত ঃ

আলোক-রাসায়নিক জারণে স্মোগের উৎপাদন নিম্নলিখিত শর্তের উপর নির্ভর করে ঃ

i) আলোর তীব্রতা,

ii) বায়ুমণ্ডলীয় বৈপরীত্যের উচ্চতা এবং তীব্রতা,

iii) হাউড্রোকার্বনের সক্রিয়তা

iv) নাইট্রিক অক্সাইড এবং হাইড্রোকার্বনের অনুপাত
v) আলোক-শোষকের উপস্থিতি এবং
vi) আবহাওয়া-শর্ত।

B. আলোক-রাসায়নিক স্মোগের উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

আলোক-রাসায়নিক স্মোগ উৎপাদনের বিভিন্ন তত্ত্ব প্রচলিত রয়েছে। তার মধ্যে লস অ্যাঞ্জেলস্ এর বায়ুমণ্ডলে আলোক-রাসায়নিক স্মোগের উৎপাদন সম্পর্কীয় অধ্যাপক এ. জে. হাজেন স্মিটের (A. J. Haagen Smit) প্রদত্ত তত্ত্বই সর্বজনস্বীকৃত। এই তত্ত্ব অনসুারে নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং হাইড্রোকার্বনের আলোক-জারণে ওজোন সহ অন্যান্য জারকের যুগপৎ উৎপাদন পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

i) নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড ঘটিত আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়া ঃ

যানবাহনের একঝসট্ গ্যাসে নির্গত নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড (NO_2) সৌর বিকিরণের অতি-বেগ্নী রশ্মি থেকে শক্তি শোষণ করে সক্রিয় হয়। পরক্ষণেই সক্রিয় নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড নাইট্রিক অক্সাইড (NO) এবং পারমাণবিক অক্সিজেনে (O) বিয়োজিত হয়। আণবিক অক্সিজেন (O_2) এবং পারমাণবিক অক্সিজেন (O) তৃতীয় কোন শক্তি—শোষক বস্তুর (M) উপস্থিতিতে স্থায়ী ওজোন অণু (O_3) উৎপন্ন করে। ওজোন অতিরিক্ত নাইট্রিক অক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় পুনরায় নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে। সমগ্র বিক্রিয়া অবিরাম চলতে থাকে এবং নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড ওজোন উৎপাদনে অনুঘটকের কাজ করে।

$$NO_2 + hUV \rightarrow NO + O$$
$$O_2 + O + M \rightarrow O_3 + M$$
$$O_3 + NO \rightarrow NO_2 + O_2$$

একঝসট্ গ্যাসে হাইড্রোকার্বনের উপস্থিতিতে পরবর্তী ধাপে কতকগুলি পর্যায়ক্রমিক জারণ বিক্রিয়া সংঘটিত হয়। ওজোন হাইড্রোকার্বনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে বিবিধ পদার্থ যথা—**অ্যালডিহাইড, কিটোন, জৈব অ্যাসিড, পারঅক্সাইড, অ্যাক্রোলিন, পার অক্সি অ্যাসাইল নাইট্রেট (PAN)** প্রভৃতি উৎপন্ন করে। ওজোন সহ পরবর্তী পর্যায়ে উৎপন্ন পদার্থ অ্যারোসল উৎপাদনের মাধ্যমে স্মোগ সৃষ্টি করে।

আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন অতিরিক্ত পরিমাণ ওজোনের উপস্থিতিতে স্মোগে নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) মিস্ট উৎপন্ন হতে পারে।

$$2NO_2 + O_3 \rightarrow N_2O_5 + O_2$$
$$N_2O_5 + H_2O \text{ (জলীয় বাষ্প)} \rightarrow 2HNO_3$$

• **সালফার-ডাই-অক্সাইড থেকে ওজোন উৎপাদন ঃ**

বায়ুতে সালফার-ডাই-অক্সাইড (প্রাথমিক বায়ু দূষক) উপস্থিত থাকলে আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ওজোন এবং সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হতে পারে।

$$SO_2 + O_2 \xrightarrow{hUV} SO_4$$
$$SO_4 + O_2 \longrightarrow SO_3 + O_3$$
$$SO_3 + H_2O \longrightarrow H_2SO_4$$

ii) অ্যালডিহাইড ঘটিত আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়া ঃ

আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অ্যালডিহাইড থেকে ওজোন উৎপন্ন হতে পারে। পূর্বে বর্ণিত আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ওজোন এবং নাইট্রিক অক্সাইডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন অক্সিজেন এর সঙ্গে অ্যালডিহাইডের (RCHO) বিক্রিয়ায় ওজোন উৎপন্ন হয়।

$$O_3 + NO \longrightarrow NO_2 + O_2$$
$$O_2 + RCHO \xrightarrow{hUV} RCO_3H$$
$$RCO_3H + O_2 \xrightarrow{hUV} RCOOH + O_3$$

এছাড়া অ্যালডিহাইড এবং অ্যাসিটোন প্রাথমিক আলোক-রাসায়নিক বিয়োজনে বিভিন্ন মূলক (radical) উৎপন্ন করে। যথা—আসিট্যালডিহাইড, মিথাইল (CH_3) এবং ফরমাইল (HCO) মূলক ও অ্যাসিটোন, মিথাইল এবং অ্যাসিটাইল মূলক (CH_3CO) উৎপন্ন করে।

$$CH_3\,CHO \xrightarrow{hUV} CH_3 + HCO$$

$$(CH_3)_2\,CO \xrightarrow{hUV} CH_3 + CH_3CO$$

d. **আলোক-রাসায়নিক স্মোগ-এর প্রভাব** (Effects of Photochemical Smog) **ঃ**

মানুষ, প্রাণী, উদ্ভিদ এবং বস্তুর উপর আলোক-রাসায়নিক স্মোগের প্রভাব লস-অ্যাঞ্জেলস্ শহরে বিশেষভাবে অনুশীলন করা হয়েছে। এছাড়া কৃত্রিম স্মোগ-কক্ষে প্রভাব অনুশীলন সম্ভব হয়েছে। আলোক-রাসায়নিক স্মোগের নিম্নবর্ণিত মন্দ প্রভাব দেখা যায়।

A. **মানুষের উপর প্রভাব ঃ**

i) **চোখের জ্বালা অনুভূতি** (Irritation of Eye) **ঃ**
বিভিন্ন যৌগ যথা, অ্যাক্রোলিন এবং ফরম্যালডিহাইড চোখে জ্বালা এবং যন্ত্রণা অনুভূতির সৃষ্টি করে।

ii) **দৃশ্যমান হ্রাস** (Visibility Reduction) **ঃ**
ধোঁয়া এবং অ্যারোসলের সমন্বয়ে স্মোগ যুক্ত বায়ু মাধ্যমে মানুষের দৃশ্যমান হ্রাস পায়।

B. উদ্ভিদের উপর প্রভাব :

ওজোন, প্যান (PAN) এবং নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড হচ্ছে পরিচিত ফাইটোটক্সিকান্ট। এদের উপস্থিতিতে উদ্ভিদের নিম্নলিখিত মন্দ প্রভাব সৃষ্টি হয়।

i) ক্লোরোসিস (Chlorosis)

ii) নেক্রোসিস (Necrosis)

এবং iii) বৃদ্ধি হ্রাস (Growth reduction)

B. বস্তুর উপর প্রভাব :

i) রবারে চিড় ধরা (Cracking of Rubber) :

আলোক-রাসায়নিক স্মোগে ওজোনের উপস্থিতিই রবারের চিড় ধরার প্রধান কারণ। যানবাহনের টায়ারের পার্শ্ব প্রাচীর এবং অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত রবার ওজোন দ্বারা আক্রান্ত হয়। চিড় ধরা বাধাদানের জন্য রবার প্রস্তুতির সময় অ্যান্টি-ওজোন্যান্ট (anti-ozonant) ব্যবহার করা হয়।

8.11. গ্রীণহাউস প্রভাব (Green House Effects) :

বিশ্বব্যাপী উষ্ণকরণ (Global Warming)

1. 'গ্রীণহাউস প্রভাব' বলতে কি বোঝায়?

i) পৃথিবীর তাপশক্তির ভারসাম্য :

পৃথিবীর জীবমণ্ডলে বাস্তুতন্ত্রের গতিশীলতা নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রাণপ্রক্রিয়ার সহনোপযোগী একটি নির্দিষ্ট 'তাপমাত্রা-বিস্তার' বা 'গড় তাপমাত্রার একান্ত প্রয়োজন। পৃথিবীর গড় স্বাভাবিক তাপমাত্রা হচ্ছে +15°C। যেহেতু সৌর বিকিরণই পৃথিবীর তাপমাত্রার প্রধান এবং একমাত্র উৎস, তাই পৃথিবীর গড় স্বাভাবিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় পৃথিবীপৃষ্ঠে সৌর বিকিরণজনিত তাপশক্তির যোগান (input) এবং উৎপাদ (output) এর ভারসাম্যের উপর (যোগান $\rightleftharpoons$ উৎপাদ)।

পৃথিবীপৃষ্ঠে সৌর বিকিরণের দৃশ্যমান (বেগ্‌নী [400nm] থেকে লাল [750nm]) এবং ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ইনফ্রারেড রশ্মির (0.8–4μm) আপতনের ফলে পৃথিবীপৃষ্ঠ এবং তৎসংলগ্ন বায়ুমণ্ডল উত্তপ্ত হয়। পৃথিবীর তাপ বৃহৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যযুক্ত ইনফ্রারেড রশ্মি (4–50μm) বা তাপীয় বিকিরণ হিসেবে পুনঃবিকিরণের মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায় এবং বায়ুমণ্ডল থেকে মহাশূন্যে বিলীন হয়। এইভাবে পৃথিবীতে তাপশক্তির যোগান এবং ভারসাম্য নিয়ন্ত্রিত থাকে ; এবং বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক গ্যাসীয় উপাদান এই তাপীয় ভারসাম্যে কোনপ্রকার বিঘ্ন সৃষ্টি করে না।

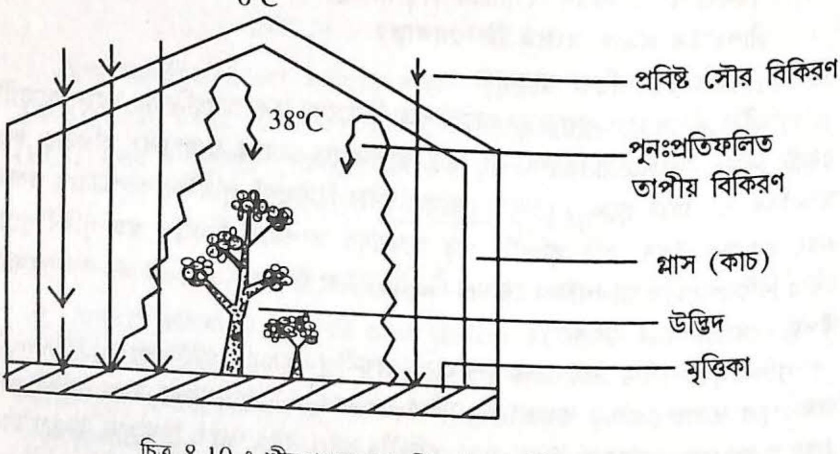
ii) বায়ুদূষক এবং তাপীয় ভারসাম্য :

বায়ুদূষক, বিশেষ করে কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2)এর দ্বারা পৃথিবীর তাপীয় ভারসাম্য পরিবর্তিত হতে পারে। বায়ুমণ্ডলে স্বাভাবিক ঘনত্বের কার্বন-ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতিতে

সৌর বিকিরণ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে পৃথিবীপৃষ্ঠে আপতিত হয়, কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠ কর্তৃক পরিত্যক্ত তাপীয় বিকিরণ যখন বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে ফিরে যায় তখন তাপীয় বিকিরণের কিছু অংশ CO_2 দ্বারা শোষিত হয়। CO_2 দ্বারা শোষিত তাপ পুনঃবিকিরণের মাধ্যমে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসে। এই প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর গড় স্বাভাবিক তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু বায়ুমণ্ডলে স্বাভাবিক ঘনত্বের অধিক কার্বন-ডাই-অক্সাইডের উপস্থিতিতে পৃথিবী থেকে পরিত্যক্ত তাপের পরিমাণ হ্রাস পেতে পারে। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেড়ে যেতে পারে।

iii) **গ্রীণহাউস প্রভাব কি?**

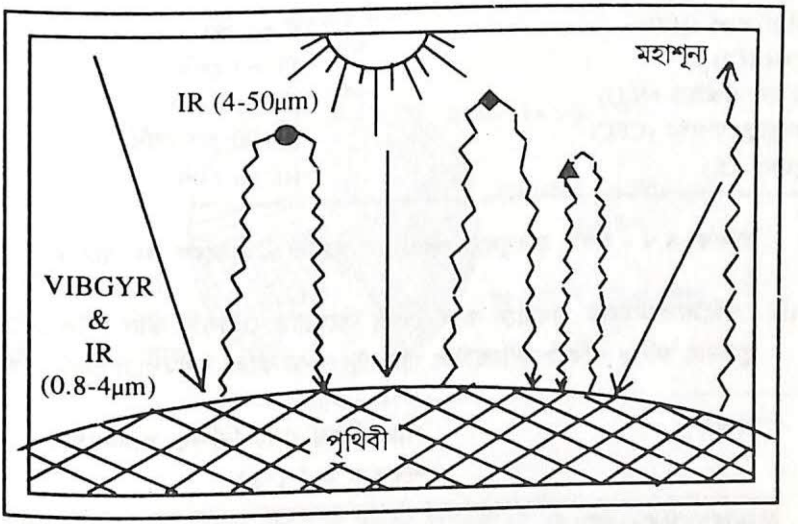
এক্ষেত্রে 'গ্রীণহাউস' কথাটি রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রকৃত অর্থে শীতপ্রধান দেশে (যেখানে পরিবেশের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কাছাকাছি) উদ্ভিদ প্রতিপালনের জন্য বাগানে স্বচ্ছ কাচের (glass) ছাউনিযুক্ত ঘর তৈরি করা হয়। এই ঘরকে **গ্রীণহাউস বা সবুজ ঘর** বলা হয়। শীতের সৌরস্নিগ্ধ দিনে পরিবেশের তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নীচে থাকলেও সবুজ ঘরের ভিতর বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা 38°C–39°C-র (100-120°F) মধ্যে নিয়ন্ত্রিত থাকে। ফলে উদ্ভিদের জৈবিক ক্রিয়া সম্পাদনে কোন অসুবিধার সৃষ্টি হয় না। **কিন্তু গ্রীণহাউসের উচ্চ-**



চিত্র 8.10 : শীতপ্রধানদেশে গ্রীণহাউসের নীতি দেখানো হয়েছে।

বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের কারণ কি? সৌর বিকিরণের দৃশ্যমান রশ্মি (বেগ্‌নী—লাল) এবং ক্ষুদ্রতম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ইনফ্রারেড রশ্মি কাচের মধ্য দিয়ে গ্রীণহাউসে সহজেই প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু মৃত্তিকা ও উদ্ভিদ কর্তৃক পরিত্যক্ত তাপীয় বিকিরণ (অর্থাৎ বৃহৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ইনফ্রারেড রশ্মি) কাচের মধ্য দিয়ে গ্রীণহাউসের বাইরের বায়ুমণ্ডলে ফিরে যেতে পারে না, কাচের অভ্যন্তর তলে প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় গ্রীণহাউসের মৃত্তিকা ও উদ্ভিদের উপর আপতিত হয়। ফলে গ্রীণহাউসের অভ্যন্তরস্থ তাপমাত্রা বেশি থাকে।

আমরা সমগ্র পৃথিবীর পরিমণ্ডলকে গ্রীণহাউস রূপে কল্পনা করতে পারি। এক্ষেত্রে বায়ুমণ্ডলের কার্বন-ডাই-অক্সাইড পৃথিবীর গ্রীণহাউসের কাচ আস্তরক হিসেবে কাজ করে। কারণ CO_2 পৃথিবীতল থেকে তাপীয় বিকিরণের উৎপাদকে বাধা দেয়। তাই **বায়ুমণ্ডলে CO_2 এর ঘনত্ব বৃদ্ধির দরুন পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধির ঘটনাকে গ্রীণহাউস প্রভাব (Greenhouse Effect) বলা হয়।** 1988 খ্রীঃ নাসার (NASA) প্রখ্যাত বিজ্ঞানী



চিত্র 8.11 ঃ গ্রীণহাউস প্রভাবের ক্রিয়াপ্রণালী দেখানো হয়েছে (→ সৌর বিকিরণ, ⇝ তাপীয় বিকিরণ (IR), ● ◆ ▲ গ্রীণহাউস গ্যাসের অণু)।

'জেমস হ্যানসেন' (J. Hansen) এর ঘোষণা অনুযায়ী পৃথিবীর উষ্ণকরণ (Global Warming) ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

2. **গ্রীণহাউস গ্যাস** (Green House Gas) ঃ

i) কার্বন-ডাই-অক্সাইডকে প্রধান গ্রীণহাউস গ্যাস বলা হয়। কার্বন-ডাই-অক্সাইড ব্যতিরেকে অন্যান্য কয়েকটি গ্যাস গ্রীণহাউস প্রভাব সৃষ্টিতে বিশেষ উপযোগী; গ্রীণহাউস প্রভাব সৃষ্টিকারী এই গ্যাসগুলির অন্যতম হচ্ছে **জলীয় বাষ্প** (Water Vapour), **মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ফ্রেয়ন গ্যাস** (**ক্লোরোফ্লুরোকার্বন, CFC**) এবং **ওজোন**। বায়ুমণ্ডলে শেষোক্ত গ্যাসগুলির ঘনত্ব (আয়তন শতাংশ) কার্বন-ডাই-অক্সাইডের তুলনায় অনেক কম হলেও পৃথিবীর উত্তপ্তকরণে (তাপীয় বিকিরণের শোষণ এবং পুনঃবিকিরণে) কার্বন-ডাই-অক্সাইডের তুলনায় অনেক বেশি উপযোগী (বা ক্ষমতাশালী)। উদাহরণ হিসেবে ফ্রেয়ন গ্যাসের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এক অণু ফ্রেয়ন গ্যাসের উষ্ণকরণ ক্ষমতা 10,000 কার্বন-ডাই-অক্সাইড

অণুর মোট উষ্ণকরণ ক্ষমতার সমান। তালিকায় গুরুত্ব অনুসারে গ্রীণহাউস গ্যাসের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রীণহাউস গ্যাস	প্রতি অণু কার্বন-ডাই-অক্সাইড এর সাপেক্ষে উষ্ণকরণ ক্ষমতা
কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2)	—
জলীয় বাষ্প (H_2O)	5 গুণ কম
মিথেন (CH_4)	23 গুণ বেশি
নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O)	270 গুণ বেশি
ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (CFC)	10,000 গুণ বেশি
ওজোন (O_3)	10 গুণ বেশি

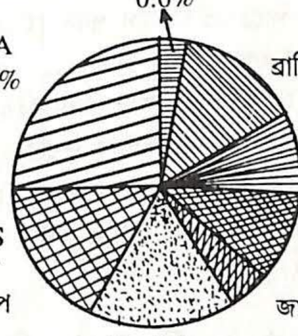
তালিকা 8.9 : গুরুত্ব ক্রমানুসারে গ্রীণহাউস গ্যাসের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

ii) পরিসংখ্যানমূলক অধ্যয়নে জানা গেছে শিল্পোন্নত দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অধিক পরিমাণ গ্রীণহাউস গ্যাস উৎপাদন করে। বায়ুমণ্ডলে মোট নিক্ষিপ্ত

অঞ্চল	সমগ্র বিশ্বে মোট নিক্ষিপ্ত পরিমাণের শতকরা হার (%)
• **শিল্পোন্নত দেশ** (66.95%)	
আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র	27.44
জাপান	2.51
পশ্চিম ইউরোপ	11.89
পূর্ব ইউরোপ	4.54
সোবিয়েত রাশিয়া (সাবেক)	13.08
অস্ট্রেলিয়া	2.00
• **উন্নয়নশীল দেশ** (33.05%)	
ভারত	0.013
চিন	0.57
ব্রাজিল	18.21
এশিয়া (জাপান বাদে)	7.97
আফ্রিকা	3.04
আমেরিকা (USA , কানাডা বাদে)	22.03%

তালিকা 8.10 ঃ কাউন্সিল অব সায়েন্স এণ্ড এনভিরনমেন্ট (CSE) এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বে মোট নিক্ষিপ্ত গ্রীণহাউস গ্যাসের শতকরা হার উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্রীণহাউস গ্যাসের প্রায় 67 শতাংশ শিল্পোন্নত দেশের অবদান এবং অবশিষ্ট 33 শতাংশ উন্নয়নশীল দেশের অবদান (তালিকা 8.10 এবং চিত্র 8.12)। শিল্পোন্নত দেশগুলির মধ্যে আমেরিকার অবদান সবচেয়ে বেশি, 1532 মিলিয়ন টন কার্বন ইক্যুইভ্যালেন্ট প্রতি বছর।



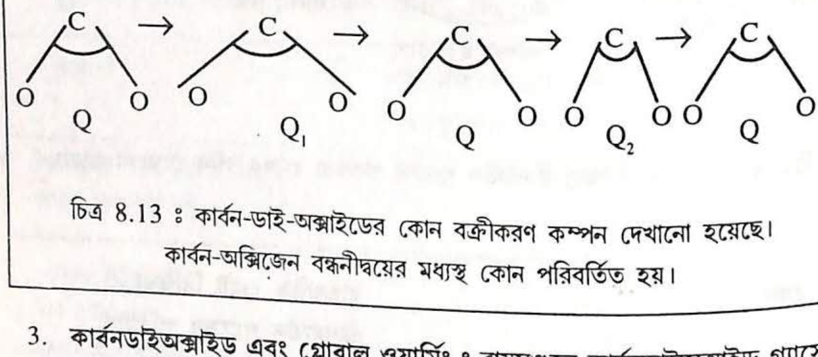
চিত্র 8.12 ঃ মোট নিক্ষিপ্ত গ্রীণহাউস গ্যাসের শতকরা হারের বন্টন দেখানো হয়েছে।

দেশ	বাৎসরিক মোট নিক্ষিপ্ত গ্রীণহাউস গ্যাসের পরিমাণ
USA	1532
ব্রাজিল	1017
USSR	730
জার্মানী	155
জাপান	140
ইংল্যাণ্ড	132
অস্ট্রেলিয়া	112

তালিকা 8.11 ঃ প্রধান কয়েকটি গ্রীণহাউস-গ্যাস উৎপাদক দেশের বাৎসরিক মোট নিক্ষিপ্ত গ্রীণহাউস গ্যাসের পরিমাণ দেখানো হয়েছে (CSE-পরিসংখ্যান)।

•• গ্রীণহাউস-গ্যাস তাপীয় ইনফ্রারেড বিকিরণ (4-50μm) শোষণ করে কেন?

গ্রীণহাউস গ্যাসের উষ্ণকরণ ক্রিয়ার মূলে রয়েছে 'তাপীয় ইনফ্রারেড বিকিরণ' (infrared radiation) শোষণ করার ক্ষমতা। ইনফ্রারেড রশ্মি শোষণ করার ক্ষমতা নির্ভর করে গ্যাসীয় অণুর উপাদান পরমাণুর পারস্পরিক কম্পন সংখ্যার (vibration frequency) উপর। যে সব গ্যাসের কম্পন সংখ্যা তাপীয় ইনফ্রারেড বিকিরণের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিস্তারের (4-50μm) সদৃশ (বা অনুরূপ) তারাই কেবল তাপীয় বিকিরণ শোষণ করতে পারে। গ্রীণহাউস গ্যাস (CO_2, CH_4, H_2O, N_2O, O_3 ইত্যাদি) ব্যতীত অন্য কোন গ্যাসে (যথা O_2, CO_2, SO_2 প্রভৃতি) এই সাদৃশ্য লক্ষ করা যায় না। সেইহেতু কেবল গ্রীণহাউস গ্যাসই **'গ্লোবাল ওয়ার্মিং'** সৃষ্টিতে সক্ষম। অণুর পারমাণবিক কম্পন দু-প্রকার হতে পারে (1) দ্বি-পারমাণবিক অণুর ক্ষেত্রে **'বন্ধনী প্রসারণ কম্পন'** (bond-stretching vibration) এবং (2) ত্রি-পারমাণবিক অণুর ক্ষেত্রে **'কোন্ বক্রীকরণ কম্পন'** (angle bending vibration)



চিত্র 8.13 ঃ কার্বন-ডাই-অক্সাইডের কোন বক্রীকরণ কম্পন দেখানো হয়েছে। কার্বন-অক্সিজেন বন্ধনীদ্বয়ের মধ্যস্থ কোন পরিবর্তিত হয়।

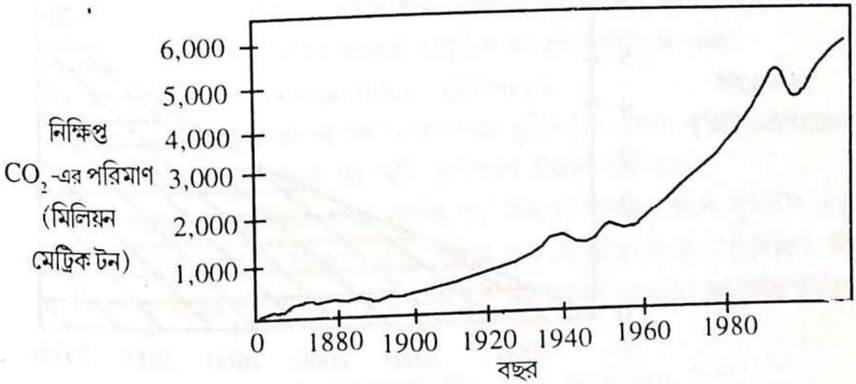
3. **কার্বনডাইঅক্সাইড এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং ঃ** বায়ুমণ্ডলে কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাসের ক্রমান্বয়িক ঘনত্ব বৃদ্ধিই গ্রীণহাউস ইফেক্ট বা গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর প্রধান কারণ। কার্বনডাইঅক্সাইডের ঘনত্ব বৃদ্ধি ঘটছে প্রধানত দুটি কারণে

1. **কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের অনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন :**

জীবাশ্ম জ্বালানির (কয়লা, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস) অবাধ ব্যবহারের ফলে এবং সিমেন্ট উৎপাদন প্রভৃতি শিল্প-প্রক্রিয়ায় অধিক পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হয়। জীবাশ্ম জ্বালানির ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে 1870-1989 খ্রীঃ এর মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়েছে প্রায় 21.5% (290-352 ppm)। অধিকাংশ পরিবেশ বিজ্ঞানীর মতে বর্তমান হারে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ঘটতে থাকলে আগামী 2030 থেকে 2050 খ্রীঃ এর মধ্যে বায়ুমণ্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ দ্বি-গুণ হবে। তার ফলে দৈনিক গড় তাপমাত্রা বাড়বে 2°C-5°C (3.5—9°F)।

2. **কার্বন-ডাই-অক্সাইডের হ্রাসপ্রাপ্ত প্রশমন ঃ**

কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের দুটি মুখ্য প্রশমক (sinker) হচ্ছে উদ্ভিদ এবং সমুদ্র। উদ্ভিদের সালোক সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড গৃহীত হয়, ফলে বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস পায়। কিন্তু অরণ্য ধ্বংসজনিত কারণে এই সম্ভাবনা ক্রমশ সংকুচিত হচেছ (বাৎসরিক 1/4 শতাংশ CO_2 বৃদ্ধি ঘটে অরণ্য ধ্বংসের ফলে)। সমুদ্রের



চিত্র 8.14 ঃ জীবাশ্ম জ্বালানির দহন এবং সিমেন্ট উৎপাদনে বাৎসরিক নিক্ষিপ্ত CO_2 এর ক্রমান্বয়িক পরিমাণ বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে।

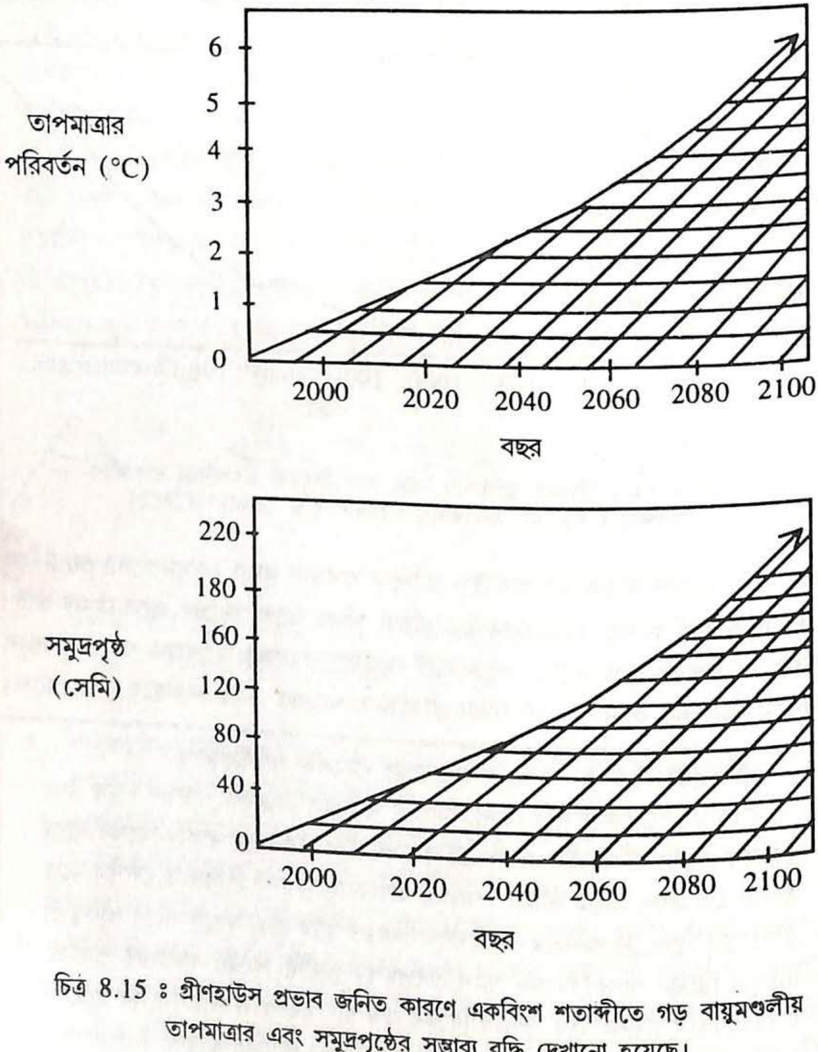
জলে বহুল পরিমাণ কার্বন-ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত অবস্থায় থাকে (বায়ুমণ্ডলের 60%-এর বেশি) কিন্তু দৈনিক গড় তাপমাত্রার ক্রমান্বয়িক বৃদ্ধির ফলে সমুদ্রের জলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের প্রশমন হ্রাস পাচ্ছে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসের উৎপাদন এবং প্রশমনের ভারসাম্য বিনাশের ফলে বাতাসে প্রধান গ্রীণহাউস গ্যাসের ঘনত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- **'গ্রীণহাউস ইফেক্ট' সম্পর্কে শিল্পোন্নত দেশের প্রতিক্রিয়া ঃ**

CO_2 ব্যতিরেকে জলীয় বাষ্প, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ফ্রেয়ন গ্যাস এবং ওজোন প্রভৃতি গ্রীণহাউস গ্যাস গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জন্য দায়ী। মিথেন গ্যাস উৎপন্ন হয় জলে আবদ্ধ উদ্ভিজ পদার্থের অবায়বীয় পচনে। শিল্পোন্নত দেশের মতে গ্রীণহাউস ইফেক্টের অন্যতম প্রধান কারণ ধানের জমি এবং গবাদি পশুর পাকস্থলী নিঃসৃত মিথেন গ্যাস। মিথেন গ্যাস উৎপাদনে তৃতীয় বিশ্বের ধানচাষই প্রধানত দায়ী। কিন্তু CSE-র মতে তৃতীয় বিশ্বের ধান চাষ থেকে উৎপন্ন মিথেন গ্যাসের পরিমাণ খুবই নগণ্য এবং গ্রীণহাউস ইফেক্টে মিথেন গ্যাসের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য নয়। তাই 'গ্রীণহাউস ইফেক্ট' সম্পর্কে ধান-উৎপাদক তৃতীয় বিশ্বের প্রতি শিল্পোন্নত দেশসমূহের দোষারোপ নিজেদের ত্রুটি আড়াল করার এক কৌশলমাত্র।

4. **বিশ্বব্যাপী উষ্ণকরণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী** (Predictions About Global Warming) ঃ

মানুষের অদূরদৃষ্টি ক্রিয়াকলাপে CO_2 এবং অন্যান্য ট্রেস গ্রীণহাউস গ্যাসের ক্রমান্বয়িক পরিমাণ বৃদ্ধি ঘটলে একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর 'ট্রপোস্ফেরিক-বায়ুমণ্ডলে দৈনিক গড়



চিত্র 8.15 ঃ গ্রীণহাউস প্রভাব জনিত কারণে একবিংশ শতাব্দীতে গড় বায়ুমণ্ডলীয় তাপমাত্রার এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের সম্ভাব্য বৃদ্ধি দেখানো হয়েছে।

তাপমাত্রা সমানুপাতিক হারে বেড়ে চলবে। আগামী 2030-2050 খ্রীঃ এর মধ্যে দৈনিক গড় তাপমাত্রা 2–5°C বৃদ্ধি পাবে। তার ফলে 2050 খ্রীঃ এর মধ্যে সমুদ্র পৃষ্ঠ (Sea

Level) 50-100 সেমি (2-3 ফুট) বাড়বে এবং একবিংশ শতাব্দীর শেষে সমুদ্র পৃষ্ঠ বাড়বে প্রায় 180-200 সেমি (6-7 ফুট)।

সমুদ্রপৃষ্ঠ বাড়বে মুখ্যত দুটি কারণে—

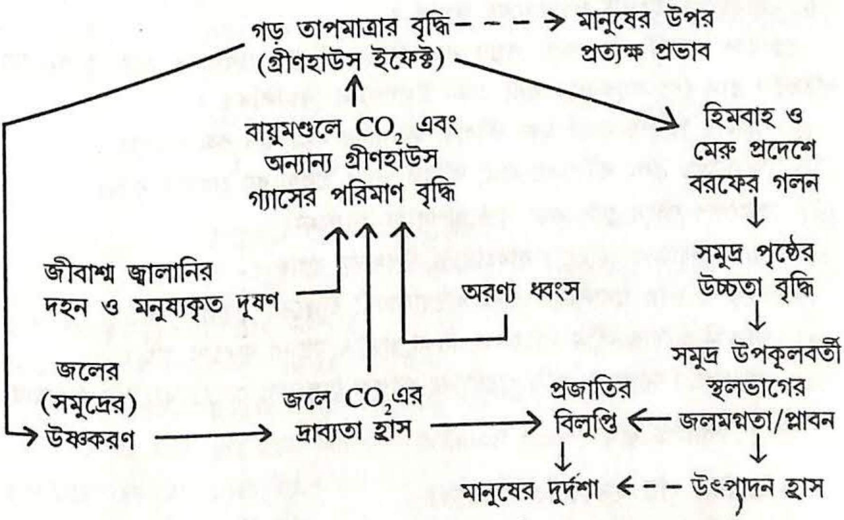
i) হিমবাহ (glaciers) এবং অ্যান্টার্কটিকা ও আর্কটিক অঞ্চলের স্থলভাগে সঞ্চিত বরফ এবং হিমালয়ের চূড়ায় সঞ্চিত বরফের গলনের জন্য—(স্যাটেলাইট গৃহীত চিত্রে দেখা গেছে গত 15 বছরে 6% পোলার আইসক্যাপ গলে গেছে)।

এবং ii) তাপমাত্রা বৃদ্ধি জনিত কারণে সামুদ্রিক জলের প্রসারণের জন্য।

5. **গ্রীণহাউস প্রভাব** (Green House Effects) ঃ

বায়ুমণ্ডলে গ্রীণহাউস গ্যাসের সঞ্চয়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধিজনিত কারণে পৃথিবীর পরিবেশের উপর যে বিরূপ প্রভাব পড়বে তা অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল ঃ

i) তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের গড় উচ্চতা বাড়বে। ফলে পৃথিবীর সমুদ্র উপকূলবর্তী নীচু স্থলভূমি জলমগ্ন হবে। বিশেষ করে এশিয়ার সুমদ্র উপকূলবর্তী নীচু ধান উৎপাদক জমির পরিমাণ হ্রাস পাবে, বা লবণাক্ত জলের প্রকোপে মৃত্তিকার উর্বরতা



চিত্র 8.16 ঃ গ্রীণহাউস ইফেক্টের কারণ ও মন্দপ্রভাব দেখানো হয়েছে।

হ্রাস পাবে। কৃষিজমি হ্রাসের কারণে ফসল উৎপাদন হ্রাস পাবে এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে। উদাহরণ হিসেবে বাংলাদেশের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 1990 খ্রীঃ বাংলাদেশের 118 মিলিয়ন জনসংখ্যার খাদ্যাভাব ছিল চরম সংকটে এবং বর্তমানে পুনরায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপে সংকট আরোও বেড়েছে। একটি হিসাবে দেখা গেছে 2030 সাল নাগাদ

বাংলাদেশের প্রায় 17% স্থলভূমি জলমগ্ন হবে। ফলে জনসংখ্যার চাপে এক অভাবনীয় খাদ্যাভাব জনিত সংকট সৃষ্টি হবে।

ii) তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে কিছু অঞ্চল নতুনভাবে জলমগ্ন হবে এবং কিছু অঞ্চল শুকিয়ে যাবে। তার ফলে স্থানীয় জলবায়ুর পরিবর্তন দেখা দেবে। বাস্তুতন্ত্রের প্রাণপ্রবাহের উপর জলবায়ুর পরিবর্তন বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

iii) গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে কেবল মানুষ আক্রান্ত হবে না, অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। তাপমাত্রার বৃদ্ধি যদি উল্লিখিত হারে বাড়ে, তাহলে অসংখ্য জীবের প্রজাতি পৃথিবী থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হবে। স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক ডেনিস মার্ফির (Dennis Murphy) পর্যবেক্ষণজনিত সিদ্ধান্ত অনুসারে বায়ুমণ্ডলের বর্তমান গড় তাপমাত্রা 3°C বৃদ্ধি পেলে 44% স্তন্যপায়ী, 23% প্রজাপতি এবং কয়েক শতাংশ পাখি বিলুপ্ত হবে।

v) সামুদ্রিক জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং দ্রবীভূত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের মাত্রা হ্রাসের জন্য সামুদ্রিক বাস্তুতন্ত্র বিপন্ন হবে এবং অসংখ্য জলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণী প্রজাতি চিরতরে হারিয়ে যাবে।

6. **গ্রীণহাউস ইফেক্ট লঘুকরণের উপায় ঃ**

গ্লোবাল ওয়ার্মিং বন্ধ করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে তাপমাত্রার পরিবর্তন হ্রাস (বা লঘুকরণ) করা যায়। উপায়গুলি নিম্নলিখিত ঃ

i) প্রচলিত শক্তির উৎস যথা জীবাশ্ম জ্বালানির যথাসম্ভব কম ব্যবহার।
ii) অপ্রচলিত এবং নবীভবনযোগ্য শক্তির উৎস ব্যবহারের প্রবণতা বৃদ্ধি।
iii) অরণ্যের ধ্বংস হ্রাস এবং বৃক্ষরোপণ ও বনসৃজন।
iv) ফ্রেয়ন গ্যাসের (CFC) ব্যবহার ও উৎপাদন রোধ।
v) গাড়ি ও শিল্প প্রণালীতে শক্তি ব্যবহারকারী ইঞ্জিনের দক্ষতা বৃদ্ধি।
vi) জ্বালানি প্রয়োজনহীন সাইকেল, রিক্সা প্রভৃতি যানের ব্যবহার বৃদ্ধি।
vii) পৃথকভাবে ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারের প্রবণতা হ্রাস এবং বাস/ট্রাম/ট্রেনে যাতায়াত।

8.12. অ্যাসিড বৃষ্টি (Acid Rain) ঃ

i) অ্যাসিড বৃষ্টি বলতে কি বোঝায়?

বৃষ্টি, শিশির এবং তুষার যে কোন ধরনের অধঃক্ষেপণে অ্যাসিড.বা অম্লের মান স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি হলেই অধঃক্ষেপণ (Precipitation)কে **'অ্যাসিড রেন' বা 'অ্যাসিড বৃষ্টি'** বলা হয়। স্বাভাবিক বৃষ্টির জলে বায়ুর স্বাভাবিক উপাদান কার্বন-ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত অবস্থায় অর্থাৎ কার্বনিক অ্যাসিড রূপে (H_2CO_3) উপস্থিত থাকে। কার্বনিক অ্যাসিডের বিয়োজনে উৎপন্ন হাইড্রোজেন আয়নের (H^+) উপস্থিতিতে স্বাভাবিক বৃষ্টির জল ঈষৎ আম্লিক প্রকৃতির হয় ($CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$)। স্বাভাবিক

বৃষ্টির জলে pHএর সর্বনিম্ন মান হতে পারে 5.6 (pH1–6.9 হচ্ছে অ্যাসিড বিস্তার, pH=7 হচ্ছে প্রশম এবং pH7.1–14 হচ্ছে ক্ষারীয় বিস্তার)। **অধঃক্ষেপণে pHএর মান 5.6 এর কম হলেই অধঃক্ষেপণকে 'অ্যাসিড বৃষ্টি বলা হয়।** অ্যাসিড বৃষ্টির ঘটনা সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয় গ্রেট ব্রিটেনে, 1800 শতকের শেষভাগে। তারপর বেশ কিছু সময় অর্থাৎ 1960 সাল পর্যন্ত অ্যাসিড বৃষ্টির ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু 1960 সালের পরবর্তী সময়ে অ্যাসিড বৃষ্টির ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ভয়াবহ পরিবেশ-সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

ii) অ্যাসিড বৃষ্টির কারণ ঃ

অ্যাসিড বৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে মনুষ্যসৃষ্ট দূষণ ক্রিয়া। বৃষ্টির অম্লত্ব সৃষ্টি হয় বৃষ্টির জলে **'সালফিউরিক অ্যাসিড** (H_2SO_4) এবং নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3) এর উপস্থিতির ফলে। এই অ্যাসিডদ্বয় হচ্ছে প্রাইমারী বায়ুদূষক—**সালফার-ডাই-অক্সাইড** (SO_2) এবং **নাইট্রোজেন অক্সাইড** (NO_x) থেকে সৃষ্ট গৌণ বায়ু দূষক। উৎস থেকে বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত SO_2 এবং NO_x বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে বিস্তির্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। বিস্তারের সময় SO_2 এবং NO_x বায়ুর আর্দ্রতা বা জলবিন্দুর সঙ্গে বিক্রিয়ায় সালফিউরিক এবং নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। উৎপন্ন অ্যাসিড বৃষ্টির মাধ্যমে অধঃক্ষিপ্ত হয়। 60-70% অম্লবৃষ্টির জলে সালফিউরিক অ্যাসিড উপস্থিত থাকে এবং 30-40% অম্লবৃষ্টির জলে নাইট্রিক অ্যাসিড উপস্থিত থাকে।

$$2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$$
$$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$$

$$2NO_2 + O_3 \rightarrow N_2O_5 + O_2$$
$$N_2O_5 + H_2O \rightarrow 2HNO_3$$

- **সালফার-ডাই-অক্সাইডের উৎস ঃ**
  a) জীবাশ্ম জ্বালানির দহন (60–70%),
  b) সালফাইড আকরিক থেকে সালফার নিষ্কাশন,
  c) সীসা, দস্তা এবং তামা নিষ্কাশনের চুল্লী।
- **নাইট্রোজেন অক্সাইডের উৎস ঃ**
  a) যানবাহনের একঝসট্স,
  b) পাওয়ার হাউস,
  c) ধাতু নিষ্কাশনের চুল্লী ইত্যাদি।

iii) বাস্তুতন্ত্রের উপর অ্যাসিড বৃষ্টির প্রভাব ঃ

বাস্তুতন্ত্রের উপর অ্যাসিড বৃষ্টি বিরূপ প্রভাব ফেলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাস্তুতন্ত্রের একমুখী পরিবর্তন ঘটে। বাস্তুতন্ত্রের উপর অ্যাসিড বৃষ্টির প্রভাব অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

a) হ্রদ, নদী, পুকুর এবং জলপ্রপাতের অম্লকরণের ফলে জলজ প্রাণী এবং উদ্ভিদ আক্রান্ত হয়। অধিক অম্লত্বের ফলে মাছ মরে যায়, বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং খুব সম্ভবত প্রজনন ক্ষমতা হ্রাস পায়। pH হ্রাসের কারণে মাছের ডিমের হ্যাচিং (hatching) বাধাপ্রাপ্ত হয়। রোহিত (trout) এবং সালমন (salmon) জাতীয় মাছ অধিক অম্লত্বের কারণে মারা যায়।

b) জলের অধিক অম্লত্বের কারণে জলজ খাদ্য শৃঙ্খল বা জলজতন্ত্রের উপযোগী সবুজ শৈবাল এবং বিভিন্ন ধরনের ব্যাক্‌টিরিয়া মারা যায়। অধিক অম্লের উপস্থিতিতে জলাশয়ের জৈববস্তুর জীব-পচন (বায়বীয়) বা ডিকম্পোজিশান কমে যায়। এই কারণে হ্রদ, নদী, এবং অন্যান্য জলাশয়ে সঞ্চিত জৈব বস্তুর পরিমাণ বাড়ে এবং সঞ্চয়জনিত কারণে দূষণের সৃষ্টি হয়। অধিক অম্লত্বের ফলে জলাশয়ের সমগ্র বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে জলাশয়ের বন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

c) জলের অম্লত্বের ফলে ভারী ধাতু যথা—সীসা, ক্যাডমিয়াম, তামা, এবং দস্তার ঘনত্ব সহ্যসীমা (tolerable limits) অতিক্রম করে।

d) অ্যাসিড বৃষ্টির প্রভাবে বৃষ্টি-অরণ্যের (rain forests) প্রভূত ক্ষতি হয়। বৃষ্টি অরণ্যের ক্রমান্বয়িক সংকোচনের জন্য অম্লবৃষ্টি অনেকাংশেই দায়ী। অম্লবৃষ্টির প্রভাবে উদ্ভিদের পাতা বিনষ্ট হয়, পাতার উপরের ত্বক ক্ষয়ে যায় এবং গাছে কাঠের পরিমাণ হ্রাস পায়। এছাড়া বীজের অঙ্কুরোদ্‌গম বা জার্মিনেশান অম্লবৃষ্টির প্রভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়।

e) অম্লবৃষ্টির প্রভাবে মৃত্তিকাও আক্রান্ত হয়। মৃত্তিকার পুষ্টি উপাদান যথা পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং সোডিয়াম আয়ন অম্লবৃষ্টির প্রভাবে নিষ্কাশিত হয় (leaching)। এছাড়া মৃত্তিকাতে দ্রবণীয় অ্যালুমিনিয়াম এবং দস্তা প্রভৃতি বিষাক্ত ধাতুর মুক্তির ফলে মৃত্তিকা থেকে উদ্ভিদের পুষ্টি পদার্থের শোষণে বাধার সৃষ্টি হয়। অম্লবৃষ্টির ফলে কেঁচো এবং উপকারী আণুবীক্ষণিক জীব মারা যায়, ফলে মৃত্তিকা অনুর্ব্বর হয়ে পড়ে।

f) উপরিউক্ত প্রভাব ব্যতিরেকে অ্যাসিড বৃষ্টির সংস্পর্শে মানুষের ত্বক-কোষের অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে। ফলে মুখমণ্ডলের বহিরাকৃতিগত পরিবর্তন দেখা দেয়।

g) অ্যাসিড বৃষ্টির প্রভাবে বিভিন্ন ধাতু এবং অট্টালিকা নির্মাণের বস্তু যথা মার্বেল (উদাঃ ভারতের তাজমহল) ক্ষয়ে যায়।

iv) অ্যাসিড বৃষ্টি সম্পর্কীয় অধুনা সংগৃহীত তথ্য ঃ

অ্যাসিড বৃষ্টি কবলিত অঞ্চলসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে উত্তর আমেরিকার দেশসমূহ। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চল এবং কানাডার দক্ষিণ ওন্টারিও অঞ্চল অ্যাসিড অধঃক্ষেপণের মুখ্য অঞ্চল। কারণ আমেরিকার ওহিও ভ্যালির (Ohio Valley) পাওয়ার প্লান্ট থেকে নিক্ষিপ্ত সালফার-ডাই-অক্সাইড উপরিউক্ত স্থানের উপর দিয়ে মুখ্যত পরিবহন-

স্থানান্তরিত হয়। ইউরোপের কয়েকটি দেশও অ্যাসিড বৃষ্টির দ্বারা আক্রান্ত হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলে সংঘটিত অ্যাসিড বৃষ্টির pH থাকে 3.9-4.5 মাত্রার মধ্যে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, সর্বাপেক্ষা নিম্নতম pH দেখা গেছে 1974 সালে স্কটল্যাণ্ডের অ্যাসিড বৃষ্টিতে, যার pH মান ছিল 2.4।

a) অ্যাসিড বৃষ্টির প্রভাবে কানাডার বহু নদী এবং হ্রদের **ফ্লোরা** (flora) এবং **'ফণা'** (fauna) বর্তমানে বিপন্ন। উচ্চমাত্রায় অ্যাসিডের উপস্থিতিতে কানাডার প্রায় 4000 হ্রদ ইতঃপূর্বেই বন্ধ্যা (sterile) হয়ে গেছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ওহিও উপত্যকায় বর্তমান হারে দূষণ ঘটতে থাকলে এই শতকের শেষে 48000 হ্রদ নতুন করে প্রাণ হারাবে (বা ধ্বংস হবে)।

b) স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান দেশগুলিও অ্যাসিড বৃষ্টির দ্বারা আক্রান্ত। হাজারেরও বেশি হ্রদ বিগত দু-দশকে অ্যাসিডের প্রভাবে বিনষ্ট হয়েছে।

c) রিপোর্টে প্রকাশিত জার্মানির (পশ্চিম জার্মানী) 30% অরণ্য অ্যাসিড বৃষ্টির প্রকোপে ধীরে ধীরে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে চলেছে।

d) ভারতেও অ্যাসিড বৃষ্টির ঘটনা ইতঃপূর্বেই ঘটেছে। ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার (BARC) এর নিরীক্ষণমূলক রিপোর্টে প্রকাশিত যে দিল্লি, হায়দরাবাদ, ব্যাঙ্গালোর এবং নাগপুরে বৃষ্টির জলে অ্যাসিড মাত্রার কোন তারতম্য না ঘটলেও 'পুনে (Pune) এবং মুম্বাই (সাবেক বম্বে) অ্যাসিড বৃষ্টির দ্বারা আক্রান্ত। পুনেতে বৃষ্টির জলে pH এর মান ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। 1974 সালে মুম্বাই এর ট্রম্বে এবং চেম্বুর অঞ্চলে যে অ্যাসিড বৃষ্টি হয়েছিল তাতে pH এর মান ছিল যথাক্রমে 4.5 এবং 4.8। অধুনা রিপোর্টে প্রকাশিত 'মথুরা অয়েল রিফাইনারী' থেকে নির্গত সালফার-ডাই-অক্সাইড দ্রবীভূত বৃষ্টির দ্বারা তাজমহলের মার্বেল পাথর আক্রান্ত হচ্ছে।

• **অ্যাসিড বৃষ্টি প্রতিকারের উপায় ঃ**

জলাশয়ের অ্যাসিড জলের সঙ্গে চুন মিশ্রিত করে অ্যাসিডকে প্রশমিত করা যায়। কিন্তু এই পদ্ধতি একটি স্বল্পস্থায়ী উপায়। এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট ব্যবধানে বার বার চুন প্রয়োগ করতে হয়। এছাড়া বৃহৎ জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণ চুন মেশানোর প্রয়োজন হয়, যা খরচ সাপেক্ষ। স্থির এবং সচল দূষণ-উৎস থেকে সালফার-ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইডের উৎপাদন এবং নিক্ষেপ নিয়ন্ত্রিত করে বা বাধা দিয়ে অ্যাসিড বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

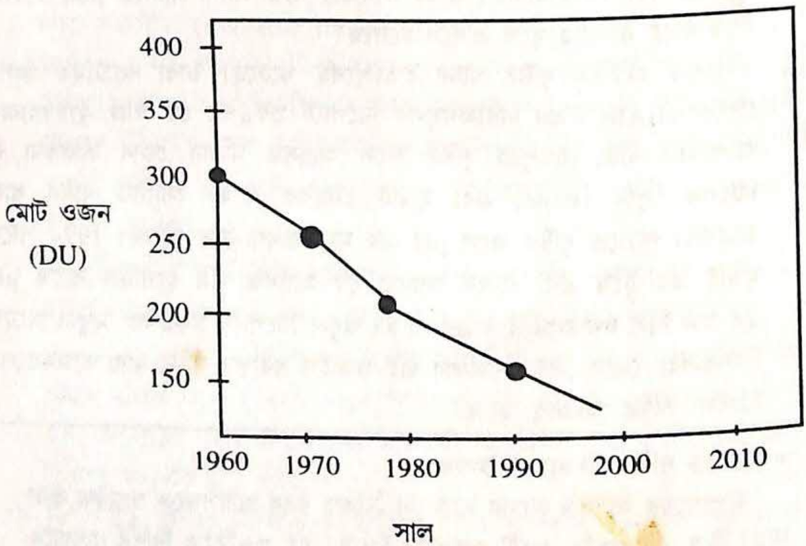
8.13. ওজোন স্তরের ক্ষয় ঃ ওজোন হোল

বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফেরিক **'ওজোন স্তর'** পৃথিবীর জীবমণ্ডলের প্রাকৃতিক সৌরপর্দা রূপে কাজ করে। সৌর-বিকিরণের প্রাণসংহারক উপাদান অতি-বেগ্নী রশ্মি (UV-B,

UV-C) ওজোন স্তর ভেদ করে জীবমণ্ডলে প্রবেশ করতে পারে না। ফলে জীবজগৎ বিপদের হাত থেকে রক্ষা পায়। তাই জীবজগতের প্রাণপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণে ওজোন স্তরের গুরুত্ব প্রশ্নাতীত। কিন্তু দূষণের ফলে ওজোন স্তর ক্রমশ পাতলা হচ্ছে। অধুনা দক্ষিণ মেরুদেশ বা অ্যান্টার্কটিকায় ক্লোরিন দূষণ জনিত **'ওজোন ছিদ্র'** বা **'ওজোন হোলের'** উৎপত্তি এক ভয়াবহ পরিবেশ সংকটের সৃষ্টি করেছে।

i) ওজোন হোল (Ozone hole) কি?

1985 খ্রীঃ ডঃ জে. সি. ফারমেন এবং তাঁর সহকর্মীরা অ্যান্টার্কটিকায় ওজোন হোল আবিষ্কার করেন (ব্রিটিশ অ্যান্টার্কটিক সার্ভে'র বিজ্ঞানী)। তাঁরা পর্যবেক্ষণ করেন যে 1970 সালের মাঝামাঝি সময় থেকে প্রতিবছর সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে (অ্যান্টার্কটিকার বসন্তকাল) অ্যান্টার্কটিকার ওজোনস্তর অতিদ্রুত পাতলা হচ্ছে। 1980 সালের অক্টোবর মাসে অ্যান্টার্কটিকার কিছু অঞ্চলে ওজোন স্তর সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়



চিত্র 8.17 ঃ অ্যান্টার্কটিকায় 'হ্যালি বে স্টেশনের' উপরে স্ট্র্যাটোস্ফেরিক ওজোন ঘনত্বের হ্রাস দেখানো হয়েছে।

(এই বিনষ্টের পরিমাণ অ্যান্টার্কটিকার মোট ওজোনের 50 শতাংশ)। প্রতিবছর সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বরের মধ্যে অ্যান্টার্কটিকার ওজোন স্তরের এই ক্ষয়কে ডঃ ফারমেন 'ওজোন হোল' নামে অভিহিত করেন। 1993 সালে অক্টোবরের প্রথমে ওজোন ঘনত্ব নেমে আসে সর্বাধিক 90 ডবসন এককে (90DU)।

ii) ওজোন হোল সৃষ্টির কারণ ঃ

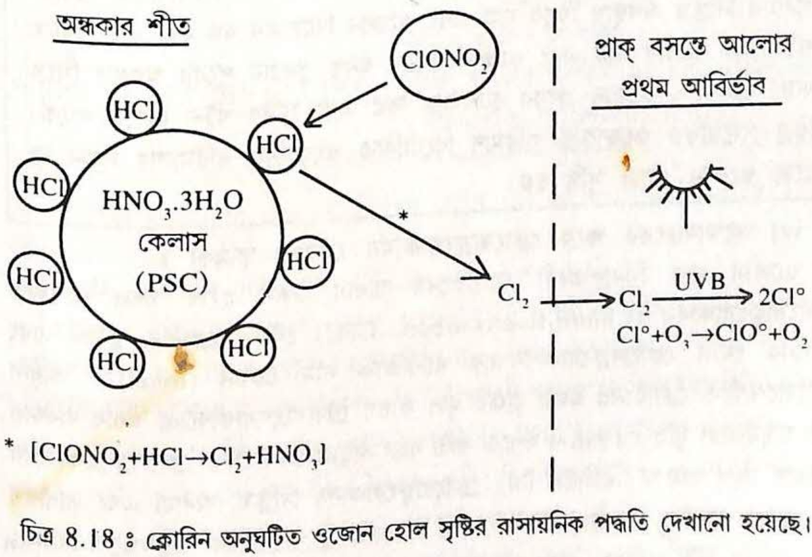
1986 সালের পূর্বে ওজোন হোল সৃষ্টির পেছনে কোন প্রাকৃতিক ঘটনা বা দূষণের ভূমিকা সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। 1986 সালে ডঃ সুসান সলোমান ওজোন হোল সৃষ্টির জন্য 'ক্লোরিন দূষণ'কে দায়ী করেন। তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, আগামী কয়েক দশকে অ্যান্টার্কটিক ওজোন হোল প্রসারিত হবে এবং ভবিষ্যতে সুমেরুদেশেও ওজোন হোল সৃষ্টি হবে।

iii) ওজোন হোল সৃষ্টির পদ্ধতি ঃ

ওজোন গ্যাসের সৃষ্টি এবং ধ্বংস একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। ওজোনের সৃষ্টি এবং ধ্বংসের মধ্যে ভারসাম্যের ফলে ওজোনের ঘনত্ব নির্দিষ্ট মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত থাকে। কিন্তু ওজোনের সৃষ্টির চেয়ে ধ্বংসের হার বেশি হলে ভারসাম্য বিঘ্নিত হয় এবং ফলস্বরূপ 'ওজোন হোল' সৃষ্টি হয়। ক্লোরিন দূষণের ফলে ওজোন হোল সৃষ্টির পদ্ধতিটি অতিসংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

a) ওজোন বিয়োজক ক্লোরিন নিম্নস্ট্র্যাটোস্ফিয়্যার স্তরে (যেখানে ওজোন স্তরের ঘনত্ব সর্বাধিক) গ্যাসীয় **ক্লোরিন নাইট্রেট** ($ClONO_2$) এবং **হাইড্রোজেন ক্লোরাইড** (HCl) রূপে নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে।

b) সূর্যের অনুপস্থিতিতে শীতকালে অ্যান্টার্কটিকায় নিম্নস্ট্র্যাটোস্ফিয়্যারে বায়ুর



চিত্র 8.18 ঃ ক্লোরিন অনুঘটিত ওজোন হোল সৃষ্টির রাসায়নিক পদ্ধতি দেখানো হয়েছে।

তাপমাত্রা –80°C এ নেমে যায়, ফলে বায়ুর চাপ অতি দ্রুত হ্রাস পায়। বায়ুর চাপ হ্রাস এবং পৃথিবীর ঘূর্ণনের জন্য অ্যান্টার্কটিকায় ভর্টেক্স (vortex) উৎপন্ন

হয়। ভর্টেক্স মধ্যস্থ বায়ুর গতিবেগ ঘণ্টায় 300 কিমির বেশি থাকে, ফলে ভর্টেক্স মধ্যস্থ বায়ু বাইরের বায়ু থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে পড়ে। ভর্টেক্সে বায়ুর তাপমাত্রা –80°C-এর কম হওয়ায় জল এবং নাইট্রিক অ্যাসিড ঘনীভূত হয়ে **'নাইট্রিক অ্যাসিডের ট্রাইহাইড্রেট'** ($HNO_3.3H_2O$) কেলাস উৎপন্ন হয়। এই কেলাস PSC বা **'পোলার স্ট্র্যাটোস্ফেরিক ক্লাউড'** (Polar Stratospheric Clouds) নামে পরিচিত।

PSC কেলাসের গায়ে গ্যাসীয় **'হাইড্রোজেন ক্লোরাইড'** এবং **'ক্লোরিন নাইট্রেট'** কেলাসের অংশরূপে সংযুক্ত থাকে। যখন হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের সঙ্গে ক্লোরিন নাইট্রেটের সংঘাত ঘটে তখন আণবিক ক্লোরিন গ্যাস উৎপন্ন হয়। শীতের অন্ধকারে এইভাবে উৎপন্ন ক্লোরিন গ্যাস নিম্ন স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যারে সঞ্চিত থাকে।

c) বসন্তের শুরুতে সূর্যকিরণের প্রথম আবির্ভাবে আণবিক ক্লোরিন অতিবেগ্নী রশ্মির দ্বারা বিয়োজিত হয়ে ক্লোরিন পরমাণু উৎপন্ন করে। ক্লোরিন পরমাণু পরবর্তী পর্যায়ে ওজোন অণুকে (O_3) অক্সিজেন অণু (O_2) এবং ক্লোরিনমনোক্সাইডে (ClO) বিয়োজিত করে। ওজোন অণুর বিনাশে ওজোন স্তর পাতলা হয় বা ওজোন স্তরে হোল বা ছিদ্রের সৃষ্টি হয়।

বসন্তের পরবর্তী পর্যায়ে ভর্টেক্স স্থির হয়ে যায়, ফলে পারমাণবিক ক্লোরিন পুনরায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ফিরে যায় এবং ওজোন বিয়োজন বন্ধ হয়। এই পর্যায়ে ওজোনের সংশ্লেষ ঘটে এবং ওজোন স্তরের ঘনত্ব পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে যায়। এইভাবে ওজোন স্তরের চক্রাকার ক্ষয় এবং সৃষ্টির ঘটনা চলতে থাকে। কিন্তু সংশ্লেষিত ওজোনের পরিমাণ বিয়োজিত ওজোনের পরিমাণের সমান না হলে ওজোন হোল সৃষ্টি হয়।

iv) ওজোনস্তরের ক্ষয়ে ক্লোরোফ্লুরোকার্বন যৌগের ভূমিকা :

ওজোন স্তর বিনাশকারী ক্লোরিনের প্রধান উৎস হচ্ছে বহুল ব্যবহৃত **'ক্লোরোফ্লুরোকার্বন** (Chloro-flourocarbon, CFC) যৌগ। ক্লোরিন, ফ্লুরিন এবং কার্বনের যৌগ ক্লোরোফ্লুরোকার্বন-এর বাণিজ্যিক নাম **ফ্রেয়ন** (freon)। অধুনা স্ট্র্যাটোস্ফেরিক ক্লোরিনের ঘনত্ব বৃদ্ধির মূল কারণ ক্লোরোফ্লুরোকার্বনের অবাধ ব্যবহার এবং বায়ুমণ্ডলে মুক্তি। 1980-র দশকে প্রতি বছর বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত ক্লোরোফ্লুরোকার্বনের পরিমাণ ছিল প্রায় 1 মিলিয়ন টন। ক্লোরোফ্লুরোকার্বন নিষ্ক্রিয়, অদাহ্য এবং সাধারণ তাপমাত্রায় গ্যাসীয় হওয়ায় উৎস থেকে সহজেই ট্রপোস্ফেরিক বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হয়। এছাড়া বৃষ্টি বা অন্য কোন প্রাকৃতিক উপায়ে এই যৌগ ট্রপোস্ফেরিক বায়ুমণ্ডল থেকে অপসারিত হয় না। ফলে দশকের পর দশক স্বাচ্ছন্দ্যে বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়াতে পারে। কালক্রমে ক্লোরোফ্লুরোকার্বন ট্রপোস্ফিয়্যার বায়ুস্তরে অতি-বেগ্নী

রশ্মির (UV) দ্বারা আলোক বিয়োজিত হয়ে ক্লোরিন উৎপন্ন করে। উৎপন্ন ক্লোরিন পরমাণু ওজোন অণুকে ভেঙে দেয়।

$$CF_2Cl_2 \xrightarrow{\text{UV-C}} CF_2Cl^\circ + Cl^\circ$$
$$Cl^\circ + O_3 \longrightarrow ClO + O_2$$

স্ট্র্যাটোস্ফেরিক বায়ুমণ্ডলে ক্লোরিনের বর্তমান ঘনত্ব 3.5ppb, যা ট্রপোস্ফেরিক বায়ুমণ্ডলের তুলনায় প্রায় ছয়গুণ বেশি (ট্রপোস্ফেরিক ক্লোরিনের ঘনত্ব 0.6ppb) এবং 1970 সালের স্ট্র্যাটোস্ফেরিক ক্লোরিন ঘনত্বের দ্বিগুন। ক্লোরিন দূষণ সৃষ্টিকারী সি. এফ সি (ক্লোরোফ্লুরোকার্বন) যৌগের অন্যতম হচ্ছে সি. এফ. সি.-12, 11 এবং 113 (এই যৌগ সমূহের রাসায়নিক সংকেত এবং ব্যবহার তালিকায় উল্লেখ করা হল)।

সি. এফ. সি.	রাসায়নিক সংকেত	ব্যবহার
সি. এফ সি.-12	CF_2Cl_2	রেফ্রিজারেটার, এয়ারকণ্ডিসনার, কঠিন প্লাসটিক ফোম, স্প্রে-ক্যান(বিভিন্ন সুগন্ধী স্প্রে-ক্যান)।
সি. এফ সি-11	CF_2Cl_3	নরম ফোম (যথা গাড়ির সিট, বালিশ, কুশান, কার্পেট)রেফ্রিজারেটার, ফ্রিজার এবং অট্টালিকা নির্মাণ এবং স্প্রে-ক্যান।
সি. এফ. সি.-113	$CF_2Cl\text{-}CFCl_2$	গ্রিজ, গ্লু, এবং বিভিন্ন ইলেকট্রিক সারকিটের সোলডার ধৌতকরণ (বা অপসারণ)

তালিকা 8.12 : সি. এফ. সি. যৌগের প্রকৃতি এবং ব্যবহার উল্লেখ করা হয়েছে।

a) **সি. এফ. সি প্রতিস্থাপন** (CFC replacements) ঃ

প্রচলিত ক্লোরোফ্লুরোকার্বন জলে অদ্রাব্য হওয়ায় বৃষ্টির মাধ্যমে বায়ুমণ্ডল থেকে অপসারিত হতে পারে না। এছাড়া হাইড্রক্সিল মূলক এবং বায়ুমণ্ডলের গ্যাসের সঙ্গেও সি. এফ. সি. বিক্রিয়া করে না এবং দৃশ্যমান বা UV রশ্মির দ্বারাও আলোক বিয়োজিত হয় না। এই কারণে সি. এফ. সি. শতাধিক বছর অপরিবর্তিত অবস্থায় বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত থাকতে পারে। তাই প্রচলিত সি. এফ. সি. যৌগকে 'কঠিন সি. এফ. সি. (hard CFC) বলা হয়। এহেন যৌগের ওজোন বিনাশ ক্রিয়ার কথা ভেবেই অপেক্ষাকৃত স্বল্পস্থায়ী, প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় অপসারণ যোগ্য এবং অপেক্ষাকৃত কম ওজোন বিনাশ ক্ষমতাসম্পন্ন এইচ সি এফ সি (HCFC) এবং এইচ এফ সি (HFC) যৌগের প্রচলন শুরু হয়েছে (1990 সালের পর)। এইচ সি এফ সি বা 'হাইড্রোক্লোরোফ্লুরোকার্বন অতিরিক্ত

হাইড্রোজেন পরমাণুযুক্ত সি এফ সি যৌগ এবং এইচ এফ সি বা 'হাইড্রোফ্লুরোকার্বন ক্লোরিন বিহীন—হাইড্রোজেন যুক্ত এফ সি যৌগ যা বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সি এফ. সি-কে প্রতিস্থাপন করতে সক্ষম। কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রতিস্থাপক যৌগের ক্লোরিন মুক্তির দ্রুততা এবং ওজোন বিনাশ ক্রিয়ার অধিক প্রাবল্য সত্ত্বেও স্বল্পস্থায়িত্ব এবং প্রাকৃতিক অপসারণ ক্রিয়ার কথা মাথায় রেখে যৌগকে সি. এফ. সি প্রতিস্থাপনে ব্যবহার করা হয় (উদা ঃ CFC-11 যৌগের প্রতিস্থাপক HCFC-22 যৌগের ওজোন বিনাশ ক্রিয়ার তীব্রতা প্রায় 15 গুণ বেশি। তালিকায় (8.13) সি. এফ. সি. যৌগ এবং তাদের বিভিন্ন প্রতিস্থাপকের নাম উল্লেখ করা হল।

সি. এফ. সি যৌগ	প্রতিস্থাপক যৌগ
CFC-11	HCFC-22 (CHF_2Cl)
	HCFC-123 ($CHCl_2$-CF_3)
CFC-12	HFC-134a (CH_2F-CF_3)

তালিকা 8.13 ঃ সি. এফ. সি এবং তাদের প্রতিস্থাপক যৌগ দেখানো হয়েছে।

•• অন্যান্য ওজোন বিনাশক যৌগ ঃ

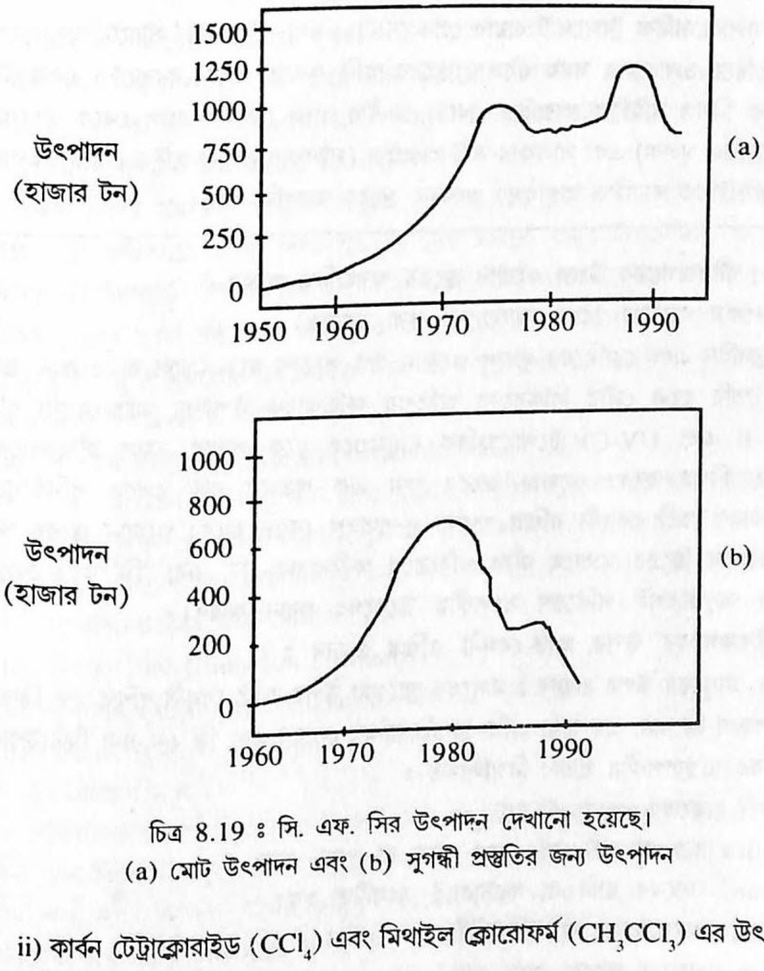
সি. এফ. সি. ব্যতিরেকে অন্যান্য কয়েকটি স্থায়ী গ্যাসীয় যৌগ ওজোন স্তর ক্ষয় করতে সক্ষম। এই যৌগগুলি **'ব্রোমিন'** যুক্ত এবং **'হ্যালোন-রাসায়নিক'** নামে পরিচিত। যথা অগ্নি নির্বাপনে ব্যবহৃত CF_3Br, CF_2BrCl এবং CH_3Br (মিথাইল ব্রোমাইড)। এই যৌগগুলি সি. এফ. সি-র মত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় বায়ুমণ্ডল থেকে অপসারিত হয় না এবং ওজোন ধ্বংসকারী ব্রোমিন নিঃসরণ করে ওজোন স্তর ক্ষয় করতে সক্ষম।

b) সি. এফ. সির ব্যবহার বা প্রয়োগ সম্পর্কীয় আন্তর্জাতিক চুক্তি ঃ

ওজোন স্তর ক্ষয়ে সি. এফ. সি. যৌগের ভূমিকার কথা মাথায় রেখেই প্রথমে উন্নত দেশসমূহ বিক্ষিপ্তভাবে সি. এফ. সি. যৌগের উৎপাদন এবং ব্যবহারের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে। 1970 খ্রীঃ উত্তর আমেরিকা এবং স্ক্যাণ্ডেনেভিয়ান দেশসমূহ সুগন্ধী অ্যারোসল উৎপাদনে সি. এফ. সি. যৌগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে। কিন্তু ওজোন স্তরের গুরুত্ব ও ব্যাপকতা এবং বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান সি. এফ. সি. ব্যবহারের প্রবণতা পর্যবেক্ষণ করে বিশ্বের সর্বত্র চুক্তি সাক্ষরিত হয়। 1987 খ্রীঃ কানাডার মন্ট্রিয়ালে এই সম্পর্কীয় যে আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় তা 'মন্ট্রিয়াল-প্রোটোকল' (Montreal Protocol) নামে পরিচিত। এরপর 1990 খ্রীঃ লণ্ডন এবং 1992 খ্রীঃ কোপেন হাগেন সম্মেলনে মন্ট্রিয়ালে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলির প্রয়োগ সুনিশ্চিত করা হয়। মন্ট্রিয়াল

সম্মেলনের গৃহীত খসড়ার সারমর্ম নিম্নলিখিত ঃ

i) 1995 সালের মধ্যে সমস্ত উন্নত দেশে সি. এফ. সি. এবং হ্যালোন উৎপাদন বন্ধ করা হবে।



চিত্র 8.19 ঃ সি. এফ. সির উৎপাদন দেখানো হয়েছে।
(a) মোট উৎপাদন এবং (b) সুগন্ধী প্রস্তুতির জন্য উৎপাদন

ii) কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4) এবং মিথাইল ক্লোরোফর্ম (CH_3CCl_3) এর উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বন্ধ করা হবে।

iii) এইচ সি এফ সি (HCFC) এবং এইচ এফ সি (HFC) প্রতিস্থাপক যৌগের ব্যবহার 2040 সালের মধ্যে বন্ধ করা হবে।

উপরিউক্ত চুক্তি সঠিকভাবে কার্যকর হলে স্ট্র্যাটোস্ফেরিক ক্লোরিন (1991 সালের পরিসংখ্যানে 3.4ppb) 4-5ppb এ পৌঁছাবে এবং 1995-2005 সাল পর্যন্ত এই ঘনত্বের কোন পরিবর্তন হবে না, এবং 2005 সালের পরে স্ট্র্যাটোস্ফেরিক ক্লোরিনের ঘনত্ব

অতিদ্রুত হ্রাস পাবে। কিন্তু অ্যান্টার্কটিকায় 'ওজোন হোল' নিয়মিত চলতে থাকবে 2075 সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ ক্লোরিনের ঘনত্ব 2ppb-এ নেমে না আসা পর্যন্ত।

> • **কংকর্ড (Concorde) ওজোন স্তর ক্ষয় করতে সক্ষম ঃ**
>
> সুপারসোনিক ট্রান্সপোর্ট এয়ার প্লেন (SSTs) যথা—**'কংকর্ড'** স্ট্র্যাটোস্ফিয়্যারের মধ্য দিয়ে চলাচলের সময় ওজোন স্তরের ক্ষতি করতে পারে। কংকর্ডের একঝসট্ থেকে নির্গত নাইট্রিক অক্সাইড (NO), জলীয় বাষ্প (জলীয় বাষ্প থেকে উৎপন্ন হাইড্রক্সিল মূলক) এবং সালফার-ডাই-অক্সাইড (সালফার-ডাই-অক্সাইড থেকে উৎপন্ন সালফিউরিক অ্যাসিড অণুবিন্দু) ওজোন স্তরের ক্ষয়বৃদ্ধি করে।

v) জীবজগতের উপর ওজোন স্তরের ক্ষয়জনিত প্রভাব :

(পঞ্চম অধ্যায়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে)

ক্লোরিন এবং ব্রোমিনের দূষণে ওজোন স্তর পাতলা হয়ে গেলে বা ওজোন স্তরে ছিদ্র তৈরি হলে সৌর বিকিরণের অতিশয় ক্ষতিকারক উপাদান অতি-বেগ্‌নী রশ্মি (UV-B এবং UV-C) ট্রপোস্ফেরিক বায়ুমণ্ডলে ঢুকে পড়বে, ফলে জীবজগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। ওজোন স্তরের ক্ষয় এক শতাংশ বৃদ্ধি পেলে পৃথিবীপৃষ্ঠে ক্ষতিকারক অতি-বেগ্‌নী রশ্মির প্রাবল্য দু-শতাংশ বেড়ে যাবে। ওজোন স্তরের ক্ষয় বা ওজোন ছিদ্রের মাধ্যমে জীব পরিবেশে ক্ষতিকারক 'বি' এবং 'সি' অতি-বেগ্‌নী রশ্মির অনুপ্রবেশই পরিবেশ সম্পর্কীয় উদ্বেগের প্রধান কারণ।

• **জীবজগতের উপর অতি-বেগ্‌নী রশ্মির প্রভাব ঃ**

1. মানুষের উপর প্রভাব ঃ মানুষের স্বাস্থ্যের উপর অতি-বেগ্‌নী রশ্মির মন্দ ক্রিয়ার মূল কারণ ডি এন. এর দ্বারা অতি-বেগ্‌নী রশ্মির শোষণ এবং ডি এন এ-র মিউটেশান। মানুষের স্বাস্থ্যস্পর্কীয় প্রভাব নিম্নলিখিত ঃ

i. ত্বকের ক্যানসার ঘটে।
ii. ত্বক তামাটে বর্ণ ধারণ করে বা পুড়ে যায়।
iii. চোখের ছানি বা ক্যাটার‍্যাক্ট সংঘটিত হয়।
iv. অনাক্রম্যতা বা ইমিউনিটি হ্রাস পায়।
v. প্রজনন ক্ষমতা কমে যায়।

2. প্রাণীর উপর প্রভাব ঃ

i. বৃদ্ধি ও বংশবিস্তার ব্যাহত হয়।
ii. অনাক্রম্যতা কমে যায়।

3. উদ্ভিদের উপর প্রভাব ঃ

i. উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ ব্যাহত হয়।

ii. উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়।

iii. ফাইটোপ্লাঙ্কটনের বিনাশ ঘটে। ফলে জলজ বাস্তুতন্ত্রের গতিশীলতা বিঘ্নিত হয়।

8.14. বায়ুর উৎকর্ষ মান (Air Quality Standards) ঃ

আমাদের পরিবেষ্টক বায়ুতে দূষকের উপস্থিতি এবং ঘনত্বের মানের উপর বায়ুর উৎকর্ষ মান নির্ভর করে। তাই উৎকর্ষমান নির্ণয়ে পরিবেষ্টক বায়ুর (ambient air) পরিমাপ, পরীক্ষা এবং বায়ুদূষণের প্রভাব অনুশীলন একান্ত প্রয়োজন।

i) বায়ুর উৎকর্ষ মান বলতে কি বোঝায়?

কোন নির্দিষ্ট সময়ে পরিবেষ্টক বায়ুতে উপস্থিত বায়ুদূষকের যে পরিমাণে মানুষের স্বাস্থ্য এবং বাস্তুতন্ত্রের কোন ক্ষতি হয় না সেই মানকে বায়ুর উৎকর্ষমান বা **'এয়ার কোয়ালিটি স্ট্যাণ্ডার্ড'** বলা হয়। এটি দূষকের একটি আইনসম্মত বা বৈধ পরিমাপ সীমা। বিভিন্ন দেশের প্রকট শর্ত, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং স্বাস্থ্য-সমস্যার অসমতার কারণে পরিবেষ্টক বায়ুতে দূষকের অনুমোদিত সীমা বা বায়ুর উৎকর্ষ মান ভিন্ন। বায়ুর উৎকর্ষ মান বিভিন্ন প্রকার হতে পারে—

a) **ন্যূনতম সীমা মান** (Threshold Limit Value, TLV)

প্রতিদিন আটঘণ্টা এবং প্রতি সপ্তাহে পাঁচদিন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের কাজ করার জন্য বৈধ-প্রকট মাত্রাকে ন্যূনতম সীমা মান (TLV) বলা হয়। অপরপক্ষে বায়ুর উৎকর্ষ মান হল অজীব এবং সজীব বস্তুর দিনে 24 ঘণ্টা এবং সপ্তাহে সাতদিনের বৈধ প্রকট মাত্রা।

b) নিক্ষেপ মান (Emission standards)

c) দৃশ্যমান (Visibility Standards) এবং

d) গন্ধমান (Odour Standards) ইত্যাদি।

ii) নিক্ষেপ মান ঃ

বিভিন্ন সচল এবং স্থির দূষক উৎস থেকে বায়ুতে নিক্ষিপ্ত দূষকের মাত্রা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থান বিশেষে অনুমোদন-যোগ্য নিক্ষেপ সীমা রয়েছে ; এই সীমামানকে 'নিক্ষেপ মান' বলা হয়। নিক্ষেপ মানের অধিক পরিমাণ কোন দূষক বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হলে মানুষের স্বাস্থ্য তথা বাস্তুতন্ত্রের উপর মন্দ প্রভাব সৃষ্টি হয়। সচল উৎস যথা বায়ুযান, মোটর ভেহিকল (অটোমোবাইল, ট্রাক, বাস, মোটর সাইকেল প্রভৃতি) এবং রেলরোড লোকোমোটিভ এবং স্থির উৎস যথা—কলকারখানার চিমনি এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট থেকে দূষক বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হয়।

iii) ভারতে বায়ুর উৎকর্ষমান (Air Quality Standards of India) ঃ

প্রধানত চারটি দূষকের ক্ষেত্রে বায়ুর উৎকর্ষমান নির্ধারিত হয়। এই চারটি দূষক হচ্ছে সালফার-ডাই-অক্সাইড (SO_2), নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO_x), কার্বনমনোক্সাইড (CO)

এবং সাসপেনডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার (SPM)। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এই চারটি দূষকের উৎকর্ষমান ভিন্ন (নীচের তালিকায় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বায়ুদূষকের উৎকর্ষমান দেওয়া হয়েছে।)

বিভাগ	অঞ্চল	ঘনত্ব (মাইক্রোগ্রাম/m3)			
		SO_2	NO_x	CO	SPM
A.	শিল্পাঞ্চল	120	120	5000	500
B.	বসতি এবং গ্রামাঞ্চল	80	80	2000	200
C.	স্পর্শকাতর অঞ্চল	30	30	1000	100

তালিকা 8.14 ঃ ভারতের আঞ্চলিক বায়ুর উৎকর্ষমান দেখানো হয়েছে।
(উৎস ঃ Air Pollution : M N Rao and HVN Rao)

iv) ভারতের বিভিন্ন শহরের বায়ুর উৎকর্ষমান ঃ

1981 সালে NEERI (National Environmental Engineering Research Institute) এবং বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) যৌথ প্রয়াসে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ নগরে বায়ুর শুদ্ধতা পরীক্ষা করা হয়। এস. পি. এম্., সালফারডাই অক্সাইড, সালফেশান রেট (SR) এবং ডাস্টফল্ (DF) পরিমাপের ফল থেকে জানা যায় অধিকাংশ শহর / নগরের বায়ু কম বা বেশি দূষিত। বিভিন্ন শহরের চরিত্র নিম্নলিখিত ঃ

নগর	SPM	SO_2	সালফেশান হার ($SO_3/100cm^2$/দিন)	ডাস্টফল (MT/km^2/মাস)
দিল্লি	433	31	0.20	31
কলকাতা	522	90	0.45	34
মুম্বাই	184	38	0.45	11
চেন্নাই	155	8	0.33	-
নাগপুর	199	12	0.22	34
হায়দ্রাবাদ	143	30	–	–
জয়পুর	308	6	0.18	19

তালিকা 8.15 ঃ 1981 সালে ভারতের বিভিন্ন নগরে বায়ুর উৎকর্ষের বাৎসরিক সারাংশ দেখানো হয়েছে। (উৎস : Air Pollution ; M N Rao & HVN Rao)

দিল্লি ঃ বাণিজ্য অঞ্চলের দূষণমাত্রা পার্শ্ববর্তী অবাণিজ্য অঞ্চলের দূষণমাত্রার তুলনায় অনেক বেশি। বছরের অধিকাংশ সময় এস. পি. এম-এর মান অধিকমাত্রায় বজায় থাকে।

কলকাতা ঃ কলকাতার বায়ু ধুলিপূর্ণ (dusty)।

মুম্বাই (সাবেক বম্বে) ঃ বছরের বেশিরভাগ সময় সক্রিয় দূষকের উপস্থিতি বজায় থাকে।

মাদ্রাজ ঃ ব্যস্ত অঞ্চলগুলি অধিক মাত্রায় দূষিত।

নাগপুর ঃ পরিবেষ্টক বায়ুর উৎকর্ষ সন্তোষ জনক।

হায়দ্রাবাদ ঃ ধুলিকণা জনিত দূষণের সমস্যা রয়েছে।

জয়পুর ঃ প্রাকৃতিক ধুলিকণার উপস্থিতির ফলে SPM খুবই বেশি।

8.15. স্বাভাবিক বৃত্তিমূলক (বা পেশাগত) রোগ (Occupational Diseases) ঃ

i) বৃত্তিমূলক রোগ বলতে কি বোঝায়?

শিল্প কারখানায় বৃত্তিমূলক কাজে নিয়োজিত কর্মী (শ্রমজীবী মানুষ) বায়ুদূষণ জনিত কারণে বিভিন্ন ক্ষতিকারক অজৈব বা জৈব রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ শ্রমজীবী মানুষের বিভিন্ন শারীরবৃত্তিয় অস্বাভাবিকতা বা রোগ সৃষ্টি করে। বিষাক্ত রাসায়নিকের বৃত্তিমূলক প্রকটে শ্রমজীবী মানুষে সৃষ্ট মন্দ প্রভাব বা রোগ কে **'বৃত্তিমূলক রোগ'** (occupational diseases) বলা হয়।

ii) বৃত্তিমূলক প্রকট ঃ

শ্রমজীবী মানুষ প্রধানত তিন উপায়ে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থের সান্নিধ্যে প্রকট হয়।

a) স্পর্শজনিত প্রকট ঃ এক্ষেত্রে রাসায়নিক পদার্থ শ্রমজীবী মানুষের দেহের উন্মুক্ত স্থানে ত্বকের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে, যথা মুখমণ্ডল, চোখ, কান, হাত এবং পায়ের ত্বক রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা আক্রান্ত হয়। উদাহরণ ঃ **ডার্মাটাইটিস** (dermatitis) একটি স্পর্শজনিত বৃত্তিমূলক রোগ।

b) শ্বসনজনিত প্রকট ঃ বিভিন্ন বস্তুর কণা (ডাস্ট) এবং গ্যাসীয় বায়ুদূষক শ্বসনক্রিয়ার মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে শ্বাসনালী, এবং ফুসফুসজনিত রোগ সৃষ্টি হয়। উদাহরণ ঃ 'নিউমোকোনিওসিস' (pneumoconiosis)।

c) গ্রহণজনিত প্রকট ঃ খাদ্য এবং পানীয় বস্তু বিষাক্ত পদার্থের দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। এক্ষেত্রে খাদ্য এবং পানীয়ের মাধ্যমে রাসায়নিক পদার্থ শ্রমজীবী মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। উদাহরণ— সীসা, পারদ, আর্সেনিক, দস্তা, ক্রোমিয়াম, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি।

iii) ধুলিকণাজনিত বৃত্তিমূলক রোগ ঃ

শ্বাসক্রিয়ার মাধ্যমে বিষাক্ত রাসায়নিক বস্তুকণা বা ধুলিকণার (গড় ব্যাস 0.1–150μ) ফুসফুসে প্রবেশই শ্রমজীবী মানুষের বৃত্তিমূলক রোগের প্রধান কারণ। যেসব রাসায়নিক বস্তুকণার ব্যাস 3μ-এর কম, তারা সহজেই শ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে প্রবেশ

করে এবং 'নিউমোকোনিওসিস' (pneumoconiosis) শ্রেণীর রোগ সৃষ্টি করে। নিউমোকোনিওসিস একটি ফুসফুসঘটিত রোগ। এই রোগে ফাইব্রোসিস (fibrosis) এবং অন্যান্য সহযোগী জটিল অস্বাভাবিকতার কারণে মানুষের কার্যক্ষমতা হ্রাস পায় এবং মানুষ ক্রমশ অক্ষম হয়ে পড়ে। তালিকায় (8.16) ধূলিকণাজনিত বিভিন্ন বৃত্তিমূলক রোগ দেওয়া হল।

বস্তু	বৃত্তিমূলক রোগ
অ্যাজবেস্টস	অ্যাজবেস্টৌসিস
সিলিকা	সিলিকোসিস
টোব্যাকো	টোব্যাকোসিস
কোলডাস্ট	অ্যানথ্রাকোসিস
আয়রণ	সিডারোসিস
কটন ডাস্ট	বিসনোসিস
সুগার কেন ডাস্ট	ব্যাগাসোসিস

তালিকা 8.16 ঃ ধূলিকণাজনিত বিভিন্ন বৃত্তিমূলক রোগের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

a) অ্যাজবেস্টৌসিস ঃ সপ্তম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে।

b) সিলিকোসিস (Silicosis) ঃ মুক্ত সিলিকা বা সিলিকন-ডাই-অক্সাইডের (SiO_2) ধূলিকণা শ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে প্রবেশ করার ফলে 'সিলিকোসিস' সৃষ্টি হয়। খনি শিল্প (যথা-কয়লা, অভ্র, সোনা, রূপা, সীসা, দস্তা, ম্যাঙ্গানীজ ইত্যাদি), পটারী শিল্প, সিরামিক্স শিল্প, অট্টালিকা ও অন্যান্য নির্মাণকার্য এবং বালি—চুল্লীর কাজে নিযুক্ত শ্রমজীবী মানুষ সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত হয় (1952 খ্রীঃ খনি আইন এবং 1948 খ্রীঃ কারখানা আইনে সিলিকোসিস একটি জ্ঞাপনীয় [ঘোষিত] পেশাগত রোগ)।

● সিলিকোসিস সংক্রমণে সাহায্যকারী শর্ত ঃ নিম্নলিখিত কয়েকটি শর্ত সিলিকোসিস সংক্রমণকে প্রভাবিত করে।

I. ধূলিকণার রাসায়নিক উপাদান ঃ ধূলিকণায় মুক্ত সিলিকার ঘনত্ব বেশি হলে বিষক্রিয়ার তীব্রতা বাড়ে।

II. কণার আয়তন ঃ কণার আয়তন 0.5-0.3μ-এর মধ্যে থাকলে সংক্রমণের সম্ভাবনা বহুগুণ বাড়ে কারণ, এই বিস্তারের মধ্যবর্তী যে কোন কণা প্রশ্বাসের সঙ্গে সহজেই ফুসফুসে প্রবেশ করে।

III. প্রকট কাল ঃ প্রকটকাল বেশি হলে সিলিকোসিসে সংক্রমণের সম্ভাবনা বহুগুণ

বাড়ে। উপরিউক্ত শর্তের উপর নির্ভর করে কয়েকমাস থেকে ছয়বছর প্রকটকালের মধ্যে সিলিকোসিস রোগের সংক্রমণ ঘটতে পারে।

এবং

IV. মানুষের সংবেদনশীলতা ঃ শ্রমজীবী মানুষের স্বাস্থ্য এবং অনাক্রম্যতার উপর সিলিকোসিস সংক্রমণের সংবেদনশীলতা নির্ভর করে। সংবেদনশীলতা বেশি হলে সংক্রমণের সম্ভাবনা বহুগুণ বাড়ে।

● ● **সিলিকোসিসের উপসর্গ ঃ** সিলিকোসিসে আক্রান্ত মানুষের নিম্নলিখিত উপসর্গ দেখা যায় ঃ

i) দীর্ঘ স্থায়ী কাশি (Chronic Cough)
ii) বুকে যন্ত্রণা (Chest Pain)
iii) বিশেষ ক্ষেত্রে **'সিলিকোটিউবারকিউলোসিস'**।

8.16. বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ (Control of Air Pollution) ঃ

বায়ুদূষণ নিম্নলিখিত তিনটি উপায়ের যৌথ প্রয়াসে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে ঃ

1. প্রাযুক্তিক উপায় (Technological means)
2. আইনসম্মত উপায় (Legal means) এবং
3. স্বকীয় বা ব্যক্তিগত উপায় (Personal means)

8.16.1 প্রাযুক্তিক উপায়ে বায়ুর দূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ

● **উদ্দেশ্য ঃ** প্রাযুক্তিক বা প্রায়োগিক উপায়ের প্রধান উদ্দেশ্য উৎস থেকে বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত বায়ু দূষকের (প্রধানত গ্যাসীয় এবং পার্টিকুলেট) পরিমাণ হ্রাস এবং অজীব ও সজীব সম্পদের উপর বায়ু দূষণের মন্দ-প্রভাব নিয়ন্ত্রণ বা হ্রাস।

● **প্রাযুক্তিক পদ্ধতি ঃ** প্রাযুক্তিক উপায় অবলম্বন করে তিনটি পদ্ধতিতে বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত বায়ুদূষকের পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব।

i) উৎস থেকে বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বে ক্ষতিকারক গ্যাস এবং বস্তুর (বস্তুকণা বা পার্টিকুলেট) শোষণ।

ii) ক্ষতিকারক গ্যাস এবং বস্তুকে অক্ষতিকারক গ্যাস এবং বস্তুতে রূপান্তর।

iii) নিক্ষিপ্ত দূষকের লঘুকরণ (উদাহরণ ঃ যথাসম্ভব দীর্ঘ চিমনী ব্যবহার করে ধোঁয়া ও দূষককে অপেক্ষাকৃত উপরের মুক্ত বায়ুর সঙ্গে মিশ্রণ ঘটানো হয়। এক্ষেত্রে দূষকের লঘুকরণ সহজতর হয়)।

প্রাযুক্তিক উপায় ঃ বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রধানত দুটি প্রায়োগিক উপায় অবলম্বন করা হয়।

A. নিয়ন্ত্রণ সজ্জার ব্যবহার, এবং

B. পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ।

A. নিয়ন্ত্রণ-সজ্জার ব্যবহার (Use of Control Equipment) ঃ

দূষণের উৎসস্থানে নিয়ন্ত্রণ সজ্জার ব্যবহারের মাধ্যমে দূষক বস্তু (পার্টিকুলেট বা কণাকার) এবং দূষক গ্যাসের বায়ুমণ্ডলে নিক্ষেপন হ্রাস করা হয়। এইক্ষেত্রে প্রায়োগিক উপায়ে পার্টিকুলেট (এরোসল) এবং ক্ষতিকারক গ্যাস উৎস থেকে নির্গমনের পূর্বে শোষিত হয়।

a) স্থির দূষণ উৎসস্থানে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ স্থির দূষণ উৎস থেকে নির্গত বায়ুদূষক নিয়ন্ত্রণে নিম্নলিখিত নিয়ন্ত্রণ সজ্জা ব্যবহার করা হয়।

i) ফিল্টার (Filters) ঃ ইলেকট্রিক পাওয়ার প্লান্টে ফিল্টার বা ছাঁকনি ব্যবহার করা হয়। পাওয়ার প্লান্টে চিমনির ধোঁয়ার মাধ্যমে নির্গত পার্টিকুলেট বা কণাবস্তু ফিল্টারের দ্বারা পৃথকিকৃত হয়। এইক্ষেত্রে ধোঁয়াকে পর্যায়ক্রমিক কাপড়ের থলির মধ্য দিয়ে চালনা করানো হয়, ফলে কণাবস্তু থলি-ছাঁকনি দ্বারা পৃথকিকৃত হয়। ফিল্টার বা ছাঁকনি দ্বারা কণাবস্তু দূরীভূত হলেও কোন দূষক গ্যাস দূরীভূত হয় না।

ii) সাইক্লোন (Cyclones) ঃ ছোট শিল্প / কারখানায় কণাবস্তুর নিয়ন্ত্রণে সাইক্লোন ব্যবহার করা হয়। সাইক্লোনে কণাবস্তু সমন্বিত বায়ুকে ধাতব চোঙের মধ্যদিয়ে চালনা করানো হয়। চোঙ অতিক্রম করার সময় চোঙের প্রাচীরের সঙ্গে কণাবস্তুর ধাক্কা লাগে, ফলে কণাবস্তু সাইক্লোনের নীচে অধঃক্ষিপ্ত হয়। অধঃক্ষিপ্ত কণাবস্তু শেষ পর্যায়ে সাইক্লোন থেকে অপসারিত হয়। সাইক্লোনের সাহায্যে বৃহৎ আয়তনের কণাবস্তু 60-90% এবং খুব কম পরিমাণে ক্ষুদ্রতম কণাবস্তু অপসারিত হয়। কিন্তু ছাঁকনির অনুরূপ সাইক্লোনের সাহায্যে কোন গ্যাসীয় দূষক দূরীভূত হয় না।

iii) ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর (Electrostatic Precipitator) ঃ কণাবস্তুর অপসারণে এই নিয়ন্ত্রণ সজ্জা প্রায় 99% কার্যকরী। বিভিন্ন উন্নত দেশে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে 'ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রেসিপিটেটর' ব্যবহার করা হয়। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কণাবস্তু যুক্ত বায়ু প্রথমে তড়িৎ ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, ফলে কণাবস্তু তড়িৎ আধানগ্রস্ত হয়। এই তড়িৎ আধানযুক্ত কণাবস্তু পরবর্তী পর্যায়ে বিপরীত তড়িৎ আধান সম্পন্ন অধঃক্ষেপক প্রাচীরে আকৃষ্ট হয়। এবং পরিষ্কার গ্যাস অধঃক্ষেপকের বিপরীত প্রান্ত দিয়ে নির্গত হয়। প্রাচীর গাত্র থেকে কণাবস্তুর অধঃক্ষেপণের জন্য একান্তর ভাবে যন্ত্রের বিদ্যুৎ সরবরাহ ছিন্ন করা হয়।

iv) স্ক্রাবার (Scrubber) ঃ এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কণাবস্তু এবং গ্যাস উভয়ই (যথা সালফারডাই অক্সাইড (SO_2) দূরীভূত হয়। স্ক্রাবারে রক্ষিত জল এবং কলিচুনের মধ্য দিয়ে দূষক সমৃদ্ধ বায়ু চালনা করার সময় কণাবস্তু (99%) এবং সালফারডাইঅক্সাইড গ্যাস (প্রায় 80-95%) শোষিত হয়। ফলে দূষিত বায়ু পরিশ্রুত বায়ুরূপে নির্গত হয়।

উপরিউক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সাহায্যে চিমনি নিঃসৃত বায়ুতে দূষকের পরিমাণ হ্রাস পেলেও 'নিয়ন্ত্রণ-সজ্জা' সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থের অসতর্ক পুনর্বাসনে স্থলের এবং

জলের দূষণ ঘটতে পারে। কারণ বর্জ্য পদার্থে বিভিন্ন প্রকার ক্ষতিকারক মৌল এবং অজৈব বস্তু উপস্থিত থাকে। যেমন স্ক্রাবার নিঃসৃত বর্জ্য পদার্থে অতি-বিষাক্ত সালফার যৌগ উপস্থিত থাকে। সেইহেতু নিয়ন্ত্রণ সজ্জা নিঃসৃত বর্জ্য পদার্থের যথাযথ পুনর্বাসন অত্যাবশ্যক।

b) সচল দূষণ উৎসস্থানে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ

যানবাহন যথা কার, বাস, ট্রাক প্রভৃতি বায়ুদূষণের প্রধান সচল উৎস। ইঞ্জিন নকশা পরিবর্তনের মাধ্যমে সচল উৎস থেকে দূষক নিক্ষেপণ হ্রাস করা যায়। কিন্তু আধুনিক ইঞ্জিনের কোন নকশাই কার্বনমনোক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং হাইড্রোকার্বন-এর নিক্ষেপণকে স্বীকৃত মানে হ্রাস করতে পারে না। সেই হেতু দূষক নিক্ষেপণ হ্রাস করার জন্য একঝসট ব্যবস্থার সঙ্গে **'ক্যাটালাইটিক কনভার্টার'** (Catalytic Converter) ব্যবহার করা হয়।

• ক্যাটালাইটিক কনভার্টার ঃ

অটোমোবাইল ইঞ্জিনের একঝসট্ ব্যবস্থার সঙ্গে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার সংযুক্ত থাকে। একঝসট্ গ্যাসকে কনভার্টারের মধ্য দিয়ে চালনা করলে কার্বনমনোক্সাইড এবং হাইড্রোকার্বন যথাক্রমে জল এবং কার্বনডাইঅক্সাইডে পরিবর্তিত হয়। বিশেষ প্রায়োগিক ক্যাটালাইটিক কনভার্টার (সুইডিশ) নাইট্রোজেন অক্সাইডের নিক্ষেপণকে স্বীকৃত মানে হ্রাস করতে পারে।

গ্যাসীয় দূষক	স্ক্রাবারে ব্যবহৃত শোষক দ্রবণ
SO_2	অ্যামোনিয়াম সালফাইট, ডাইমিথাইল অ্যানিলিন, কলিচুন, ক্যালসিয়াম সালফেট এবং সালফাইট, সোডিয়াম সালফাইট, ক্ষারীয় জল ইত্যাদি।
H_2S	সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড এবং ফেনল মিশ্রণ (3:2), অ্যামোনিয়াম লিকার, ইথানোল্যা-মাইন, ট্রাইপটাশিয়াম ফসফেট প্রভৃতি।
HF	সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড, জল
NO_x	জল, নাইট্রিক অ্যাসিড (অ্যাকুয়াস)

তালিকা 8.17 ঃ স্ক্রাবারে ব্যবহৃত দূষক—গ্যাস শোষকের (absorbent) নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

গ্যাসীয় দূষক	স্ক্রাবারে ব্যবহৃত কঠিন বিশোষক
SO_2	চূর্ণীকৃত কলিচুন বা ডলোমাইট, ক্ষারীয় অ্যালুমিনা
H_2S	ফেরাস অক্সাইড
NO_x	সিলিকা জেল
HF	কলিচুন, সোডিয়াম ফ্লুরাইড পেলেট

তালিকা 8.18 ঃ স্ক্রাবারে ব্যবহৃত কঠিন গ্যাস বিশোষকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

B. **পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ ঃ** নিম্নলিখিত চারটি 'পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ' উপায়ে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় :

i) প্রণালীর পরিবর্তন,
ii) প্রতিকল্প বা বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার,
iii) নিয়ন্ত্রণ সজ্জার পরিবর্তন বা স্থানান্তর এবং
iv) ক্রিয়াপ্রণালীর পরিবর্তন।

i) **প্রণালীর পরিবর্তন ঃ**

অধুনা আবিষ্কৃত উন্নত প্রায়োগিক উপায়ে কয়লার দহন থেকে প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় অধিক পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা এবং সঙ্গে সঙ্গে বায়ুদূষণের মাত্রা হ্রাস করা সম্ভব। কয়লা দহনের এরূপ একটি আধুনিক প্রণালীর নাম - **ম্যাগনেটোহাইড্রোডিনামিকস্** (Magneto hydrodynamics, MHD)। MHD পদ্ধতি কয়লার দহনে প্রায় 60% উপযোগী, কিন্তু প্রচলিত পাওয়ার প্লান্ট 30-40% উপযোগী। এছাড়া MHD পদ্ধতিতে কয়লার 95% সালফার অশুদ্ধি অপসারিত হয়, ফলে সালফারডাই অক্সাইডের উৎপাদন হ্রাস পায়। এই পদ্ধতিতে প্রচলিত পদ্ধতির তুলনায় নাইট্রোজেন অক্সাইড এবং কণাবস্তুর উৎপাদন অনেক কম হয়। ফলে সামগ্রিক ভাবে বায়ুদূষণের মাত্রা MHD পদ্ধতিতে অনেক কম থাকে।

• **MHD-প্রণালীর নীতি ঃ** এই পদ্ধতিতে প্রথমে কয়লাকে চূর্ণ করা হয় এবং চূর্ণীকৃত কয়লার সঙ্গে পটাশিয়াম কার্বনেট বা সিজিয়াম মিশ্রিত করা হয় (পটাশিয়াম কার্বনেট বা সিজিয়াম সহজেই আয়নিত হয়)। এই মিশ্রণ যখন উচ্চ তাপমাত্রায় দগ্ধ হয়, তখন **উত্তপ্ত আয়নিত গ্যাস (প্লাজমা) উৎপন্ন হয়।** এই উত্তপ্ত আয়নিত গ্যাস বা '**ইলেকট্রন যুক্ত প্লাজমাকে** চৌম্বক ক্ষেত্রে চালনা করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। এছাড়া গ্যাসীয় উত্তাপের সাহায্যে স্টীম উৎপাদন করে এবং স্টীমের সাহায্যে জেনারেটার ঘুরিয়েও বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব।

ii) **প্রতিকল্প বা বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার ঃ**

• **প্রতিকল্প জ্বালানি** (Substituted fuel) ঃ উদাহরণ হিসেবে কয়লার প্রতিকল্প জ্বালানির

কথা উল্লেখ করা যায়। কয়লায় উদ্বায়ী এবং সালফার সংযুতির উপর ধোঁয়া, ভূসা বা ঝুল (soot) এবং সালফার-ডাই-অক্সাইডের উৎপাদন নির্ভর করে। তাই উদ্বায়ী উপাদান এবং সালফারযুক্ত কয়লার পরিবর্তে অপেক্ষকৃত কম উদ্বায়ী উপাদান এবং সালফার যুক্ত কয়লা ব্যবহার করলে ধোঁয়া, ভূসা এবং সালফার-ডাই-অক্সাইডের নিক্ষেপণ কমে যায়।

- **বিকল্প জ্বালানি** (Alternative fuels) **ঃ** প্রচলিত জ্বালানি যথা—কয়লা, প্রাকৃতিক তেল এবং গ্যাসের ব্যবহার হ্রাস করে উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে অপ্রচলিত শক্তির (যথা—বায়ুশক্তি, সৌরশক্তি) ব্যবহার বৃদ্ধি করে বায়ুদূষণ হ্রাস করা সম্ভব।

iii) **নিয়ন্ত্রণ সজ্জার পরিবর্তন বা স্থানান্তর ঃ**

স্ক্রাবার, প্রেসিপিটেটর, সাইক্লোন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ সজ্জার এক বা একাধিক উপাংশের পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ প্রণালীতে নিয়ন্ত্রণ সজ্জার স্থানান্তর ঘটিয়ে বায়ুদূষণ হ্রাস-প্রযুক্তির গুণমান বৃদ্ধি করা সম্ভব।

iv) **ক্রিয়াপ্রণালীর পরিবর্তন ঃ** উদাহরণ হিসেবে থার্মাল পাওয়ার প্লান্টের প্রণালী উল্লেখ করা যায়। অপেক্ষাকৃত মন্দ জলবায়ুগত অবস্থায় এবং কম সালফার সংযুতি সম্পন্ন কয়লা ব্যবহার করে বায়ুমণ্ডলে সালফার-ডাইক্সাইডের নিক্ষেপণকে হ্রাস করা সম্ভব।

8.16.2. আইনসম্মত উপায়ে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ

শুধুমাত্র প্রায়োগিক উপায়ে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। প্রায়োগিক উপায় অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে আইন প্রয়োগ করা প্রয়োজন। 1974 খ্রীঃ এর পূর্বে পরিবেশ প্রতিরোধ সম্পর্কীয় বৈধ শিল্প—বিধিনিষেধ ছিল খুবই নগণ্য। কিন্তু শিল্পের অপরিকল্পিত বিস্তার, যত্রতত্র নগরায়ন এবং অটোমোবাইলের সংখ্যার বাধাহীন বৃদ্ধি জনিত ক্রমবর্ধমান পরিবেশ দূষণ ও দূষণ সম্পর্কীয় দুর্ঘটনা হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণের জন্য 1981 খ্রীঃ ভারতে বায়ু **(দূষণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগ করা হয়।** এই আইন ভারতের প্রতিটি রাজ্যে সমানভাবে প্রযোজ্য। এছাড়া বায়ু, স্থল এবং জলের দূষণ নিয়ন্ত্রণে 1986 খ্রীঃ **'পরিবেশ (প্রতিরোধ) আইন'** প্রণয়ন এবং প্রয়োগ করা হয়। উপরিউক্ত আইন ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে 1978 খ্রীঃ স্মোক ন্যুইসেন্স অ্যাক্ট (1905) সংশোধনের মাধ্যমে বায়ুর দূষণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

আইনসম্মত উপায়ে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ নিম্নলিখিত উপায়ে বায়ুদূষণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ করা যায় ঃ

i) নগরায়ন এবং শিল্পায়নের পূর্বে উপযুক্ত স্থান এবং পরিমণ্ডল নির্ধারণ। এক্ষেত্রে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অনুমোদন বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত।

ii) শিল্পাঞ্চল, বসতি ও গ্রামাঞ্চল এবং স্পর্শকাতর অঞ্চলে পরিবেষ্টক বায়ুর উৎকর্ষ মানের সীমা নির্ধারণ। চারটি প্রধান দূষক SO_2, NO_X, CO এবং SPM এর ঘনত্ব মানের উপর বায়ুর উৎকর্ষের মান নির্ধারণ বাধ্যতামূলক করা উচিত।

iii) সচল এবং স্থির উৎস থেকে বায়ুতে নিক্ষিপ্ত দূষকের স্থানবিশেষে 'অনুমোদন যোগ্য সীমা' বা 'নিক্ষেপ মান' নির্ধারণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য নিক্ষেপ মানের বেশি নিক্ষেপণকারীকে (শিল্পসংস্থা, অটোমোবাইল, রেলওয়ে লোকোমোটিভ প্রভৃতি) কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধের আওতায় আনা উচিত।

iv) শিল্প সংস্থায়, কারখানায় এবং অটোমোবাইল ইঞ্জিনে দূষণ নিয়ন্ত্রণ সজ্জার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা। এক্ষেত্রে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এর তদারকি প্রয়োজন।

v) শিল্পের আধুনিকীকরণ এবং উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন অটোমোবাইল ইঞ্জিনের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা।

vi) শিল্পজাত ক্ষতিকারক বর্জ্য পদার্থ এবং নিয়ন্ত্রণ সজ্জা নিষ্কাশিত জৈব বা অজৈব বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থের উপযুক্ত প্রক্রিয়াকরণ।

- **বায়ুদূষণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় ভারতীয় আইনগত বাধ্যবাধকতা ঃ**

a. **বায়ু আইন (দূষণ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ)** [Air (Prevention & Control of Pollution) Act 1981]

i) এই আইনের 21 নং ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তি বা সংস্থা ঘোষিত দূষণ নিয়ন্ত্রণ অঞ্চলে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ এর অনুমতি ব্যতিরেকে কোন শিল্প-প্লান্ট স্থাপন বা প্রক্রিয়াকরণ শুরু করতে পারবে না।

ii) এই আইনগত বাধ্যবাধকতায় আরোও বলা হয়েছে যে, কোন শিল্প বা কারখানা রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অনুমোদিত সীমার অধিক কোন সাধারণ এবং ক্ষতিকারক বস্তু বা গ্যাস বায়ুমণ্ডলে নিক্ষেপ করতে পারবে না।

b. **বেঙ্গল স্মোক ন্যুইসেন্স আইন** (Bengal Smoke Nuisance Act–1905) [সংশোধন—1973]

এই আইনের 8A ধারা অনুসারে স্মোক ন্যুইসেন্স বিভাগের মুখ্য পরিদর্শকের দ্বারা নক্শা বা পরিকল্পনার (Plan) অনুমোদন ব্যতীত কোন চুল্লী, চিমনী বা অন্যান্য ধোঁয়া নিক্ষেপকারী ইউনিট বা সজ্জার স্থাপন, পুনঃস্থাপন বা পরিবর্তন এবং সংযোগ করা যাবে না। প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুমোদিত সময়ের পর পুনঃঅনুমোদন জরুরী।

c. **পরিবেশ (প্রতিরোধ) আইন** 1986 [Environment (Protection) Act 1986]

i) কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে প্রাধিকারপ্রাপ্ত কোন সংস্থা কর্তৃক নির্দেশিত অনুমোদনযোগ্য সীমার অধিক যে কোন কঠিন, তরল বা গ্যাসীয় বস্তু কোন শিল্প সংস্থা নিক্ষেপ করতে পারবে না।

ii) কেন্দ্রীয় সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধিকারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি শিল্পসংস্থাকে যে কোন উপযোগী নির্দেশ দিতে পারে, এবং এরূপ নির্দেশ শিল্প সংস্থায় কার্যকর করা বাধ্যতামূলক।

8.16.3. স্বকীয় বা ব্যক্তিগত উপায় অবলম্বনে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ

নিম্নবর্ণিত স্বকীয় উপায় অবলম্বন করে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় ঃ

i) **সংরক্ষণ** (Conservation) ঃ শক্তিউৎসের সংরক্ষণের দ্বারা বায়ুদূষণ হ্রাস করা সম্ভব। **পুনরাবর্তন** (recycling), **কার্যকারিতা বৃদ্ধি** এবং চাহিদার হ্রাস সংরক্ষণ কৌশলের অন্যতম উপায়।
ব্যক্তিগত, সরকারি এবং আইনদ্বারা গঠিত যৌথ সংস্থা (যথা পৌরসভা) সংরক্ষণের মাধ্যমে শক্তির চাহিদা হ্রাস করা যায়। শক্তির চাহিদা যখন কমে যায়, তখন বায়ুদূষণ হ্রাস পায়।

ii) **সম্পদের যথাযথ ব্যবহার** ঃ কোন অপ্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদন এবং ব্যবহার শক্তি সম্পদের সংরক্ষণ হ্রাস করে, ফলে দূষণের বৃদ্ধি ঘটে। তাই অপ্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদন এবং ব্যবহার বন্ধ করে বায়ুদূষণ হ্রাস কার যায় অর্থাৎ সম্পদের যথাযথ ব্যবহার বায়ুদূষণের মান হ্রাস করতে সক্ষম।

iii) **অপচয় হ্রাস** ঃ সংরক্ষণ কৌশল পরোক্ষভাবে অপচয় হ্রাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। কোন বস্তুর বা রূপান্তরিত শক্তির অপচয়ের বৃদ্ধিতে দূষণ বাড়ে। ফলে অপচয় হ্রাস করে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। উদাহরণ হিসেবে বিদ্যুৎশক্তির অপচয়ের কথা বলা যায়। বিদ্যুৎশক্তির অপচয় বাড়লে অতিরিক্ত চাহিদা যোগানের জন্য বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে অতিরিক্ত কয়লা পুড়বে (তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে), ফলে বায়ুতে দূষক গ্যাসের নিক্ষেপণও বাড়বে।

8.17. সারাংশ (Summary) ঃ

- বিভিন্ন প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট উৎস থেকে বায়ুদূষক উৎপন্ন হয়। মানুষের ক্রিয়াকলাপে সৃষ্ট দূষকই বায়ুদূষণের প্রধান কারণ।
- ছয়টি প্রধান বায়ুদূষক হচ্ছে CO_2, SO_X, NO_X, কণাবস্তু, হাইড্রোকার্বন এবং আলোক-রাসায়নিক স্মোগ। শিল্প, পাওয়ার প্লান্ট এবং পরিবহন মাধ্যমই মনুষ্য-সৃষ্ট বায়ুদূষণের প্রধান উৎস।
- শীতপ্রধান দেশের প্রাচীন শিল্প—নগর রূপালী বায়ুযুক্ত নগরের অন্তর্গত। এই শ্রেণীর নগরের প্রধান বায়ু দূষক সালফেট এবং কণাবস্তু, যা আর্দ্রতার সহযোগে স্মোগ উৎপন্ন করে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত শুষ্ক জলবায়ুগত স্থানে অবস্থিত নতুন এবং শিল্পবিহীন (বা খুব কম শিল্পযুক্ত) নগর বাদামী বায়ুযুক্ত নগরের অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর নগরের প্রধান বায়ুদূষক হচ্ছে কার্বনমনোক্সাইড, ওজোন এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড। হাইড্রোকার্বন এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড সৌর আলোকের উপস্থিতিতে আলোক রাসায়নিক স্মোগ উৎপন্ন করে।
- বিভিন্ন শর্ত যথা বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ ও অভিমুখ, তাপমাত্রা, বায়ুমণ্ডলের

স্থিরতা, অধঃক্ষেপণ, আর্দ্রতা এবং সৌর বিকিরণ কোন স্থানের বায়ুদূষণকে প্রভাবিত করে। তাপমাত্রার **বিকিরণ, অধোগমন** এবং **তাপাভেদ্য-বৈপরীত্য** বায়ুদূষণের বিস্তৃতিতে সাহায্য করে।

- বায়ুদূষণ মানুষের স্বাস্থ্যের উপর মন্দ প্রভাব সৃষ্টি করে। বায়ুদূষণের অ্যাকিউট প্রকটে মানুষের অস্বস্তি, চোখ এবং কণ্ঠনালীর জ্বালা, শীতপ্রবণতা, কাশি, হৃদপিণ্ডের অক্রিয়তা এবং মৃত্যু হতে পারে। শিশু এবং ফুসফুস ও হৃৎপিণ্ড রোগে আক্রান্ত বয়স্ক মানুষ বায়ুদূষকের প্রতি সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল। বায়ুদূষণে দীর্ঘস্থায়ী প্রকট এবং ধূমপানের যৌথ কারণে মানুষের স্বাস্থ্যের উপর 'ক্রনিক ইফেক্ট' সৃষ্টি হয়। ক্রনিক ইফেক্টের অন্যতম প্রধান উপসর্গ হচ্ছে **'ব্রঙ্কাইটিস'** এবং **'এমফাইসিমা'**।
- বায়ুদূষণের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় প্রভাব দেখা যায় বস্তুর উপর। ধাতু, রঙ, চামড়া, রবার, কাগজ, কাচ, সিরামিক, কাপড় এবং মার্বেলের ক্ষতি হয় বায়ুদূষণের ফলে। বস্তুরউপর মন্দ প্রভাব সৃষ্টিকারী বায়ুদূষকের অন্যতম সালফার-ডাই-অক্সাইড় (এবং সালফিউরিক অ্যাসিড), ওজোন, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং ফটোকেমিক্যাল-অক্সিডেন্ট।
- বায়ুদূষণপূর্ণ এলাকায় সৌর আলোকের উপস্থিতিতে হাইড্রোকার্বন এবং নাইট্রোজেন অক্সাইডের আলোক রাসায়নিক জারণে ফগ্ উৎপন্ন হয়। ফগ্ এবং ধোঁয়ার মিশ্রণে স্মোগ উৎপন্ন হয়। স্মোগ মানুষ, উদ্ভিদ এবং বস্তুর উপর মন্দ প্রভাব সৃষ্টি করে।
- কার্বন-ডাই-অক্সাইড, জলীয় বাষ্প, মিথেন, নাইট্রাস-অক্সাইড, ক্লোরোফ্লুরোকার্বন প্রভৃতি গ্যাসের ক্রমবর্ধমান ঘনত্ব বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর উষ্ণকরণ ইতোমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। উপরিউক্ত গ্যাস সমূহের ঘনত্ব বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর উষ্ণকরণকে **'গ্রীণহাউস প্রভাব'** বলা হয়। গ্রীণহাউস গ্যাসের অনিয়মিত উৎপাদন এভাবে চলতে থাকলে 2050 সালের মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা 2°C–5°C বৃদ্ধি পাবে এবং তার ফলে সমুদ্রের জলস্তর 2-3 ফুট বেড়ে যাবে। এই কারণে সমুদ্র উপকূলবর্তী নীচু স্থলভূমি ডুবে যাবে, ফলে বিস্তীর্ণ অঞ্চলের জীবজগতের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে।
- বৃষ্টি, শিশির এবং তুষারপাত যে কোন প্রাকৃতিক অধঃক্ষেপণের মাত্রা 5.6 এর কম হলেই অধঃক্ষেপণকে **অ্যাসিড বৃষ্টি** বলা হয়। অ্যাসিড বৃষ্টির প্রধান কারণ সালফার-ডাই-অক্সাইড এবং নাইট্রোজেন অক্সাইডের সালফিউরিক এবং নাইট্রিক অ্যাসিডে রূপান্তর। অ্যাসিড বৃষ্টির প্রভাবে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য এবং গতিশীলতা বিঘ্নিত হয়, মানুষের ত্বকের ক্ষতি হয় এবং ধাতু, মার্বেল প্রভৃতি বস্তুর ক্ষয় হয়।

- ওজোন স্তরের ক্ষয় এবং 'ওজোন হোল' সৃষ্টি অধুনা পরিবেশ সংকটের সৃষ্টি করেছে। ক্লোরিন দূষণজনিত কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের এবং বিশেষ করে অ্যান্টার্কটিকার স্ট্র্যাটোস্ফেরিক ওজোন স্তরের ক্রমবর্ধমান ক্ষয়ের কারণে প্রতিবছর ওজোন হোলের আকার বাড়ছে। ওজোন হোলের মধ্য দিয়ে জীবমণ্ডলে প্রাণ সংহারক অতিবেগ্নী রশ্মির আবির্ভাবের আশঙ্কায় মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে। কারণ ওজোনস্তর সৌরপর্দার ন্যায় মানুষ এবং সমগ্র জীবজগতকে অতিবেগ্নী রশ্মির প্রভাব থেকে রক্ষা করে চলেছে।
- বায়ুর উৎকর্ষমান কোন স্থানের বায়ুর SPM, SO_2, CO এবং NO_X প্রভৃতি বায়ুদূষকের নিক্ষেপ মানের উপর নির্ভর করে।
- বৃত্তিমূলক বা পেশাগত কাজে লিপ্ত শ্রমজীবী মানুষ বায়ুদূষণের ফলে (বা পরিবেশ দূষণের ফলে) যে সমস্ত রোগে আক্রান্ত হয় সেই সব রোগকে **'পেশাগত রোগ'** বলা হয়। **'সিলিকোসিস'**, এবং **'অ্যাজবেস্টোসিস'** পেশাগত রোগের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।
- বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কোন একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি যথেষ্ট নয়। প্রাযুক্তিক (প্রায়োগিক), আইনসম্মত এবং ব্যক্তিগত উপায়ের যৌথ প্রয়াসে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

• অনুশীলনী •

A. **রচনাভিত্তিক বা দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

1. বায়ুদূষণ বলতে কি বোঝায়? বায়ুদূষণের প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট উৎস উল্লেখ কর। মনুষ্যসৃষ্ট বায়ুদূষকের উৎপাদন পদ্ধতি বর্ণনা কর।
2. বায়ুদূষক কি? বিভিন্ন শ্রেণীর বায়ুদূষকের প্রকৃতি বর্ণনা কর।
3. প্রধান গ্যাসীয় বায়ুদূষক এবং তাদের উৎস বর্ণনা কর।
4. রূপালী এবং বাদামী বায়ুযুক্ত নগর বলতে কি বোঝায়?
5. বায়ুদূষণে প্রভাব বিস্তারকারী জলবায়ুগত শর্তগুলি বর্ণনা কর।
6. তাপমাত্রার বৈপরীত্য বলতে কি বোঝ? বিকিরণ বৈপরীত্য, অধোগমন বৈপরীত্য এবং তাপাভেদ্য বৈপরীত্য বর্ণনা কর।
7. মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বায়ুদূষণের প্রভাব বর্ণনা কর।
8. উদ্ভিদ এবং প্রাণীর উপর বায়ুদূষণের প্রভাব বর্ণনা কর।
9. অজীব বস্তুর উপর বায়ুদূষণের প্রভাব বর্ণনা কর।
10. বায়ুদূষণের ফলে আর্থিক ক্ষতির হিসাব উল্লেখ কর।
11. আলোক-রাসায়নিক বায়ুদূষণ বলতে কি বোঝ? আলোক রাসায়নিক স্মোগের উৎপাদন পদ্ধতি এবং জীবের উপর আলোক-রাসায়নিক স্মোগের প্রভাব বর্ণনা কর।

12. গ্রীণহাউস প্রভাব কি? প্রধান গ্রীণহাউস গ্যাস কি কি? গ্রীণহাউস প্রভাব বর্ণনা কর।
13. অ্যাসিডবৃষ্টির কারণ কি? বাস্তুতন্ত্রের উপর অ্যাসিডবৃষ্টির প্রভাব বর্ণনা কর।
14. 'ওজোন হোল' কি? ওজোন হোল সৃষ্টির কারণ এবং পদ্ধতি বর্ণনা কর। জীবজগতের উপর ওজোনস্তরের ক্ষয়জনিত প্রভাব উল্লেখ কর।
15. বায়ুর উৎকর্ষ মান বলতে কি বোঝ? ভারতের বিভিন্ন শহরের বায়ুর উৎকর্ষ মান উল্লেখ কর।
16. পেশাগত রোগ বলতে কি বোঝায়? কেন পেশাগত রোগ সৃষ্টি হয়? যে কোন একটি পেশাগত রোগের কারণ এবং উপসর্গ বর্ণনা কর।
17. বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
18. বায়ুদূষণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয় ভারতীয় আইনগত বাধ্যবাধকতা উল্লেখ কর।

B. **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

1. দূষক, দূষণ এবং বায়ুদূষণ বলতে কি বোঝায়?
2. প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট বায়ুদূষকের নাম উল্লেখ কর।
3. প্রাথমিক এবং গৌণ বায়ুদূষক কাকে বলে?
4. প্রধান বায়ুদূষক গ্যাস এবং তাদের উৎস উল্লেখ কর।
5. রূপালী এবং বাদামী বায়ুযুক্ত নগর বলতে কি বোঝ?
6. তাপমাত্রার বৈপরীত্য কাকে বলে? তাপাভেদ্য বৈপরীত্য কি?
7. মুখ্য বায়ুদূষক গ্যাস, উৎস এবং মানুষের উপর তাদের অ্যাকিউট এফেক্ট উল্লেখ কর।
8. অ্যাজবেস্টোসিস কি? অ্যাজবেস্টোসিসের কারণ এবং উপসর্গ উল্লেখ কর।
9. ধূমপানে মানুষের কি কি ক্ষতি হয়?
10. প্রাণীর উপর সীসা, ফ্লুরাইড এবং আর্সেনিকের প্রভাব উল্লেখ কর।
11. স্থূলাণু বিকিরণ বলতে কি বোঝ?
12. বায়ুদূষক কী উপায়ে উদ্ভিদের উপর ক্রিয়া করে?
13. উদ্ভিদের স্বাস্থ্যের উপর সালফার-ডাই-অক্সাইড, হাইড্রোজেন ফ্লুরাইড এবং ওজোন গ্যাসের প্রভাব সংক্ষেপে উল্লেখ কর।
14. ধাতু, রং, রবার, চামড়া, কাগজ, কাপড়, কাঁচ এবং সেরামিকের উপর বায়ুদূষণের প্রভাব সংক্ষেপে উল্লেখ কর।
15. শিল্প সম্পদের উপর বায়ুদূষণের প্রভাব উল্লেখ কর।
16. বায়ুদূষণের ফলে আর্থিক ক্ষতির ক্ষেত্রগুলি উল্লেখ কর।
17. আলোক-রাসায়নিক স্মোগ কি? মানুষের উপর সংক্ষেপে আলোক-রাসায়নিক স্মোগের প্রভাব উল্লেখ কর।

18. 'গ্রীণহাউস' প্রভাব কি? গ্লোবাল ওয়ার্মিং বলতে কি বোঝ?
19. 'গ্রীণহাউস' গ্যাস' তাপীয় ইনফ্রারেড বিকিরণ শোষণ করে কেন?
20. গ্রীণহাউস এফেক্টের কারণ ও প্রভাব উল্লেখ কর।
21. গ্রীণহাউস এফেক্ট সম্পর্কে শিল্পোন্নত দেশের প্রতিক্রিয়া উল্লেখ কর।
22. অ্যাসিড বৃষ্টি বলতে কি বোঝ? অ্যাসিড বৃষ্টির কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে উল্লেখ কর।
23. ওজোন হোল কি? ওজোন স্তর ক্ষয়ে CFC-র ভূমিকা উল্লেখ কর।
24. CFC-র ব্যবহার সম্পর্কীয় আন্তর্জাতিক চুক্তি উল্লেখ কর।
25. জীবজগতের উপর ওজোন স্তরের ক্ষয়জনিত প্রভাব উল্লেখ কর।
26. সুপারসোনিক এয়ার-প্লেন কি ওজোন স্তর ক্ষয় করতে পারে?
27. সিলিকোসিস কি? নিউমোকোনিওসিস কেন হয়?
28. বেঙ্গল স্মোক্ ন্যুইস্যান্স আইন এবং পরিবেশ প্রতিরোধ আইন উল্লেখ কর।



Phenol, waste float in Sarobar

Pools double as toilet, *dhobi ghat* for local slumdwellers

AN EASTERN AGE SPECIAL

'Clubs not polluting the lakes'

চিত্র 9.1 ঃ কলকাতার সুভাষ-সরোবরের দূষণ সংক্রান্ত প্রকাশিত রিপোর্ট (সৌজন্যে ঃ দি এশিয়ান এজ্, সেপ্টেম্বর 24, 1997, সোনালী এস. মজুমদার)।

9.4. জলদূষণের বিন্দু (Point) এবং অবিন্দু (Non-Point) উৎস ঃ

বায়ুদূষণের মত জলের দূষণও প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট উভয় উপায়ে সংঘটিত হয়। কিন্তু মনুষ্যসৃষ্ট উৎসই জলদূষণের প্রধান উৎস। আবার জলের কোন বিভেদ প্রাচীর না থাকার কারণে কোন একটি দেশে উৎপন্ন জলদূষক পৃথক একটি দেশের পানীয় বা স্নানের জলকে সংক্রমিত করতে পারে। যাইহোক, মনুষ্যসৃষ্ট জলদূষকের উৎসকে দুভাগে ভাগ করা হয়।

শিল্প সংস্থা	নির্গত দূষক
অ্যাসিটেট রেওন	অ্যাসিটিক অ্যাসিড
ভিসকোজ রেওন	জিঙ্ক, সালফাইড
কিউপ্রামোনিয়াম রেওন	কপার
পারমাণবিক প্লান্ট	ফ্লুরাইড
ব্যাটারি তৈরির কারখানা	সীসা, খনিজ অ্যাসিড
সিরামিক প্লান্ট	ফ্লুরাইড
পেপার মিল	মুক্ত ক্লোরিন
তৈল শোধনাগার	মারক্যাপট্যান
চামড়া কারখানা	টারটারিক অ্যাসিড
লন্ড্রি	ক্ষার, ক্লোরিন, তেল, ফ্যাট এবং গ্রিজ
খাদ্য-প্রক্রিয়াকরণ	শ্বেতসার
ফার্টিলাইজার প্লান্ট	ফ্লুরাইড, ফসফেট
রঙ কারখানা	সীসা
ডেয়ারী	সুগার
ফটোগ্রাফী	সিলভার
ট্যানারী	সালফাইড, ক্রোমিয়াম, ফেনল, ট্যানিক অ্যাসিড, খনিজ অ্যাসিড, ফ্যাট, তেল, গ্রীজ
বস্ত্র কারখানা	জিঙ্ক
রাবার প্রক্রিয়াকরণ	সাইট্রিক অ্যাসিড
হাল্কা পানীয় তৈরির কারখানা	

তালিকা 9.2 ঃ কতকগুলি বিশেষ পরিচিত শিল্প সংস্থা থেকে নির্গত জল-দূষকের পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে।

i) **বিন্দু উৎস** (Point Sources) ঃ বিন্দু উৎসের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হচ্ছে কারখানা, পাওয়ার প্লান্ট, এবং ড্রেন বা নর্দমার নিষ্কাশিত আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট। এই সব উৎস থেকে টন টন বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ পয়ঃপ্রণালী, হ্রদ এবং নদীতে গিয়ে পড়ে।

9 জল দূষণ

9.1. ভূমিকা (Introduction) ঃ

জীবনের জন্য জল অপরিহার্য। জলের অনুপস্থিতিতে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। পৃথিবীর বহির্ভাগপৃষ্ঠের প্রায় 70 শতাংশ জল দ্বারা আবৃত এবং জীবের ওজনের দুই-তৃতীয়াংশ বা তার বেশী জলের সমন্বয়ে গঠিত। জনসংখ্যার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি, কৃষি এবং শিল্পের প্রসারে ভূগর্ভের জল (ground water) এবং বহির্ভাগপৃষ্ঠের জলের (surface water) শোষণ ও বাধাহীন অপচয়ে জল সম্পদ ক্রমসংকুচিত। এছাড়া মানুষের অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপে ক্রমবর্ধমান জল-দূষণের ফলে জলসম্পদের ব্যাপকতা সংকোচনের দিকে। আলোচ্য অধ্যায়ে জলদূষণের প্রকৃতি, জলদূষক, জল দূষণের উৎস, জীবজগৎ-এর উপর জলদূষণের প্রভাব এবং জল দূষণ হ্রাসের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

9.2. জলের দূষণ বলতে কি বোঝায়?

জীবের উপর মন্দ প্রভাব সৃষ্টি কারী জলের যেকোন ভৌত বা রাসায়নিক পরিবর্তন কে জলের দূষণ বলা হয়। জলদূষণের ঘটনা কোন একটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র বিশ্বের জলমণ্ডল দূষণে সংক্রমিত। কিন্তু বিভিন্ন দেশে জলদূষণের প্রকৃতি নির্ভর করে দেশের উন্নয়ন তথা প্রগতির স্তরের উপর। দরিদ্র রাষ্ট্রের প্রধান জলদূষক বা সংক্রামক হচ্ছে মানুষ ও প্রাণীর বর্জ্য বস্তু, বর্জ্য বস্তুর রোগজীবাণু এবং অদক্ষ খামার (farming) এবং কাঠের কাজে (timbering) উৎপন্ন তলানি বা গাদ (sediment)। কিন্তু উন্নত রাষ্ট্রে শিল্পের প্রগতি ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন পদ্ধতির জন্য জল দূষণের উপরিউক্ত সংক্রামক ব্যতিরেকে অতিরিক্ত বিপজ্জনক দূষক জলের দূষণ ঘটায়। বিপজ্জনক দূষকের মধ্যে তাপ, বিষাক্ত ধাতু, অ্যাসিড, পেস্টিসাইড, এবং জৈব-রাসায়নিক উল্লেখযোগ্য।

9.3. জলের দূষক (Water Pollutant) ঃ

জলের দূষণ সৃষ্টিকারী শর্তকে **'জলের দূষক'** বলা হয়। জলদূষকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—জৈবপরিপোষক, রোগজীবাণু, বিষাক্ত জৈব পদার্থ, বিষাক্ত অজৈব পদার্থ, তলানি বা গাদ, এবং তাপ। তালিকায় (9.1) বিভিন্ন জলদূষকের উদাহরণ উল্লেখ কর হল।

জলদূষকের শ্রেণী		উদাহরণ
i) পরিপোষক	জৈব	মানুষ ও প্রাণীর বর্জ্য পদার্থ, লিটার, তলানি।
	অজৈব	নাইট্রোজেন, ফসফরাস, ডিটারজেন্ট।
ii) রোগজীবাণু	—	রোগসৃষ্টিকারী ব্যাক্‌টিরিয়া, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া, প্যারাসাইট।
iii) বিষাক্ত জৈব দূষক	—	পেস্টিসাইড, পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল (PCB), পলি সাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (PAH), পেট্রোলিয়াম।
iv) বিষাক্ত অজৈব পদার্থ	—	ধাতু ও লবণ ঃ যথা, পারদ, সীসা তামা, ক্যাডমিয়াম, ক্রোমিয়াম, আর্সেনিক, নাইট্রেট, নাইট্রাইট প্রভৃতি।
v) তলানি বা গাদ	—	
vi) তাপ	—	

তালিকা 9.1 ঃ জলদূষকের প্রকৃতি এবং উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

ii) **অবিন্দু উৎস** (Non-Point Sources) ঃ কৃষিফার্ম, অরণ্য, বাগান বা লন, এবং শহরাঞ্চলের রাস্তা অবিন্দু উৎসের অন্তর্ভুক্ত। বৃষ্টির জলের মাধ্যমে তেল পরিবহনে ব্যবহৃত রাস্তা থেকে তেল, এবং শহরাঞ্চলের বাগান বা লন থেকে পোস্টিসাইড এবং রাসায়নিক সার (ফার্টিলাইজার) প্রথমে ড্রেন বা পয়ঃপ্রণালীর জলে মেশে এবং অবশেষে ড্রেনের জলের মাধ্যমে হ্রদ বা নদীর বৃহৎ জলভাণ্ডারে বাহিত হয় (তালিকা 9.3)।

9.5. জলের আন্তরমাধ্যম সংক্রমণ (Intermedia Contamination of water) ঃ

অধুনা পরিবেশ বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, জলের দূষণে আন্তর মাধ্যম সংক্রমণ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে দূষক এক মাধ্যম (যথা বায়ু) থেকে অন্য মাধ্যমে (জল) পরিবাহিত হয়। উদাহরণ ঃ

i) কৃষিজমিতে ব্যবহৃত পেস্টিসাইড বৃষ্টির জলের দ্বারা ক্ষয়ে যাওয়া মৃত্তিকার সঙ্গে হ্রদ বা নদীতে পড়ে এবং হ্রদ বা নদী থেকে সমুদ্রে বাহিত হয়।

ii) পুকুর বা হ্রদে স্তূপীকৃত বিষাক্ত জৈবপদার্থ বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মেশে এবং বৃষ্টির জলের মাধ্যমে হ্রদ, নদী ও সমুদ্রের জলে এবং স্থলভাগে অধঃক্ষিপ্ত হয়। স্থলভাগ থেকে বৃষ্টির জলের মাধ্যমে পুনরায় জলে সংক্রমিত হয়।

উৎস	দূষক
কৃষি	মৃত্তিকা, পেস্টিসাইড, ফার্টিলাইজার
সিভিকালচার (কাঠ এবং কাগজ উৎপাদনের জন্য বৃক্ষ চাষ)	তলানি/গাদ
খনি	ধাতু ও অ্যাসিড
নির্মাণকাজ	ক্ষয়ে যাওয়া তলানি
নদীর গতিপথে বাঁধ নির্মাণ	মৃত্তিকা, তলানি, ধাতু, পেস্টিসাইড, ফার্টিলাইজার
শহরাঞ্চলের বৃষ্টি ধৌতকরণ	পেস্টিসাইড, হার্বিসাইড, ফার্টিলাইজার
ড্রিলিং এবং বর্জ্যপদার্থের অনুধাবন	জৈব এবং অজৈব বর্জ্য পদার্থ

তালিকা 9.3 ঃ জলদূষণের প্রধান অবিন্দু-উৎস এবং দূষকের প্রকৃতি দেখানো হয়েছে।

iii) মৃত্তিকার গভীরে প্রোথিত বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ ধীরে ধীরে সন্নিহিত অ্যাকুইফারের জলে সংক্রমিত হয় এবং অ্যাকুইফার থেকে ঝরণা বা কূপের জলে সংক্রমিত হয়।

iv) বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ানো ধূলিকণা, তলানি, পেস্টিসাইড, অ্যাজবেস্টাস কণা, ফার্টিলাইজার, ভারীধাতু, লবণ, তেল, লিটার, এবং অন্যান্য বায়ুদুষক বৃষ্টির জলের মাধ্যমে পুকুর, হ্রদ, নদী এবং সমুদ্রের জলে অধঃক্ষিপ্ত হয়।

9.6. জলদূষণে সাহায্যকারী শর্ত ঃ

জলদূষণের প্রকৃতি এবং মাত্রা নিম্নলিখিত শর্তের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

i) জলের স্থিরীকৃতা বা প্রবহমানতা

ii) দূষকের প্রকৃতি এবং পরিমাণ (ঘনত্ব)

iii) জলের পরিমাণ

iv) জলের তাপমাত্রা

v) আন্তর-মাধ্যম সংক্রমণহার

vi) দূষকের অধঃক্ষেপণ মাত্রা

vii) জলের গভীরতা

viii) জলের পরিপোষক এবং অক্সিজেনের মাত্রা, প্রভৃতি।

উপরিউক্ত শর্তের মধ্যে প্রথম শর্ত অর্থাৎ জলের স্থিরিকৃতা বা প্রবহমানতাই জলদূষণের প্রধান সাহায্যকারী শর্ত। স্থিরিকৃত জলজ তন্ত্র যথা পুকুর এবং হ্রদের দূষণ মাত্রা প্রবহমান জলজ তন্ত্র যথা নদী, প্রস্রবণ এবং ঝরণার তুলনায় অনেক বেশি। কারণ স্থিরীকৃত জলজ তন্ত্রের জলের অপ্রবহমানতার জন্য দূষকের ক্রমান্বয়িক সঞ্চয়ে দূষণের মাত্রা বিষক্রিয় মাত্রায় পৌঁছাতে পারে।

9.7. বহির্ভাগপৃষ্ঠীয় জলের বৈশিষ্ট্য ঃ

বহির্ভাগপৃষ্ঠীয় জলের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা হল—যেগুলি জলদূষণকে প্রভাবিত করে—

9.7.1 স্থিরীকৃত এবং প্রবহমান জলজ তন্ত্র ঃ

মিষ্টি জলের বাস্তুতন্ত্রকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা হয় ঃ

a) স্থিরিকৃত জলজ তন্ত্র (Standing water system) ঃ

স্থিরিকৃত জলজ তন্ত্র যথা পুকুর এবং হ্রদ দূষণে অধিক সংবেদনশীল। জলের স্থিরিকৃতার দরুণ পুকুর এবং হ্রদের জল অত্যন্ত ধীর গতিতে প্রতিস্থাপিত হয়। একটি হ্রদের জল সম্পূর্ণ প্রতিস্থাপিত হতে 10 থেকে 100 বছর বা তার বেশি সময় লাগে। ফলে দূষকের ক্রমসঞ্চয়ে দূষণ মাত্রা দ্রুত বিষক্রিয় মাত্রায় পৌঁছাতে পারে।

b) প্রবহমান জলজ তন্ত্র (Flowing water system) ঃ

প্রবহমান জলজ তন্ত্রের উদাহরণ নদী এবং ঝরণা। প্রবহমান জলজ তন্ত্রে জলের

প্রবাহের ফলে জল দূষণমুক্ত (purging) হতে পারে (কিন্তু দূষকের সংক্রমণ অবিরাম চলতে থাকলে জলের প্রবাহ দূষণমুক্ত হতে পারে না)।

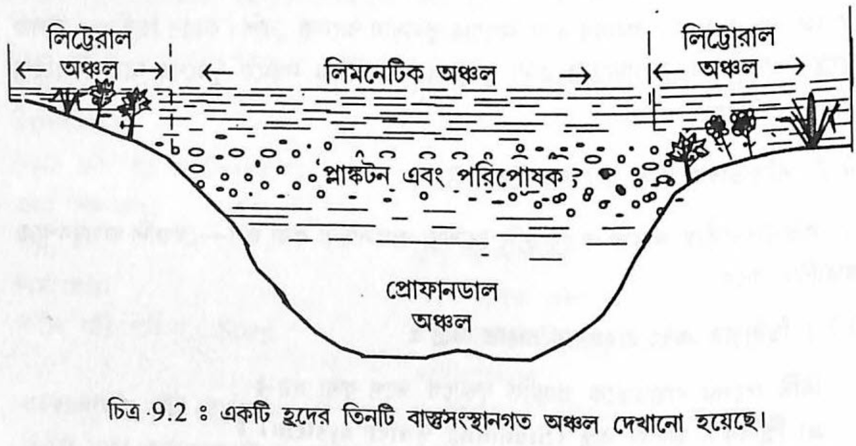
9.7.2 হ্রদের জলজ অঞ্চল ঃ

A. হ্রদের জল তিনটি বাস্তুসংস্থানগত অঞ্চল দ্বারা গঠিত ঃ

(i) **লিট্টোরাল (Littoral) বা উপকূলবর্তী অঞ্চল ঃ** হ্রদের উপকূলবর্তী অগভীর জল কে লিট্টোরাল অঞ্চল বলা হয়। এই অঞ্চলে কিছু বেলাবাসী মূলযুক্ত উদ্ভিদ জন্মায়।

(ii) **লিমনেটিক (Limnetic) বা প্রকৃত বৈশিষ্ট্যযুক্ত অঞ্চল ঃ** উপকূল অঞ্চল ব্যতিরেকে হ্রদের মুক্ত জলরাশি যেখানে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে এবং ফাইটোপ্লাঙ্কটন জন্মায় সেই অঞ্চলকে লিমনেটিক অঞ্চল বলা হয়।

(iii) **প্রোফানডাল (Profundal) বা গভীর অঞ্চল ঃ** লিমনেটিক অঞ্চলের ঠিক নীচে হ্রদের গভীর জলরাশি যেখানে সূর্যালোক পৌঁছাতে পারে না, সেই অঞ্চল কে 'প্রোফানডাল' অঞ্চল বলা হয়। গভীর হ্রদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত অগভীর হ্রদের প্রোফানডাল অঞ্চলে মাছের পপ্যুলেশান অনেক বেশি থাকে।



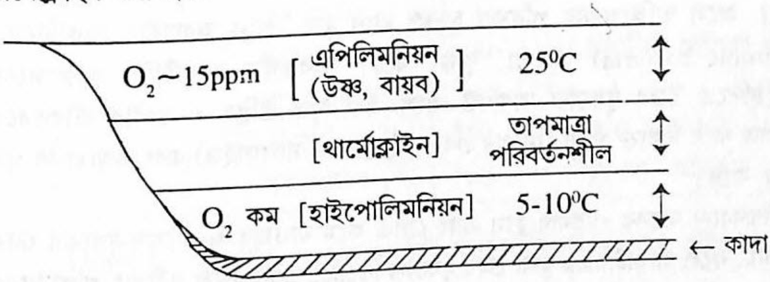
চিত্র 9.2 ঃ একটি হ্রদের তিনটি বাস্তুসংস্থানগত অঞ্চল দেখানো হয়েছে।

B. তাপমাত্রার বিস্তৃতি অনুসারে হ্রদের জল অনুরূপ তিনটি তাপীয় অঞ্চলে বিভেদিত :

(i) এপিলিমনিয়ন **(Epilimnion)** ঃ হ্রদের উপরের উষ্ণ জলস্তর কে এপিলিমনিয়ন বলা হয়।

(ii) হাইপোলিমনিয়ন **(Hypolimnion)** ঃ সর্বাপেক্ষা নীচের জলস্তরকে 'হাইপোলিমনিয়ন' বলা হয়।

(iii) থার্মোক্লাইন (Thermocline) বা মেটালিমনিয়ন **(Metalimnion)** ঃ এপিলিমনিয়ন এবং হাইপোলিমনিয়ন-এর মধ্যবর্তী পরিবর্তনশীল উষ্ণ জলস্তরকে **থার্মোক্লাইন** বলা হয়।



চিত্র 9.3 ঃ হ্রদের তিনটি তাপীয় অঞ্চল দেখানো হয়েছে।

9.8. বহির্ভাগপৃষ্ঠীয় জলদূষণের প্রকারভেদ (Types of Surface Water Pollution)

9.8.1 পরিপোষক দূষণ (Nutrient Pollution) এবং ইউট্রোফিকেশান (Eutrophication) ঃ

নদী, হ্রদ এবং জলপ্রপাতে বিভিন্ন প্রকার জৈব এবং অজৈব পরিপোষকের উপস্থিতির ফলে জলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে। অর্থাৎ জলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণীর বেঁচে থাকার জন্য কিছু পরিমাণ পরিপোষকের উপস্থিতি অপরিহার্য। যে পরিমাণ পরিপোষক জলজ বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে সেই পরিমাণ কে **'পরিপোষকের স্বাভাবিক ঘনত্ব'** বলা হয়। কিন্তু স্বাভাবিকের অধিক পরিমাণ পরিপোষক জলে দূষণ সৃষ্টি করে (অর্থাৎ দূষক রূপে ক্রিয়া করে)।

(a) **জৈব-পরিপোষক ঘটিত দূষণ** :

I. আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট, পেপার মিল, মাংস প্যাকেজিং প্লান্ট থেকে প্রচুর পরিমাণ জৈব-দূষক নদী, হ্রদ প্রভৃতির জলে মুক্ত হয়। জৈব দূষকের উপস্থিতিতে জলে উপস্থিত বায়বীয় ব্যাক্‌টিরিয়ার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। বিপরীতক্রমে ব্যাক্‌টিরিয়া জৈব দূষককে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে। ফলে, ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা জৈব দূষকের অপসারণে জল বিশোধিত হয়।

II. ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা জৈব দূষকের ডিগ্রেডেশান বা হ্রাসে অক্সিজেন প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ব্যাক্‌টিরিয়া জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন (dissolved oxygen)কে জৈব দূষকের

ডিগ্রেডেশানের কাজে লাগায়। ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ক্রমশ কমে যায়। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ ন্যূনতম সহ্য-সীমার নীচে হ্রাস পেলে মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণী অক্সিজেনের অভাবে মারা যায়।

III. জলে অক্সিজেনের পরিমাণ চূড়ান্ত মানে হ্রাস পেলে অবায়বীয় ব্যাক্‌টিরিয়ার (anaerobic bacteria) সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। অবায়বীয় ব্যাক্‌টিরিয়া অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে জৈব দূষকের অবশিষ্ট অংশ এবং মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবভরকে বিশ্লেষিত করে বিষাক্ত গ্যাস (মিথেন এবং হাইড্রোজেন সালফাইড) এবং অস্বাস্থ্যকর গন্ধ উৎপন্ন করে।

গ্রীষ্মকালে জলের পরিমাণ হ্রাস এবং স্রোত কমে যাওয়ার জন্য জৈব-দূষকের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়, ফলে ব্যাক্‌টিরিয়ার দ্বারা জৈব দূষকের ডিগ্রেডেশানের ফলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ অতি-দ্রুত হ্রাস পায়। এছাড়া গ্রীষ্মকালে উচ্চ তাপমাত্রায় দূষকের দ্রুত ক্ষয়ের ফলেও দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পেতে পারে।

নদী, হ্রদ প্রভৃতিতে ব্যাক্‌টিরিয়া দ্বারা জৈব-দূষকের সম্পূর্ণ ডিগ্রেডেশানের পর জল বিশোধিত হয় এবং পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যায়। কিন্তু জৈব-দূষক সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হওয়ার পূর্বে বিভিন্ন উৎস থেকে জৈব-দূষক পুনরায় জলে নিক্ষিপ্ত হলে জল পূর্বের স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতে পারে না। এক্ষেত্রে জলের দূষণ-মাত্রা ক্রমশ বাড়ে।

● **জীব-রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা বা বায়ো-কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড (BOD) ঃ**
কোন পরীক্ষা নমুনায় অক্সিজেন হ্রাসের হার নির্ণয় করে জলে উপস্থিত জৈব-পরিপোষকের ঘনত্ব নির্ণয় করা যায়। এই পরীক্ষা পদ্ধতিতে অক্সিজেন দ্বারা সম্পৃক্ত কিছু পরিমাণ দুষিত জলকে বদ্ধ বোতলে পাঁচ-দিন রেখে দেওয়া হয়। এই অন্তর্বর্তী সময়ে ব্যাক্‌টিরিয়া জলের জৈব পরিপোষককে ডিগ্রেড করে এবং ডিগ্রেডেশানের জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন বোতলের জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন থেকে সংগ্রহ করে। পাঁচ দিনের শেষে বোতলের জলে যে পরিমাণ দ্রবীভূত অক্সিজেন অবশিষ্ট থাকে সেই পরিমাপ থেকে পরীক্ষা শুরুকালীন বোতলের জলে উপস্থিত জৈব-দূষকের পরিমাণ পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, বোতলের নমুনা জল যত বেশি দূষিত হবে পরীক্ষাশেষে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ তত কম হবে। অতএব **ব্যাক্‌টিরিয়া বা আণুবীক্ষণিক জীবের দ্বারা দূষিত জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন হ্রাস হারের পরিমাপ কে 'জীব-রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা' বা BOD বলা হয়।**

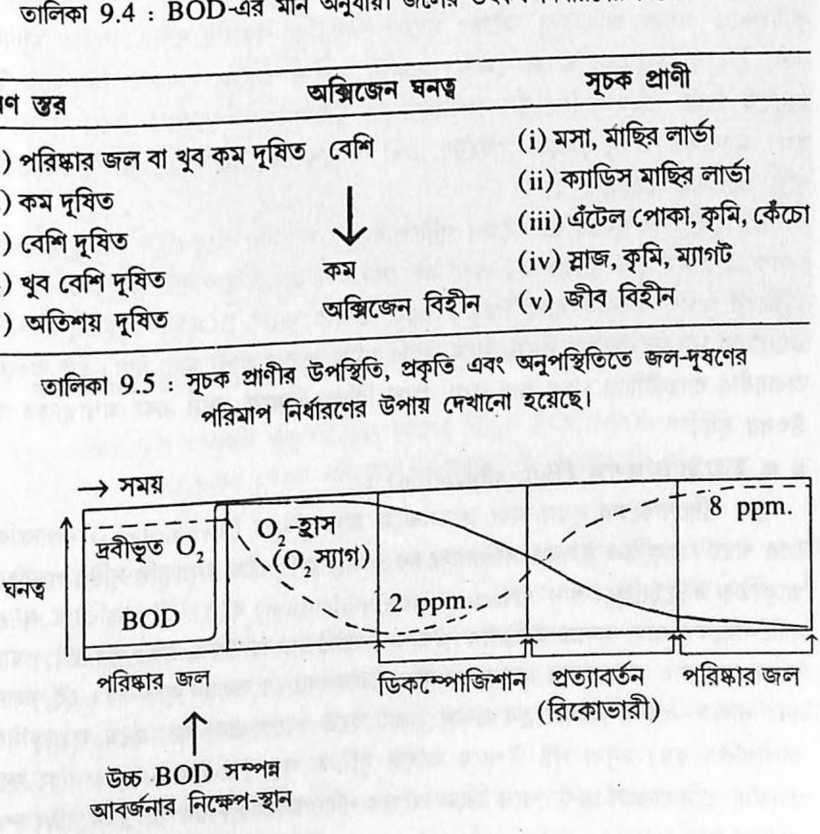
জলের উৎকর্ষ নির্ধারণে BOD নির্দেশক রূপে কাজ করে অর্থাৎ জলে BODএর মান পর্যবেক্ষণ করে জলের উৎকর্ষতা যাচাই করা যায় (তালিকা 9.4)। এছাড়া দূষিত জলে বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর উপস্থিতি দেখেও জলের দূষণ মাত্রা যাচাই করা যায়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রাণী জলের উৎকর্ষ নির্ধারণে সূচক হিসেবে কাজ করে।

নদী		আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট	
BOD ($mg\ dm^{-3}$)	উৎকর্ষ	BOD ($mg\ dm^{-3}$)	উৎকর্ষ
1	খুব ভালো		
2	ভালো	600	অত্যধিক পরিমাণ আবর্জনা
3	মোটামুটি ভালো		
10	খারাপ	350	মধ্যম আবর্জনা
20	খুব খারাপ	200	খুব কম আবর্জনা

তালিকা 9.4 : BOD-এর মান অনুযায়ী জলের উৎকর্ষ নির্ধারণের নির্দেশ সারণী।

দূষণ স্তর	অক্সিজেন ঘনত্ব	সূচক প্রাণী
(1) পরিষ্কার জল বা খুব কম দূষিত	বেশি	(i) মসা, মাছির লার্ভা
(2) কম দূষিত	↓	(ii) ক্যাডিস মাছির লার্ভা
(3) বেশি দূষিত		(iii) এঁটেল পোকা, কৃমি, কেঁচো
(4) খুব বেশি দূষিত	কম	(iv) স্লাজ, কৃমি, ম্যাগট
(5) অতিশয় দূষিত	অক্সিজেন বিহীন	(v) জীব বিহীন

তালিকা 9.5 : সূচক প্রাণীর উপস্থিতি, প্রকৃতি এবং অনুপস্থিতিতে জল-দূষণের পরিমাপ নির্ধারণের উপায় দেখানো হয়েছে।



চিত্র 9.4 : অক্সিজেন হ্রাসের লেখচিত্র (O_2–sag curve) : জলে জৈব-পরিপোষক নিক্ষেপণের পরবর্তী সময়ে জীব-রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা এবং দ্রবীভূত অক্সিজেন হ্রাসের পরিবর্তন দেখানো হয়েছে।

(b) অজৈব-পরিপোষক ঘটিত দূষণ :

অজৈব পরিপোষক যথা নাইট্রোজেন, আয়রন, সালফার, সোডিয়াম, পটাশিয়াম এবং ফসফরাস জলজ উদ্ভিদের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। 'অ্যামোনিয়া' এবং 'নাইট্রেট' রূপে 'নাইট্রোজেন' এবং 'ফসফেট' রূপে ফসফরাস জলজ উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে 'সীমায়ক শর্ত' (limiting factor) হিসেবে কাজ করে (মিষ্টি জলজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ফসফেট এবং লবণাক্ত জলজ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে নাইট্রেট)। তাই কোন কারণে জলে ফসফেট এবং নাইট্রেটের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে জলজ উদ্ভিদ যথা শৈবাল, কচুরীপানা এবং অন্যান্য উদ্ভিদের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়।

I. মনুষ্য সৃষ্ট উৎসই অজৈব-পরিপোষক ঘটিত দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ। কৃষিক্ষেতে প্রযুক্ত অতিরিক্ত অজৈব সারের প্রায় 25 শতাংশ বৃষ্টির জলের মাধ্যমে নদী, হ্রদ বা পুকুরের জলে মেশে। এছাড়া লণ্ড্রীর কাজে ব্যবহৃত ডিটারজেন্টের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ সিন্থেটিক ফসফেট বা ট্রাইফসফেট (TPP) জলে সংক্রমিত হয়। মনুষ্যসৃষ্ট উৎস থেকে নাইট্রেট এবং ফসফেটের নিক্ষেপণে জলজ উদ্ভিদের বৃদ্ধি অতিশয় ত্বরান্বিত হয়।

II. কিন্তু জল দূষণকারী অজৈব পরিপোষকের পরিমাণ কয়েকদিন পর হ্রাস পেলে জলজ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং এই ক্ষেত্রে জলজ উদ্ভিদ মারা যায়। এরপর মৃত উদ্ভিদের উপর বায়বীয় ব্যাক্টিরিয়ার পচন ক্রিয়ায় জলে BODএর মান হ্রাস পায়। BODএর মান চরমমানের নীচে নেমে গেলে সমস্ত জলজ প্রাণী মারা যায়। এই অবস্থায় অবায়বীয় ব্যাক্টিরিয়া পচন শুরু করে, ফলে বিভিন্ন বিষাক্ত গ্যাস এবং অস্বাস্থ্যকর গন্ধ উৎপন্ন হয়।

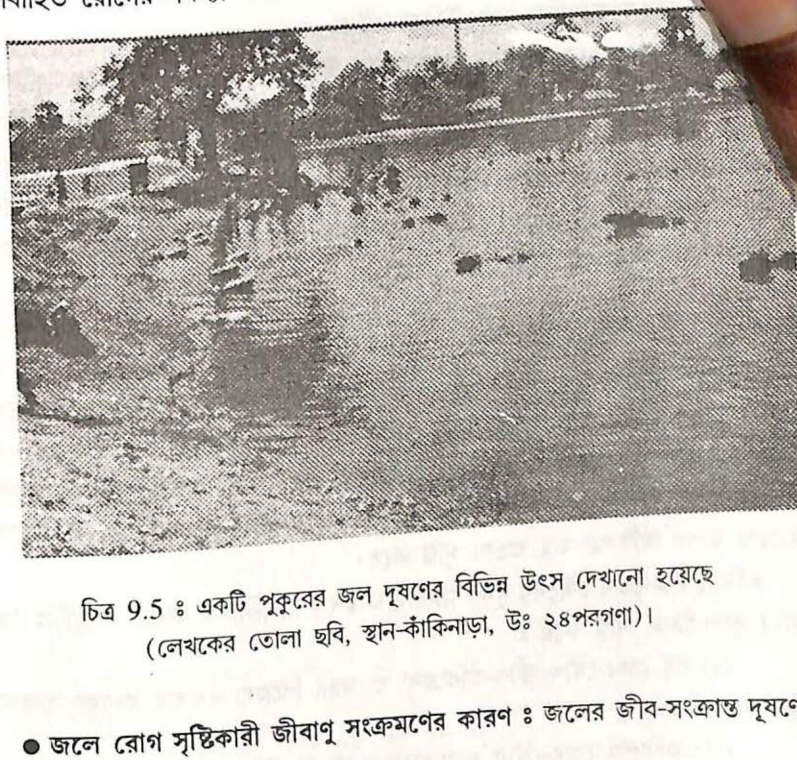
● ● ইউট্রোফিকেশান (Eutrophication) :

হ্রদ পরিপোষকের দূষণ এবং ক্রমসঞ্চয়ে জলাভূমিতে (swamplanu) রূপান্তরিত হতে পারে। প্রাকৃতিক উপায়ে পরিপোষকের সঞ্চয়ে হ্রদ থেকে জলাভূমি সৃষ্টির পদ্ধতিকে **'প্রাকৃতিক ইউট্রোফিকেশান'** (Natural Eutrophication) বলে। এই পদ্ধতিতে অজৈব পরিপোষকের দ্বারা জলজ উদ্ভিদের বৃদ্ধি ও বংশবিস্তার ত্বরান্বিত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে উদ্ভিদ মারা যায় এবং হ্রদের জলস্তরের নীচে জৈবপদার্থের তলানি সৃষ্টি হয়। এই তলানী এবং পলির—যৌথ সঞ্চয়ে হ্রদ ক্রমশ ভরাট হতে থাকে এবং কালক্রমে জলাভূমিতে রূপান্তরিত হয়। মনুষ্য সৃষ্ট উপায়ে অধিক মৃত্তিকা-ক্ষয় (soil erosion) এবং ফার্ম, আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট থেকে জলে অজৈব পরিপোষকের নিক্ষেপণে ইউট্রোফিকেশান ত্বরান্বিত হয়।

9.8.2. জীব-সংক্রান্ত দূষণ (Biological pollution) :

মনুষ্য ক্রিয়াকলাপে বহির্ভাগপৃষ্ঠের জল বিভিন্ন প্যাথোজেনিক অর্গানিজম বা

রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু যথা ভাইরাস, ব্যাক্টিরিয়া, এবং প্রোটোজোয়ার দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। জলের এরূপ দূষণকে **'জীব সংক্রান্ত দূষণ'** বলা হয়। এশিয়া, আফ্রিকা, এবং লাতিন আমেরিকার অনুন্নত রাষ্ট্রে জলবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাব বেশি হলেও অধুনা উন্নত রাষ্ট্রে আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতির ত্রুটি এবং পানীয় জলে জীবাণু সংক্রমণের ফলে জলবাহিত রোগের সমস্যা গুরুতর।



চিত্র 9.5 ঃ একটি পুকুরের জল দূষণের বিভিন্ন উৎস দেখানো হয়েছে
(লেখকের তোলা ছবি, স্থান-কাঁকিনাড়া, উঃ ২৪পরগণা)।

● **জলে রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণু সংক্রমণের কারণ** ঃ জলের জীব-সংক্রান্ত দূষণের কারণ—

(i) অপ্রক্রিয়াকৃত বা বেঠিক প্রক্রিয়াকৃত আবর্জনার সংক্রমণ।

(ii) জলাশয়ের জলে প্রাণীর বর্জ্য পদার্থের প্রত্যক্ষ সংক্রমণ।

(iii) মাংস প্যাকিং প্লান্ট এবং ট্যানিং প্লান্ট থেকে অপ্রক্রিয়াকৃত প্রাণী বর্জ্য পদার্থের জলে নিক্ষেপণ। এবং

(iv) কতিপয় বন্য প্রাণীপ্রজাতির দ্বারা জলবাহিত রোগের বিস্তার।

● **জলবাহিত রোগ** ঃ জলবাহিত রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর সংক্রমণে মানুষের বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি হয়। এই সব রোগে শিশু, যুবক, বৃদ্ধ—সব বয়সের মানুষই অক্রান্ত হয়। কয়েকটি প্রধান জলসংক্রমিত রোগের নাম উল্লেখ করা হল—

(i) ভাইরাল হেপাটাইটিস,

(ii) পোলিও (ভাইরাস ঘটিত),
(iii) টাইফয়েড জ্বর (ব্যাক্‌টিরিয়া ঘটিত),
(iv) অ্যামিবিক ডিসেণ্ট্রি (প্রোটোজোয়া ঘটিত),
(v) কলেরা (ব্যাক্‌টিরিয়া ঘটিত),
(vi) সিসটোসোমিয়াসিস (schistosomiasis) (পরজীবী কৃমি ঘটিত) এবং
(vii) সালমোনেল্লোসিস (ব্যাক্‌টিরিয়া ঘটিত) ।

● **জলের জীব-সংক্রান্ত দূষণ পরিমাপের উপায় ঃ** জলে প্রতিটি রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর পৃথক পরিমাপ, সময় এবং খরচ সাপেক্ষ। সেই কারণে অন্ত্রে প্রাপ্ত **'কলিফর্ম ব্যাক্‌টিরিয়া'র** উপস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে জলের উৎকর্ষ নিরূপণ করা হয়। জলে কলিফর্ম ব্যাক্‌টিরিয়ার সংখ্যা থেকে কত পরিমাণ মল সংক্রমিত হয়েছে তা জানা যায়। আবার কলিফর্ম ব্যাক্‌টিরিয়ার সংখ্যা থেকে মল সংক্রমণে আন্যান্য রোগসৃষ্টিকারী জীবাণুর সংক্রমণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়।

9.8.3. বিষাক্ত জৈব-পদার্থঘটিত দূষণ ঃ

অধুনা প্রায়10000 সিন্থেটিক জৈব-যৌগ বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। এইসব জৈব-যৌগের অধিকাংশই বিভিন্ন উৎস থেকে জলে সংক্রমিত হয় এবং মারাত্মক দূষণ সমস্যা সৃষ্টি করে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জৈব-যৌগ যথা—পেস্টিসাইড, পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল (PCB) এবং পলিসাইক্লিক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (PAH) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর অতিশয় মন্দ প্রভাব সৃষ্টি করে।

● **সিন্থেটিক জৈব যৌগের দূষণ ক্রিয়ার কারণ ঃ** নিম্নলিখিত কারণে সিন্থেটিক জৈব যৌগ দূষণ-ক্রিয়া সৃষ্টি করে ঃ

(i) বহু জৈব-যৌগ জীব-অবিশ্লেষ্য বা মন্থর বিশ্লেষ্য হওয়ায় বহুবছর বাস্তুতন্ত্রে বিদ্যমান থাকে।

(ii) কতিপয় জৈব-যৌগ খাদ্য-শৃঙ্খলে জীববিবর্ধিত হয়।

(iii) কিছু জৈব-যৌগ মানুষের ক্যানসার সৃষ্টি করে এবং কিছু যৌগ জল অসংক্রমণে ব্যবহৃত ক্লোরিনের সঙ্গে বিক্রিয়ায় মনুষ্য কারসিনোজেনে পরিবর্তিত হয়।

(iv) কিছু জৈব-যৌগ মাছ এবং অন্যান্য জলজ প্রাণী ধ্বংস করে।

এবং (v) কিছু যৌগ জল এবং মাছের স্বাদ বা রঙের ক্ষতি করে।

(৭ম অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে বিশদ্ আলোচনা করা হয়েছে।)

9.8.4. বিষাক্ত অজৈব-পদার্থ ঘটিত দূষণ ঃ

অজৈব রাসায়নিক যথা ধাতু, অ্যাসিড, এবং অজৈব লবণ অতি-পরিচিত জলদূষক। পারদ, সীসা, ক্যাডমিয়াম এবং আর্সেনিক মানুষের স্বাস্থ্যের উপর অতিশয় মন্দ প্রভাব

সৃষ্টি করে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অজৈব জলদূষকের উৎস, এবং প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

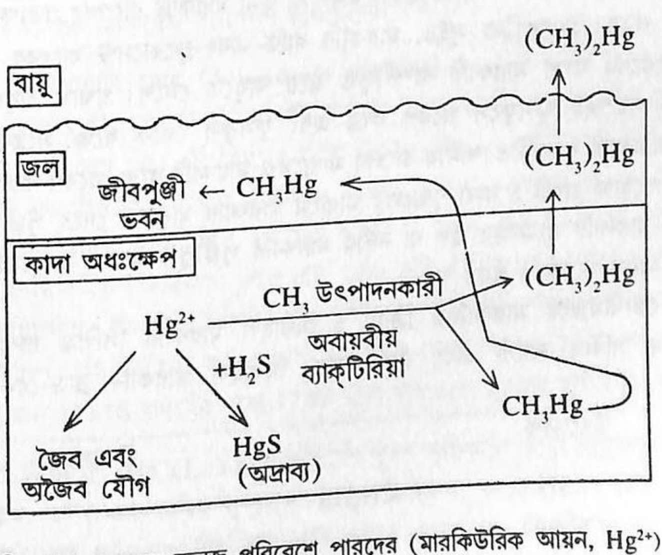
1. পারদ বা মারকারি (Mercury) ঃ যে সমস্ত ধাতু জলের দূষণ সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে পারদ সর্বাপেক্ষা বিষক্রিয়। 1955 সাল পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল পারদ অনুপকারী জলদূষক। কিন্তু 1955 সালের 'মিনামাটা' বিপর্যয়ের পর পারদ সম্পর্কে মানুষের দূষণ সম্পর্কীয় ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বাস্তুতন্ত্র এবং মানুষের স্বাস্থ্যের উপর পারদের পরিবেশগত প্রভাব যথেষ্ট উদ্বেগজনক।

a) দূষণের উৎস ঃ মনুষ্য সৃষ্ট উৎসই পারদের পরিবেশ সংক্রমণের প্রধান কারণ। মানুষের অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপের ফলে প্রতিবছর সমগ্র বিশ্বে 10,000 মেট্রিকটন পারদ জলে এবং বায়ুতে নিক্ষিপ্ত হয়।

I. ভিনাইল ক্লোরাইড প্লাস্টিক-পেন্ট উৎপাদন কারখানা থেকে পারদ উপজাত হিসেবে পয়ঃপ্রণালীর মাধ্যমে নদী, হ্রদ প্রভৃতির জলে নিক্ষিপ্ত হয় (ভিনাইল ক্লোরাইড প্লাস্টিক উৎপাদনে পারদ (Hg^{2+}) অনুঘটক রূপে ব্যবহৃত হয়)।

II. ক্লোর অ্যালকালি প্লান্ট, পাওয়ার প্লান্ট, ভস্মীকরণ কারখানা (ইনসিনারেটর), ল্যাবরেটরী এবং হাসপাতাল থেকে জলীয় বর্জ্য পদার্থের মাধ্যমে পারদ নদী বা হ্রদের জলে মেশে।

b) পরিবেশ বিষক্রিয়া ঃ জলে সংক্রমিত পারদ (Hg^{2+}) নদী বা হ্রদের জলস্তরের নীচে কাদায় বসবাসকারী অবায়বীয় ব্যাক্টিরিয়ার দ্বারা ডাইমিথাইল মারকারি



চিত্র 9.6 ঃ হ্রদের জলজ পরিবেশে পারদের (মারকিউরিক আয়ন, Hg^{2+}) পরিবেশগত রূপান্তর দেখানো হয়েছে।

(CH_3HgCH_3) এবং মিথাইল মারকারি (CH_3Hg)তে পরিবর্তিত হয়। ডাইমিথাইল মারকারি খুব দ্রুত জল থেকে বায়ুতে বাষ্পীভূত হয় এবং মিথাইল মারকারি জলের নীচে অধঃক্ষেপে সঞ্চিত থাকে। মিথাইল মারকারি পর্যায়ক্রমে দ্রবীভূত হয়ে জলে মুক্ত হয়। প্রশম বা আম্লিক জলীয় মাধ্যমে মিথাইল মারকারির উৎপাদন হার ডাইমিথাইল মারকারির তুলনায় অনেক বেশি।



চিত্র 9.7 : জলজ খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে পারদের জীববিবর্ধন সম্পর্কীয় প্রবাহ-ক্রম দেখানো হয়েছে।

মিথাইল মারকারি লিপিড দ্রাব্য হওয়ায় জলজ উদ্ভিদ এবং প্রাণী কোষে জীবপুঞ্জীভূত হয়। ফলে জলজ বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে উচ্চট্রফিক লেভেলের প্রাণীদেহে জীববিবর্ধিত (biomagnified) হয়। জীববিবর্ধিত পারদ পাখি এবং মানুষের নার্ভতন্ত্রের উপর বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে মন্দ-প্রভাব সৃষ্টি করে।

● **মানুষের স্বাস্থ্যের উপর মারকারির বিষক্রিয়াজনিত প্রভাব :**

1. **প্রকট উপায় :** মানুষ প্রধানত দুটি উপায়ে পারদের সংস্পর্শে আসে। **i) প্রত্যক্ষ প্রকট :** বৃত্তিমূলক কাজে লিপ্ত শ্রমজীবী মানুষ বা কর্মী মারকারি বাষ্পের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসতে পারে। ইলেকট্রিক সুইচ, মারকারি বাতি এবং ফ্লুরোসেন্ট বাল্বের অসাবধান প্রক্রিয়াকরণের ফলে মারকারি বাষ্পীভূত হয়ে বায়ুতে মেশে। প্রশ্বাস বায়ুর মাধ্যমে মারকারি সহজেই ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং ফুসফুস থেকে রক্তে সংক্রমিত হয়। এছাড়া মারকারি সংক্রমিত পানীয় জলের মাধ্যমেও মারকারি রক্তে প্রবেশ করতে পারে।

ii) পরোক্ষ প্রকট : খাদ্য-শৃঙ্খলের মাধ্যমে মারকারি মানুষের দেহে পুঞ্জীভূত হয়। মিথাইল মারকারি সংক্রমিত হ্রদ বা নদীর মারকারি পুঞ্জীভূত মাছের মাধ্যমেই পরোক্ষ উপায়ে মানুষ মারকারি গ্রহণ করে।

2. **কোষীয়স্তরে মারকারির ক্রিয়া :** মিথাইল মারকারি লিপিড দ্রাব্য হওয়ায় চর্বিকোষে সঞ্চিত থাকে এবং রক্তে মুক্ত মিথাইল মারকারি ব্লাড-ব্রেন-বেরিয়ার

উৎসেচক—SH (সক্রিয়) + CH_3Hg ⟶ উৎসেচক—S–Hg (নিষ্ক্রিয়) + CH_4

(blood–brain–barrier) অতিক্রম করে মস্তিষ্কের নার্ভ-কোষের উপর ক্রিয়া করে। মারকারি বিষক্রিয়ার মূল কারণ কোষীয় প্রোটিন বা উৎসেচকের স্থায়ী-নিষ্ক্রিয়করণ (permanent inactivity)। **এক্ষেত্রে প্রোটিন বা উৎসেচক সংগঠনকারী যে সব অ্যামিনোঅ্যাসিডের সালফ্‌হাইড্রিল মূলক (–SH) রয়েছে সেইসব অ্যামিনো অ্যাসিডের সঙ্গে মারকারি স্থায়ীভাবে বিক্রিয়া করে।** সালফ্‌হাইড্রিল মূলকের হাইড্রোজেন মারকারি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। মারকারি সংযুক্তির ফলে প্রোটিন বা উৎসেচকের আণবিক গঠন পরিবর্তিত হয়। **মিথাইল মারকারি মাতার শরীর থেকে অমরার মাধ্যমে ভ্রূণে প্রবেশ করতে পারে। এইক্ষেত্রে ভ্রূণ-মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।**

3. **মানুষের স্বাস্থ্যের উপর মারকারির মন্দ-প্রভাব ঃ** মানুষের স্বাস্থ্যের উপর মারকারির মন্দপ্রভাবের মূল কারণ মস্তিষ্কের উপর মিথাইল মারকারির বিষক্রিয়া এবং কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের অক্রিয়তা বা অস্বাভাবিক ক্রিয়া। মানুষের স্বাস্থ্যের উপর মারকারির মন্দ প্রভাবগুলি হচ্ছে—

(i) পেশীর চেষ্টীয় নিয়ন্ত্রণের (motor control) অক্ষমতা।

(ii) পদ (হাত এবং পা), জিভ এবং ঠোঁটের অসাড়তা।

(iii) অনীহা এবং উত্তেজিতা।

(iv) মানসিক দৌর্বল্য এবং বৈকল্য।

(v) দৃষ্টিহীনতা এবং বধিরত্ব।

(vi) বাক্‌-বিঘ্নতা। এবং

(vii) ভ্রূণ-মস্তিষ্কের অসম্পূর্ণ বৃদ্ধি, হানি ইত্যাদি।

● **মিনামাটা রোগ (Minamata disease) ঃ**

1955 খ্রীঃ জাপানের মিনামাটা সমুদ্রের উপকূলবর্তী গ্রামের মানুষ এক অজানা রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগের প্রধান উপসর্গ ছিল—পেশীর অক্রিয়তা, হাত, পা, ঠোঁট এবং জিবের অসাড়তা, দৃষ্টিবিভ্রম, বধিরত্ব, অনীহা, স্মৃতিবৈকল্য এবং উত্তেজিতা। রোগের কারণ উদ্ভবজনিত সমীক্ষায় সর্বপ্রথম জানা গেল মিনামাটা সমুদ্রে পারদ সংক্রমণজনিত বিষক্রিয়ার ফলে এই রোগ সৃষ্টি হয়েছে। যে সকল মানুষ দীর্ঘদিন নিয়মিতভাবে মিনামাটা সমুদ্রের মাছ ভক্ষণ করত তারাই পারদ বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিল। এই বিষক্রিয়া জনিত রোগ **'মিনামাটা রোগ'** নামে পরিচিত। খবরে প্রকাশিত 52 জন আক্রান্ত মানুষের মধ্যে 17জন মারা যায় এবং 23জন স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়।

2. **সীসা বা লেড (Lead) ঃ** পরিবেশ দূষণ সৃষ্টিকারী ভারী ধাতুগুলির মধ্যে সীসা অন্যতম, যদিও মারকারির তুলনায় সীসার বিষক্রিয়া অনেক কম। মৌল সীসা জলে অদ্রাব্য, তাই পরিবেশে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে না। সীসার দ্বি-যোজ্যতা সম্পন্ন আয়নই (Pb^{2+}) কেবল জলে দ্রাব্য এবং পরিবেশগত ভাবে বিষক্রিয়। তাই মৌল সীসা

iv) **আকাশ পরিবহন ঃ** স্থল-পরিবহন ব্যতীত আকাশ পরিবহন জনিত কারণেও শব্দ-দূষণ ঘটে। বিমান বন্দরে রানওয়েতে বিমান চালু করার সময় এবং আকাশপথে উড়বার সময় ভয়ানক শব্দ দূষণ সৃষ্টি হয় (110 dB)। অপেক্ষাকৃত বড় এবং গতিশীল জেট বিমান সৃষ্ট শব্দ দূষণের মাত্রা অনেক বেশি। অধুনা প্রচলিত পাশ্চাত্যের সুপারসোনিক এয়্যারক্র্যাফ্‌ট (যথা অতিশয় দ্রুতগতিসম্পন্ন 'কংকর্ড) যন্ত্রণাদায়ক শব্দ দূষণের সৃষ্টি করে।

v) **কথোপকথন ঃ** মানুষের উচ্চ-স্বরে কথা বলার সময়ও শব্দ দূষণ সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক স্বরে মানুষের কথোপকথনের সময় শব্দ দূষণ উৎপন্ন হয় না (60 dB), কিন্তু কোন জমায়েত স্থলে, অফিসে, বার-রেস্টুরেন্টে, শিক্ষায়তনে উচ্চস্বরে কথা বলার ফলে যন্ত্রণাদায়ক শব্দ দূষণের সৃষ্টি হতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর পুরুষ-স্বরের তুলনায় অধিক যন্ত্রণাদায়ক বা শব্দ-দূষক। কারণ পুরুষ-স্বরের গড় কম্পাঙ্ক 120 Hz, সেক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের স্বরের গড় কম্পাঙ্ক 250 Hz। তাই স্ত্রীলোকের স্বর পুরুষের স্বরের তুলনায় অধিক তীক্ষ্ণ। রক মিউজিকের ক্ষেত্রে ভীষণ শব্দ-দূষণ সৃষ্টি হয়।

vi) **সামাজিক কারণ ঃ**

a) মিটিং, মিছিল প্রভৃতিতে মাইকের মাধ্যমে বক্তৃতা বা পুজো-পার্বণে বিবাহাদিতে এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত মাইকের উচ্চ-তীব্র শব্দে মানুষের ক্ষতি হয়।

b) পুজোপার্বণে, প্রতিমা বিসর্জনের সময় বা কোন আনন্দ সংবাদে এবং দেওয়ালির সময় আতশবাজি পোড়ানোর রীতি এখনও অব্যাহত এবং ক্রমবর্ধমান। কিন্তু আতশবাজি পোড়ানোর ফলে ভয়াবহ বায়ুদূষণের সঙ্গে সঙ্গে আতশবাজির অনিয়মিত এবং তীব্র শব্দে অবর্ণনীয় শব্দ-দূষণ ঘটে, যা মানুষের অসংশোধনযোগ্য ক্ষতি করে।

c) রেডিও, টেলিভিশান, খেলাধূলা, জঞ্জাল অপসারণ এবং ধৌতকরণ ক্রিয়ায়ও শব্দ-দূষণের সৃষ্টি হয় (75—120 dB)।

12.7 সাধারণ শব্দের তীব্রতা পরিমাপক ডেসিবেল স্কেল (মানদণ্ড) এবং শব্দ-দূষণ ঃ

শ্রবণানুভূতি সৃষ্টিকারী সাধারণ শব্দের **'ন্যূনতম তীব্রতা'** (Threshold intensity) বা **'প্রমাণ তীব্রতা মাত্রা'** (Standard intensity level) **"অ্যাকাসটিক্যাল সোসাইটি অব আমেরিকা"** (Acoustical Society of America) দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। অ্যাকাসটিক্যাল সোসাইটি অনুসারে সাধারণ শব্দের শ্রবণানুভূতি সৃষ্টিকারী প্রমাণ তীব্রতা মাত্রা হচ্ছে '0' (শূন্য) ডেসিবেল (Zero decibel)। সোসাইটিকৃত এই ডেসিবেল-স্কেল তীব্রতা মানের একটি লগ্ স্কেল (log scale)। এই স্কেল অনুসারে শব্দের তীব্রতা মাত্রা 0-140 ডেসিবেলের যে কোন মাত্রায় কানের শ্রুতি-গ্রাহক অঙ্গ—**"অর্গ্যান অব্ কর্টির"** ক্ষতি

হতে পারে। এই ক্ষতির মাত্রা ডেসিবেল স্কেলের উচ্চতম তীব্রতা মাত্রায় (70-140 ডেসিবেল) সর্বাপেক্ষা বেশি। বিভিন্ন মনুষ্যসৃষ্ট শব্দের উৎস থেকে নির্গত শব্দের তীব্রতামান এবং শব্দানুভূতির প্রকৃতি ডেসিবেল-স্কেলে পর্যায়ক্কিত করা হয়েছে।

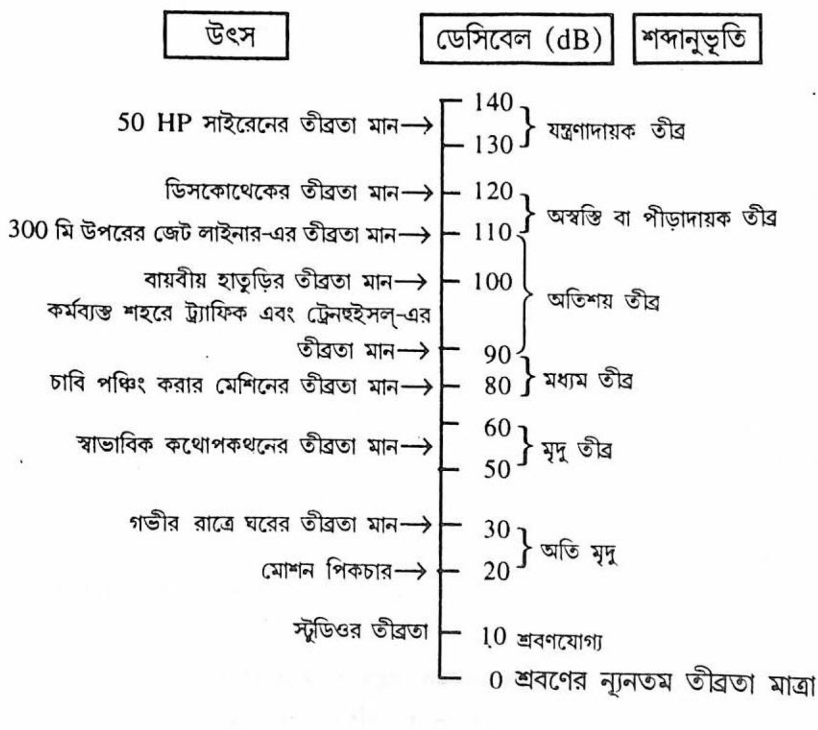
- **ডেসিবেল কি?**

'বেল' (bel) এবং **'ডেসিবেল'** হচ্ছে শব্দের তীব্রতা নির্দেশক একক। শব্দ এবং প্রমাণ শব্দের তীব্রতার অনুপাতের লগ (log) কে 'বেল' বলা হয়। যেহেতু এক **'ডেসিবেল'** (decibel) হচ্ছে 0.1'**বেল**' ; তাই শব্দের তীব্রতা এবং প্রমাণ শব্দের তীব্রতার 10 লগ্‌কে এক ডেসিবেল বলা হয়, অর্থাৎ

$$\text{ডেসিবেল (dB) সংখ্যা} = 10 \log \frac{\text{শব্দের তীব্রতা}}{\text{প্রমাণ শব্দের তীব্রতা}}$$

- **শ্রবণানুভূতি সৃষ্টিকারী ন্যূনতম তীব্রতামাত্রা ঃ**

শূন্য ডেসিবেল ('0' dB), 0.000204 ডাইন/সেমি^{2} চাপে।



চিত্র 12.4 ঃ সাধারণ শব্দের তীব্রতা মানের 'ডেসিবেল স্কেল' এবং শব্দানুভূতি দেখানো হয়েছে।

বা সীসার যৌগ জলে দ্রাব্য স্থায়ী Pb^{2+} উৎপাদনের মাধ্যমেই মানুষ তথা জীবের উপর মন্দ-প্রভাব সৃষ্টি করে।

a) **দূষণ উৎস ঃ i) স্টোরেজ ব্যাটারি ঃ** মোটর গাড়িতে ব্যবহৃত স্টোরেজ ব্যাটারির ইলেকট্রোড তৈরিতে মৌল সীসা এবং সীসার অক্সাইড (লেড অক্সাইড, PbO_2) ব্যবহার করা হয়। স্টোরেজ ব্যাটারি উৎপাদনে পুরনো ব্যাটারির সীসা পুনরায় কাজে লাগানো হয় অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সীসার পুনরাবর্তন (recycling) ঘটানো হয়। কিন্তু অসতর্ক পুনরাবর্তন প্রক্রিয়ার ফলে সীসা পরিবেশে মুক্ত হয়। এছাড়া যে সব স্টোরেজ ব্যাটারির পুনরাবর্তন ঘটানো হয় না সেগুলি পৌরপ্রতিষ্ঠানের বর্জ্য পদার্থের সঙ্গে পরিবেশে পরিত্যক্ত হয়। ফলে সীসা কালক্রমে পরিবেশে সংক্রমিত হয়।

জলে বা মৃত্তিকায় সংক্রমিত সীসা থেকে দ্রাব্য Pb^{2+} উৎপন্ন হয়। Pb^{2+} জলজ বা স্থলজ উদ্ভিদ কতৃক সহজেই সংগৃহীত হয়। উদ্ভিদ থেকে খাদ্য-শৃঙ্খলের মাধ্যমে মানুষের দেহ কোষে সীসা সংবাহিত এবং সঞ্চিত হয়।

(ii) **পেট্রোলের দহন ঃ** পেট্রোলের মধ্যে অশুদ্ধি হিসেবে সামান্য পরিমাণ সীসা মিশ্রিত থাকে। মোটর-গাড়িতে পেট্রোলের দহনের ফলে উৎপন্ন সীসা একঝসট্‌স গ্যাসের মাধ্যমে বায়ুতে নিক্ষিপ্ত হয়। বৃষ্টির মাধ্যমে বায়ুতে ভাসমান সীসাকণা পুকুর, হ্রদ, নদী, সমুদ্র এবং স্থলভাগের মৃত্তিকায় অধঃক্ষিপ্ত হয়। জল এবং মৃত্তিকা থেকে সীসা খাদ্য-শৃঙ্খলে প্রবেশ করে।

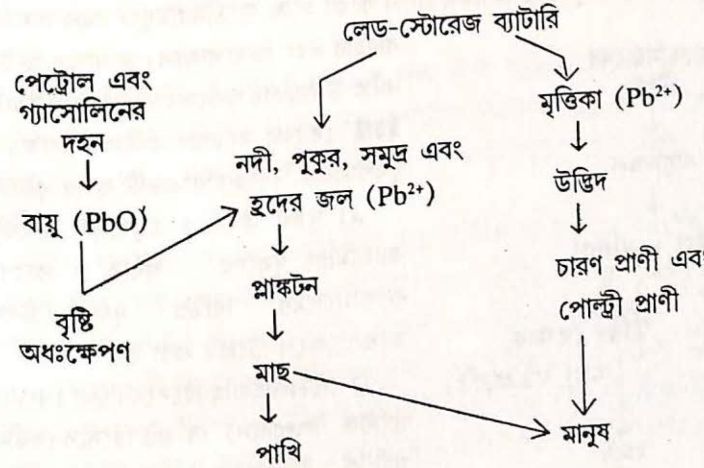
(iii) **গ্যাসোলিনের দহন ঃ** উন্নত রাষ্ট্রে মোটরগাড়ির জ্বালানি হিসেবে গ্যাসোলিন ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ইঞ্জিন স্টার্টকরাকালীন ইঞ্জিনের আকস্মিক আঘাত প্রতিহত করার জন্য গ্যাসোলিনের সঙ্গে সামান্য পরিমাণ **'টেট্রাঅ্যালকিল লেড'** (PbR_4) মেশানো হয়। গ্যাসোলিনের দহনের সময় **'টেট্রাঅ্যালকিল লেড'** থেকে সীসা উৎপন্ন হয় এবং উৎপন্ন সীসা লেডডাইহ্যালাইড (PbBrCl) রূপে বায়ুতে নিক্ষিপ্ত হয়। পরবর্তী পর্যায়ে সৌর-আলোকের উপস্থিতিতে লেডডাইহ্যালাইড লেডঅক্সাইডে পরিবর্তিত হয়। বাতাসে লেডঅক্সাইডের কণা অ্যারোসল উৎপন্ন করে। লেডঅক্সাইড বৃষ্টির মাধ্যমে জল এবং মৃত্তিকায় অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং উৎপন্ন লেডআয়ন জলজ ও স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করে।

$$PbR_4 \rightarrow [Pb] \rightarrow PbBrCl \xrightarrow{\text{সূর্যালোক}} PbO$$

● উন্নত রাষ্ট্রে সীসার দূষণ হ্রাসে অধুনা ট্রেট্রাঅ্যালকিল লেডের পরিবর্তে গ্যাসোলিনের সঙ্গে MMT (**মিথাইল সাইক্লোপেন্টাডাইইনাইল ম্যাঙ্গানীজ ট্রাইকার্বোনিল**) মেশানো হয়।

(iv) **পেস্টিসাইড ঃ** পরিবেশে সীসার অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে 'লেড আর্সেনেট' $[Pb_3(AsO_4)_2]$ পেস্টিসাইডের ব্যবহার।

(v) সীসার আস্তরণযুক্ত টিনের ক্যানে কোন আম্লিক পানীয় রাখার ফলে পানীয় তরলে সীসা সংক্রমিত হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে সীসার আস্তরণযুক্ত জলসরবরাহকারী পাইপলাইন থেকে সীসা পানীয় জলে সংক্রমিত হয়।



চিত্র 9.8 ঃ উৎস থেকে মানুষের দেহে সীসা'র পরিবেশ সংক্রমণ-জনিত প্রবাহক্রম দেখানো হয়েছে।

b) **মানুষের স্বাস্থ্যের উপর সীসার মন্দ প্রভাব ঃ** সীসা বিপাকীয় বিষ হিসেবে কাজ করে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা'র (WHO) রিপোর্ট অনুসারে পানীয় জলে সীসার সীমামান 50 ppb। এই সীমা মানের অধিক সীসা মানুষের দেহে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। খাদ্য-শৃঙ্খলজনিত জীববিবর্ধন এবং পানীয় জলে সীসার সংক্রমণের ফলে নিম্নলিখিত প্রভাব সৃষ্টি হয়।

i) সীসা হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষে সাহায্যকারী 'ALA-সিন্থেজ' (Amino Levulinic Acid–Synthase) উৎসেচককে নিষ্ক্রিয় করে হিমোগ্লোবিন উৎপাদনে বাধা দেয়। ফলে অ্যানিমিয়া সৃষ্টি হয়।

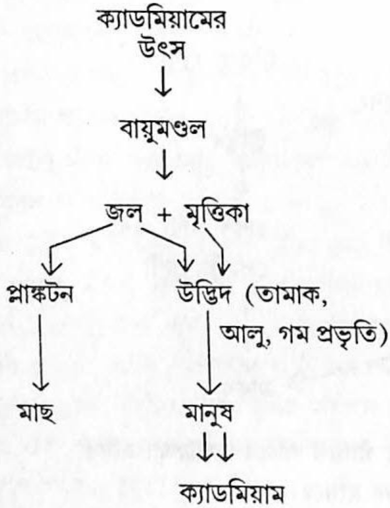
ii) সীসার উচ্চ-ঘনত্বে বৃক্কের কাজ বিঘ্নিত হয় এবং স্থায়ীভাবে মস্তিষ্কের কোষ বিনষ্ট হয়।

iii) রক্তে সীসার অধিক ঘনত্বে রক্তচাপের বৃদ্ধি ঘটে।

iv) পেশাগত কারণে সীসা-সংক্রমিত স্ত্রীলোকের গর্ভপতন ঘটে বা মৃত সন্তান প্রসব হয়।

v) সাতবছরের চেয়ে কম বয়সের শিশুর সীসার প্রতি অধিক সংবেদনশীলতা দেখা যায়। এই বয়সের শিশুদের সীসার প্রভাবে মস্তিষ্কের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এছাড়া সীসার প্রভাবে শিশুদের আই.কিউ. (IQ) হ্রাস পায়।

3. **ক্যাডমিয়াম (Cadmium) ঃ** মনুষ্যসৃষ্ট ক্রিয়াকলাপে পরিবেশে সংক্রমিত ক্যাডমিয়াম মানুষের উপর মন্দ প্রভাব সৃষ্টি করে। ক্যাডমিয়াম আয়নিত অবস্থায় (ক্যাডমিয়াম আয়ন, Cd^{2+}) জলে দ্রাব্য এবং পরিবেশগতভাবে বিশেষ সক্রিয়। ক্যাডমিয়ামসৃষ্ট পরিবেশ দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ক্যাডমিয়ামযুক্ত বস্তুর অসতর্ক ব্যবহার এবং ডিসপোজাল। জাপানের জিন্টসু নদীর উপত্যকায় বসবাসকারী মানুষের 'ইটাই-ইটাই' রোগের সংক্রমণ ক্রনিক ক্যাডমিয়াম দূষণজনিত বিষক্রিয়ার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।



চিত্র 9.9 ঃ ক্যাডমিয়ামের পরিবেশ স্থানান্তর দেখানো হয়েছে।

a) দূষণ উৎস ঃ মনুষ্যসৃষ্ট উৎসই ক্যাডমিয়াম দূষণের প্রধান কারণ। ক্যাডমিয়ামের বিভিন্ন দূষণ উৎস অতিসংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

i) স্টেবিলাইজার হিসেবে (যথা ঃ PVC প্লাস্টিক উৎপাদনে) বা রঙ হিসেবে (রঙীন প্লাস্টিক উৎপাদনে) ক্যাডমিয়াম যৌগ ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারের পর ক্যাডমিয়াম সমৃদ্ধ প্লাস্টিক বর্জ্য-পদার্থরূপে পরিবেশে নিক্ষিপ্ত হয়। পৌরপ্রতিষ্ঠানের জৈবপদার্থের সঙ্গে প্লাস্টিক যখন ভস্মীকরণ করা হয় বা পুড়িয়ে ফেলা হয়, তখন ক্যাডমিয়াম পরিবেশে মুক্ত হয়।

ii) আকরিক থেকে জিঙ্ক নিষ্কাশনের সময় উপজাত হিসেবে ক্যাডমিয়াম উৎপন্ন হয়। ফলে জিঙ্ক নিষ্কাষণ কারখানার সন্নিহিত অঞ্চলের পরিবেশে ক্যাডমিয়াম সংক্রমিত হয়।

iii) ক্যাডমিয়াম প্লেটেড ইস্পাতের পুনরাবর্তনের সময় উচ্চ তাপে কিছু পরিমাণ ক্যাডমিয়াম উদ্বায়ীকৃত হয়।

iv) কৃষিজমিতে প্রযুক্ত ফসফেট সারের সঙ্গে কিছু পরিমাণ ক্যাডমিয়াম প্রাকৃতিক সংক্রামক হিসেবে উপস্থিত থাকে। ফলে মৃত্তিকা ক্যাডমিয়াম দ্বারা দূষিত হয়।

v) ক্যালকুলেটার এবং সমস্থানীয় যন্ত্রের ব্যবহৃত রিচার্জেবল নিকাড ব্যাটারির ('NICAD'—নিকেল এবং ক্যাডমিয়াম) ইলেকট্রোড তৈরি হয় ক্যাডমিয়াম দ্বারা (প্রতিটি ব্যাটারিতে প্রায় 5 গ্রাম ক্যাডমিয়াম থাকে)। ব্যবহারের শেষে নিকাড ব্যাটারি বর্জ্য পদার্থরূপে আবর্জনার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। আবর্জনা ভস্মীকরণের সময় নিকাড ব্যাটারির দহনে ক্যাডমিয়াম মৌল 'কণাকারে' বায়ুতে সংক্রমিত হয়।

b) মানুষের শরীরে ক্যাডমিয়ামের সংক্রমণ বা প্রকট ঃ

i) বায়ুমণ্ডলে বিক্ষিপ্ত ক্যাডমিয়াম-কণা বৃষ্টির মাধ্যমে জলে এবং মৃত্তিকায় অধঃক্ষিপ্ত হয়। ক্যাডমিয়াম সাধারণত 'ক্যাডমিয়াম আয়নরূপে (Cd^{2+}) জলে দ্রবীভূত থাকে। ফলে প্রশ্বাস-বায়ু এবং পানীয় জলের মাধ্যমে ক্যাডমিয়াম সরাসরি মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে।

ii) ক্যাডমিয়াম সংক্রমিত সেচের জল এবং মৃত্তিকা থেকে বেশ কিছু উদ্ভিদ ক্যাডমিয়াম সংগ্রহ করে। ফলে খাদ্য-শৃঙ্খলের মাধ্যমে মানুষের শরীরে ক্যাডমিয়াম পরিবাহিত হয়। এক্ষেত্রে ক্যাডমিয়ামের জীব-স্থানান্তর ঘটে কিন্তু **জীবপুঞ্জীভবন** ঘটে না।

আলু, দানাশস্য যথা—চাল, গম এবং ডাল প্রভৃতির মাধ্যমে মানুষের শরীরে ক্যাডমিয়াম প্রবেশ করে। মাছ এবং মাংস (বিশেষ করে বৃক্ক) প্রভৃতি প্রাণী খাদ্যের মাধ্যমেও যথেষ্ট পরিমাণ ক্যাডমিয়াম মানুষের শরীরে প্রবেশ করে (100 μg/kg)।

iii) ধূমপায়ী মানুষের ক্যাডমিয়াম প্রকট বেশ উদ্বেগজনক। তামাক গাছ (Tobacco Plant) জল এবং মৃত্তিকা থেকে ক্যাডমিয়াম শোষণ করে পাতায় সঞ্চিত রাখে। ধূমপানের সময় তামাক পাতার দহনে ক্যাডমিয়াম কণা ধোঁয়াতে মুক্ত হয় এবং ধোঁয়ার মাধ্যমে ধূমপায়ীর শরীরে ক্যাডমিয়াম প্রবেশ করে।

c) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ক্যাডমিয়ামের প্রভাব ঃ ক্যাডমিয়ামের অ্যাকিউট প্রকট অতিশয় ক্ষতিকারক। মানুষের ক্ষেত্রে ক্যাডমিয়ামের মারণ মাত্রা (Lethal dose) প্রায় 1 গ্রাম। লঘুমাত্রার দীর্ঘস্থায়ী প্রকটে ক্যাডমিয়াম সৃষ্ট ক্রনিক বিষক্রিয়ার উপসর্গগুলি নিম্নলিখিত ঃ

i) ক্যাডমিয়ামের ক্রনিক বিষক্রিয়ায় মানুষের সন্ধিস্থানে তীব্র যন্ত্রণার সৃষ্টি হয়।

ii) অস্থি ক্রমশ ছিদ্রযুক্ত, বায়ব এবং ভঙ্গুর হয়, ফলে অল্প বাহ্যিক আঘাতে অস্থি সহজেই ভেঙ্গে যায় এবং অক্রিয় হয়ে পড়ে। অস্থির এই গঠনপরিবর্তনের মূল কারণ ক্যাডমিয়াম দ্বারা অস্থি-ক্যালসিয়ামের প্রতিস্থাপন। যেহেতু ক্যালসিয়াম এবং ক্যাডমিয়াম আয়নের আধান এবং আয়তন একই, তাই কিছু পরিমাণ অস্থি-ক্যালসিয়াম ক্যাডমিয়াম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

iii) ক্যাডমিয়াম বিষক্রিয়ায় রক্তচাপের বৃদ্ধি ঘটে।

iv) জিঙ্ক-অপরিহার্য উৎসেচকের গঠন থেকে জিঙ্ক ক্যাডমিয়াম দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে, কারণ জিঙ্ক এবং ক্যাডমিয়াম সমধর্ম বিশিষ্ট মৌল (পর্যায় সারণীতে অভিন্ন সাব-গ্রুপে অবস্থিত) এবং উভয় মৌলের স্বাভাবিক আয়ন আধান +2। উৎসেচকের গঠন থেকে জিঙ্ক অপসারিত হওয়ার ফলে উৎসেচকের ক্রিয়া বিঘ্নিত হয়, ফলে বিপাকীয় অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি হয়।

v) ক্যাডমিয়ামের প্রভাবে বৃক্ক এবং ফুসফুসের স্বাভাবিক ক্রিয়া বিঘ্নিত হয়।

● **মেটালোথিওনিন এবং ক্যাডমিয়ামের বিষক্রিয়া প্রতিরোধ ঃ**

সালফার সমৃদ্ধ প্রোটিন—**'মেটালোথিওনিন'** (metallothionein)মানুষের লঘুমাত্রার ক্রনিক ক্যাড়মিয়াম—বিষক্রিয়া প্রতিরোধে সক্ষম। এই প্রোটিনের মুখ্য কাজ শরীরে দস্তার স্বাভাবিক বিপাক নিয়ন্ত্রণ রাখা। মেটালোথিওনিন প্রোটিনের বহুসংখ্যক –SH গ্রুপ থাকার ফলে শরীরে প্রবিষ্ট সমস্ত ক্যাডমিয়ামের সঙ্গে মেটালোথিওনিন জটিল উৎপন্ন করতে পারে। **'মেটালোথিওনিন-ক্যাডমিয়াম জটিল'** অবশেষে মূত্রের মাধ্যমে দেহ থেকে অপসারিত হয়।

● **ইটাই-ইটাই বা আউচ-আউচ রোগ** (Itai-Itai or Ouch Ouch Disease) ঃ 1968 সালে জাপানের জিন্টসু নদীর উপত্যকা অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ (বিশেষ করে বয়স্কা স্ত্রীলোক যাদের সন্তান-সন্ততির সংখ্যা একাধিক এবং খাদ্য-মান অতিশয় নিম্নমানের) ক্যাডমিয়াম দূষণজনিত একটি বিশেষ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়। এই রোগকে ইটাই-ইটাই বা আউচ-আউচ রোগ বলা হয়। শতাধিক মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়।

জিন্টসু উপত্যকায় বসবাসকারী অধিবাসীদের মূল খাদ্য-শস্য ছিল চাল। জিন্টসু নদীর জল স্থানীয় ধানচাষে সেচের কাজে ব্যবহার করা হত। কিন্তু নদী পাশ্ববর্তী জিঙ্ক খনি এবং জিঙ্ক নিষ্কাশন কারখানা থেকে নিঃসৃত ক্যাডমিয়ামের সংক্রমণে জিন্টসু নদীর জল ছিল মারাত্মক দূষিত। তাই ক্যাডমিয়াম-দূষিত সেচের জলে উৎপন্ন চালে ক্যাডমিয়ামের সংক্রমণ থাকত যথেষ্ট। জিন্টসু-উপত্যকার অধিবাসীরা অজান্তেই চালের মাধ্যমে ক্যাডমিয়াম সংগ্রহ করত। বহু বছর ধরে শরীরে ক্যাডমিয়ামের সঞ্চয় জনিত কারণে ইটাই-ইটাই রোগে আক্রান্ত মানুষের প্রতিদিনের সংগৃহীত ক্যাডমিয়ামের পরিমাণ ছিল প্রায় 600 মাইক্রোগ্রাম। ইটাই-ইটাই রোগের প্রধান উপসর্গ হচ্ছে—

i) সন্ধিতে যন্ত্রণা।

ii) অস্থির ক্ষয় এবং ভঙ্গুরতা।

iii) রেচনক্রিয়ায় (বৃক্কীয়) বিঘ্ন।

iv) অগভীর ও অনিয়মিত শ্বসন এবং

v) উচ্চ রক্ত-চাপ।

4) আর্সেনিক (Arsenic) ঃ

অধুনা বিশ্বের সর্বত্র কম-বেশি আর্সেনিক সংক্রমণের ঘটনা ঘটছে। পানীয় জল, বিশেষ করে ভূগর্ভ জলই (গ্রাউণ্ড ওয়াটার) মানুষের আর্সেনিক সংক্রমণের প্রধান উৎস। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ঘোষিত পানীয় জলে আর্সেনিকের প্রমাণ-মাত্রা 0.05 mg/L হলেও বিশ্বের বহু জায়গায় পানীয়জলে আর্সেনিকের পরিমাণ উক্তমাত্রার তুলনায় বহুগুণ

বেশি। যেহেতু আর্সেনিক অতিবিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ তাই উচ্চমাত্রার অ্যাকিউট প্রকটে মানুষের মৃত্যু এবং স্বল্পমাত্রার দীর্ঘস্থায়ী বা ক্রনিক প্রকটে মানুষের স্বাস্থ্যের অপরিবর্তনীয় হানি ঘটে। আর্সেনিকের ত্রিযোজী (As-III) এবং পঞ্চমযোজী (As-V) অবস্থাই বিষক্রিয়া সৃষ্টিতে সর্বাধিক উপযোগী।

a) পরিবেশসম্পর্কীয় উৎস ঃ

i) আর্সেনিক উদ্ভূত পেস্টিসাইড যৌগের অবাধ ব্যবহারের ফলে মৃত্তিকা এবং জল আর্সেনিক দ্বারা সংক্রমিত হয়। বহুল ব্যবহৃত আর্সেনিক যুক্ত ইনসেক্টিসাইড-, লেড আর্সেনেট (As-V) এবং হার্বিসাইড-, ক্যালসিয়াম আর্সেনেট (As-V), সোডিয়াম আর্সেনাইট (As-III) এবং প্যারিস গ্রীণ (As-III) হচ্ছে আর্সেনিক দূষণ সৃষ্টিকারী উল্লেখযোগ্য পেস্টিসাইড।

ii) আকরিক থেকে সোনা এবং সীসা নিষ্কাশনের সময় কিছু পরিমাণ আর্সেনিক পরিবেশে মুক্ত হয়। কারণ সোনা এবং সীসার আকরিকের সঙ্গে আর্সেনিক উপস্থিত থাকে।

iii) কয়লাতে আর্সেনিক অশুদ্ধি হিসেবে উপস্থিত থাকে। তাই কয়লা দহনের ফলেও আর্সেনিক বায়ুমণ্ডলে মুক্ত হয়।

iv) পানীয় জল, বিশেষ করে ভূগর্ভ-জলই মানুষের শরীরে আর্সেনিক পুঞ্জীভবনের প্রধান উৎস। পানীয় জলে অজৈব আর্সেনিকের গড় পরিমাণ প্রায় 2.5ppb। একজন প্রাপ্তবয়স্ক স্বাভাবিক মানুষের দৈনিক পানীয় জল গ্রহণের পরিমাণ 1.6 লিটার হলে ঐ ব্যক্তির শরীরে দৈনিক প্রবিষ্ট আর্সেনিকের পরিমাণ হবে প্রায় 4 মাইক্রোগ্রাম। আর্সেনিক অ্যাসিড (H_3AsO_4) বা ডিপ্রোটোনেটেড আকারে আর্সেনিক জলে উপস্থিত থাকে।

b) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ঃ

i) আর্সেনিক একটি অতিপরিচিত 'মনুষ্য কারসিনোজেন'। পানীয় এবং খাদ্যের মাধ্যমে আর্সেনিক শরীরে প্রবেশ করলে ফুসফুস, যকৃৎ, বৃক্ক, মূত্রথলী এবং ত্বকের ক্যানসার সৃষ্টি হতে পারে। ধূমপান আর্সেনিক প্রভাবিত ক্যানসারের সম্ভাবনাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করে।

ii) আর্সেনিকের অ্যাকিউট বিষক্রিয়ায় বমি, ডায়েরিয়া এবং পাক-অন্ত্রের অপরিবর্তনীয় ক্ষতি হয়।

iii) আর্সেনিকের ক্রনিক বিষক্রিয়ার অন্যতম প্রধান উপসর্গ হচ্ছে হাত এবং পায়ের ত্বকের পরিবর্তন। আর্সেনিকের প্রভাবে হাতের চেটো (করতল) এবং পায়ের পাতায় ছোপ-ছোপ কালো দাগ সৃষ্টি হয়। এই উপসর্গ **'ব্ল্যাকফুট ডিজিজ'** নামে পরিচিত। এছাড়া ত্বকের কেরাটিনাইজেশান ঘটে এবং উদ্দীপিতা হ্রাস পায়।

iv) আর্সেনিক উৎসেচক ক্রিয়ায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে বিপাকীয় অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি করে।

5. নাইট্রেট এবং নাইট্রাইট (Nitrates and Nitrites) ঃ a) উৎস ঃ নাইট্রেট এবং নাইট্রাইট হচ্ছে অতি-পরিচিত দুটি অজৈব জলদূষক। নাইট্রেটের প্রধান উৎস

সেপটিক ট্যাঙ্ক (septic tanks), বার্ন-ইয়ার্ড, অত্যধিক সারযুক্ত শস্য এবং বর্জ্য পদার্থ প্রক্রিয়াকরণের প্লান্ট ইত্যাদি। জলের মাধ্যমে নাইট্রেট মানুষের শরীরে প্রবেশ করার পর অন্ত্রে অধিকতর বিষক্রিয় 'নাইট্রাইটে' পরিবর্তিত হয়।

b) **মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ঃ**

i) লোহিতরক্তকণিকাস্থিত হিমোগ্লোবিন নাইট্রাইট দ্বারা জারিত হয়ে **'মেটহিমোগ্লোবিনে'** (methemoglobin) রূপান্তরিত হয়। ফলে হিমোগ্লোবিনের অক্সিজেন পরিবাহিতা হ্রাস পায়। কলাকোষে অক্সিজেন যোগান হ্রাসের কারণে **রক্তাল্পতা** এবং **হৃৎপিণ্ডের ইসচিমিয়া** প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি হয়।

ii) নাইট্রাইট দূষণ গ্রামাঞ্চলে শিশু-মৃত্যুর একটি অন্যতম প্রধান কারণ। ইউরোপে এবং উত্তর আমেরিকায় বিগত 40 বছরে নাইট্রাইট বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত 2000 শিশুর মধ্যে 160 জন **শিশু** মারা যায়। তৃতীয় বিশ্বের গ্রামাঞ্চলে নাইট্রাইট বিষক্রিয়ায় শিশুমৃত্যুর ঘটনা ভয়াবহ।

6. **লবণ (Salts) ঃ** শীতের সময়ে শীতপ্রধান দেশে রাস্তার উপর জমে থাকা তুষার গলানোর কাজে সোডিয়াম ক্লোরাইড এবং ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতি লবণ ব্যবহার করা হয়। তার ফলে তুষারগলা জলের সঙ্গে লবণ হ্রদ, নদী এবং ভূ-গর্ভের জলে সংক্রমিত হয়। বহির্ভাগপৃষ্ঠের জলে অতিরিক্ত লবণের উপস্থিতিতে লবণ অসহনশীল উদ্ভিদ এবং প্রাণীর প্রজাতি চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

7. **ক্লোরিন (Chlorine) ঃ** ক্লোরিন একটি অতিসক্রিয় অজৈব রাসায়নিক পদার্থ। পৌর-প্রতিষ্ঠান সরবরাহকৃত পানীয় জলে অত্যধিক পরিমাণ ক্লোরিনের উপস্থিতির কারণে মানুষের ক্লোরিনজাত বিষক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ক্লোরিন যৌগের বাধাহীন এবং অত্যধিক ব্যবহারই ক্লোরিনদূষণের প্রধান কারণ।

a) **দূষণ উৎস ঃ** i) পানীয় জলে ব্যাক্‌টিরিয়া ধ্বংস করার কাজে ক্লোরিন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু প্রয়োজনাতিরিক্ত ক্লোরিন ব্যবহারের ফলে অতিরিক্ত ক্লোরিন পানীয় জলের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে।

ii) আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট থেকে নিঃসৃত বর্জ্যপদার্থ যুক্ত জলের নির্বীজকরণে ক্লোরিন ব্যবহার করা হয়। নির্বীজকৃত জলের সঙ্গে অতিরিক্ত ক্লোরিন নদী, পুকুর এবং হ্রদের জলে নিক্ষিপ্ত হয়।

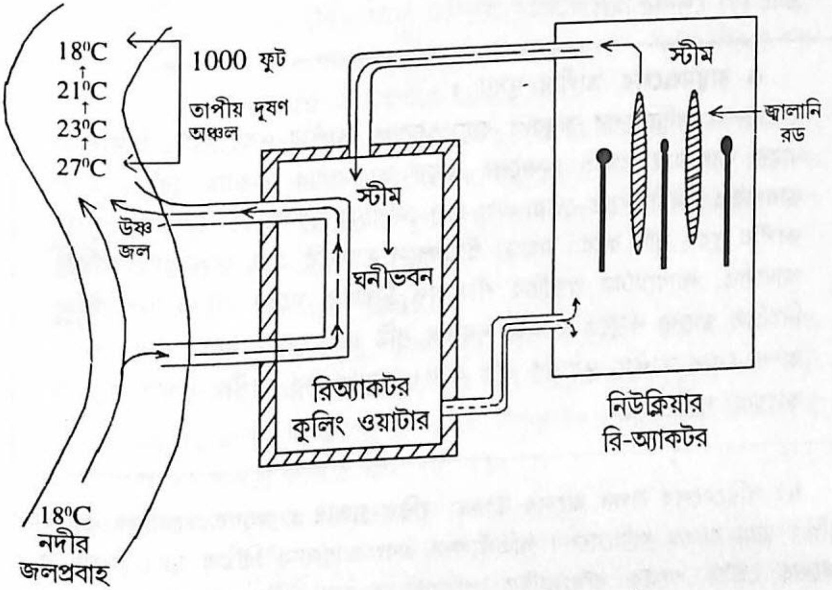
iii) পাওয়ার প্লান্টে শীতল করার কাজে ব্যবহৃত পাইপের ভিতরে এবং বাইরে জন্মানো শৈবাল, ছত্রাক এবং ব্যাক্‌টিরিয়া প্রভৃতি ধ্বংস করতে ক্লোরিন ব্যবহার করা হয়। উদ্বৃত্ত ক্লোরিন পাওয়ার প্লান্ট নিঃসৃত জলের মাধ্যমে নদীর জলে মেশে।

b) **মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ঃ** ক্লোরিন জলে উপস্থিত জৈব যৌগের সঙ্গে বিক্রিয়ায় অধিকতর ক্ষতিকারক **'ক্লোরিনেটেড অর্গ্যানিক'** যৌগে পরিবর্তিত হতে পারে। ক্লোরিন এবং ক্লোরিনজাত যৌগ মনুষ্যেতর জীব এবং মাছের উপর বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।

এছাড়া ক্লোরিন এবং অধিকাংশ ক্লোরিনজাত যৌগ মানুষের **'কারসিনোজেন'** এবং **'টেরাটোজেন'** হিসেবে কাজ করে। পানীয় জলে মাত্রাতিরিক্ত ক্লোরিন সংক্রমণের ফলে যকৃৎ এবং অন্ত্রের ক্যানসারের সম্ভাবনা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

9.8.5. তাপসংক্রান্ত জলদূষণ (Thermal Water Pollution) ঃ

বিভিন্ন শিল্প-প্রক্রিয়ায় শীতল করার কাজে নদী এবং হ্রদের জল ব্যবহার করা হয়। শীতলিকরণ ক্রিয়ায় ব্যবহৃত জলের তাপমাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পায় এবং ক্রিয়াশেষে উষ্ণজল নদী এবং হ্রদে নিক্ষিপ্ত হয়। শিল্প-প্রক্রিয়ায় উপজাত হিসেবে উৎপন্ন এই



চিত্র 9.10 ঃ নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কুলিং সিস্টেম থেকে নির্গত উষ্ণজলের প্রভাবে নদীর জলের তাপসংক্রান্ত দূষণ দেখানো হয়েছে।

বিপুল পরিমাণ উষ্ণ জলের নিক্ষেপণে নদী এবং হ্রদের স্থানীয় তাপমাত্রার পরিবর্তন
(বৃদ্ধি) ঘটে। মনুষ্য-সৃষ্ট শিল্প-ক্রিয়াকলাপে জলের তাপমাত্রার অস্বাভাবিক বৃদ্ধির দরুণ
জলজ বাস্তুতন্ত্রের যে অনভিপ্রেত পরিবর্তন ঘটে তাকে **'জলের তাপীয় দূষণ'** বলা হয়।
a) তাপসংক্রান্ত জল-দূষণের কারণ ঃ যেসব কলকারখানা এবং শিল্পসংস্থায় শিল্প-
প্রক্রিয়ায় শীতল করার কাজে পর্যাপ্ত জল ব্যবহার করা হয় ঐসব কলকারকানা বা
শিল্পসংস্থা নদী বা হ্রদের তাপসংক্রান্ত জল দূষণের প্রধান কারণ। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য

যে জলের তাপীয় দূষণের প্রধান উৎস হচ্ছে 'নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ' এবং 'তাপবিদ্যুৎ' কেন্দ্র'। একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে শীতল করার কাজে দৈনিক মোট গৃহীত জলের 86% (প্রায় 730 বিলিয়ন লিটার) ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে (তাপ এবং নিউক্লিয়ার)। এই বিপুল পরিমাণ উষ্ণ জল প্রতিদিন নদী এবং হ্রদে নিক্ষেপের কারণে তাপীয় দূষণের সৃষ্টি হয়। যে সব বিশেষ শিল্পসংস্থা বা কারখানা তাপসংক্রান্ত জলদূষণের সৃষ্টি করে সেগুলি উল্লেখ করা হল ঃ

i) বিদ্যুৎ (তাপ এবং নিউক্লিয়ার) উৎপাদন কেন্দ্র,

ii) ইস্পাত মিল,

iii) তৈল-শোধনাগার

এবং iv) পেপার-মিল।

● **বায়ুমণ্ডলের তাপীয় দূষণ ঃ**

জলজ পরিবেশের অনুরূপ বায়ুমণ্ডলেরও তাপীয় দূষণ ঘটে। শিল্পাঞ্চলে বায়ুর তাপমাত্রা বসতি অঞ্চলের বায়ুর তাপমাত্রার তুলনায় বেশি। কারণ কারখানার চিমনী নিসৃত ধোঁয়া এবং চালু মেশিনের ঘর্ষণজনিত তাপ বায়ুমণ্ডলের তাপীয় দূষণ সৃষ্টি করে। এছাড়া গ্রীষ্মকালে সরকারি এবং বেসরকারি অফিস, আদালত, ল্যাবরেটরি প্রভৃতির শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরের বাইরে অশীততাপ নিয়ন্ত্রিত স্থানের বায়ুতে তাপীয় দূষণের সৃষ্টি হয়। কুলার নিসৃত উষ্ণ জলীয় বাষ্প এরূপ তাপীয় দূষণের সৃষ্টি করে। বায়ুমণ্ডলের তাপীয় দূষণে মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়।

b) পরিবেশের উপর জলের উষ্ণতা বৃদ্ধির প্রভাব ঃ জলের স্বাভাবিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য জলজ পরিবেশের গতিশীলতা এবং ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। বিশেষ করে জলের ভৌত শর্তের অস্বাভাবিক পরিবর্তনের জন্য জীব-পরিবেশের অনভিপ্রেত পরিবর্তন ঘটে।

i) জলজ বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রভাব ঃ জলের অল্প উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জলজ বাস্তুতন্ত্রের উপর বিশেষ কোন মন্দ প্রভাব পড়ে না। কিন্তু জলের তাপমাত্রার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটলে জলজ বাস্তুতন্ত্রের **'উষ্ণতা-অসহনীয়'** সকল উদ্ভিদ এবং প্রাণী মারা যায়। বিশেষ উদ্ভিদ বা প্রাণীর বিলুপ্তির কারণে **'খাদ্য-শৃঙ্খল'** এবং **'খাদ্য-জালিকা'**র সদস্য জীবের খাদ্য-খাদক সম্পর্ক বিঘ্নিত হয়। ফলে জলজ বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন উদ্ভিদ বা প্রাণী প্রজাতি চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

ii) জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন-এর পরিমাণ এবং তাপসংক্রান্ত জলদূষণ ঃ জলের গড় স্বাভাবিক তাপমাত্রার বৃদ্ধির ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়। উষ্ণতা-

বৃদ্ধিজনিত কারণে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস দুটি উপায়ে ঘটে—(এক) উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জলে অক্সিজেনের দ্রাব্যতা হ্রাস পায়, ফলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়। উল্লেখ্য 0^0C তাপমাত্রায় জলের দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ যেখানে 14.6 ppm সেখানে 35^0C তাপমাত্রায় দ্রবীভূত অক্সিজেন এর পরিমাণ মাত্র 7.1 ppm। (দুই) পরোক্ষ উপায়েও জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। জলের উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে জীবের বিপাকীয় সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। আবার বিপাকীয় সক্রিয়তা বৃদ্ধির কারণে অক্সিজেনের চাহিদা বাড়ে। জলজ জীবের অতিরিক্ত অক্সিজেন চাহিদার জন্য জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন-এর পরিমাণ হ্রাস পায়।

● ● জলজ জীবের উপর দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাসের প্রভাব ঃ

I. জলের 10^0C তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ এতটা হ্রাস পায় যে কতিপয় জলজ জীবের প্রজাতি অক্সিজেনের অভাবে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়। বিশেষ করে কয়েকটি মাছের প্রজাতি চিরতরে হারিয়ে যায়।

II. অক্সিজেনের অধিক হ্রাসে জলে দ্রবীভূত জৈব-পদার্থের বায়বীয় জারণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সৃষ্ট অবায়বীয় পরিবেশে অবাত ব্যাক্‌টিরিয়ার দ্বারা জৈব পদার্থের পচনে মারাত্মক দূষণ সৃষ্টি হয় এবং তার সঙ্গে বিষক্রিয় ও দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই প্রকার জল দূষণে মাছ এবং অন্যান্য জীব বাঁচতে পারেনা।

iii) তাপীয় আঘাত (Thermal Shock) ঃ

জলের স্বাভাবিক তাপমাত্রার হঠাৎ পরিবর্তনের ফলে মাছ এবং অন্যান্য জীব মারা যায়। এই ঘটনাকে **তাপীয় আঘাত** বা **থার্মাল শক্** বলা হয়। উষ্ণতার হঠাৎ পরিবর্তনে অভিযোজন অক্ষমতাই তাপীয় আঘাতের মূল কারণ। বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের ক্রিয়াসূচনা বা হঠাৎ ক্রিয়াস্থিতির কারণে তাপীয় আঘাতের সৃষ্টি হয়।

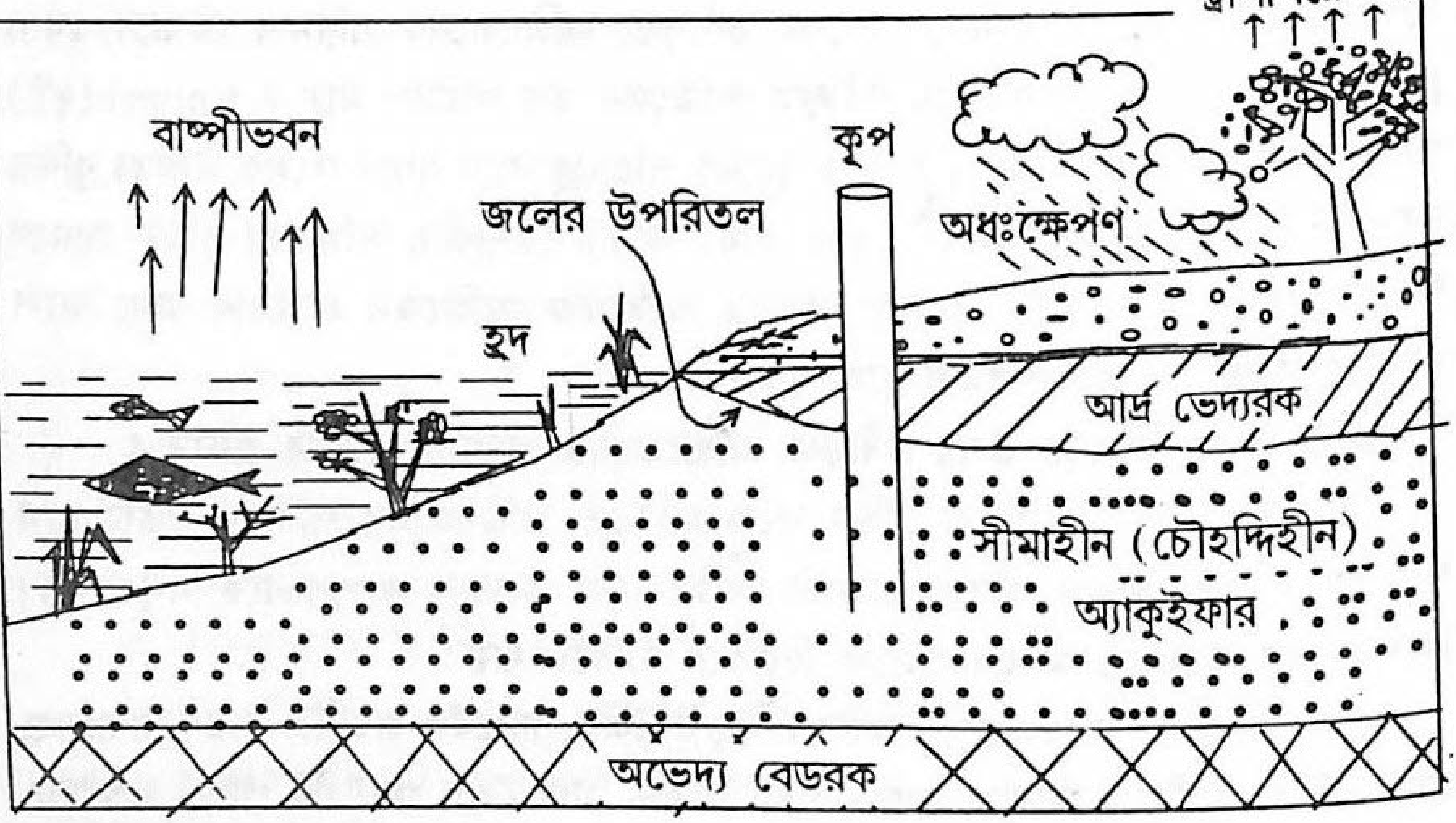
c) তাপসংক্রান্ত জলদূষণের নিয়ন্ত্রণ ঃ

কৃত্রিম পুকুর বা হ্রদ তৈরি করে তাপসংক্রান্ত জলদূষণ নিয়ন্ত্রন করা যায়। এক্ষেত্রে শিল্পসংস্থা থেকে উষ্ণ-জল নদী বা হ্রদে নিক্ষেপের পূর্বে শীতল করার জন্য কৃত্রিম পুকুরে সঞ্চয় করা যেতে পারে। পরবর্তী পর্যায়ে পুকুরের শীতল জল নদী বা হ্রদে নিক্ষেপ করা যায়। শিল্পসংস্থা নির্গত উষ্ণজল **'কুলিং টাওয়ার'**এর (Cooling Tower) সাহায্যে শীতল করেও নদী বা হ্রদে নিক্ষেপ করা যেতে পারে।

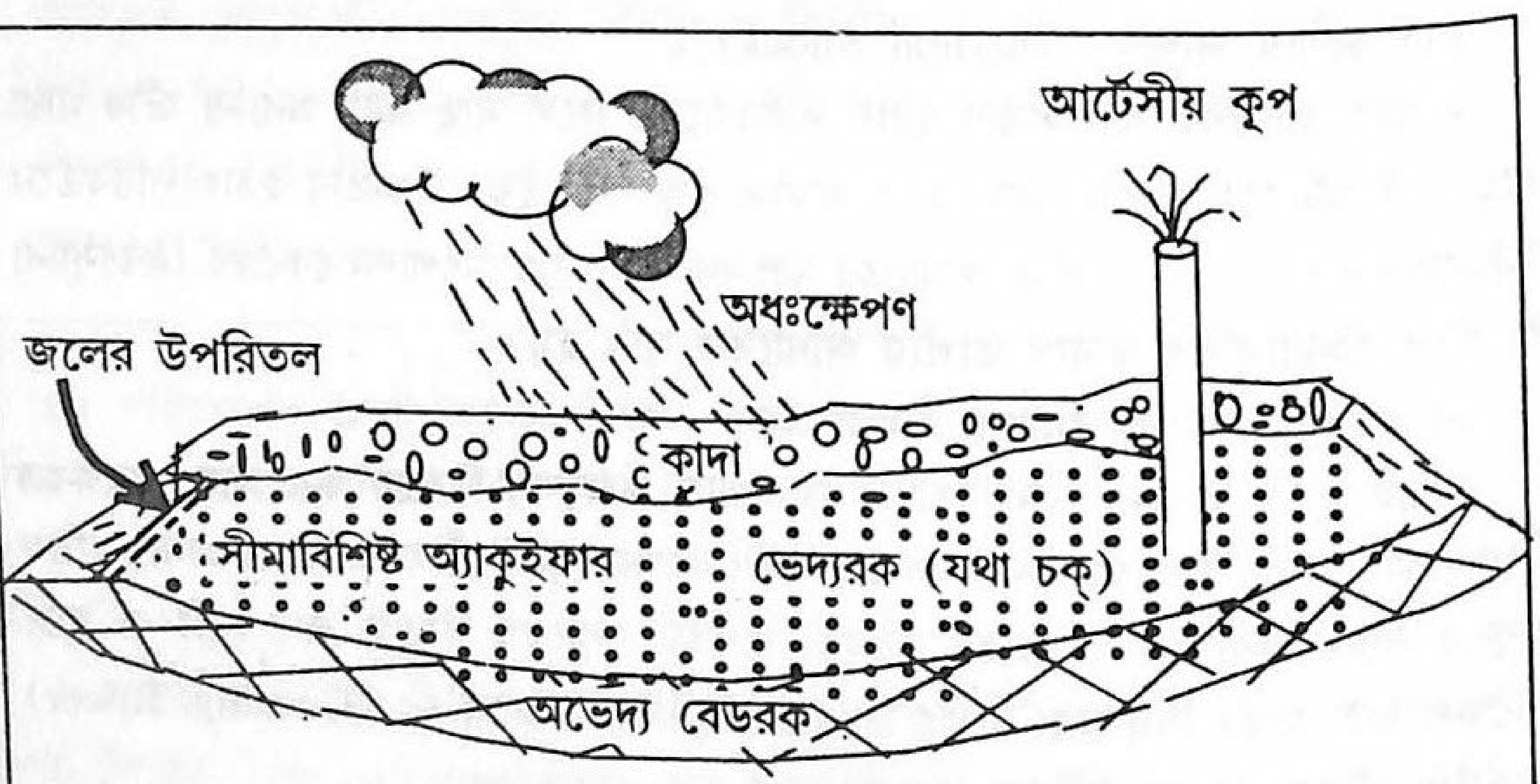
9.9. ভূগর্ভ জলের দূষণ (Ground Water Pollution) ঃ

মনুষ্য সৃষ্ট অদূরদর্শী এবং অপরিকল্পিত ক্রিয়াকলাপে ভূগর্ভ জলের ভাণ্ডারও বর্তমানে দূষণের শিকার। ভূগর্ভের অ্যাকুইফারে সঞ্চিত জল পানীয় জলের একটি প্রধান উৎস। কিন্তু অ্যাকুইফারের জল বর্তমানে নিরাপদ নয়, পরিবেশ দূষণে বিপন্ন। বাস্তবক্ষেত্রে ভূগর্ভ-জলে কতিপয় দূষকের ঘনত্ব বহির্ভাগপৃষ্ঠীয় জলের তুলনায় বহুগুণ

বেশি। আবার মানুষের জীবন বিপন্নকারী ভূ-গর্ভজলের কতিপয় দূষক বিষক্রিয় মাত্রায় স্বাদহীন এবং গন্ধহীন।



(a) চৌহদ্দিহীন অ্যাকুইফার



(b) সীমাবিশিষ্ট অ্যাকুইফার

চিত্র 9.11 ঃ অ্যাকুইফারে ভূগর্ভস্থ জলের অবস্থান দেখানো হয়েছে।

a) **দূষণের উৎস ঃ** বহির্ভাগপৃষ্ঠীয় দূষিত জল চুইয়ে ভুগর্ভ জলে সংক্রমিত হতে পারে। দূষিত জলের এরূপ অধোগমনের ফলে বহুবিধ বিষক্রিয়-রাসায়নিক, জৈব এবং

অজৈব দূষক ভূগর্ভ জলে সংক্রমিত হয়। বিভিন্ন উৎস থেকে দূষিত জল ভূগর্ভ জলে চুইয়ে যেতে পারে, যথা ঃ

i) সেপটিক ট্যাঙ্ক,

ii) ময়লা জলের কুয়া বা মলকুণ্ড,

iii) তৈলকূপ,

iv) কৃষিখামার,

এবং v) বর্জ্যপদার্থ বা আবর্জনা সমৃদ্ধ পুকুর ইত্যাদি।

b) দূষকের প্রকৃতি ঃ দূষিত কূপ থেকে সংগৃহীত জলের নমুনা বিশ্লেষণ করে শতাধিক রাসায়নিক বস্তুর উপস্থিতি প্রমাণ করা গেছে। প্রাপ্ত রাসায়নিকের অধিকাংশই মানুষের স্বাস্থ্যের পক্ষে অতিশয় ক্ষতিকর। পরিচিত রাসায়নিক দূষকগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—ক্লোরাইড, নাইট্রেট, ভারী ধাতু এবং বিষক্রিয় জৈবযৌগ (যথা পেস্টিসাইড, পি.সি.বি., পি.এ.এইচ.)। কম আণবিক ওজনসম্পন্ন জৈব যৌগই সর্বাপেক্ষা ভীতিজনক, কারণ এই গ্রুপের অধিকাংশ যৌগই কারসিনোজেনিক।

c) দূষণের স্থায়িত্ব ঃ কোন কারণে ভূগর্ভ জল একবার দূষিত হলে দূষক খুব দ্রুত ভূগর্ভ জলের কোন একটি অঞ্চল থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে পরিবাহিত হতে পারে না। ফলে দীর্ঘদিন ঐ অঞ্চলে দূষণের মাত্রা অপরিবর্তিত থাকে। ভূগর্ভ জলের এরূপ দূষণ-স্থায়িত্বের মূল কারণ ভূ-গর্ভ জলের অতি-মন্থর প্রবাহ (5-64 সেমি/দিন)। কোন কারণে অ্যাকুইফার সংক্রমিত হলে অ্যাকুইফারের নিজস্ব পরিশোধনে কয়েশতববছর সময়ের প্রয়োজন হয়।

d) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ভূগর্ভ জল দূষণের প্রভাব ঃ ভূগর্ভ থেকে উত্তোলিত দূষিত-জল পানের ফলে মানুষের বহুবিধ স্বাস্থ্যসম্পর্কীয় প্রভাব দেখা দিতে পারে। প্রভাবগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল ঃ

i) গর্ভপতন, শিশুর জন্মগত ওজন হ্রাস, প্রাক্-পূর্ণাঙ্গমৃত্যু এবং জন্মত্রুটি।

ii) শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির চোখের জ্বালা এবং গাত্রচর্মের ফুস্কুড়ি (চুলকনা)।

এবং iii) স্নায়ুসম্পর্কীয় সমস্যা যথা—ঝিমুনি, মাথাধরা ও মূর্ছা যাওয়া ইত্যাদি।

e) ভূগর্ভ জলের দূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ ভূগর্ভ জলের দূষণ নিয়ন্ত্রণ খুবই দুরূহ। ভূগর্ভ জলের উপযুক্ত সংরক্ষণই দূষণ হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণের শ্রেষ্ঠ উপায়।

ভূগর্ভ জলের দূষণ অনুসন্ধান যথেষ্ট সময় এবং খরচ সাপেক্ষ। দূষণ অনুসন্ধানমূলক কাজে জলের নমুনা সংগ্রহের জন্য গভীর কূপ খনন, জলের প্রবাহ এবং গতিবেগ নির্ধারণ খুবই জরুরী। ভূগর্ভ জলের দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য যেসব সীমিত প্রযুক্তির উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছে সেগুলি উল্লেখ করা হল।

i) দূষিত অ্যাকুইফার থেকে পাম্পক্রিয়ায় বহির্ভাগপৃষ্ঠে জল উত্তোলন করে পরিশোধন করা হয় এবং পরিশোধিত জলকে পুনরায় অ্যাকুইফারে ফেরৎ পাঠানো হয়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই পদ্ধতি ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

ii) মৃত্তিকা এবং ভূগর্ভ জলে বসবাসকারী কতিপয় প্রাকৃতিক ব্যাক্‌টিরিয়ার ব্যবহারের মাধ্যমে ভূগর্ভ জলের পরিশোধন ক্রিয়া শুরু হয়েছে। 1970 সালের পর থেকেই জীবাণুবিজ্ঞানীদের (Microbiologists) নিরলস প্রচেষ্টায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ভূগর্ভ জলের দূষণ নিয়ন্ত্রণ করার কাজে **ব্যাক্‌টিরিয়া-প্রযুক্তির** ব্যবহার শুরু হয়েছে। স্টোরেজ ট্যাঙ্ক বা পরিবহনের সময় পড়ে যাওয়া হাইড্রোকার্বন তেলের (যথা—অপরিশোধিত তেল, গ্যাসোলিন এবং ক্রিওসোট) সংক্রমণে পানের উপযোগী জলের দূষণ নিয়ন্ত্রণে বিশেষ জল ও মৃত্তিকাবাসী ব্যাক্‌টিরিয়ার ব্যবহার শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাক্‌টিরিয়া মৃত্তিকা বা ভূগর্ভ জলে সংক্রমিত হাইড্রোকার্বনকে হজম করতে পারে বা বিশ্লেষিত করতে সক্ষম হয় **(অয়েল ইটিং ব্যাক্‌টিরিয়া)**। ব্যাক্‌টিরিয়ার সাহায্যে হাইড্রোকার্বন মিথেন এবং কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাসে পরিবর্তিত হয়।

9.10. সামুদ্রিক দূষণ ঃ

সমুদ্র দূষণ একটি প্রধান পরিবেশগত সমস্যা। সমুদ্রের দূষণ বিভিন্ন কারণে ঘটতে পারে। তেল এবং প্লাস্টিকই সমুদ্রের প্রধান দূষক। আলোচ্য অংশে হাইড্রোকার্বন তেল এবং প্লাস্টিক সম্পর্কীয় সামুদ্রিক পরিবেশ দূষণ আলোচনা করা হল।

9.10.1. সামুদ্রিক তেল-দূষণ ঃ

প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট উভয় উপায়েই সামুদ্রিক তেল-দূষণ সংঘটিত হয়। প্রতিবছর প্রায় 3.2 মিলিয়ন মেট্রিকটন হাইড্রোকার্বন তেল সমুদ্রে সংক্রমিত হয়। এই তেলের সংক্রমণজনিত দূষণে সামুদ্রিক পরিবেশে ভয়াবহ সঙ্কটের সৃষ্টি হয়।

a) **উৎস এবং সংক্রমণ ঃ** বিভিন্ন কারণে সমুদ্রের তেল দূষণ ঘটতে পারে। এই সমস্ত কারণকে সামুদ্রিক তেল দূষণের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

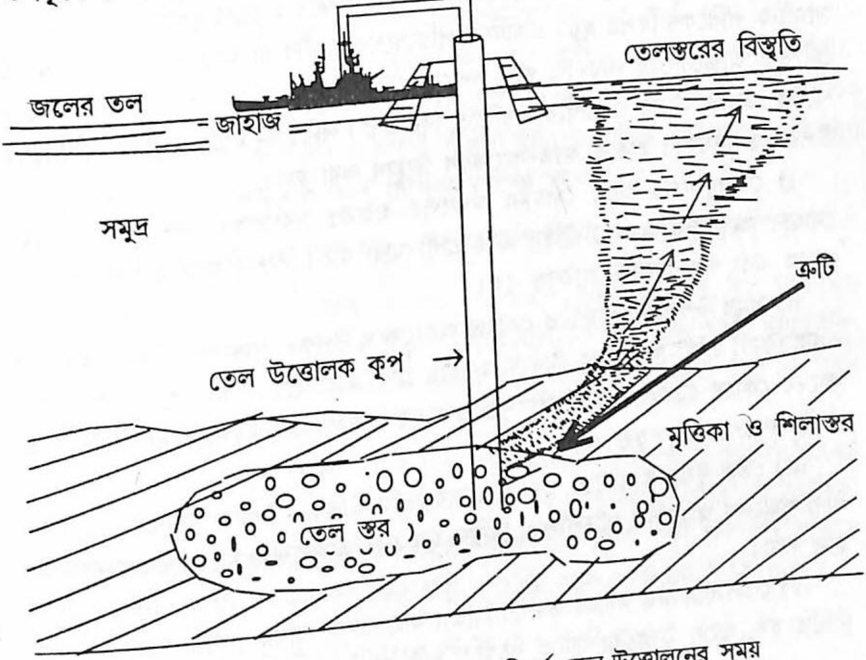
● **উৎস ঃ** i) অফশোরের (offshore) বা সমুদ্র তীর থেকে দূরবর্তী অঞ্চলে সমুদ্রের তলদেশে মৃত্তিকার নীচে যে প্রাকৃতিক তেলের ভাণ্ডার রয়েছে (যথা—ভারতের মুম্বাই হাই অঞ্চল) সেই ভাণ্ডার থেকে প্রচুর পরিমাণ তেল মৃত্তিকাস্তরের মধ্য দিয়ে চুইয়ে প্রতিনিয়ত সমুদ্রের জলে সংক্রমিত হয়। সমুদ্রে সংক্রমিত মোট তেলের প্রায় অর্ধেক উক্ত উৎসের অবদান।

ii) সমুদ্রে সংক্রমিত তেলের প্রায় একপঞ্চমাংশ আসে—তেলকূপের ফেটে যাওয়া বা আকস্মিক নির্গমন, তেল পরিবাহী পাইপলাইনের ভাঙ্গন এবং তেলপরিবাহী ট্যাঙ্কার জাহাজ থেকে তেলের উপচে পড়ে যাওয়ার ফলে।

iii) তেল পরিবাহী জাহাজ পরিষ্কার করা এবং জাহাজ স্থির রাখার জন্য তলদেশে সঞ্চিত জল সমুদ্রে নিক্ষেপণের ফলেও বেশ কিছু পরিমাণ তেল সমুদ্রে সংক্রমিত হয়।

iv) সমুদ্রে সংক্রমিত তেলের অবশিষ্ট পরিমাণ আসে দেশের অভ্যন্তরে স্থলভাগে তেলের অসতর্ক ব্যবহারজনিত অপচয়ের ফলে। অসতর্ক ব্যবহারের ফলে তেল মৃত্তিকায় সংক্রমিত হয় এবং বৃষ্টির জলে ধুয়ে নদীর মাধ্যমে সমুদ্রে পরিবাহিত হয়।

v) এছাড়া অফশোর তেল উত্তোলন প্রক্রিয়ার ত্রুটি এবং অফশোর থেকে সমুদ্র উপকূলে তেল স্থানান্তরের সময় তেল নির্গমনের ফলেও সমুদ্র দূষিত হয়।



চিত্র 9.12 : সুমদ্রের তলদেশ থেকে ত্রুটিপূর্ণ তেল-উত্তোলনের সময় সমুদ্রের জলে তেলের সংক্রমণ দেখানো হয়েছে।

vi) তেলপরিবাহী ট্যাঙ্কারের দুর্ঘটনাজনিত ধ্বংসের ফলে প্রচুর পরিমাণ কালো, ভিসকাস অপরিশোধিত তেল (ক্রুড অয়েল) সমুদ্রে সংক্রমিত হয়।

● **সংক্রমণ :**

i) সমুদ্রে সংক্রমিত অশোধিত তেলের প্রায় 25 শতাংশ উদ্বায়ী এবং সংক্রমণের তিনমাসের মধ্যে বাষ্পীভূত হয়।

ii) তুলনামূলকভাবে অনুদ্বায়ী এবং জলের তুলনায় হাল্কা তেলের যৌগ জলের উপরে পাতলা আস্তরণরূপে ভেসে থাকে এবং পরবর্তী কয়েকমাসের মধ্যে ব্যাক্‌টিরিয়ার দ্বারা বিশ্লেষিত হয়। ব্যাক্‌টিরিয়ার দ্বারা এভাবে অপসারিত তেলের পরিমাণ প্রায় 60 শতাংশ।

iii) সংক্রমিত তেলের অবশিষ্ট 15 শতাংশ ভারী যোগ দ্বারা গঠিত। এই ভারীযৌগসমূহ পুঞ্জীভূত আকারে সমুদ্রের তলদেশে অধঃক্ষিপ্ত হয়। মেরুঅঞ্চলের শীতল জলে তেলের বিশ্লেষণ হার খুব কম, ফলে সংক্রমিত তেল বরফের মধ্যে সঞ্চিত থাকে এবং উপযুক্ত সময়ে, এমনকি বহুবছর পরেও বরফ থেকে সমুদ্রে মুক্ত হয়।

সমুদ্রে তেলের সংক্রমণ-বিস্তার বিভিন্ন শর্তের উপর নির্ভর করে। এই প্রসঙ্গে দুটি উল্লেখযোগ্য শর্ত হচ্ছে সমুদ্রের স্রোত এবং বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ ও অভিমুখ।

b) সামুদ্রিক তেলদূষণের পরিবেশ সম্পর্কীয় প্রভাব : তেল দূষণের ফলে সমুদ্রের সামগ্রিক পরিবেশ বিপন্ন হয়। একদিকে পরিবেশের অজীব শর্তের (জলের pH, দ্রাব্যতা, দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ, পুষ্টি পদার্থের উপস্থিতি ইত্যাদি) এবং অপরদিকে সজীব শর্তের (জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীর উপস্থিতি, বিষক্রিয়া) পরিবর্তন ঘটে। সামুদ্রিক পরিবেশের উপর তেলদূষণের প্রভাব অতি-সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

i) তেলদূষণের ফলে মোহানা অঞ্চলের বাস্তুতন্ত্র সর্বাপেক্ষা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মোহানা অঞ্চলের অসংখ্য উদ্ভিদ এবং প্রাণী মারা যায়। বিশেষ করে প্লাঙ্কটন, কাঁকড়া, শামুক এবং গলদাচিংড়ি আক্রান্ত হয়।

ii) সমুদ্র উপকূলে সংক্রমিত তেলের অধঃক্ষেপে উপকূল অঞ্চলের মৃত্তিকার অভ্যন্তরে বসবাসকারী প্রাণী বিশেষতঃ কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী মারা যায়। যেসব প্রাণী বেঁচে থাকে তাদের কোষে তেলের যৌগ জীবপুঞ্জীভূত হয়। ফলে খাদ্য-উৎস হিসেবে চিহ্নিত বহু প্রাণী ভক্ষণের অনুপযুক্ত হয়।

iii) তেল-দূষণের প্রভাবে খাদ্য-শৃঙ্খলের ভিত্তি উদ্ভিদ—'শৈবাল' বিষগ্রস্ত হয়, ফলে খাদ্য-শৃঙ্খলের স্বাভাবিক গতিশীলতা বিঘ্নিত হয় এবং ভক্ষণযোগ্য মাছের উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়।

iv) তেলসংক্রমিত মাছের ভক্ষণে বিভিন্ন মাছ-খাদক পাখির পেশীর স্বাভাবিক ক্রিয়া বিঘ্নিত হয়, ফলে উড়ানের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

v) পাখির ফেদার বা পালকের অপরিবাহী ক্রিয়া তেলদূষণের ফলে হ্রাস পায়। ফলে পাখির অধিক শৈত্য সংবেদনশীলতা সৃষ্টি হয় এবং অধিক শীতে পাখি মারা যায়।

vi) এছাড়া তেলদূষণের কারণে উপকূলবর্তী সামুদ্রিক অঞ্চলে মাছের চারা উৎপাদন হ্রাস পায়, ফলে ঐ অঞ্চলে জলজ-বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়।

9.10.2. প্লাস্টিক দূষণ (Plastic Pollution) :

জীব-অবিশ্লেষ্য প্লাস্টিকের অবাধ ব্যবহার এবং ব্যবহারের পর সমুদ্রের জলে নিক্ষেপের ফলে সমুদ্রের জলজ পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। সমুদ্রের জলে প্লাস্টিক সংক্রমণ-জনিত দূষণকে সামুদ্রিক প্লাস্টিক দূষণ বলা হয়।

i) প্লাস্টিক দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে ব্যবহারের পর নাইলনের মাছ ধরার জাল, প্লাস্টিকথলি, প্লাস্টিকের ফিতা এবং অন্যান্য ব্যবহার সামগ্রীর সামুদ্রিক সঞ্চয়। যেহেতু প্লাস্টিক জীব-অবিশ্লেষ্য, তাই নিক্ষেপের পর অবিকৃত অবস্থায় সমুদ্রে সঞ্চিত থেকে সামুদ্রিক জীবের ক্ষতি করতে পারে।

ii) প্লাস্টিক দূষণের ফলে সামুদ্রিক মলাস্কা, ক্রাসটেসিয়া, মাছ এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী মারা

যায়। মাছ এবং অপেক্ষাকৃত বড় স্তন্যপায়ী প্রাণী প্লাস্টিক খেয়ে ফেললে জীব-অবিশ্লেষ্যতার কারণে প্রাণীর পাকস্থলীতে প্লাস্টিক সঞ্চিত হয়, কখনোই আন্ত্রিকক্রিয়ায় শরীর থেকে নির্গত হতে পারে না। পাকস্থলীতে প্লাস্টিকের এরূপ ক্রমসঞ্চয়ের ফলে প্রাণী খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না, যদিও প্রাণীর যথেষ্ট খিদে থাকে। অবশেষে খাদ্যের অভাবে প্রাণী মারা যায়। জলজ প্রাণী ব্যতিরেকে সামুদ্রিক খাদ্য শৃঙ্খলের সঙ্গে সম্পর্ক জনিত অসংখ্য পাখি প্লাস্টিক দূষণজনিত কারণে মারা যায়। কয়েকটি পরিসংখ্যানগত সমীক্ষা অনুসারে **প্রতিবছর আনুমানিক 10 লক্ষ সামুদ্রিক পাখি প্লাস্টিক দূষণের ফলে মারা যায়।**

9.10.3. চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য বস্তু এবং আবর্জনা স্তূপীকরণজনিত দূষণ :

বিভিন্ন রাষ্ট্রে চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য বস্তু যথা রক্তসংক্রমিত ব্যান্ডেজ, সূচ, সংক্রমিত রক্তের ভায়াল এবং ব্যবহৃত সিরিঞ্জ প্রভৃতি সমুদ্রে স্তূপীকৃত করা হয়। যদিও আমেরিকা সহ অন্যান্য উন্নত রাষ্ট্রে অধুনা আইন প্রণয়ন করে চিকিৎসা সংক্রান্ত সামুদ্রিক দূষণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে।

এছাড়া আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট নিঃসৃত বর্জ্য পদার্থের স্তূপীকরণের ফলেও সমুদ্রের জল দূষিত হয়। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে আংশিক প্রক্রিয়াকরণ করে বা আদৌ প্রক্রিয়াকরণ না করে আবর্জনা সমুদ্রে ফেলা হয়। ফলে শিল্পসংস্থা নিঃসৃত বর্জ্য পদার্থের মাধ্যমে অসংখ্য জৈব-রাসায়নিক এবং বিষক্রিয় ধাতু সমুদ্রের জলে সংক্রমিত হতে পারে।

9.11. জলের দূষণ নিয়ন্ত্রণ (Control of Water Pollution) :

জলের দূষণ হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ তিন উপায়ে করা সম্ভব— আইনসম্মত, প্রযুক্তিগত এবং ব্যক্তিগত।

9.11.1. আইনসম্মত উপায়ে জলের দূষণ নিয়ন্ত্রণ :

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে দূষণমুক্ত বহির্ভাগপৃষ্ঠের এবং ভূ-গর্ভের জল একটি মহার্ঘ্য সম্পদ। কিন্তু জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং জলের বাধাহীন অপচয়ে ও অদূরদর্শী ব্যবহারে দূষণমুক্ত জলের ভাণ্ডার ক্রমসংকুচিত। এই পরিবেশ সঙ্কটের মুখে জলের সদ্ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ অতীব জরুরী। বিশ্বের সব রাষ্ট্রে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জলের যথোচিত ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের উদ্যোগ শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের **'ক্লিন ওয়াটার অ্যাক্ট'** (US Clean Water Act, 1981) এবং ভারতের **'ওয়াটার (প্রতিরোধ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) অ্যাক্ট, 1974** এবং **ওয়াটার (প্রতিরোধ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) সেস অ্যাক্ট, 1977** উল্লেখ করা যায়।

● জল (প্রতিরোধ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন, 1974-এর আইনগত বাধ্যবাধকতা :

(i) এই আইনের 25(i)(a) ধারা অনুসারে 'রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তি নদী বা পুকুরে, কূপ এবং আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ প্লান্টে, জমিতে

আবর্জনা নিক্ষেপণযোগ্য কোন শিল্প, কারখানা এবং নিক্ষেপণ ইউনিট স্থাপন বা প্রসারণ বা পরিবর্তন করতে পারবে না।

(ii) উক্ত আইনের 25(a)(i)(b)(c) ধারা অনুসারে কোন ব্যক্তি রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের অনুমতি ছাড়া আবর্জনা নিক্ষেপকারী কোন নতুন বা প্রতিকল্প নির্গমপথ ব্যবহার করতে পারবে না।

● **জল (প্রতিরোধ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) সেস আইন, 1977-এর আইনগত বাধ্যবাধকতা ঃ**

(1) উক্ত আইনের 3নং ধারা অনুযায়ী সমস্ত চিহ্নিত শিল্প সংস্থা নির্ধারিত হারে সেস প্রদান করতে বাধ্য থাকবে।

(2) আইনের 5নং ধারা অনুসারে সমস্ত চিহ্নিত শিল্প সংস্থা বা স্থানীয় নিয়ামক সংস্থা নির্ধারিত উপায়ে সেস রিটার্ন সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। এবং

(3) শিল্প সংস্থা বা স্থানীয় নিয়ামক সংস্থা কতটা পরিমাণ জল ব্যবহার করে থাকে তার পরিমাপ এবং লিপিবদ্ধতার জন্য শিল্প এবং নিয়ামক সংস্থায় মিটার সংযোগ থাকা বাধ্যতামূলক।

ভারত এবং বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের জলদূষণ আইন—মূলত বিন্দু উৎস থেকে বর্হিভাগপৃষ্ঠের জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কীয়, অর্থাৎ আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট স্থাপনের মাধ্যমে পৌর সংস্থা নিঃসৃত আবর্জনার নিয়ন্ত্রণ এবং শিল্প সংস্থা থেকে নদীতে নিঃসৃত আবর্জনার পরিমাণ হ্রাস। অধুনা বহিঃরাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে ভূ-গর্ভের জল সংরক্ষণের উদ্যোগ শুরু হয়েছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ভূ-গর্ভের জল সংরক্ষণ এবং গুণমান নির্দিষ্টকরণের জন্য 1986 সালে **'পানীয় জল আইন'** রূপায়ণ করা হয়েছে। এছাড়া EPA কর্তৃক পানীয়জলে পেস্টিসাইড এবং অন্যান্য শিল্পজাত অতিরিক্ত 85টি রাসায়নিক পদার্থের চরম মাত্রা নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু এইসব আইনে জলদূষণের সার্বিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয়নি। তাই সংরক্ষণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য অতিরিক্ত কয়েকটি আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে।

(i) সরকারের সর্বস্তরে আইন প্রয়োগ করে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আইনের মাধ্যমে খাড়া পথ-পার্শ্বস্থ অঞ্চলে ধাপ সৃষ্টি করে, অনাবৃত বা নগ্ন জমিতে অরণ্য সৃষ্টি করে, নতুন নির্মিত হাইওয়ে বা হাউসিং সন্নিহিত স্থানে মৃত্তিকা সংরক্ষণকারী উদ্ভিদ সৃষ্টি করে এবং অধঃক্ষেপণ যুক্ত জলস্রোত নদীতে পড়ার আগে পুকুরে সঞ্চয় করে বহির্ভাগ পৃষ্ঠের জলের দূষণ রোধ করা সম্ভব।

(ii) প্রত্যেকটি দেশের ভূ-গর্ভে জল সংরক্ষণের জন্য **'অ্যাকুইফার ম্যাপিং'** অত্যাবশ্যক এবং অ্যাকুইফার অঞ্চলের ভূ-পৃষ্ঠে শিল্পায়ন নিষিদ্ধ করা উচিত।

(iii) আইন করে পানীয় জল সরবরাহকারী সংস্থার দ্বারা সরবরাহকৃত পানীয় জলের উৎকৃষ্টমান এবং দূষকের উপস্থিতি সংক্রান্ত পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন।

(iv) আইন প্রণয়নের মাধ্যমে জলাজমির সংরক্ষণ করা উচিত।

9.11.2. প্রযুক্তিগত উপায়ে জলের দূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ

আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ প্লান্টের প্রযুক্তি প্রয়োগ করে বহির্ভাগপৃষ্ঠের এবং ভূ-গর্ভ জলের গুণমান বৃদ্ধি করা সম্ভব। এক্ষেত্রে পৌরসংস্থা, হাসপাতাল, স্কুল, এবং শিল্পসংস্থা নিঃসৃত দূষক যথা মানুষের মল ও মূত্র, কাগজ, সাবান, ডিটারজেন্ট, নোংরা (কাদা), বস্ত্র খণ্ড, খাদ্যাবশেষ, জীবাণু এবং গৃহস্থালীতে ব্যবহৃত অন্যান্য রাসায়নিক বস্তু নির্গম পথ বা পয়ঃপ্রণালীর মাধ্যমে সরাসরি নদী বা সমুদ্রে না ফেলে আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ প্লান্টে প্রক্রিয়াকরণ করা হয় বা আবর্জনা মুক্ত করা হয়। প্রক্রিয়াকরণের পর আবর্জনা অপসারিত জলকে প্লান্টে নির্বীজকৃত করে নদীতে ফেলা হয়।

তিনটি পর্যায়ক্রমিক ধাপে আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ প্লান্টে আবর্জনা প্রক্রিয়াকৃত করা হয়—

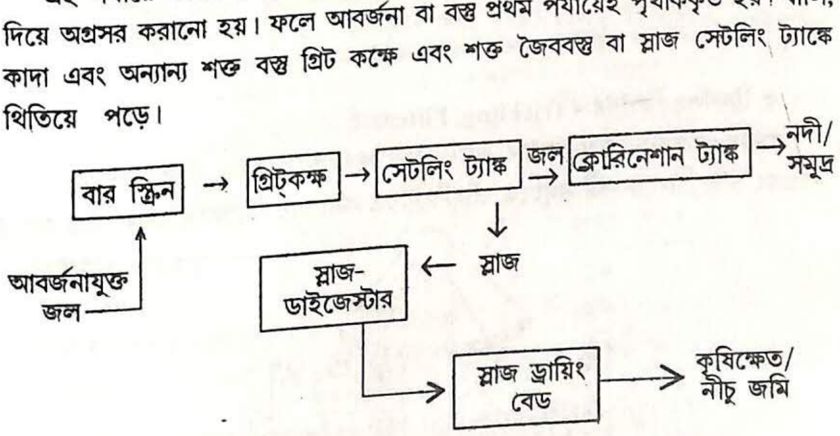
i) প্রথম পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়াকরণ (Primary treatment)।

ii) দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়াকরণ (Secondary treatment)।

এবং iii) তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়াকরণ (Tertiary treatment)।

i) প্রথম পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়াকরণ ঃ

এই পর্যায়ে আবর্জনা যুক্ত জলকে পর্যায়ক্রমিক ঝাঁঝারি (grates) এবং পর্দার মধ্য দিয়ে অগ্রসর করানো হয়। ফলে আবর্জনা বা বস্তু প্রথম পর্যায়েই পৃথকিকৃত হয়। বালি, কাদা এবং অন্যান্য শক্ত বস্তু গ্রিট কক্ষে এবং শক্ত জৈববস্তু বা স্লাজ সেটলিং ট্যাঙ্কে থিতিয়ে পড়ে।

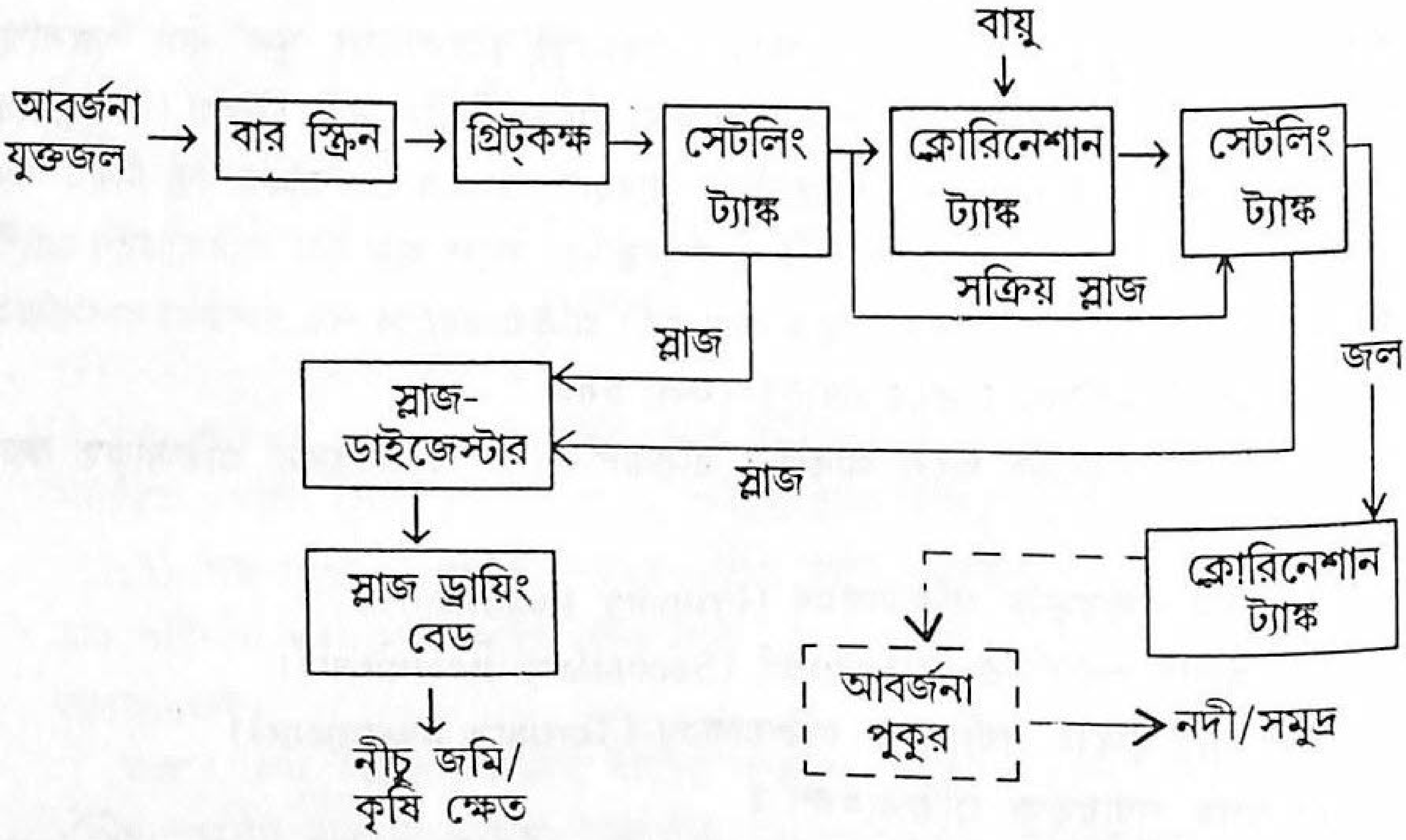


চিত্র 9.13 ঃ প্রথম পর্যায়ভুক্ত আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের বিচলন-নির্দেশক চিত্র দেখানো হয়েছে।

ii) দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়াকরণ ঃ

প্রক্রিয়াকরণের এই পর্যায়ে জৈবিক উপায়ে জৈব-বস্তুকে বিশ্লেষিত করা হয়। প্রথম পর্যায়ের প্রক্রিয়াকরণে সৃষ্ট স্লাজকে একটি বড় ট্যাঙ্কে (বায়বীয়) পাঠানো

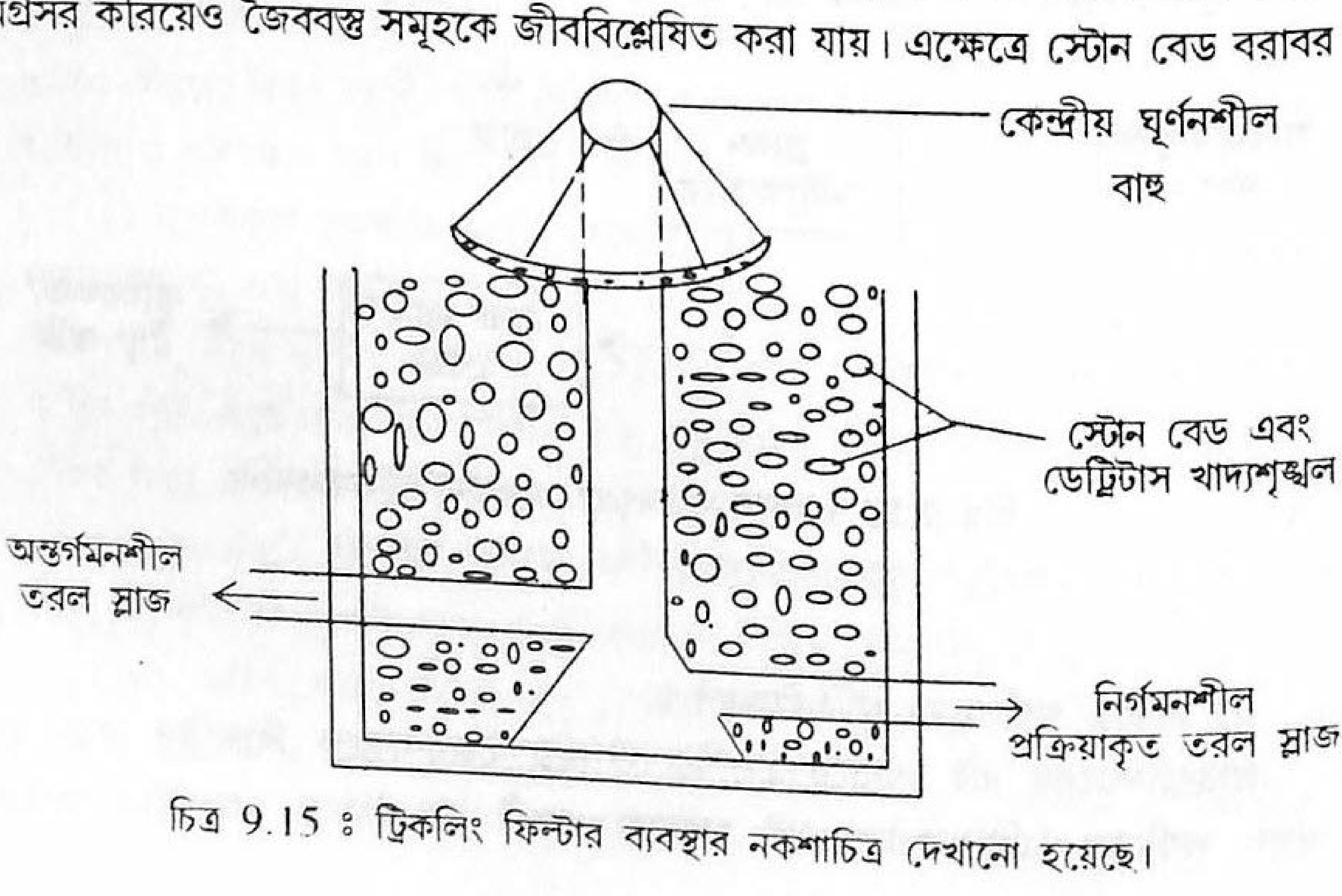
হয়। এক্ষেত্রে ট্যাঙ্কে অবস্থিত বায়বীয় ব্যাক্টিরিয়া এবং অন্যান্য বিশ্লেষক জীবের দ্বারা স্লাজ বিশ্লেষিত হয়।



চিত্র 9.14 ঃ দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের বিচলন নির্দেশক চিত্র দেখানো হয়েছে (ভাঙ্গা রেখা নির্দেশিত চিত্রে তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়াকরণের অংশ সংযোজন করা হয়েছে)।

● **ট্রিকলিং ফিল্টার (Trickling Filter) ঃ**

প্রথম পর্যায়ের প্রক্রিয়াকরণে সৃষ্ট তরল স্লাজকে ট্রিকলিং ফিল্টারের মধ্য দিয়ে অগ্রসর করিয়েও জৈববস্তু সমূহকে জীববিশ্লেষিত করা যায়। এক্ষেত্রে স্টোন বেড বরাবর



চিত্র 9.15 ঃ ট্রিকলিং ফিল্টার ব্যবস্থার নকশাচিত্র দেখানো হয়েছে।

একটি দীর্ঘ পাইপ বা নল ধীরে ধীরে আবর্তন করিয়ে তরল স্লাজকে কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট ডেট্রিটাস জীবযুক্ত কক্ষে ফোঁটায় ফোঁটায় ফেলা হয়। ডেট্রিটাস জীব বলতে ডেট্রিটাস খাদ্য-শৃঙ্খল সৃষ্টিকারী জীব—ব্যাক্‌টিরিয়া, প্রোটোজোয়া, ছত্রাক, শামুক, কৃমি এবং পতঙ্গ প্রভৃতিকে বোঝায়। এরূপ খাদ্যশৃঙ্খলে ব্যাক্‌টিরিয়া এবং ছত্রাক জৈব-স্লাজকে বিশ্লেষণ করে পুষ্টি সংগ্রহ করে। আবার প্রোটোজোয়া ব্যাক্‌টিরিয়া এবং ছত্রাককে খাদ্যরূপে গ্রহণ করে এবং শামুক ও পতঙ্গ প্রোটোজোয়া খেয়ে বেঁচে থাকে। এই পদ্ধতিতে কিছু পরিমাণ অজৈব পুষ্টি পদার্থও অপসারিত হয়।

(দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়াকরণের শেষ পর্যায়ে অবশিষ্ট জৈব পদার্থের অপসারণের জন্য ট্যাঙ্ক নিঃসৃত স্লাজকে **'সেটলিং বেসিন'** বা ক্ল্যারিফায়ারে পাঠানো হয়)।

অধিকাংশ পৌরসংস্থা এবং শিল্পসংস্থা নিঃসৃত আবর্জনার দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়াকরণের পর প্রাপ্ত জলীয় অংশকে একটি বৃহৎ ট্যাঙ্কে ক্লোরিনেশান করা হয়। ক্লোরিনেশানের ফলে প্যাথোজেনিক ব্যাক্‌টিরিয়া এবং প্রেটোজোয়া মারা যায়। ক্লোরিনেশানের পর জলীয় অংশকে নির্গম নলের সাহায্যে নদী বা সমুদ্রে নির্গত করানো হয়।

দূষক বস্তু	প্রক্রিয়াকরণে দূষক অপসারণ (শতাংশ)	
	প্রথম পর্যায়ভুক্ত	প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত
কঠিন বস্তু	60%	90%
জৈববর্জ্য	30%	90%
ফসফরাস		30%
নাইট্রেট		50%
লবণ		5%
তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক		0%
কীটনাশক		0%

তালিকা 9.6 ঃ আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ প্লান্টে প্রথমপর্যায়ভুক্ত এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়াকরণের দূষক অপসারণ ক্ষমতা দেখানো হয়েছে।

iii) তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়াকরণ ঃ

দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়াকরণের পরেও নিঃসৃত জলে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ উপস্থিত থাকতে পারে। রাসায়নিক পদার্থের অপসারণের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রক্রিয়াকৃত জলীয় অংশকে তৃতীয় পর্যায়ে প্রক্রিয়াকৃত করে জলকে নদী বা সমুদ্রে ফেলা হয়। কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়াকরণ ক্রিয়া অধিকাংশ ক্ষেত্রে খুবই ব্যয়সাপেক্ষ।

কিন্তু বিশেষ কয়েকটি প্রক্রিয়াকরণপদ্ধতি তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়াকরণে স্বীকৃত এবং সমাদৃত হয়েছে। যেমন—দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত প্রক্রিয়াকরণের পর নিঃসৃত জলকে নদী বা সমুদ্রে ফেলার পূর্বে পুকুরে ধরে রাখা হয়। এক্ষেত্রে পুকুরে জন্মানো শৈবাল এবং কচুরীপানা পুকুরের জল থেকে নাইট্রেট এবং ফসফেট সংগ্রহ করে বেঁচে থাকে। কতিপয় উদ্ভিদ যথা—ডাক্-উইড (duck-weeds) জলে দ্রবীভূত জৈব পদার্থকে সরাসরি সংগ্রহ করতে পারে। আবর্জনা পুকুরে জাত উদ্ভিদ থেকে জৈব-সার এবং মানুষ ও গৃহপালিত প্রাণীর খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব।

আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট থেকে উৎপন্ন স্লাজকে শুষ্ক করে কৃষিক্ষেত এবং পতিত জমি বা নীচুজমি ভরাট করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

● **জৈব-ইঁট (Bio-Bricks) ঃ**

প্রক্রিয়াকৃত স্লাজ কৃষিক্ষেতে ব্যবহারের ফলে পরোক্ষ উপায়ে বিশেষ মন্দ প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে। প্রক্রিয়াকৃত আবর্জনার মাধ্যমে উদ্ভিদ বা শাক-সব্জীতে প্যাথোজেনিক ভাইরাস, ব্যাক্‌টিরিয়া, প্রোটোজোয়া প্রভৃতি সংক্রমিত হয়, ফলে মানুষ ও গৃহপালিত প্রাণীর বিভিন্ন রোগ সংক্রমণের ঘটনা ঘটে। এছাড়া 'উদ্ভিদ' আবর্জনা থেকে বিষাক্ত ধাতু সংগ্রহ করতে পারে এবং বিষাক্ত ধাতু খাদ্যশৃঙ্খলের মাধ্যমে মানুষের উপর মন্দ প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে। এই কারণে জার্মানী এবং সুইজারল্যাণ্ডে প্রক্রিয়াকরণের পর প্লান্টনিঃসৃত স্লাজকে পুড়িয়ে ফেলার পর কৃষিক্ষেতে ব্যবহার করা হয়।

অধুনা মেরীল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী প্লান্ট নিঃসৃত 'স্লাজ'এর সঙ্গে কাদা এবং স্লেট মিশিয়ে গন্ধহীন বিশেষ ইঁট (ব্রিক) তৈরি করেছেন। এই ইঁটকে **'জৈব-ইঁট'** বা **'বায়োব্রিক'** বলা হয়। এই বায়োব্রিক দেখতে সাধারণ ইঁটের মতই। বায়োব্রিকের ব্যবহার পরীক্ষামূলকভাবে শুরু হয়েছে।

9.11.3. **ব্যক্তিগত উপায়ে জলের দূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ**

ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় জলের দূষণ হ্রাস করা সম্ভব।

i) পরিবার সীমায়িত করে (অর্থাৎ পরিবারের সদস্য সংখ্যা হ্রাস করে) এবং অপ্রয়োজনীয় পদার্থের ব্যবহার হ্রাস করে জলের দূষণ হ্রাস করা সম্ভব।

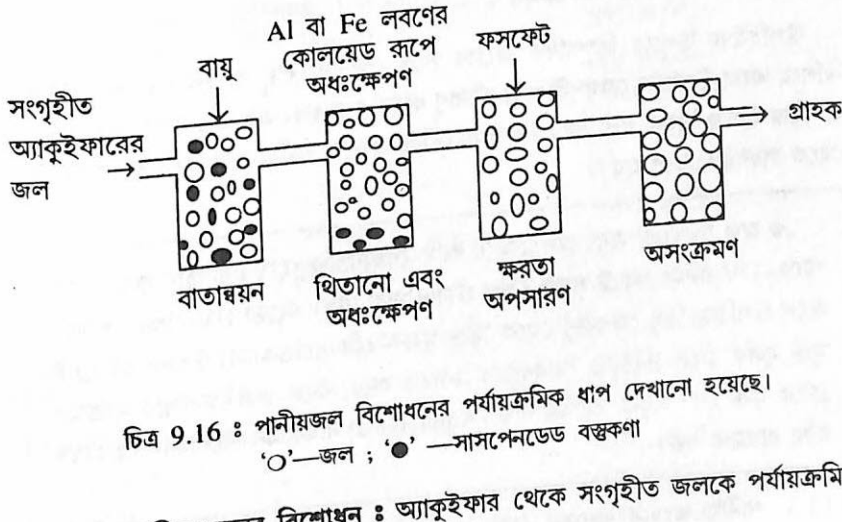
ii) জলদূষণ সৃষ্টিকারী বিষাক্ত রাসায়নিকের ব্যবহার হ্রাস করে জলের দূষণরোধ সম্ভব।

iii) কম্পোস্টিং টয়লেট স্থাপনের মাধ্যমেও জলের দূষণরোধ সম্ভব।

iv) রাসায়নিক সার, পেস্টিসাইড, ডিটারজেন্ট এবং অন্যান্য রাসায়নিকের বিধিনিষেধের মাধ্যমেও দূষণরোধ ব্যক্তিগত স্তরে সম্ভব। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, **কম-ফসফেটযুক্ত বা ফসফেট বিহীন ডিটারজেন্ট বস্ত্র ধৌতকরণের কাজে ব্যবহার** করা উচিত।

9.12. পানীয় জল (Drinking Water) ঃ

পৌরসংস্থা সরবরাহকৃত জলের প্রধান উৎস হচ্ছে ভূ-গর্ভ জল এবং কিছু ক্ষেত্রে বহির্ভাগপৃষ্ঠের জল। ভূ-গর্ভ জলের প্রধান উৎস—'অ্যাকুইফার' (aquifer) এবং বহির্ভাগপৃষ্ঠের জলের প্রধান উৎস—'নদী'। সংগৃহীত জলের বিশোধন এবং অসংক্রমণের (disinfection) (বা রোগজীবাণু নাশ) পর ব্যবহারের জন্য সরবরাহ করা হয়। গ্রামাঞ্চলে গভীর বা অগভীর কূপের মাধ্যমে সংগৃহীত ভূ-গর্ভ জল পানীয় জল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পানীয় জলের উৎকর্ষতা নির্ভর করে—জলে বায়ুর উপস্থিতি এবং অ্যালুমিনিয়াম, আয়রন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও জীবাণুর অনুপস্থিতির উপর। উক্ত মৌলসমূহ পানীয়জলে উপস্থিত থাকলেও এদের পরিমাণ কখনোই অনুমোদনকৃত ঘনত্বের বেশি হয় না।



চিত্র 9.16 ঃ পানীয়জল বিশোধনের পর্যায়ক্রমিক ধাপ দেখানো হয়েছে।
'○'—জল ; '●' —সাসপেনডেড বস্তুকণা

9.12.1. পানীয় জলের বিশোধন ঃ অ্যাকুইফার থেকে সংগৃহীত জলকে পর্যায়ক্রমিক কতকগুলি ধাপের মাধ্যমে বিশোধিত করা হয়, ঃ

i) সংগৃহীত জলকে প্রথমে বাতান্বিত করা হয়। বাতান্বয়নের ফলে দুর্গন্ধ যুক্ত দ্রবীভূত গ্যাস যথা—H_2S এবং গন্ধ উদ্রেককারী উদ্বায়ী জৈবযৌগ দূরীভূত হয়। বাতান্বয়নের ফলে দ্রবীভূত জৈব পদার্থের জারণে CO_2 উৎপন্ন হয়। এই CO_2 পানীয় জলে দ্রবীভূত অবস্থায় উপস্থিত থাকে।

ii) জলে অদ্রবীভূত অপেক্ষাকৃত বড়বস্তুকণার পৃথকিকরণের জন্য জলকে কিছু সময় স্থির রাখা হয়, ফলে অদ্রবীভূত বস্তুকণা জলাধারের নীচে থিতিয়ে পড়ে বা বস্তুকণার পৃথকিকরণের জন্য জলকে ফিল্টারের মধ্য দিয়ে অগ্রসর করানো হয়।

iii) দ্রবীভূত বস্তু যথা অ্যালুমিনিয়াম বা আয়রনের লবণকে (0.001-1μm) কোলয়ডীয় বস্তুকণারূপে অধঃক্ষিপ্ত করানো হয় বিশোধনের এই ধাপে। জলের প্রশম বা ক্ষারীয় pH মাত্রায় ফেরিক (III) সালফেট [$Fe_2(SO_4)_3$] বা অ্যালুমিনিয়াম সালফেট [অ্যালাম, $Al_2(SO_4)_3$] যোগ করলে আয়রন বা অ্যালুমিনিয়াম—ফেরিক হাইড্রক্সাইড [$Fe(OH)_3$] বা অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড [$Al(OH)_3$] রূপে অধঃক্ষিপ্ত হয়।

iv) শেষ ধাপে জলের খরতা সৃষ্টিকারী অতিরিক্ত ক্যালসিয়াম এবং ফসফরাস অপসারণ করা হয়। ফসফেট আয়ন দূরীভবনের জন্য উপযুক্ত পরিমাণে ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সাইড [$Ca(OH)_2$] যোগ করা হয়, ফলে ফসফেট আয়ন অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম ফসফেট [$Ca_3(PO_4)_2$] এবং ক্যালসিয়াম ফসফেট হাইড্রক্সাইড [$Ca_3(PO_4)_3OH$] রূপে অধঃক্ষিপ্ত হয়। অনুরূপ পদ্ধতিতে ফসফেট আয়ন যোগ করে ক্যালসিয়াম আয়ন দূরীভূত করা যায়।

9.12.2. পানীয় জলের অসংক্রমণ ঃ

উপরিউক্ত উপায়ে বিশোধিত জলের সঙ্গে ক্লোরিন (Cl_2 বা HOCl) বা ওজোন মিশিয়ে জলে উপস্থিত রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু ধ্বংস করা হয়। এই প্রক্রিয়াকে 'অসংক্রমণ' বা **'ডিজ-ইনফেকশান'** বলা হয়। এই অসংক্রমিত জলকে পানীয় জল হিসেবে পৌরসংস্থা থেকে সরবরাহ করা হয়।

● জল বিশোধন এবং অসংক্রমণে অতি-বেগনীরশ্মি (UV) ব্যবহার করা যেতে পারে। UV-রশ্মির প্রকটে সমস্ত রোগ জীবাণু মারা যায়। এছাড়া UV-রশ্মির শোষণে জলে উপস্থিত কিছু জৈবঅণু থেকে 'মুক্ত-মূলক' (ফ্রি-র‍্যাডিক্যাল) উৎপন্ন হয়। এই মুক্ত মূলক জলে দ্রবীভূত জৈববস্তুকে জারিত করে, ফলে জল জৈববস্তুর সংক্রমণ থেকে মুক্ত হয়। অধুনা 'অ্যাকুয়াগার্ড (Aquaguard) নামক জলবিশোধন-যন্ত্রে UV-রশ্মি ব্যবহৃত হয়।

9.12.3. পানীয় জলের গুণমান (Water Quality Standards for Drinking Water) ঃ

পানীয় জলের পানযোগ্যতা (Potability) নির্ধারিত হয় জলের গুণমানের দ্বারা। আবার জলের গুণমান নির্ভর করে জলে উপস্থিত রঙ, গন্ধসৃষ্টিকারী পদার্থ, ক্ষরতা সৃষ্টিকারী আয়ন, অজৈব পদার্থ, বিষাক্ত ভারী ধাতু এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থের মাত্রার উপর। 1975 সালের ICMR (ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব্ মেডিক্যাল রিসার্চ) স্বীকৃত পানীয় জলের ভৌত, রাসায়নিক এবং তেজস্ক্রিয় গুণমান নীচের তালিকায় দেওয়া হল।

বস্তু	উচ্চকাম্যসীমা (Highest Desirable Limit)	সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য সীমা (Max. Permissible Limit)
1) ভৌতগুণমান ঃ		
a) জলের রঙ বিঘ্নকারীবস্তু (TCU)	5 একক	25 একক
b) গন্ধসৃষ্টিকারী বস্তু	অনাপত্তিকর	অনাপত্তিকর
c) স্বাদ পরিবর্তনকারী বস্তু	,,	,,
d) টার্বিডিটি (ঘোলাটে)	5 একক	25 একক
e) pH বিস্তার	7–8.5	6.5–9.2
2) রাসায়নিক গুণমান ঃ		
রাসায়নিক বস্তু		
a) মোট ক্ষরতা	300mg. $CaCO_3$/L	600 mg $CaCO_3$/L
b) ক্যালসিয়াম	75mg/L	200 mg/L
c) ম্যাগনেসিয়াম	50mg/L	100 mg/L
d) কপার	0.05mg/L	1.5 mg/L
e) লোহা	0.1mg/L	1.0 mg/L
f) ম্যাঙ্গানীজ	0.1mg/L	0.5 mg/L
g) ক্লোরাইড	200mg/L	1000 mg/L
h) সালফেট	200mg/L	400 mg/L
i) নাইট্রেট	20mg/L	—
j) ফ্লুরাইড	1.0mg/L	1.5 mg/L
k) ফেনোলিক যৌগ	0.001mg/L	0.002 mg/L
বিষক্রিয় রাসায়নিক বস্তু ঃ		
a) আর্সেনিক		0.05 mg/L
b) সীসা		0.1 mg/L
c) পারদ		0.001 mg/L
d) ক্যাডমিয়াম		0.01 mg/L
e) সায়ানাইড		0.05 mg/L
3) তেজস্ক্রিয়তা ঃ		
a) বিটা তেজস্ক্রিয়তা		30 pCi/L
b) আলফা ,,		3 pCi/L

তালিকা 9.7 ঃ পানীয় জলের গুণমান উল্লেখ করা হয়েছে।

(উৎস ঃ Environmental Pollution, N.Manivasakam, 1984)

● পানীয়জলে কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থের আন্তর্জাতিক গুণমান ঃ

বস্তু	সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য সীমা
নাইট্রেট	45 mg/L
ফ্লুরাইড	1.5 mg/L
ফেনোলিক বস্তু	0.002 mg/L
আর্সেনিক	0.05 mg/L
ক্যাডমিয়াম	0.01 mg/L
ক্রোমিয়াম	0.05 mg/L
সায়ানাইড	0.2 mg/L
সীসা	0.05 mg/L
সেলেনিয়াম	0.01 mg/L
রেডিওনিউক্লিওটাইড (বিটা-তেজস্ক্রিয়তা)	1000 bbc/L

9.13. সারাংশ ঃ

● জীবের উপর মন্দ প্রভাব সৃষ্টিকারী জলের যে কোন ভৌত বা রাসায়নিক পরিবর্তনকে 'জলদূষণ' বলা হয়। জলদূষণের উৎস দুপ্রকারের—প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট। মনুষ্যসৃষ্ট উৎস আবার দু-প্রকার—বিন্দু উৎস (যথা—পাওয়ার প্লান্ট, কারখানা) এবং অবিন্দু উৎস (যথা—কৃষিফার্ম, অরণ্য, বাগান)।

● জল-দূষকের প্রকৃতি অনুসারে জলদূষণ প্রধানত 6 প্রকার—পরিপোষক, রোগজীবাণু, বিষাক্ত জৈবপদার্থ, বিষাক্ত অজৈব পদার্থ, তলানি (গাদ) এবং তাপীয় জলদূষণ।

● জল-দূষণের একটি প্রধান উপায় হচ্ছে 'আন্তর-মাধ্যম' সংক্রমণ। অর্থাৎ জল, স্থল এবং বায়ুমণ্ডলের দূষণ একে অপরকে প্রভাবিত করতে পারে।

● হ্রদের জলরাশি তিনটি বাস্তুসংস্থানগত অঞ্চল দ্বারা গঠিত—লিট্টোরাল, লিমনেটিক এবং প্রোফানডাল। আবার তাপমাত্রার বিস্তৃতি অনুসারেও হ্রদের জল তিনটি অনুরূপ তাপীয় অঞ্চলে বিভেদিত—এপিলিমনিয়ন, হাইপোলিমনিয়ন এবং থার্মোক্লাইন।

● দূষিত জলে ব্যাক্‌টিরিয়া বা আণুবীক্ষণিক জীবের দ্বারা দ্রবীভূত 'অক্সিজেন হ্রাস' হারের পরিমাপকে 'জীবরাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা' (BOD) বলা হয়। BOD-এর পরিমাপ থেকে জৈব-পরিপোষকঘটিত জলদূষণের মাত্রা নির্ধারণ করা যায়।

● প্রাকৃতিক উপায়ে পরিপোষকের সঞ্চয়ে হ্রদ থেকে জলাভূমি সৃষ্টির ঘটনাকে 'ইউট্রোফিকেশান' বলা হয়। ইউট্রোফিকেশান পরিপোষক ঘটিত জলদূষণের একটি প্রত্যক্ষ প্রতিফলন।

● জলের জীব-সংক্রান্ত দূষণের প্রধান কারণ পানীয় এবং ব্যবহারোপযোগী জলে রোগ-জীবাণুর উপস্থিতি। জীব-সংক্রান্ত দূষণের ফলে মানুষের বিভিন্ন জলবাহিত রোগ যথা ঃ আমাশা, টাইফয়েড, কলেরা, হেপাটাইটিস এবং সিস্টোসোমিয়াসিস প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।

● ভারী ধাতু (যথা ঃ পারদ, সীসা, ক্যাডমিয়াম এবং আর্সেনিক) হচ্ছে অজৈব পদার্থঘটিত প্রধান জলদূষক। বাস্তুতন্ত্র এবং মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ভারী ধাতুর পরিবেশগত প্রভাব যথেষ্ট উদ্বেগজনক। মিনামাটা এবং ইটাই-ইটাই (আউচ-আউচ) বিপর্যয় হচ্ছে পারদ এবং ক্যাডমিয়াম বিষক্রিয়াজনিত ভয়াবহ পরিবেশগত দুর্ঘটনার উদাহরণ।

● তাপ ও নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট, ইস্পাত কারখানা, পেপারমিল এবং তৈল শোধনাগার থেকে নিক্ষিপ্ত উষ্ণ-জলের প্রভাবে নদী এবং হ্রদের জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধির দরুন জলজ বাস্তুতন্ত্রের যে অনভিপ্রেত পরিবর্তন ঘটে, তাকে জলের **'তাপীয় দূষণ'** বলা হয়। তাপীয় দূষণের প্রভাবে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন-এর পরিমাণ হ্রাস পায়, ফলে বহু জলজ প্রজাতি চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

● ভূ-গর্ভস্থ জলও মনুষ্যসৃষ্ট ক্রিয়াকলাপে দূষিত হয়। সেপটিক ট্যাঙ্ক, মলকুণ্ড, তৈলকূপ এবং আবর্জনা সমৃদ্ধ পুকুরের দূষিত জল চুইয়ে ভূ-গর্ভস্থ জলে সংক্রমিত হতে পারে। ভূ-গর্ভস্থ জলের দূষণে পরিবেশ দূষণের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়।

● সামুদ্রিক দূষণ একটি পরিচিত পরিবেশগত সমস্যা। তেল এবং প্লাস্টিকই সমুদ্রের প্রধান দূষক। কিন্তু তেল-দূষণে সামুদ্রিক পরিবেশের বিপর্যয়ের মাত্রা অধিক ভয়াবহ। প্রাকৃতিক কারণে অফশোর অঞ্চলে সঞ্চিত তেলের সংক্রমণে বা মনুষ্যসৃষ্ট কারণে যথা সমুদ্রে তেল-উত্তোলনের সময় তেলের আকস্মিক নির্গমনে বা তেলপরিবাহী ট্যাঙ্কার থেকে সমুদ্রে তেল পড়ে যাওয়ার কারণে সামুদ্রিক তেল দূষণ সৃষ্টি হয়। সামুদ্রিক তেল দূষণের ফলে সমুদ্রের 'বাস্তুতন্ত্র ভারসাম্য' বিঘ্নিত হয় এবং অসংখ্য জীবের প্রজাতি বিলুপ্ত হয়।

● বায়ুদূষণের মত জলদূষণকেও আইনগত, প্রযুক্তিগত এবং ব্যক্তিগত উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। অধিক ক্রিয়াশীল প্রযুক্তির সাহায্যে আবর্জনাযুক্ত জলকে প্রক্রিয়াকৃত করে জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

● জলের পানযোগ্যতা নির্ভর করে জলের গুণমানের উপর। কোন জলের ভৌত, রাসায়নিক, জৈবিক এবং তেজস্ক্রিয় গুণাবলী যদি নির্দিষ্ট সর্বোচ্চ মাত্রার মধ্যে থাকে এবং কোন প্রকার অনভিপ্রেত শারীরবৃত্তিয় প্রভাব সৃষ্টি করে না, সেই জলকে **পানযোগ্য জল (Potable water)** বা **'পানীয় জল' (Drinking water)** বলে।

• অনুশীলনী •

A. রচনাভিত্তিক বা দীর্ঘউত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. জলের দূষণ বলতে কি বোঝায়? জলদূষকের প্রকৃতি এবং উদাহরণ উল্লেখ কর। জলদূষণের বিন্দু এবং অবিন্দু উৎস বর্ণনা কর।

2. জলের আন্তরমাধ্যম সংক্রমণ বর্ণনা কর। জলদূষণের সাহায্যকারী শর্তসমূহ উল্লেখ কর।

3. বহির্ভাগপৃষ্ঠীয় জলের পরিপোষক দূষণ বর্ণনা কর। জীবরাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা বা বায়োকেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমাণ্ড (BOD) কাকে বলে? 'ইউট্রোফিকেশান' বলতে কি বোঝায়?

4. বহির্ভাগপৃষ্ঠীয় জলের জীবসংক্রান্ত দূষণ বর্ণনা কর।

5. বহির্ভাগপৃষ্ঠীয় জলের বিষক্রিয় জৈব এবং অজৈব পদার্থঘটিত দূষণ বর্ণনা কর।

6. মানব স্বাস্থ্যের উপর পারদ, সীসা, ক্যাডমিয়াম এবং আর্সেনিকের প্রভাব উল্লেখ কর।

7. তাপসংক্রান্ত জলদূষণ বলতে কি বোঝ? এই দূষণের কারণ এবং পরিবেশ সংক্রান্ত প্রভাব বর্ণনা কর।?

8. কি কি উপায়ে সামুদ্রিক তৈল দূষণ ঘটে? সামুদ্রিক তৈল দূষণে পরিবেশ সম্পর্কীয় প্রভাব বর্ণনা কর।

9. কি কি উপায়ে প্লাসটিক জলদূষণের সৃষ্টি করে? প্লাসটিক দূষণে পরিবেশ সম্পর্কীয় প্রভাব উল্লেখ কর।

10. জলদূষণের নিয়ন্ত্রণ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

11. ভূগর্ভ জলের দূষণ কিভাবে ঘটে? মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ভূগর্ভ জলদূষণের প্রভাব বর্ণনা কর। ভূগর্ভ জলের দূষণ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

12. পানীয় জল কাকে বলে? পানীয় জলের বিশোধন এবং অসংক্রমণ বর্ণনা কর।

13. পানীয় জলের গুণমান বলতে কি বোঝ? ICMR স্বীকৃত পানীয় জলের ভৌত, রাসায়নিক এবং তেজস্ক্রিয় গুণমান বর্ণনা কর।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. জলদূষণ কি? বিভিন্ন জলদূষণের প্রকৃতি এবং উদাহরণ উল্লেখ কর।

2. হ্রদের জলজ অঞ্চল বর্ণনা কর।

3. স্থিরীকৃত জলজতন্ত্র বলতে কি বোঝ?

4. জীবরাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা (BOD) কি? BOD অনুসারে জলের উৎকর্ষ মান উল্লেখ কর।

5. ইউট্রোফিকেশান কাকে বলে?

6. জলে রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু সংক্রমণের কারণ কি? কয়েকটি জলবাহিত রোগের নাম উল্লেখ কর।

7. জলজ পরিবেশে পারদের পরিবেশগত রূপান্তর উল্লেখ কর। জলজ খাদ্য-শৃঙ্খলে পারদের জীব-বিবর্ধন বর্ণনা কর।

8. মানবস্বাস্থ্যের উপর মারকারির বিরূপ প্রভাব বর্ণনা কর। কোষীয়স্তরে মারকারি কিভাবে কাজ করে?

9. মিনামাটা রোগ কি? মিনামাটা রোগের কারণ এবং উপসর্গ বর্ণনা কর।

10. মানবদেহে সীসা কিভাবে সংক্রমিত হয়? সীসা কিভাবে পরিবেশকে দূষিত করে।

11. মানুষের স্বাস্থ্যের উপর সীসার প্রভাব বর্ণনা কর।

12. মানুষের শরীরে ক্যাডমিয়ামের সংক্রমণ কিভাবে ঘটে? মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ক্যাডমিয়ামের প্রভাব উল্লেখ কর।

13. 'মেটালোথিওনিন' কি? 'ইটাই-ইটাই' রোগ বলতে কি বোঝায়?

14. জলে ক্লোরিনের দূষণ কিভাবে ঘটে? মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ক্লোরিন দূষণের প্রভাব বর্ণনা কর?

15. জলে নাইট্রেট এবং নাইট্রাইট দূষণের কারণ উল্লেখ কর। মানুষের স্বাস্থ্যের উপর এই দূষণের প্রভাব বর্ণনা কর।

16. সামুদ্রিক তৈল দূষণে পরিবেশ সম্পর্কীয় প্রভাব উল্লেখ কর।

17. ট্রিকলিং ফিলটার কি?

18. ভূ-গর্ভ জলদূষণের উৎসগুলি উল্লেখ কর।

19. বায়োব্রিকস বা জৈব ইঁট কি?

20. পানীয় জল বলতে কি বোঝ? পানীয় জলে সীসা, পারদ, আর্সেনিক এবং ফ্লুরাইডের উচ্চ কাম্য সীমা এবং সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য সীমা উল্লেখ কর।

10 মৃত্তিকা দূষণ

10.1. ভূমিকা (Introduction) :

জলবায়ুকৃত খনিজ উপাদান ; জৈব উপাদান—'হিউমাস' ; জল এবং বায়ুর সহযোগে মৃত্তিকা গঠিত হয়। মৃত্তিকার উর্বরতা এবং উৎপাদনশীলতা নির্ভর করে শীর্ষ-মৃত্তিকা বা টপ-সয়েলের উৎকর্ষ মানের উপর, কারণ মৃত্তিকার পুষ্টি পদার্থ কেন্দ্রীভূত থাকে এই স্তরেই। শীর্ষ-মৃত্তিকা স্তরে পুষ্টি পদার্থের আত্মস্থতা, মৃত্তিকার সংমিশ্রণ এবং বাতান্বয়নের মাধ্যমে উৎকর্ষ-মানের বৃদ্ধি ঘটে এই স্তরে বসবাসকারী 'ব্যাক্‌টিরিয়া', 'ছত্রাক' (ডিকম্পোজার) এবং 'কেঁচো' (ডেট্রিভোর) প্রভৃতি প্রাণীর দ্বারা। কিন্তু মনুষ্যসৃষ্ট দূষণ ক্রিয়ার ফলে বর্তমানে শীর্ষ-মৃত্তিকা স্তরে পুষ্টি পদার্থের অপসারণ ঘটছে, মৃত্তিকা সৃষ্টিকারী জীবের গতিশীলতা বিঘ্নিত হচ্ছে, বহিরাগত সজীব ও অজীব উপাদানের আবির্ভাব ঘটছে। মহার্ঘ্য সম্পদ-'শীর্ষ-মৃত্তিকা স্তরের' এই বিপন্নতা অদূর ভবিষ্যতে পরিবেশ সঙ্কটের সম্ভাবনা সম্পর্কে নিশ্চিত করে তুলেছে। মৃত্তিকার দূষণে স্বকীয় প্রভাব ব্যতিরেকে জল ও বায়ুর দূষণও প্রভাবিত হয় অর্থাৎ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মৃত্তিকার দূষণ জল এবং বায়ুদূষণের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। আবার বায়ু ও জলের দূষণও মৃত্তিকার দূষণকে প্রভাবিত করে।

10.2. মৃত্তিকার দূষক (Soil Pollutants) :

মৃত্তিকার দূষণ সৃষ্টিকারী শর্ত কে প্রধানত দু-ভাগে ভাগ করা হয়— 'সজীব দূষক' (Biotic Pollutant) এবং অজীব দূষক (Abiotic Pollutant)। অজীব এবং সজীব দূষকের উদাহরণ এবং উৎস তালিকায় দেওয়া হল।

দূষক	উৎস
1. সজীব—	
রোগসৃষ্টিকারী ভাইরাস, ব্যাক্টিরিয়া, প্রোটোজোয়া, কৃমি।	পৌর-প্রতিষ্ঠানের আবর্জনা, আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট নিঃসৃত 'সংক্রমিত স্লাজ', মানুষ ও প্রাণীর মল এবং মূত্র।
2. অজীব—	
অজৈব ঃ সালফেট, ফসফেট, ভারীধাতু যথা- পারদ, সীসা, ক্যাডমিয়াম ; লবণ, অ্যাসিড ইত্যাদি।	কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার, প্লাস্টিক উৎপাদন কারখানা, ভস্মীকরণ কারখানা, পাওয়ার প্লান্ট, স্টোরেজ ব্যাটারির অসতর্ক পুনরাবর্তন, জিঙ্ক নিষ্কাশন কারখানা, পেট্রোল দহন, PVC প্লাস্টিক দহন, ফসফেট সার, অম্লবৃষ্টি ইত্যাদি।
জৈব ঃ পেস্টিসাইড, প্লাস্টিক দ্রব্য, পলিথিন দ্রব্য।	কৃষিফার্ম, প্লাস্টিক এবং পলিথিন সমৃদ্ধ আবর্জনা।

তালিকা 10.1 ঃ মৃত্তিকার দূষক এবং দূষক উৎস।

10.3. মৃত্তিকা দূষণের প্রকার ভেদ ঃ

দূষণের প্রকৃতি অনুসারে মৃত্তিকা দূষণ কে নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ

i) জীব-সংক্রান্ত দূষণ
ii) পরিপোষক দূষণ
iii) অজৈব-পদার্থ ঘটিত দূষণ
iv) জৈব-পদার্থ ঘটিত দূষণ
v) অ্যাসিড দূষণ
vi) তেজস্ক্রিয় পদার্থ ঘটিত দূষণ এবং
vii) প্লাস্টিক দূষণ

i) জীব-সংক্রান্ত দূষণ ঃ আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের প্লান্ট নিঃসৃত অসংক্রমিত স্লাজ, হাসপাতালের আবর্জনা (যথা রক্তমাখা ব্যান্ডেজ, সূচ, সিরিঞ্জ ইত্যাদি) এবং অপ্রক্রিয়াকৃত পৌর প্রতিষ্ঠানের আবর্জনায় বিভিন্ন রোগসৃষ্টিকারী জীবাণু যথা ভাইরাস, ব্যাক্টিরিয়া, প্রোটোজোয়া এবং কৃমি উপস্থিত থাকে। এই সব আবর্জনা স্থলভাগে স্থূপীকৃত করা হয় এবং কৃষিক্ষেত্রে সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কৃষিজমিতে উৎপন্ন শাক-সব্জী এবং

ফল আবর্জনায় উপস্থিত রোগজীবাণুর দ্বারা আক্রান্ত হয়। শাক-সব্জীর মাধ্যমে মানুষ, গবাদীপশু এবং পোল্ট্রী প্রাণীতে রোগ সংক্রমিত হয়। রোগ-জীবাণুর দ্বারা শীর্ষ মৃত্তিকার এইরূপ সংক্রমণকে মৃত্তিকার 'জীব-সংক্রান্ত দূষণ' বলা হয়। রোগাক্রান্ত মানুষ ও প্রাণীর বিষ্ঠা, মূত্র প্রভৃতির মাধ্যমেও মৃত্তিকা জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। মৃত্তিকা এবং জলের সংক্রমণের মাধ্যমে সুস্থ মানুষ এবং প্রাণী পুনরায় আক্রান্ত হয়।

আবর্জনা,
↓
স্লাজ, মল, মূত্র
↓
মৃত্তিকা
↓
উদ্ভিদ
↓
মানুষ/গবাদিপশু/পোল্ট্রীপ্রাণী
↓
রোগ-সংক্রমণ

চিত্র 10.1 : মৃত্তিকার জীব-সংক্রান্ত দূষণ উৎস থেকে মানুষ এবং মনুষ্যেতর প্রাণীতে রোগ জীবাণুর সংক্রমণ বিস্তার দেখানো হয়েছে।

ii) পরিপোষক দূষণ :

মৃত্তিকার শীর্ষস্তর বা শীর্ষ মৃত্তিকা (টপ-সয়েল) পুষ্টি পদার্থ বা পরিপোষকের একমাত্র আধার। উদ্ভিদ বেঁচে থাকার জন্য পুষ্টি পদার্থ সংগ্রহ করে এই শীর্ষ মৃত্তিকাস্তর থেকেই। শীর্ষ মৃত্তিকার পরিপোষক উৎকর্ষতা সৃষ্টি হয় মৃত্তিকাতে বসবাসকারী ডেট্রিভোর এবং ডিকম্পোজার জীবের দ্বারা জলবায়ুকৃত খনিজ উপাদানের সঙ্গে মৃত-জীব ও জীব উপাংশ উদ্ভূত হিউমাসের অন্তীকরণ, বাতান্বয়ন এবং জলের আসক্তির ফলে।

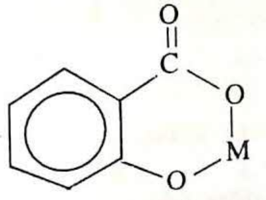
অধুনা কৃষিপদ্ধতির বিশেষ প্রবণতার কারণে শীর্ষ মৃত্তিকায় পরিপোষকের পুনরাবর্তন সম্ভব হচ্ছে না। পরিপোষকের হ্রাসে বা নিঃশেষে মৃত্তিকা বন্ধ্যা (বা অনুর্বর) হয়ে যাচ্ছে। ফলে সামগ্রিক উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে। মৃত্তিকার পরিপোষক হ্রাসের ঘটনাকে **'পরিপোষক দূষণ'** বলা হয়। মৃত্তিকা'র পরিপোষক দূষণের প্রধান কারণ একই শস্যের পুনরাবৃত্তি, পরপর দুটি চাষের অন্তর্বর্তী সময়ের ব্যবধান হ্রাস এবং অত্যধিক পরিমাণ রাসায়নিক সার ও কীট নাশকের ব্যবহার। অত্যধিক রাসায়নিক সার এবং কীট-নাশকের ব্যবহারের ফলে মৃত্তিকার **ডিকম্পোজার** এবং **'ডেট্রিভোর'** জীব মারা যায়, ফলে হিউমাস তৈরি হতে পারে না এবং মৃত্তিকার সংমিশ্রণ, বাতান্বয়ন ও জলাসক্তি হ্রাস পায়। এই

কারণে সামগ্রিক ভাবে মৃত্তিকার পরিপোষক উৎকর্ষতা বিনষ্ট হয়। রাসায়নিক দূষণে মৃত্তিকার উৎকর্ষতা হ্রাসের অন্য একটি কারণ হল মৃত্তিকার pH-মান এর পরিবর্তন।

iii) অজৈব-পদার্থ ঘটিত দূষণ ঃ

অজৈব পদার্থ ঘটিত মৃত্তিকা দূষণের প্রধান কারণ স্থলভাগের শিল্পসংস্থা এবং পৌর সংস্থা নিক্ষেপিত কঠিন আবর্জনার অপরিকল্পিত স্তূপীকরণ। কয়লা ও খনিশিল্প, ধাতু প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, প্লাস্টিক ও পেন্ট উৎপাদন প্রভৃতি শিল্প সংস্থার নিক্ষেপিত বর্জ্য পদার্থের মাধ্যমে বিভিন্ন অজৈব বিষাক্ত ধাতু যথা সীসা, পারদ, ক্যাডমিয়াম, দস্তা প্রভৃতি মৃত্তিকায় সংক্রমিত হয়। পৌর সংস্থা নিক্ষেপিত কঠিন বর্জ্য পদার্থ যথা ধাতব পাত্র, গৃহস্থ জ্বালানির অদাহ্য অংশ, রাস্তা পরিষ্কৃত বর্জ্য পদার্থ, খাদ্যাংশ, পরিত্যক্ত যানবাহন, কাগজ, গ্লাস এবং অব্যবহৃত স্টোরেজ ব্যাটারির স্তূপীকরণের ফলে বিভিন্ন অজৈব রাসায়নিক, ভারী ধাতু মৃত্তিকায় সংক্রমিত হয়। এছাড়া কৃষিকাজে ব্যবহৃত রাসায়নিক সারের মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগের ফলেও মৃত্তিকা নাইট্রেট এবং ফসফেট দ্বারা সংক্রমিত হয়।

(a) শিল্প এবং পৌর সংস্থার আবর্জনা নিঃসৃত ভারী ধাতু প্রধানত তিনটি উপায়ে মৃত্তিকায় সংলগ্ন থাকতে পারে—খনিজ কণা'র গায়ে বিশোষিত হয়ে, হিউমিক ও ফালভিক অ্যাসিডের সঙ্গে কমপ্লেক্স উৎপন্ন করে (—COOH গ্রুপের সঙ্গে ভারী ধাতুর ক্যাটায়ন এর সঙ্গে বিক্রিয়ায়), এবং অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে। অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়ায় ভারী ধাতুর সঙ্গে সালফাইডের বিক্রিয়ায় ধাতব সালফাইড উৎপন্ন হয়, যথা HgS এবং CdS।



(M = ভারী ধাতু)

ফালভিক অ্যাসিড এবং ভারী ধাতুর জটিল

মৃত্তিকা যেসব ভারী ধাতু কে ধরে রাখে ঐ সব ধাতু উদ্ভিদ দ্বারা শোষিত হয়। উদ্ভিদ থেকে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীকোষে খাদ্যশৃঙ্খলজনিত সম্পর্কের কারণে পরিবাহিত হয়। ফলে মানুষ ও প্রাণীর উপর ধাতুর বিষক্রিয়া-জনিত মন্দপ্রভাব সৃষ্টি হয়। মৃত্তিকায় সঞ্চিত ভারী ধাতু জলদূষণের মাধ্যমেও পরোক্ষে মানুষের উপর মন্দ-প্রভাব সৃষ্টি করে।

উৎস → ভারী ধাতু (Hg,Cd,Pb) → মৃত্তিকা → উদ্ভিদ → মনুষ্যেতর প্রাণী / মানুষ

b) অধুনা কৃষি পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন অজৈব পদার্থঘটিত মৃত্তিকা দূষণের অন্যতম

একটি কারণ। কৃষিকাজে মাত্রাতিরিক্ত অজৈব রাসায়নিক সার প্রয়োগের ফলে উদ্বৃত্ত সার মৃত্তিকায় সঞ্চিত থাকে। মৃত্তিকাস্থ অজৈব রাসায়নিক সারের সঙ্গে ক্ষতিকারক সিন্থেটিক জৈব-রাসায়নিকের সংক্রমণ ঘটলে মৃত্তিকাস্থ জল সিন্থেটিক জৈব রাসায়নিকের দ্বারা দূষিত হতে পারে। জৈব রাসায়নিক দূষক এইভাবে উদ্ভিদ ও মানুষের উপর মন্দ প্রভাব সৃষ্টি করে।

iv) জৈব-পদার্থ ঘটিত দূষণ ঃ

i) জৈব-পদার্থ ঘটিত মৃত্তিকা দূষণের প্রধান কারণ আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে পেস্টিসাইড এবং মৃত্তিকা-নিয়ন্ত্রকের অবাধ ব্যবহার। জলে অদ্রাব্য অর্গ্যানোক্লোরিন পেস্টিসাইডই প্রধান মৃত্তিকা দূষক। ডি ডি টি, হেপ্টাক্লোর, ক্লোরডেন, অলড্রিন, ডাইএল ড্রিন এবং এন্ড্রিন প্রভৃতি অর্গ্যানোক্লোরিন পেস্টিসাইডের মাত্রাতিরিক্ত এবং অসতর্ক ব্যবহারের ফলে পেস্টিসাইডের বেশ কিছু অংশ মৃত্তিকায় সংক্রমিত হয়। মৃত্তিকায় বসবাসকারী ডিকম্পোজার এবং ডেট্রিটাস জীবের দ্বারা এই সব পেস্টিসাইড অবিশ্লেষ্য হওয়ায় বহুবছর অবিকৃত অবস্থায় সঞ্চিত থাকতে পারে এবং কোন কোন সময় মৃত্তিকার ধৌতকরণ প্রক্রিয়ায় জলে সংক্রমিত হয়। মৃত্তিকায় সঞ্চিত পেস্টিসাইড লিপিড দ্রাব্য হওয়ায় সহজেই উদ্ভিদ মূলদ্বারা শোষিত এবং কোষে জীব-পুঞ্জীভূত হতে পারে। যেহেতু এই শ্রেণীর পেস্টিসাইড 'জীব-অবিশ্লেষ্য' (Non-biodegradable), তাই পেস্টিসাইড পুঞ্জীভূত উদ্ভিদ থেকে খাদ্য-শৃঙ্খলজনিত পরিবহনের ফলে মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর কোষে পেস্টিসাইড জীব বিবর্ধিত হয়, ফলে স্বাস্থ্য-সম্পর্কীয় মন্দ প্রভাব সৃষ্টি হয়।

অর্গ্যানোক্লোরিন
পেস্টিসাইড
↓
কৃষি-ক্ষেতের মৃত্তিকা
↓
স্থলজ উদ্ভিদ (জীব-পুঞ্জীভবন)
↓
শস্য, পাতা, ফল, মূল

বিষক্রিয়া ← মনুষ্যেতর প্রাণী   মানুষ → বিষক্রিয়া

চিত্র 10.2 ঃ বাস্তুতন্ত্রের উপর পেস্টিসাইড সৃষ্ট মৃত্তিকা দূষণের প্রভাব দেখানো হয়েছে।

পেস্টিসাইড ব্যতীত জৈব পদার্থ ঘটিত মৃত্তিকা-দূষণের অপর কারণ হচ্ছে কৃষিক্ষেতে এবং বাগানে ফিউমিগ্যান্ট এবং সয়েল কন্ডিশনার (মৃত্তিকা-নিয়ন্ত্রক) এর ব্যবহার। সীসা,

পারদ এবং আর্সেনিক সমৃদ্ধ জৈব যৌগ ফিউমিগ্যান্ট বা সয়েল কন্ডিসনার হিসেবে ব্যবহারের ফলে ভারী ধাতুগুলি স্থায়ীরূপে মৃত্তিকায় সঞ্চিত হয়। মৃত্তিকা থেকে উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদ থেকে খাদ্য-শৃঙ্খলের মাধ্যমে ভারী ধাতু মানুষের শরীরে পরিবাহিত হয়।

v) অ্যাসিড দূষণ ঃ

মৃত্তিকার অ্যাসিড (অম্ল) দূষণ বলতে অ্যাসিড বৃষ্টির প্রভাবে শীর্ষ-মৃত্তিকার উৎকর্ষমানের হ্রাসকে বোঝায়। মৃত্তিকার অ্যাসিড দূষণ বায়ু দূষণের একটি পরোক্ষ প্রভাব। বায়ুতে উপস্থিত সালফার এবং নাইট্রোজেন অক্সাইড বৃষ্টির জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সালফিউরিক এবং নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। উৎপন্ন সালফিউরিক এবং নাইট্রিক অ্যাসিড বৃষ্টির জলের মাধ্যমে মৃত্তিকায় অধঃক্ষিপ্ত হয়। অ্যাসিড বৃষ্টির pH মান স্বাভাবিকভাবেই 5.6 এর কম থাকায় মৃত্তিকার pH মান হ্রাস পায়, অর্থাৎ অম্লত্ব বাড়ে। এই অবস্থায় মৃত্তিকায় উপস্থিত ধাতব এবং জৈব আয়নের আধান প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটে, ফলে উদ্ভিদ মৃত্তিকা থেকে জলের মাধ্যমে অপরিহার্য্য ধাতব এবং জৈব আয়ন শোষণ করতে পারে না।

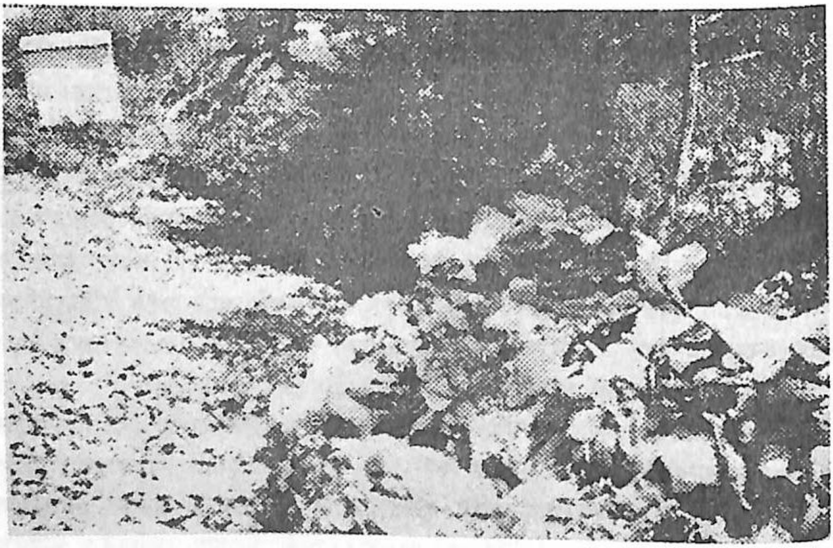
vi) তেজস্ক্রিয় পদার্থ ঘটিত দূষণ ঃ

মৃত্তিকা তেজস্ক্রিয় পদার্থের দ্বারাও দূষিত হতে পারে। শিল্প সংস্থা এবং নিউক্লিয়ার পরীক্ষাগার থেকে নিঃসৃত তেজস্ক্রিয় বর্জ্য বস্তু এবং নিউক্লিয়ার বিস্ফোরণের ফলে বায়ুমণ্ডলে সংক্রমিত তেজস্ক্রিয় বস্তুর বৃষ্টি-অধঃক্ষেপণের ফলে মৃত্তিকা তেজস্ক্রিয় বস্তুর দ্বারা সংক্রমিত হয়। নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট নিঃসৃত বর্জ্যবস্তুর মাধ্যমে স্ট্রনসিয়াম-90 এবং সিজিয়াম-137 প্রভৃতি নিউক্লাইড সহ রুথেনিয়াম-106, আয়োডিন-131, রোডিয়াম-106, বেরিয়াম-140, ল্যান্থানিয়াম-140 এবং সিরিয়াম-144 প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থ মৃত্তিকায় সংক্রমিত হয়। যেহেতু তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধায়ু অনেক বেশি (যথা ঃ স্ট্রনসিয়ামের-90'এর 28 বছর, এবং সিজিয়াম-137 এর 30 বছর), তাই মৃত্তিকা কণার সঙ্গে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সের দ্বারা সংযুক্ত থেকে বহু বছর অবিকৃত অবস্থায় সঞ্চিত থাকতে পারে। এছাড়া কসমিক বিকিরণ এবং হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের ফলেও তেজস্ক্রিয় কার্বন (C-14) মৃত্তিকায় সংক্রমিত হতে পারে। মৃত্তিকায় সংক্রমিত তেজস্ক্রিয় পদার্থ তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণের মাধ্যমে এবং খাদ্য শৃঙ্খলজনিত জীব-পুঞ্জীভবনের মাধ্যমে জীবের উপর মন্দ প্রভাব সৃষ্টি করে। তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রভাবিত জীবজগতের উপর মন্দ প্রভাবের মূল কারণ হচ্ছে ডি এন এ (DNA) এর 'মিউটেশান'।

vii) প্লাস্টিক দূষণ ঃ

মৃত্তিকা দূষণের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে প্লাস্টিক এবং পলিথিন দ্রব্যের বাধাহীন ব্যবহার এবং ব্যবহারের শেষে আবর্জনা হিসেবে স্থলভাগে নিক্ষেপ। চা-পানের পলিস্টাইরেন কাপ, প্লাস্টিক দ্রব্যের ভগ্নাংশ (যথা ক্যান, বালতি, জাগ, গেলাস, বাটি প্রভৃতি), ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ, পলি-ব্যাগ, পলি-সিট, কলমের অংশ বা ভগ্নাংশ এবং

অন্যান্য বহুবিধ প্লাস্টিক ও পলিথিন দ্রব্য স্থলভাগে যত্রতত্র সঞ্চয়ের ফলে মৃত্তিকা দূষিত হয়। যেহেতু প্লাস্টিক এবং পলিথিন দ্রব্য জীব-অবিশ্লেষ্য, তাই উক্ত দ্রব্যসমূহ মৃত্তিকার শীর্ষ-স্তরে সঞ্চিত থাকাকালীন কখনোই বিনষ্ট হয় না, পরন্তু দীর্ঘদিন জলবায়ুকরণের



চিত্র 10.3 ঃ স্তূপীকৃত পলিব্যাগের জলবায়ুকরণের দ্বারা মৃত্তিকার দূষণ দেখানো হয়েছে (লেখকের তোলা ছবি)।

ফলে বিভিন্ন বিষাক্ত রাসায়নিক উপাদান নিঃসরণের মাধ্যমে মৃত্তিকাকে দূষিত করে। প্লাস্টিক নিঃসৃত রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে মৃত্তিকাস্থ ডেট্রিভোর ও ডি-কম্পোজার জীব মারা যায় এবং খাদ্যশৃঙ্খলজনিত কারণে প্রত্যক্ষভাবে উদ্ভিদ এবং পরোক্ষভাবে মনুষ্যেতর প্রাণী এবং মানুষের ক্ষতি হয় (চিত্র 10.3)।

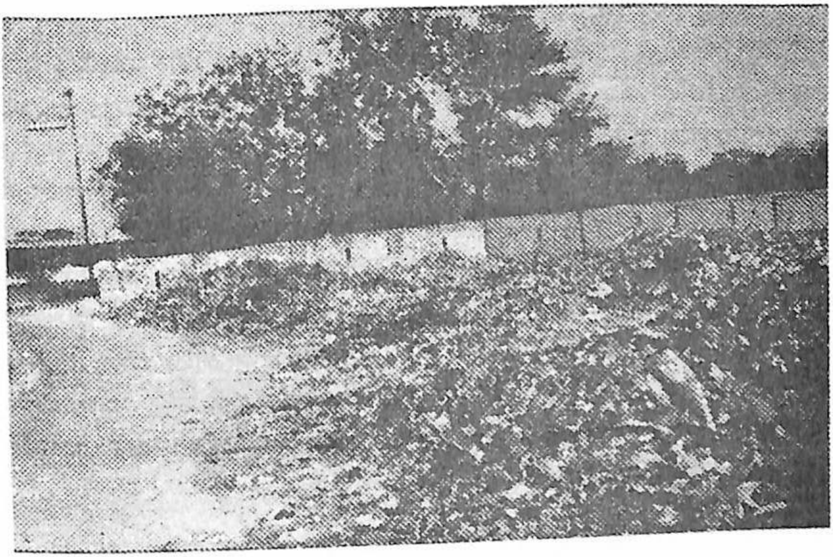
10.4. মৃত্তিকা দূষণের কারণ ঃ

মনুষ্য সৃষ্ট ক্রিয়াকলাপই মৃত্তিকা দূষণের প্রধান কারণ। মনষ্য সৃষ্ট উৎস থেকে নিক্ষিপ্ত দূষক সরাসরি মৃত্তিকাকে দূষিত করে বা বায়ুদূষণ এবং জলদূষণের মাধ্যম্যেও মৃত্তিকাকে দূষিত করে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে বায়ু এবং জলদূষণ মৃত্তিকার দূষণকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে। মৃত্তিকার প্রত্যক্ষ দূষণের কারণগুলি অতি-সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

i) শিল্প ও পৌরসংস্থা নিঃসৃত বর্জ্য-পদার্থের অসতর্ক স্থানান্তর ঃ

শিল্প এবং পৌর সংস্থা নিঃসৃত কঠিন বর্জ্য পদার্থের অসতর্ক স্থানান্তর এবং স্তূপীকরণ মৃত্তিকা দূষণের একটি প্রধান কারণ। শিল্পসংস্থা নিক্ষেপিত বর্জ্য পদার্থ যথা-ভারী ধাতু,

বিষাক্ত রাসায়নিক, উপজাত পদার্থ এবং পৌর সংস্থা নিক্ষেপিত বর্জ্য পদার্থ যথা গার্বেজ (খাদ্য বর্জ্য) ; রাবিশ দ্রব্য, কাগজ, গ্লাস, ধাতব পাত্র, প্লাস্টিক, তন্তু, জ্বালানি অবশেষ,



চিত্র 10.4 ঃ পৌরসংস্থা নিঃসৃত জঞ্জালের অসতর্ক স্তূপীকরণ মৃত্তিকা দূষণের একটি অন্যতম কারণ (লেখকের তোলা ছবি)।

ব্যাটারি, পরিত্যক্ত গাড়ি প্রভৃতি অপরিকল্পিত উপায়ে স্তূপীকৃত করা হয়। সুপরিকল্পিত উপায়ে স্তূপীকৃত বর্জ্য পদার্থের পুনরাবর্তন এবং যথাযথ ব্যবহারের অভাবে জলবায়ুকরণের ফলে স্তূপীকৃত বর্জ্য পদার্থ থেকে মৃত্তিকা দূষিত হয় (চিত্র 10.4) ।

ii) কৃষি ক্রিয়াকলাপ ঃ

আধুনিক কৃষিপদ্ধতিতে মাত্রাতিরিক্ত এবং অপরিকল্পিত রাসায়নিক সার, কীটনাশক এবং মৃত্তিকা নিয়ন্ত্রকের ব্যবহারের ফলে শীর্ষ মৃত্তিকা দূষিত হয়। এছাড়া খামার চাষ যথা পোল্ট্রী এবং পশুপালনের ফলে উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থের (যথা মল, খাদ্য অবশেষ) অসতর্ক স্থানান্তর এবং স্তূপীকরণ কৃষিজনিত মৃত্তিকা দূষণের একটি প্রধান কারণ। কৃষি ফার্ম সৃষ্ট স্তূপীকৃত বর্জ্য পদার্থের মধ্যে রোগবাহী পতঙ্গ, মাছি, এবং ইঁদুরের বংশবৃদ্ধি ঘটে। এছাড়া জৈব-বর্জ্য পদার্থের পচন ও বিশ্লেষণের ফলে যে দুর্গন্ধ ছড়ায় তার ফলে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের সমস্যা সৃষ্টি হয়।

iii) তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থের অসতর্ক স্থানান্তর ঃ

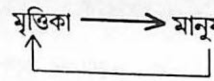
নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট, নিউক্লিয়ার ল্যাবরেটরি, তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহারকারী হাসপাতাল এবং শিল্পসংস্থা থেকে নিঃসৃত তেজস্ক্রিয় পদার্থপূর্ণ বর্জ্য পদার্থের অসতর্ক

স্থানান্তরের কারণে মৃত্তিকা দূষিত হয়। যেহেতু তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধায়ু অনেক বেশি, তাই মৃত্তিকায় সংক্রমিত তেজস্ক্রিয় পদার্থ তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণের মাধ্যমে মানুষ তথা জীব-জগতের ক্ষতি করে।

i) প্রাণীর দ্বারা রোগ-জীবাণুর বিস্তার ঃ

মানুষ, প্রাণী এবং পাখির মল, মূত্র প্রভৃতি রেচন পদার্থ জীব-সম্পর্কীয় মৃত্তিকা দূষণের প্রধান উৎস। সার হিসেবে ব্যবহৃত আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণের প্লান্ট নিঃসৃত অসংক্রমিত স্লাজও মৃত্তিকাকে দূষিত করে। উক্ত দূষক ব্যতীত ত্রুটিপূর্ণ স্যানিটেশান, বর্জ্য জল এবং ত্রুটিপূর্ণ কৃষি পদ্ধতি মৃত্তিকার দূষণকে প্রভাবিত করে। মানুষ এবং প্রাণীর অন্ত্রে বসবাসকারী পরজীবী প্রাণীই উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে মৃত্তিকার দূষণ সম্পর্কীয় সমস্যার প্রধান কারণ। যেসব রোগজীবাণু মৃত্তিকার দূষণ সৃষ্টি করে তাদের প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা হয় ঃ

(a) মনুষ্য-রেচিত রোগজীবাণু ঃ মনুষ্য রেচিত রোগ-জীবাণুর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আন্ত্রিক ব্যাক্টিরিয়া এবং পরজীবী কৃমি। রোগ জীবাণু সংক্রমিত মৃত্তিকার সংস্পর্শে বা সংক্রমিত মৃত্তিকায় জন্মানো সব্জি বা ফল ভক্ষণের মাধ্যমে উক্ত রোগজীবাণু সুস্থ মানুষের শরীরে সংক্রমিত হতে পারে। অর্থাৎ মৃত্তিকা এবং মানুষের মধ্যে রোগ-জীবাণু বিস্তারের চক্রাকার প্রবাহ চলতে থাকে।



b) প্রাণী-রেচিত রোগ-জীবাণু ঃ

রোগাক্রান্ত প্রাণীর মল বা মূত্র এবং জীবাণু সংক্রমিত মৃত্তিকার সংস্পর্শে মানুষের শরীরে রোগ-জীবাণু প্রবেশ করে। অর্থাৎ প্রাণী থেকে মৃত্তিকা এবং মৃত্তিকা থেকে মানুষের শরীরে রোগ-জীবাণুর বিস্তার ঘটে।

c) প্রাকৃতিক উপায়ে সংক্রমিত মৃত্তিকায় উপস্থিত রোগজীবাণু ঃ

প্রকৃতিক উপায়ে মৃত্তিকায় সংক্রমিত রোগ-জীবাণুর দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে মৃত্তিকা প্রাকৃতিক উপায়ে রোগ-জীবাণুর দ্বারা সংক্রমিত হয়।

10.5 মানুষের স্বাস্থ্যের উপর মৃত্তিকা দূষণের প্রভাব ঃ

মৃত্তিকার জৈব, অজৈব এবং জীব-ঘটিত দূষণ মানুষের স্বাস্থ্যের উপর মন্দ প্রভাব সৃষ্টি করে। মানুষের স্বাস্থ্যের উপর মৃত্তিকা-দূষণের বিভিন্ন প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

10.5.1. মানুষের স্বাস্থ্যের উপর জীব-সম্পর্কীয় মৃত্তিকা দূষণের প্রভাব ঃ

রোগগ্রস্ত মানুষের শরীর থেকে সুস্থ মানুষের শরীরে এবং রোগাক্রান্ত প্রাণী থেকে সুস্থ মানুষের শরীরে রোগ জীবাণুর সংক্রমণে মৃত্তিকা মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ রোগ-জীবাণু সংক্রমিত মৃত্তিকা মানুষের শরীরে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করতে পারে।

i) আমাশা, কলেরা, টাইফয়েড এবং প্যারাটাইফয়েড সৃষ্টিকারী ব্যাক্‌টিরিয়া মানুষের শরীর থেকে মৃত্তিকায় সংক্রমিত হয় এবং মৃত্তিকা থেকে সুস্থ মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। ব্যাক্‌টিরিয়া ব্যতিরেকে মৃত্তিকার মাধ্যমে মানুষের শরীরে রোগ সৃষ্টিকারী

মানুষ
↓
মৃত্তিকা
↓
মানুষ

প্রাণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে **কৃমি (হেলমিনথেস)**, **অ্যাসকারিস (গোলকৃমি)**, **ট্রাইচুরিস (হুইপওয়ার্ম)** এবং **'অ্যানসাইক্লোস্টোমা' (হুকওয়ার্ম)**। কৃমির ডিম এবং লার্ভা প্রত্যক্ষ স্পর্শজনিত কারণে মৃত্তিকা থেকে মানব শরীরে প্রবেশ করে। এছাড়া জীবাণু-সংক্রমিত মৃত্তিকায় সৃষ্ট রোগ-বাহী পতঙ্গের (ভেক্টর) মাধ্যমেও মানুষ আক্রান্ত হতে পারে।

ii) বিভিন্ন রোগ যথা ঃ **লেপ্টোস্পাইরোসিস, 'কিউ' জ্বর** এবং **অ্যানথ্রাক্স এর** জীবাণু মৃত্তিকার মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। লেপ্টোস্পাইরোসিস প্রাণী এবং মানুষ উভয়েরই একটি পরিচিত রোগ। প্রাণীর মূত্রের মাধ্যমে **লেপ্টোস্পাইরি** জীবাণু মৃত্তিকার সংস্পর্শে পৌঁছায়, এবং প্রত্যক্ষ স্পর্শ-জনিত কারণে মানুষের ত্বক বা মিউকাস আবরণীর মাধ্যমে মৃত্তিকা থেকে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। মৃত্তিকা এবং

প্রাণী
↓
মৃত্তিকা
↓
মানুষ

ধুলায় উপস্থিত **'রিকেটসিয়া কক্সিয়েল্লা'** জীবাণুর দ্বারা কিউ-জ্বর এবং মৃত্তিকা ও প্রাণীজ উপাদানে উপস্থিত **'ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস'** জীবাণুর দ্বারা অ্যানথ্রাক্স রোগ সৃষ্টি হয়। মৃত্তিকা এবং প্রাণীজ উপাদানে উপস্থিত ব্যাসিলাস স্পোর বছরের পর বছর সুপ্ত অবস্থায় থাকার পর রোগ-সংক্রমণ ঘটাতে সক্ষম হয়।

iii) মৃত্তিকা এবং মৃত জৈব পদার্থের উপর সৃষ্ট **ছত্রাক** এবং **'অ্যাকটিনোমাইসেটিস'** মানুষের সাবকিউটেনিয়াস এবং সিস্টেমিক **'মাইকোসিস'** সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে প্রশ্বাস বায়ু বা ক্ষত স্থানের মাধ্যমে স্পোর সরাসরি মৃত্তিকা থেকে মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে

পারে। উল্লেখ্য **'ক্রোমোমাইকোসিস'** এবং **'কক্সিডিওইডোমাইকোসিস'** দুটি মারাত্মক ছত্রাক ঘটিত 'মাইকোসিস' রোগ।

10.5.2. মানুষের স্বাস্থ্যের উপর অজৈব মৃত্তিকা দূষকের প্রভাব ঃ

ভারী ধাতু যথা পারদ, সীসা, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি মৃত্তিকা দূষক সরাসরি বা খাদ্য-শৃঙ্খলের মাধ্যমে মানুষের স্বাস্থ্যের উপর মন্দ প্রভাব সৃষ্টি করে। বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ভারী ধাতুর বিষক্রিয়াজনিত উপসর্গ উল্লেখ করা হল ঃ

- **পারদ ঃ**

i) মস্তিষ্ক কোষের বিনাশ ও ক্রিয়াহীনতা,
ii) মানসিক দৌর্বল্য ও বৈকল্য,
iii) অনীহা ও উত্তেজিতা,
iv) পেশীর শৈথিল্য, এবং
v) দৃষ্টিহীনতা ও বধিরত্ব।

- **সীসা ঃ**

i) হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষে বাধা ও অ্যানিমিয়া,
ii) মস্তিষ্ক এবং বৃক্ক কোষের ধ্বংসপ্রাপ্তি,
iii) রক্ত চাপ বৃদ্ধি,
iv) গর্ভ পতন বা মৃত- সন্তান প্রসব ইত্যাদি।

- **ক্যাডমিয়াম ঃ**

i) ফুসফুস ও বৃক্কের অক্রিয়তা,
ii) রক্ত চাপ বৃদ্ধি,
iii) অস্থির নমনীয়তা ও ভঙ্গুরতা,
iv) বিপাকীয় অস্বাভাবিকতা ইত্যাদি।

10.5.3. মানুষের স্বাস্থ্যের উপর জৈব মৃত্তিকা দূষকের প্রভাব ঃ

জৈব মৃত্তিকা-দূষক যথা পেস্টিসাইড, মৃত্তিকা নিয়ন্ত্রক, পি.এ.এইচ, এবং পি.সি.বি. প্রভৃতি খাদ্য শৃঙ্খলের বিভিন্ন স্তরে জীব-পুঞ্জীভূত এবং জীববিবর্ধিত হয়ে মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি করে।

(সপ্তম অধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।)

10.6. মৃত্তিকার দূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ

বায়ু এবং জল দূষণের মত 'মৃত্তিকার দূষণ' ('তৃতীয় দূষণ' নামে পরিচিত) প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ একটি পরিবেশ সমস্যা। কঠিন বর্জ্য পদার্থই মৃত্তিকা দূষণের জন্য প্রধানত দায়ী (প্রায় 90 শতাংশ)। মৃত্তিকার দূষণকারী কঠিন বর্জ্য-পদার্থের অধিকাংশই

'জীব-অবিশ্লেষ্য' বা **'নন-বায়োডিগ্রেডেবল'**। প্রধানত তিনটি উপায়ে মৃত্তিকার দূষণ হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ঃ—

1. আইনসম্মত উপায় ,
2. প্রযুক্তিগত উপায়,

এবং 3. স্ব-কীয় বা ব্যক্তিগত উপায়।

10.6.1. আইনসম্মত উপায় ঃ

i) আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে উৎস থেকে কঠিন বর্জ্য-পদার্থ উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস করা সম্ভব। কঠিন- বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ হ্রাস পেলে মৃত্তিকা দূষণের মাত্রাও হ্রাস পায়।

ii) আইন প্রয়োগ করে পরিবেশে দীর্ঘস্থায়ী এবং জীব-অবিশ্লেষ্য কীটনাশক, মৃত্তিকা নিয়ন্ত্রক এবং প্লাস্টিক পদার্থের উৎপাদন এবং ব্যবহার হ্রাস করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, জীব-বিশ্লেষ্য এবং পরিবেশে স্বল্পস্থায়ী পদার্থের উৎপাদন এবং ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত।

iii) আইন করে কঠিন বর্জ্য পদার্থের অনিয়ন্ত্রিত স্তূপীকরণ বা স্থলভাগের যেখানে সেখানে কঠিন বর্জ্য-পদার্থের নিক্ষেপ নিষিদ্ধ করা উচিত।

ii) জীব-দূষণ হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উপযুক্ত স্বাস্থ্য আইনের মাধ্যমে সকল স্তরের মানুষকে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা সম্পর্কীয় অভ্যাসের আওতায় আনা উচিত। এছাড়া আইন করে অপ্রক্রিয়াকৃত গৃহস্থালী নিঃসৃত বর্জ্য পদার্থের ব্যবহার হ্রাস করা উচিত।

10.6.2 প্রযুক্তিগত উপায় ঃ

প্রযুক্তিগত উপায়ে কঠিন বর্জ্য পদার্থের যথাযথ সংগ্রহ এবং ব্যবস্থা; এবং উন্নত পুনরাবর্তন প্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পদ পুনরুদ্ধার করে মৃত্তিকার দূষণ হ্রাস (বা নিয়ন্ত্রণ) করা সম্ভব।

i) **বর্জ্যপদার্থের সংগ্রহ এবং ব্যবস্থা** ঃ প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী বর্জ্য পদার্থ সংগ্রহ করে শহরের বিভিন্ন স্থানে স্তূপীকৃত করা হয় এবং স্তূপীকৃত স্থান থেকে বর্জ্য বা আবর্জনা লরি করে দূরবর্তী স্থানে স্থানান্তরিত করা হয়। এই পদ্ধতিতে অর্থ, শ্রম এবং সময়ের অপব্যয় ঘটে এবং মৃত্তিকার দূষণও নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন বিশেষ যান্ত্রিক উপায়ে স্তূপীকৃত বর্জ্য পদার্থের মিশ্রণ থেকে প্রথমে জীববিশ্লেষ্য এবং অবিশ্লেষ্য কঠিন বর্জ্য পদার্থ পৃথক করা জরুরী। এই পৃথকিকৃত কঠিন অবিশ্লেষ্য বর্জ্যপদার্থ থেকে যান্ত্রিক উপায়ে প্রকৃতিগতভাবে ভিন্ন বর্জ্য পদার্থ পৃথক এবং পুনরুদ্ধার করে পুনরাবর্তনের জন্য সংগ্রহ করা উচিত। এছাড়া জীববিশ্লেষ্য বর্জ্য পদার্থ থেকে পুনরুদ্ধার কৃত সম্পদ (যথা-কাগজ) সংগ্রহ করার পর অবশিষ্ট বর্জ্য

পদার্থকে পুড়িয়ে ফেলা উচিত বা নিরাপদ স্থানে মৃত্তিকায় গর্ত খুঁড়ে ভরাট করার পর কয়েকফুট উঁচু মৃত্তিকার স্তর দ্বারা আবৃত করা উচিত। এই পদ্ধতিতে অর্থ, সময় এবং শ্রম সাশ্রয় করা যায় এবং মৃত্তিকার দূষণও নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

ii) সম্পদের পুনরুদ্ধার ঃ

প্রযুক্তিগত উপায়ে বর্জ্য বস্তুর মধ্যে উপস্থিত পুনরাবর্তনযোগ্য বস্তু যথা কাগজ, কাচ, ধাতু এবং জৈব-পদার্থের পুনরাবর্তনের মাধ্যমে সম্পদের পুনরুদ্ধার সম্ভব।

বর্জ্য কাগজের পুনরাবর্তনের মাধ্যমে সম্পদ পুনরুদ্ধার এবং সংরক্ষণ সম্ভব। বর্জ্য কাগজ থেকে পুনরাবর্তন প্রক্রিয়ায় **একটন কাগজ উৎপাদনের মাধ্যমে 17টি গাছ কে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব।**

কাচও একটি পুনরাবর্তনযোগ্য সম্পদ। কিন্তু স্বাভাবিক উপাদান থেকে কাচ উৎপাদন বর্জ্য-কাচ থেকে পুনরাবর্তন প্রক্রিয়ায় কাচ উৎপাদনের তুলনায় অধিক লাভজনক। তাই উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে পুনরাবর্তন প্রক্রিয়ায় বর্জ্য কাচ থেকে নূতন কাচের উৎপাদনকে জনপ্রিয় এবং লাভজনক করা যায়।

বর্জ্য ধাতুর পুনরাবর্তন যথেষ্ট লাভজনক। ফেলে দেওয়া ধাতব পাত্র, ধাতব বর্জ্য, ধাতব পাত এবং অকেজো অটোমোবাইলের যন্ত্রাংশ প্রভৃতি থেকে পুনরাবর্তন প্রক্রিয়ায় ধাতু সংগ্রহ এবং ব্যবহার করা উচিত।

অবিশ্লেষ্য পদার্থ যথা পলিথিন এবং প্লাস্টিক প্রভৃতিকে পুনরাবর্তিত করে ব্যবহার করা উচিত। যদিও এই পদ্ধতি এখনও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে নি।

10.6.3. ব্যক্তিগত উপায় ঃ

ব্যক্তিগত উপায়ে মৃত্তিকার দূষণ হ্রাস (বা নিয়ন্ত্রণ) করা সম্ভব। ব্যক্তিগত স্তরে দূষণ সৃষ্টিকারী জীবঅবিশ্লেষ্য পদার্থের ব্যবহার হ্রাস করে বা বর্জ্য পদার্থ উৎপাদনকারী অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপ হ্রাস করে মৃত্তিকার দূষণ হ্রাস করা সম্ভব। দূষণ সৃষ্টিকারী বর্জ্য পদার্থের উপযুক্ত স্থানান্তর এবং নিয়ন্ত্রিত স্তূপীকরণের মাধ্যমেও মৃত্তিকার দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

10.7. বর্জ্যপদার্থের জীব-বিশ্লেষিতা ঃ

পদার্থের জীব-বিশ্লেষিতা (bio-degradability) একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত ঘটনা। যে সব পদার্থ বা বর্জ্য পদার্থ পরিবেশের (মৃত্তিকা পরিবেশের) ডেট্রিভোর এবং ডিকম্পোজার জীবের দ্বারা সরল উপাদানে বিশ্লেষিত হয় বা জীবকোষের বিপাকীয় ক্রিয়ার দ্বারা (মানুষের ক্ষেত্রেও) নির্বীষকৃত (detoxified) বা বিশ্লেষিত হয়, সেই সব পদার্থ 'জীব-বিশ্লেষ্য' পদার্থ নামে পরিচিত। কতিপয় সিন্থেটিক জৈব এবং অজৈব পদার্থ ব্যতিরেকে অধিকাংশ পদার্থই জীব-বিশ্লেষ্য। পদার্থের এই ধর্মকে **জীব-বিশ্লেষিতা** বলা হয়।

অপরপক্ষে যে সব পদার্থ পরিবেশের ডেট্রিভোর এবং ডিকম্পোজার জীব বা জীবকোষের বিপাকীয় ক্রিয়ার দ্বারা সরল উপাদানে বিশ্লেষিত হয় না, তাদের **'জীব**

অবিশ্লেষ্য পদার্থ' বলা হয়। প্লাস্টিক, পলিথিন এবং হাইড্রোকার্বন তেল জীব-অবিশ্লেষ্য পদার্থ। পদার্থের এরূপ ধর্ম 'জীব-অবিশ্লেষিতা' নামে পরিচিত। পদার্থের 'জীব-অবিশ্লেষিতা' পরিবেশ দূষণের একটি প্রধান কারণ। তাই পরিবেশের দূষণরোধে জীব অবিশ্লেষ্য পদার্থকে জীব-বিশ্লেষ্য করার নিরন্তর গবেষণা চলছে।

10.8. সারাংশ ঃ

● মৃত্তিকার দূষক দু-প্রকারের—'অজীব' ও 'সজীব'। অজীব দূষকের অন্যতম হচ্ছে সালফেট, ফসফেট, পারদ, সীসা, ক্যাডমিয়াম, অ্যাসিড, লবণ, প্লাস্টিক এবং পেস্টিসাইড এবং উল্লেখযোগ্য সজীব দূষক হচ্ছে ভাইরাস, প্রোটোজোয়া, কৃমি এবং ব্যাক্‌টিরিয়া।

● জীব সংক্রান্ত দূষণ, পরিপোষক দূষণ, অজৈব পদার্থঘটিত দূষণ, জৈব পদার্থঘটিত দূষণ, অ্যাসিড দূষণ, তেজস্ক্রিয় পদার্থঘটিত দূষণ এবং প্লাস্টিক দূষণই মৃত্তিকা দূষণের প্রধান উপায়।

● মনুষ্যসৃষ্ট ক্রিয়াকলাপই মৃত্তিকা দূষণের প্রধান কারণ। কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে—শিল্প ও পৌর সংস্থা নিঃসৃত বর্জ্য পদার্থের অসতর্ক স্থানান্তর, কৃষি ক্রিয়াকলাপ, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থের অসতর্ক স্থানান্তর এবং প্রাণীর দ্বারা রোগ জীবাণুর বিস্তার।

● সংক্রমিত মৃত্তিকার রোগজীবাণু যথা ঃ ভাইরাস, ব্যাক্‌টিরিয়া, কৃমি ও ছত্রাক ; ভারী ধাতু ; পেস্টিসাইড ; প্লাস্টিক ; এবং অন্যান্য জীব অবিশ্লেষ্য পদার্থ (যথা ঃ PAH, PCB) মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। আমাশা, কলেরা, টাইফয়েড, লেপ্টোস্পাইরোসিস, কিউ জ্বর এবং মাইকোসিস প্রভৃতি রোগ মৃত্তিকার দূষণজনিত কারণে সৃষ্টি হয়। এছাড়া পারদ, সীসা, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি ভারী ধাতুর বিষক্রিয়ায় মস্তিষ্ক কোষের ক্রিয়াহীনতা, দৃষ্টিহীনতা, অ্যানিমিয়া, ফুসফুস এবং বৃক্কের অক্রিয়তা এবং অস্থির ভঙ্গুরতা প্রভৃতি উপসর্গ সৃষ্টি হয়।

● জল এবং বায়ু দূষণের অনুরূপ মৃত্তিকার দূষণকেও তিন উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আইনগত, প্রযুক্তিগত এবং স্বকীয় উপায়ই মৃত্তিকার দূষণ হ্রাসের তিনটি প্রধান উপায়।

● অনুশীলনী ●

A. রচনাভিত্তিক বা দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. মৃত্তিকার বিভিন্ন দূষক এবং তাদের বিভিন্ন উৎস সংক্ষেপে বিবৃত কর।
2. মৃত্তিকার দূষণকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় এবং কি কি? সংক্ষেপে মৃত্তিকার দূষণ বর্ণনা কর।
3. মৃত্তিকা দূষণের কারণ বর্ণনা কর।

4. মানুষের স্বাস্থ্যের উপর মৃত্তিকা দূষণের প্রভাব বিবৃত কর।
5. মৃত্তিকার দূষণ নিয়ন্ত্রণ বর্ণনা কর।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. মৃত্তিকার দূষক বলতে কি বোঝ?
2. মৃত্তিকা কি কি উপায়ে দূষিত হতে পারে?
3. মৃত্তিকার জীব সংক্রান্ত দূষণ কি?
4. মৃত্তিকার পরিপোষক দূষণ বলতে কি বোঝ?
5. মৃত্তিকার জৈব দূষণ বর্ণনা কর।
6. প্লাসটিক কিভাবে মৃত্তিকাকে দূষিত করে?
7. মৃত্তিকার অ্যাসিড দূষণ বলতে কি বোঝ?
8. মৃত্তিকার তেজস্ক্রিয় পদার্থ ঘটিত দূষণ উল্লেখ কর।
9. মৃত্তিকার সজীব দূষক কিভাবে মানুষের ক্ষতি করে?
10. মানুষের স্বাস্থ্যের উপর মৃত্তিকার অজৈব দূষকের প্রভাব উল্লেখ কর।
11. বর্জ্য পদার্থের জীব-বিশ্লেষিতা বলতে কি বোঝায়?

11 তেজস্ক্রিয় দূষণ

11.1. ভূমিকা (Introduction) ঃ

প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থের (Radioactive materials) অবাধ এবং অদূরদর্শী ব্যবহারই 'তেজস্ক্রিয় দূষণের' (Radioactive Pollution) প্রধান কারণ। বিকল্প শক্তির উৎসরূপে তেজস্ক্রিয়পদার্থের পরমাণুকে নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া 'পারমাণবিক বোমা' তৈরিতেও তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের এই ধনাত্মক প্রয়োগের ফলে উদ্ভূত ঋণাত্মক প্রভাব যথেষ্ট উদ্বেগজনক। পারমাণবিক চুল্লীর তেজস্ক্রিয় অবশেষ বা বর্জ্যপদার্থের অসতর্ক হস্তান্তর বা ডিসপোজাল এবং পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে যে তেজস্ক্রিয় বিকিরণ (radiation) ঘটে, তার প্রভাবে পরিবেশের সজীব উপাদানের প্রাণপ্রবাহ মারাত্মকরূপে বিঘ্নিত হয়। তেজস্ক্রিয়তার ফলে অসংখ্য উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষ মারা যায় এবং DNA-এর মিউটেশানের কারণে অসংখ্য উদ্ভিদ, প্রাণী ও মানুষের অনভিপ্রেত চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটে, যা বংশপরম্পরায় বাহিত হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিবেশে সংক্রমণ এবং পরিবেশের উপর অনভিপ্রেত প্রভাবই এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

11.2. তেজস্ক্রিয় দূষণ কাকে বলে?

প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থের (প্রকৃতিতে প্রাপ্ত) অসতর্ক ব্যবহার এবং প্রক্রিয়াকরণ ও কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অসতর্ক উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং ব্যবহারের সময় তেজস্ক্রিয় রশ্মি'র বিকিরণজনিত কারণে পরিবেশের যে অনভিপ্রেত পরিবর্তন ঘটে, তাকে **'তেজস্ক্রিয় দূষণ'** (Radioactive Pollution) বলা হয়।

11.3. তেজস্ক্রিয় দূষণের উৎস ঃ

প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট উভয় উৎসই তেজস্ক্রিয় দূষণের জন্য দায়ী। বিভিন্ন প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট উৎস এবং তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণকারী তেজস্ক্রিয় পদার্থের নাম তালিকায় উল্লেখ করা হল ঃ

উৎস	মাধ্যম/প্রক্রিয়া	তেজস্ক্রিয় পদার্থ
1. প্রাকৃতিক ঃ	বায়ুমণ্ডল	মহাজাগতিক (কসমিক) রশ্মি, কার্বন-14 এবং হাইড্রোজেন-3 (ট্রাইটিয়াম)
	বারিমণ্ডল	রেডন-222, রেডিয়াম-226, রেডিয়াম-228 ইত্যাদি।
	পৃথিবীর ক্রাস্ট	ইউরেনিয়াম-235, বেরিয়াম-142, ক্রিপটন- 91, ল্যান্থানিয়াম-142, পটাসিয়াম-40,রুবিডিয়াম-87 ইত্যাদি
2. মনুষ্যসৃষ্ট	i) তেজস্ক্রিয় আকরিকের প্রক্রিয়াকরণ ঃ	প্লুটোনিয়াম-239, ইউরেনিয়াম- 238, থোরিয়াম-230, 228, রেডিয়াম-226, লেড-210
	ii) নিউক্লিয়ার বিভাজন প্রণালীতে বিদ্যুৎ উৎপাদন (পারমাণবিক চুল্লী) ঃ	ইউরেনিয়াম-235, 238, বেরিয়াম-142, ল্যান্থানিয়াম-142, প্লুটোনিয়াম-239
	iii) নিউক্লিয়ার সংযোজন ঃ	ট্রাইটিয়াম (হাইড্রোজেন-3)
	iv) পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঃ	প্লুটোনিয়াম-239, ইউরেনিয়াম-235, 238, স্ট্রনসিয়াম-90, সিজিয়াম-137
	v) তেজস্ক্রিয় ট্রেসার ঃ	কার্বন-14, আয়োডিন-125

তালিকা 11.1 ঃ তেজস্ক্রিয়তার উৎস, মাধ্যম এবং সম্পর্কযুক্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

11.4. তেজস্ক্রিয় দূষণের কারণ ঃ প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট কারণে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণে পরিবেশ দূষিত হয়। প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট তেজস্ক্রিয় দূষণের ঘটনা সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

11.4.1. প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় দূষণ ঃ

i) মহাশূন্য থেকে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশকারী মহাজাগতিক রশ্মির (Cosmic ray) প্রভাবে স্বল্পায়ু তেজস্ক্রিয় মৌল কার্বন-14 এবং ট্রাইটিয়াম (হাইড্রোজেন-3) উৎপন্ন হয়। এই তেজস্ক্রিয় মৌলদ্বয় সরাসরি জীবজগতের উপর মন্দ প্রভাব সৃষ্টি করে। উৎপন্ন কার্বন-14 এবং হাইড্রোজেন-3 অচিরেই কার্বনডাইঅক্সাইড এবং জলে জারিত হয়। উৎপন্ন কার্বনডাইঅক্সাইড এবং জল বায়ুমণ্ডল এবং বারিমণ্ডলে প্রবেশ করে। মহাজাগতিক রশ্মির 'নিউট্রন' কণার সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন এর সংঘাতে কার্বন-14 এবং উচ্চশক্তিসম্পন্ন মহাজাগতিক রশ্মি-কণার আঘাতে হাইড্রোজেন পরমাণুর বিয়োজনে হাইড্রোজেন-3 বা ট্রাইটিয়াম উৎপন্ন হয়।

ii) পৃথিবীর ক্রাস্ট (ভূ-ত্বক) অংশে বর্তমান ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়ামের আকরিকই প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রধান উৎস। প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থের তিনটি শ্রেণীক্রম রয়েছে যারা প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয়তার জন্য দায়ী—(a) **ইউরেনিয়াম-রেডিয়াম ক্রম**, (b) **থোরিয়াম ক্রম** এবং (c) **ইউরেনিয়াম-অ্যাকটিনিয়াম ক্রম**। এছাড়া পটাসিয়াম-40 এবং রুবিডিয়াম-87 তেজস্ক্রিয়তার জন্য বিশেষভাবে দায়ী। **মৃত্তিকার 20-76 শতাংশ তেজস্ক্রিয়তা পটাসিয়াম-40 এর জন্য সৃষ্টি হয়।**

iii) বারিমণ্ডলও তেজস্ক্রিয় পদার্থের দ্বারা দূষিত হতে পারে। যখন জলস্রোত তেজস্ক্রিয় আকরিক বা যৌগসম্পন্ন মৃত্তিকা বা পাহাড়ের সংস্পর্শে প্রবাহিত হয়, তখন জল তেজস্ক্রিয় পদার্থের দ্বারা দূষিত হয়। কিছু কিছু ঝরণা এংব প্রস্রবণে রেডন (নিষ্ক্রিয় গ্যাস) গ্যাসের তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক—"রেডন-222" এবং এর অপত্য সদস্য রেডিয়াম—'A' এবং রেডিয়াম—'C' এর উপস্থিতি প্রমাণিত হয়েছে।

এইরূপে বায়ুমণ্ডল, অস্মমণ্ডল এবং বারিমণ্ডলে বর্তমান তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণে পরিবেশের প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় দূষণ সৃষ্টি হয়, যার প্রভাবে পরিবেশের ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়।

11.4.2. মনুষ্যসৃষ্ট তেজস্ক্রিয় দূষণ ঃ

মনুষ্যসৃষ্ট তেজস্ক্রিয় দূষণ সৃষ্টি হয় তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার জনিত ক্রিয়াকলাপে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রক্রিয়াকরণ বা পারমাণবিক অস্ত্র এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহারই মনুষ্যসৃষ্ট তেজস্ক্রিয় দূষণের প্রধান কারণ। এছাড়া গবেষণার কাজে বা চিকিৎসা প্রণালীতে ট্রেসার হিসেবে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহারও মনুষ্যসৃষ্ট তেজস্ক্রিয় দূষণের কারণ।

i) তেজস্ক্রিয় আকরিকের প্রক্রিয়াকরণ ঃ

নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে বিয়োজনশীল তেজস্ক্রিয় মৌল যথা ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়ামের জ্বালানি দণ্ড ব্যবহার করা হয়। কিন্তু প্রাকৃতিক 'ইউরেনিয়াম-235'ই কেবল স্বতঃস্ফূর্ত বিয়োজন দেখাতে পারে। তাই নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টে ব্যবহারোপযোগী অন্যান্য তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক যথা ঃ ইউরেনিয়াম-238 এবং থোরিয়াম-232 কৃত্রিম উপায়ে তেজস্ক্রিয় মৌলের আকরিক থেকে প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। তাই নিউক্লিয়ার প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তির প্রথম ধাপে তেজস্ক্রিয় মৌলকে খনি থেকে উত্তোলন করার পর ধৌতকরণ (washing) এবং পরিশোধন (refining) করা হয় এবং পরবর্তী ধাপে গ্যাসীয় ব্যাপন বা অন্যান্য রাসায়নিক পদ্ধতির সাহায্যে ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়ামের প্রয়োজনীয় সমস্থানিক অন্যান্য তেজস্ক্রিয় মৌল থেকে পৃথক করা হয়।

তেজস্ক্রিয় আকরিকের মাইনিং এবং রিফাইনিং প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত জলে অধিক অর্ধায়ুযুক্ত এবং জলে দ্রাব্য তেজস্ক্রিয় মৌল—'কণা' বা 'তরল' আকারে উপস্থিত থাকে। নির্গত জল নদী, হ্রদ এবং সমুদ্রে স্থানান্তরিত হলে নদী, সমুদ্র এবং হ্রদের জলরাশি তেজস্ক্রিয় পদার্থের দ্বারা দূষিত হয়। ফলে তেজস্ক্রিয় পদার্থ নির্গত তেজস্ক্রিয় বিকিরণের প্রভাবে জলের সমগ্র বাস্তুতন্ত্র আক্রান্ত হয়। মাইনিং এবং রিফাইনিং নির্গত জলে ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়ামের অপত্য মৌল যথা ঃ থোরিয়াম-230, রেডিয়াম-226, সীসা-210 (ইউরেনিয়াম-রেডিয়াম ক্রম) এবং রেডিয়াম-228, থোরিয়াম-228 (থোরিয়াম ক্রম) প্রভৃতি উপস্থিত থাকে। জলে সংক্রমিত 'রেডিয়াম-226' ই জলজ পরিবেশে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর। তেজস্ক্রিয় মৌলের প্রক্রিয়াকরণে বায়ুমণ্ডলও দূষিত হয়। তেজস্ক্রিয় আকরিকের মাইনিং, ওয়াশিং, রিফাইনিং এবং সেপারেশানে বহু তেজস্ক্রিয় গ্যাস যথা রেডন, থোরন প্রভৃতি বায়ুমণ্ডলে নিক্ষিপ্ত হয় এবং পরবর্তী ধাপে বিক্ষিপ্ত কণায় বিশোষিত হয়ে বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ায়।

ii) নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টে পারমাণবিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ঃ

'বিভাজন' (ফিশান) এবং **'সংযোজন'** (ফিউশান) নিউক্লিয়ার প্রযুক্তির ভূমিকা

কোন মৌলের পরমাণুর অন্তর্নিহিত শক্তিকে পারমাণবিক শক্তি বলে। বিশেষ 'বিভাজন' (fission) এবং 'সংযোজন' (fusion) নিউক্লিয়ার প্রযুক্তির সাহায্যে নির্গত পারমাণবিক শক্তিকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।

মৌলের পরমাণুর ভারী নিউক্লিয়াস (অসংখ্য প্রোটন এবং নিউট্রন সমন্বিত) স্বাভাবিক ভাবেই অস্থির। বিভাজন প্রক্রিয়ায় ভারী নিউক্লিয়াসকে বহিরাগত 'নিউট্রন' কণার দ্বারা আঘাত করলে ভারী নিউক্লিয়াসটি সমান দুটি নিউক্লিয়াসে বিভাজিত হয়। উৎপন্ন নিউক্লিয়াসদ্বয় ভারী জনিতৃ নিউক্লিয়াস অপেক্ষা অধিক সুস্থির হয়। এই নিউক্লিয় বিভাজনে উদ্ভূত বিপুল শক্তিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে কাজে লাগানো হয় নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টে। এই বিভাজন প্রক্রিয়ায় ভারী তেজস্ক্রিয় মৌল যথা ঃ ইউরেনিয়ামের সমস্থানিক—'ইউরেনিয়াম-235', 'ইউরেনিয়াম-238' এবং 'থোরিয়াম-232' বিশেষ উপযোগী। ঠিক

বিপরীত নীতি অবলম্বনে 'সংযোজন' প্রক্রিয়ায় মৌলের পরমাণুর হাল্কা নিউক্লিয়াসদ্বয়কে সংযোজন করালে একটি সুস্থির নিউক্লিয়াস পাওয়া যায়। নিউক্লিয়াসদ্বয়ের সংযোজনে উদ্ভুত শক্তিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। সংযোজন প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেনের সমস্থানিক 'ডয়টেরিয়াম' (Deuterium, Hydrogen-2) এবং ট্রাইটিয়াম (Tritium, Hydrogen-3) ব্যবহার করা হয়।

a) নিউক্লিয়ার বিভাজন এবং পরিবেশ দূষণ ঃ

নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকটরে ইউরেনিয়ামের দুটি সমস্থানিক ব্যবহার করা হয় ঃ (a) প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম অর্থাৎ ইউরেনিয়াম-235 (^{235}U) (মূল মৌলের মাত্র 0.7 শতাংশ)। এই সমস্থানিকটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিউক্লিয়ার বিভাজন প্রদর্শন করে। এবং (b) ইউরেনিয়াম-238 (^{238}U) (মূল মৌলের 99.3 শতাংশ)। এই সমস্থানিকটি স্বতঃস্ফূর্ত নিউক্লিয়ার বিভাজন দেখায় না।

রিঅ্যাকটরে জ্বালানি দণ্ডের ইউরেনিয়াম-235 এর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে নিউট্রনের সংঘাত ঘটিয়ে সমগ্র পদ্ধতিটির সূচনা করা হয়। ফলক্রমে 235-ইউরেনিয়ামের নিউক্লিয়াস বিভাজিত হয়ে তেজস্ক্রিয় বেরিয়াম ($^{142}_{56}Ba$), ক্রিপটন নিউক্লিয়াস ($^{91}_{36}Kr$) এবং তিনটি নিউট্রন উৎপন্ন হয়। উদ্ভুত নিউট্রন পৃথক একটি 235-ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের বিভাজনে সাহায্য করে এবং শৃঙ্খল-বিক্রিয়ার (chain reaction) সূচনা করে। প্রথম নিউক্লিয় বিভাজনে সৃষ্ট পৃথক একটি নিউট্রন ইউরেনিয়াম-238 নিউক্লিয়াসের দ্বারা শোষিত হয়, ফলে ইউরেনিয়াম-238 তেজস্ক্রিয় সমস্থানিক 'ইউরেনিয়াম-239' এ পরিবর্তিত হয়। এই তেজস্ক্রিয় ইউরেনিয়াম-239 এর নিউক্লিয়াস বিটা-বিকিরণের মাধ্যমে 'নেপচুনিয়ামে' পরিবর্তিত হয়। উৎপন্ন নেপচুনিয়াম পুনরায় একটি বিটা-রশ্মি বিকিরণ করে তেজস্ক্রিয় প্লুটোনিয়ামে রূপান্তরিত হয়।

$$n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{142}_{56}Ba + {}^{91}_{36}Kr + n + n + n$$

$$n + {}^{238}_{92}U \rightarrow {}^{239}_{92}U \rightarrow \beta + {}^{239}_{93}Np \rightarrow \beta + {}^{239}_{94}Pu$$

সুতরাং রিঅ্যাকটরের জ্বালানি দণ্ডে ইউরেনিয়ামের পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উপজাত হিসেবে অধিক বিভাজনক্ষম **প্লুটোনিয়াম** এবং বেরিয়াম পাওয়া যায়। প্লুটোনিয়াম **'পারমাণবিক বোমা'** প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়। বেরিয়ামের অর্ধায়ু কম হওয়ায় (মাত্র 11 মিনিট) বিটাবিকিরণের মাধ্যমে 'ল্যান্থানিয়ামে পরিবর্তিত হয়। ল্যান্থানিয়াম পুনরায় 'বিটা' বিকিরণের ফলে পৃথক মৌলের নিউক্লিয়াসে পরিবর্তিত হয়। অর্থাৎ জ্বালানি দণ্ডের

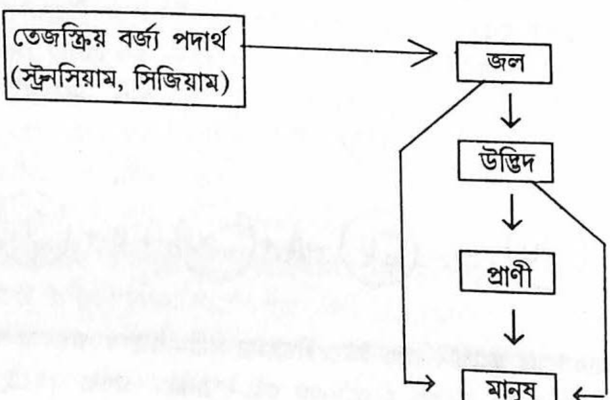
বেরিয়াম তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণের ফলে বহু অন্তর্বর্তী তেজস্ক্রিয় মৌলের মাধ্যমে অবশেষে দীর্ঘ-অর্ধায়ুযুক্ত পৃথক পৃথক তেজস্ক্রিয় মৌলে পরিণত হয়। বেরিয়াম থেকে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় মৌলের অন্যতম হচ্ছে স্ট্রনসিয়াম-90 (${}^{90}_{38}Sr$) (অর্ধায়ু-28 বছর) এবং সিজিয়াম-137 (${}^{137}_{55}Cs$) (অর্ধায়ু-30 বছর)।

$$ {}^{142}_{56}Ba \rightarrow \beta + {}^{142}_{57}La $$

•• তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ এবং পরিবেশ দূষণ ঃ

নিউক্লিয়ার প্লান্টে যে জ্বালানি অবশেষ বা বর্জ্য পদার্থ নির্গত হয় তাতে প্লুটোনিয়াম, সিজিয়াম এবং স্ট্রনসিয়ামের মত মারাত্মক তেজস্ক্রিয় পদার্থ উপস্থিত থাকে। এই তেজস্ক্রিয় মৌলগুলি পরিবেশের পক্ষে অতীব ক্ষতিকর। তাই নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্ট থেকে নিঃসৃত বর্জ্য পদার্থের সংরক্ষণ এবং ডিসপোজাল প্রক্রিয়ায় সর্তকতা অতি আবশ্যক।

তেজস্ক্রিয় স্ট্রনসিয়াম এবং সিজিয়াম কোন কারণে পরিবেশে সংক্রমিত হলে মারাত্মক পরিবেশ সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই মৌলদ্বয় অতি সহজেই প্রাণী তথা মানুষের শরীরে প্রবেশ করে সংগঠক কোষীয় উপাদান থেকে রাসায়নিক ভাবে সমধর্মী অত্যাবশ্যক মৌলকে প্রতিস্থাপিত করে। এই কারণে শরীরে অস্বাভাবিক শারীরবৃত্তিয় ক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। প্লুটোনিয়ামের অর্ধায়ু প্রায় 24000 বছর। তাই পাওয়ার প্লান্ট নিঃসৃত জ্বালানি রডকে এমনভাবে সংরক্ষণ করা উচিত যাতে পরিবেশ প্লুটোনিয়াম নিঃসৃত আলফারশ্মির (α-ray) দ্বারা দূষিত হতে না পারে। অন্যথায় পরিবেশের সজীব উপাদানের উপর প্লুটোনিয়ামের ক্ষতিকর প্রভাব পড়তে পারে।



চিত্র 11.1 ঃ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থের পরিবেশ দূষণ এবং জীবদেহে সংক্রমণ দেখানো হয়েছে।

> **•• প্লুটোনিয়াম উৎপাদন এবং তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিবেশে সংক্রমণ ঃ**
> পারমাণবিক বোমা প্রস্তুতিতে প্লুটোনিয়ামের ব্যবহার অপরিহার্য। একটি পরমাণু বোমা তৈরী করতে প্রায় 4-5 কিলোগ্রাম অস্ত্র-মানের (weapons-grade) প্লুটোনিয়াম ($93\%\, ^{239}Pu$) প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য সমগ্র বিশ্বের মধ্যে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্লুটোনিয়ামের উৎপাদন সর্বাপেক্ষা বেশি। ওয়াশিংটনের 'হ্যানফোর্ড' আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট্রের প্লুটোনিয়ামের উৎপাদন এবং প্রক্রিয়াকরণের প্রধান কর্মস্থল। হ্যানফোর্ডে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থের উৎপাদন, সঞ্চয় এবং ডিসপোজাল বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। তেজস্ক্রিয় বর্জ্যপদার্থের সংক্রমণে হ্যানফোর্ডের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বর্তমানে মারাত্মকভাবে দূষিত। সেই কারণে হ্যানফোর্ডকে বিশ্বের 'নোংরাতম স্থান' (dirtiest place) বা **'দূষিততম স্থান'** বলা হয়। প্রায় $190{,}000 m^3$ অতি তেজস্ক্রিয় কঠিন বর্জ্য, 760 মিলিয়ন মধ্যম তেজস্ক্রিয় মানের তরলবর্জ্য এবং অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ হ্যানফোর্ডের মৃত্তিকায় সঞ্চিত আছে।

b) নিউক্লিয়ার সংযোজন এবং পরিবেশদূষণ ঃ

সংযোজন প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য হাইড্রোজেনের সমস্থানিক **'ডয়টেরিয়াম'** এবং **'ট্রাইটিয়াম'**কে জ্বালানিরূপে ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে দুটি ডয়টেরিয়ামের মধ্যে বা একটি ডয়টেরিয়ামের সঙ্গে একটি ট্রাইটিয়ামের সংযোজন ঘটানো হয়। দুটি ডয়টেরিয়ামের সংযোজনে একটি **হিলিয়াম**, একটি **নিউট্রন** বা **ট্রাইটিয়াম** এবং একটি সাধারণ **হাইড্রোজেন** উৎপন্ন হয়। কিন্তু ডয়টেরিয়ামের সঙ্গে ট্রাইটিয়ামের সংযোজনে একটি **হিলিয়াম** এবং একটি **নিউট্রন** উৎপন্ন হয়।

সুতরাং সংযোজন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনে একমাত্র যে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য উৎপাদিত হয়, তা হচ্ছে 'ট্রাইটিয়াম'। এই ট্রাইটিয়াম (অর্ধায়ু 12 দিন) বিটা রশ্মি বিকিরণ করে। ট্রাইটিয়াম নিঃসৃত 'বিটা' রশ্মি মানুষের ত্বক ভেদ করতে অসমর্থ হলেও ট্রাইটিয়াম সাধারণ

$$^{2}_{1}H + ^{2}_{1}H \rightarrow ^{3}_{2}He + ^{1}_{0}n \quad \text{or} \quad ^{3}_{1}H + ^{1}_{1}H$$

$$[\, D + D \rightarrow He + n \quad \text{or} \quad T + H \,]$$

$$^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + ^{1}_{0}n$$

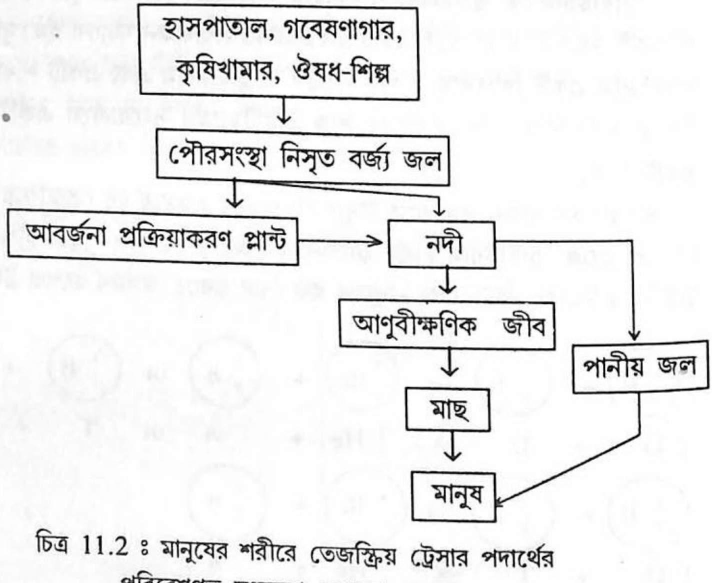
$$[\, D + T \rightarrow He + n \,]$$

হাইড্রোজেনের মত প্রশ্বাস বায়ু, ত্বক, জল এবং খাদ্যের মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। ফলে কোষ অতিসহজেই ট্রাইটিয়ামের তেজস্ক্রিয়তায় প্রকট হয়।

c) ট্রেসার হিসেবে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার এবং পরিবেশ দূষণ ঃ

চিকিৎসা শিল্পে, কৃষিতে এবং বিজ্ঞান গবেষণায় তেজস্ক্রিয় পদার্থ রেডিও-ট্রেসার হিসেবে রাসায়নিক এবং জীব-রাসায়নিক বিক্রিয়ার গতিপথ নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ভূ-গর্ভ জলের প্রবাহের হার এবং অভিমুখ নির্ণয়েও তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করা হয়। রেডিও ট্রেসার হিসেবে উপরিউক্ত কাজে ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় পদার্থের অন্যতম হচ্ছে কার্বন-14 এবং আয়োডিন-125।

হাসপাতাল, গবেষণাগার এবং ঔষধ তৈরির কারখানা নিঃসৃত বর্জ্য জলে তৈজস্ক্রিয়-ট্রেসার উপস্থিত থাকে। তাই নদী বা আবর্জনা প্রক্রিয়াকরণ প্লান্টে আসা পৌরসংস্থা নিঃসৃত বর্জ্য জলে বিভিন্ন ধরনের তেজস্ক্রিয় পদার্থ উপস্থিত থাকে। সংক্রমিত নদীর জলে উপস্থিত বিভিন্ন প্রকার আণুবীক্ষণিক জীব তেজস্ক্রিয় ট্রেসার পদার্থ যথা ঃ আয়োডিন এবং ফসফরাসের তেজস্ক্রিয় সমস্থানিককে জীবপুঞ্জীভূত করতে পারে। এই তেজস্ক্রিয় পুঞ্জীভূত আণুবীক্ষণিক জীবকে মাছ খাদ্য-রূপে গ্রহণ করে, আবার মানুষ মাছের মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় পদার্থ পুঞ্জীভূত করে। ফলে পুঞ্জীভূত তেজস্ক্রিয় পদার্থের তেজস্ক্রিয়তায় মানব কোষ সরাসরি প্রকট হয়। খাদ্য-শৃঙ্খলগত কারণ ব্যতিরেকে নদী থেকে সংগৃহীত পানীয় জলের মাধ্যমেও তেজস্ক্রিয় পদার্থ মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে।



চিত্র 11.2 ঃ মানুষের শরীরে তেজস্ক্রিয় ট্রেসার পদার্থের পরিবেশগত সংক্রমণ দেখানো হয়েছে।

d) উপরিউক্ত ক্রিয়াকলাপ ব্যতিরেকে অন্যান্য কয়েকটি মনুষ্যসৃষ্ট কারণেও মানুষের শরীরে তেজস্ক্রিয় সংক্রমণ ঘটতে পারে। যেমন চিকিৎসার কাজে 'X'-রশ্মির অনিয়ন্ত্রিত

ব্যবহার, উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা বহির্ভূত রঙীন TV-সেটের ব্যবহার, X-রশ্মি-ফ্লুরোস্কোপ এবং হাতঘড়ির লুমিনাস ডায়াল প্রভৃতি মানুষের প্রভূত ক্ষতিসাধন করতে পারে।

11.5. পরিবেশ তথা মানুষের স্বাস্থ্যের উপর তেজস্ক্রিয় দূষণের প্রভাব ঃ

পরিবেশ তথা মানুষের স্বাস্থ্যের উপর তেজস্ক্রিয় দূষণের প্রভাব বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে আলোচনা করা হল ঃ

11.5.1. তেজস্ক্রিয় দূষক এবং বিকিরণ প্রকৃতি ঃ

মানুষ এবং অন্যান্য জীবের উপর তেজস্ক্রিয় দূষণের প্রভাব নির্ভর করে তেজস্ক্রিয় দূষকের প্রকৃতি অর্থাৎ দূষক পদার্থের অর্ধায়ুর মান (এক সেকেণ্ড থেকে কয়েকহাজার বছর হতে পারে) এবং সংক্রমিত দূষক পদার্থ থেকে কোন ধরনের তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয় তার উপর। কারণ সজীব কোষে ক্ষতির প্রকৃতি এবং পরিমাণ নির্ভর করে তেজস্ক্রিয়-রশ্মির প্রকৃতির উপর, আবার তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রকৃতি নির্ভর করে তেজস্ক্রিয় দূষক পদার্থের প্রকৃতির উপর। তিনধরনের তেজস্ক্রিয় রশ্মির বিকিরণ ঘটে—

i) **আলফা-রশ্মি ($\propto$ ray) ঃ** ধনাত্মক আধানযুক্ত কণা দ্বারা গঠিত। এই প্রকার রশ্মির ভেদ-করার ক্ষমতা কম। উদাঃ প্লুটোনিয়াম আলফা রশ্মি বিকিরণ করে।

ii) **বিটা-রশ্মি (β ray) ঃ** ঋণাত্মক আধানযুক্ত কণা দ্বারা গঠিত। এই রশ্মির ভেদ-ক্ষমতা আলফা এবং 'X'-রশ্মির তুলনায় বেশি। উদাহরণ ঃ ইউরেনিয়াম এবং বেরিয়াম বিটা রশ্মি বিকিরণ করে।

iii) **গামা-রশ্মি (γ ray) ঃ** এই প্রকার রশ্মির কণার কোন আধান নেই। রশ্মির প্রকৃতি 'X'-রশ্মির অনুরূপ। এই প্রকার রশ্মির ভেদ-ক্ষমতা সর্বাপেক্ষা বেশি।

11.5.2. পরিবেশগত শর্ত ঃ

পরিবেশগত শর্ত তেজস্ক্রিয়-সংক্রামকের পরিণতি নির্ধারণ করে। আবার এই পরিণতির উপর তেজস্ক্রিয় পদার্থের জীব-সম্পর্কীয় প্রভাব নির্ভর করে। বিভিন্ন শর্ত যথা—তেজস্ক্রিয়-সংক্রামকের ব্যাপন হার, অধঃক্ষেপণ ও সঞ্চয় হার, বিস্তৃতি অঞ্চল এবং কোন একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে সংক্রামকের ঘনত্ব মানুষ তথা জীবের উপর তেজস্ক্রিয় দূষণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে। কোন অঞ্চলে সংক্রামকের ঘনত্ব আবার বায়ুমণ্ডলের শর্ত যথা ঃ বায়ুপ্রবাহ, তাপমাত্রা এবং জলবায়ু প্রভৃতির উপর নির্ভর করে।

11.5.3. প্রকট-প্রকৃতি ঃ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রকট

মানুষের শরীরে তেজস্ক্রিয় সংক্রামক পদার্থের অনুপ্রবেশের ঘটনাকে প্রকট বা এক্সপোজার বলা হয়। প্রকট দুভাবে হতে পারে—'প্রত্যক্ষ' এবং 'পরোক্ষ'।

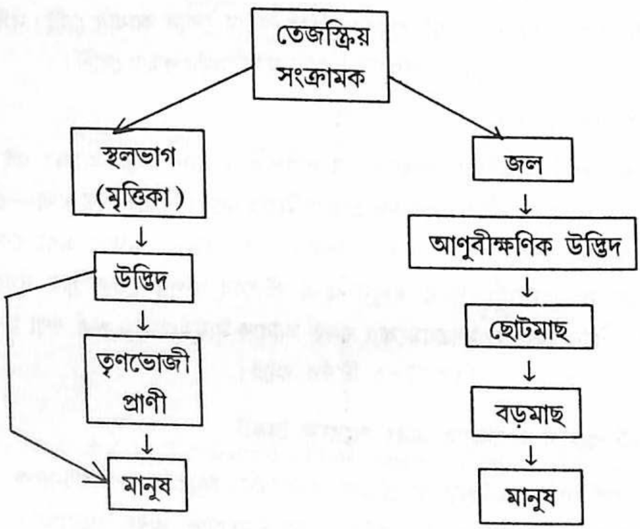
i) **প্রত্যক্ষ প্রকট** (Direct Exposure) ঃ

প্রশ্বাস বায়ুর মাধ্যমে বাতাসে ভেসে বেড়ানো তেজস্ক্রিয় পদার্থের কণা এবং তেজস্ক্রিয়

গ্যাস যখন শ্বাসনালীর মধ্য দিয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং শ্বাসনালীর মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় পদার্থ শোষিত হয়, তখন দেহকোষ তেজস্ক্রিয় বিকিরণে সরাসরি প্রকট হয়। এছাড়া পানীয় জলের মাধ্যমেও তেজস্ক্রিয় সংক্রামক পদার্থ মানুষের শরীরে সরাসরি প্রবেশ করতে পারে। পানীয় জলের পরিশোধন ক্রিয়ায় উপযুক্ত সতর্কতার অভাবে পানীয় জলের মাধ্যমে রেডন গ্যাস (^{222}Rn), রেডিয়াম (^{226}Ra) এবং থোরিয়াম (^{232}Th) মানুষের শরীরে প্রবেশ করে।

ii) **পরোক্ষ প্রকট** (Indirect Exposure) ঃ

মানুষের শরীরে তেজস্ক্রিয়-পদার্থের সংক্রমণ ঘটতে পারে তেজস্ক্রিয়-পদার্থ সংক্রমিত খাদ্যের মাধ্যমে। তেজস্ক্রিয় পদার্থের খাদ্য-শৃঙ্খলজনিত এই সংক্রমণকে পরোক্ষ প্রকট বলা হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থের অসতর্ক ডিসপোজাল এর কারণে 'মৃত্তিকা' এবং 'জল' সংক্রমিত হয়। কতিপয় জলজ এবং স্থলজ উদ্ভিদ তেজস্ক্রিয় পদার্থকে জীব পুঞ্জীভূত করতে পারে। খাদ্য-শৃঙ্খলজনিত কারণে তেজস্ক্রিয়-সংক্রামক পদার্থ উদ্ভিদ থেকে প্রাণী এবং প্রাণী থেকে মানুষের শরীরে সংক্রমিত হয়। উদাঃ কিছু মিষ্টি জলের উদ্ভিদ তেজস্ক্রিয় লোহা (^{55}Fe) এবং স্ট্রনসিয়াম পুঞ্জীভূত করতে পারে। কিছু উদ্ভিদ খাদক মাছ উদ্ভিদের মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় লোহা এবং স্ট্রনসিয়াম সংগ্রহ করে। মানুষ আবার মাছের মাধ্যমে ক্ষতিকর মাত্রায় উপরিউক্ত তেজস্ক্রিয় পদার্থ সংগ্রহ করে। এইভাবে পরোক্ষ উপায়ে মানুষের শরীরে প্রবিষ্ট তেজস্ক্রিয় পদার্থ বিকিরণজনিত প্রভাব সৃষ্টি করে।



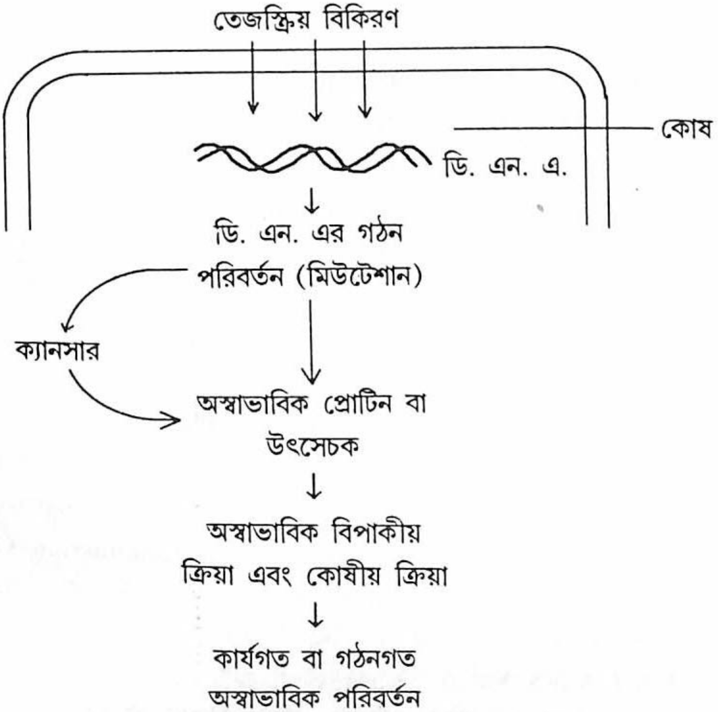
চিত্র 11.3 ঃ পরিবেশ থেকে মানুষের শরীরে তেজস্ক্রিয় পদার্থের খাদ্য-শৃঙ্খলজনিত-প্রবাহ দেখানো হয়েছে।

11.5.4. মানুষের স্বাস্থ্যের উপর তেজস্ক্রিয় দূষণের প্রভাব ঃ

শুধুমাত্র পেশাগত কারণে মানুষ তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হয় না, অন্যান্য পারিপার্শ্বিক এবং পরিবেশগত কারণেও মানুষ তেজস্ক্রিয়তায় আক্রান্ত হয় (পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে)। পেশাগত বিভিন্ন কারণ যথা—তেজস্ক্রিয় আকরিকের প্রক্রিয়াকরণ, নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং হাসপাতাল ও পরীক্ষাগারে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত মানুষ ক্রনিক তেজস্ক্রিয় দূষণের শিকার হয়। অবশ্য বিভিন্ন আকস্মিক দুর্ঘটনায় মানুষের উপর অ্যাকিউট তেজস্ক্রিয়তা সৃষ্টি হতে পারে। আলোচ্য অংশে মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ক্রনিক তেজস্ক্রিয় দূষণের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

A. কোষীয় স্তরে তেজস্ক্রিয় দূষকের ক্রিয়া-প্রণালী ঃ

ক্রনিক তেজস্ক্রিয় বিকিরণজনিত প্রকটে দেহকোষ এবং জননকোষের (গোনাডে)



চিত্র 11.4 ঃ কোষীয়স্তরে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ক্রিয়াপ্রণালী দেখানো হয়েছে।

ক্রোমোসোমের অসংশোধনযোগ্য পরিবর্তন ঘটতে পারে। এই ঘটনাকে 'মিউটেশান' বলা হয়। দেহকোষের ক্রোমোসোমের মিউটেশানের ফলে ক্যানসার (যথা ত্বক ও অস্থির ক্যানসার) বা গঠন ও কার্যসম্বন্ধীয় অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু জননকোষে মিউটেশান ঘটলে যে অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি হয় তা বংশপরম্পরায় বাহিত হয় অর্থাৎ পিতা-মাতার অস্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য সন্তানসন্ততির মধ্যে দেখা যায়। মানুষের উপর তেজস্ক্রিয় দূষণজনিত প্রভাবের মূল কারণ হচ্ছে ক্রোমোসোমের অসংশোধনযোগ্য পরিবর্তন।

B. তেজস্ক্রিয় দূষণের ক্রনিক প্রভাব ঃ

মানুষের উপর তেজস্ক্রিয় দূষণের ক্রনিক প্রভাব বা প্রভাবজনিত উপসর্গ নিম্নলিখিত ঃ

i) ফুসফুস ও যকৃতের ক্ষত (আলসার), ফাইব্রোসিস এবং ক্যানসার,

ii) রক্তাল্পতা এবং লিউকেমিয়া (রক্ত-ক্যানসার),

iii) অস্বাভাবিক এবং অপূর্ণাঙ্গ শিশুর জন্ম,

iv) গর্ভনিক্ষেপ এবং গর্ভত্রুটি,

v) মৃত-শিশুর জন্ম,

vi) জরায়ুর ক্যানসার,

vii) পেশীর দৌর্বল্য এবং অক্রিয়তা,

viii) স্নায়বিক বৈকল্য এবং স্মৃতিশক্তির হ্রাস,

ix) দৃষ্টিশক্তিহ্রাস বা দৃষ্টিহীনতা,

x) বন্ধ্যাত্ব এবং থাইরয়েড গ্রন্থির অস্বাভাবিকতা,

xi) অস্থির অসংশোধনযোগ্য পরিবর্তন যথা—নেক্রোসিস এবং অস্থি-সারকোমা (ক্যানসার) এবং

xii) ত্বকের অসংশোধনযোগ্য পরিবর্তন যথা—অ্যাট্রফি, ইরাইথিমা, অ্যালোপেসিয়া এবং রঞ্জকের পরিবর্তন ইত্যাদি।

11.6. তেজস্ক্রিয়তার সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য সীমা বা মাত্রা ঃ

মানুষের উপর তেজস্ক্রিয় দূষণের প্রভাব তেজস্ক্রিয়তার সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য সীমা বা মাত্রার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, 'ইন্টারন্যাশন্যাল কমিশন অন্ রেডিওলজিক্যাল প্রোটেকশান' (International Commission On Radiological Protection) তেজস্ক্রিয়তার সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য মাত্রা নিরূপণ করেছে। উক্ত কমিশনের নির্দেশিত মান অনুযায়ী বিকিরণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সপ্তাহে সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য মোট মাত্রা (বা সীমামান) হচ্ছে 0.3 রেম (rem)। কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন প্রকটের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ জীবনকালে (life time) মোট সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য মাত্রা হচ্ছে 200 রেম অর্থাৎ প্রতিসপ্তাহে 0.1 রেম এবং বছরে 5 রেম। গর্ভজ ভ্রূণ, শিশু এবং কিশোরের ক্ষেত্রে বিকিরণের সর্বোচ্চ

অনুমোদিত মাত্রা কমিশন নির্দেশিত উপরিউক্ত মাত্রার তুলনায় কিছুটা পৃথক। গর্ভজ ভ্রূণের ক্ষেত্রে (বিশেষ করে 13 সপ্তাহের কম বয়সী ভ্রূণের ক্ষেত্রে) বিকিরণের সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য সীমা কখনোই 3 রেম এর বেশি হবে না এবং 18 বছরের কম বয়সী শিশুর ক্ষেত্রে এই সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য সীমামাত্রা কখনোই বছরে 5 রেম এর বেশি হবে না। যদিও ত্বক, অস্থি এবং থাইরয়েড সুরক্ষিত বিকিরণ প্রকটে সর্বোচ্চ সীমার মান কিছুটা বেশি। পানীয় জলে স্ট্রনসিয়াম-90 এবং রেডিয়াম-26 এর সর্বোচ্চ মাত্রা কখনোই 3 এবং 10 pCi এর বেশি হবে না। **'ফেডারেল রেডিয়েশান কাউন্সিলের'** নির্দেশিকা অনুসারে স্ট্রনসিয়াম-90 এবং আলফা-বিকিরকের অনুপস্থিতিতে পৌরসংস্থা সরবরাহকৃত পানীয় জলে মোট বিটা বিকিরণের মাত্রা কখনোই প্রতি লিটার জলে 1000 pCi এর বেশি হবে না। উল্লিখিত সর্বোচ্চ অনুমোদিত মাত্রার চেয়ে বেশি মাত্রার প্রকটে মানুষের শরীরে তেজস্ক্রিয়-বিকিরণজনিত অস্বাভাবিকতা সৃষ্টি হয়।

• **রেম** (rem) **ঃ রেম** শব্দটি রোয়েন্টজেন ইকুইভ্যালেন্ট-ম্যান (roentogen-equivalent-man) শব্দত্রয়ের আদ্য-অক্ষর নিয়ে গঠিত। বিকিরণ শক্তির একক (ইউনিট) হিসেবে **'রেম'** ব্যবহার করা হয়।

এক রোয়েন্টজেন (r) X-রশ্মির বিকিরণের সঙ্গে জৈবিকভাবে তুল্য যে পরিমাণ বিকিরণ মানুষের শরীরে শক্তি ক্ষয় বা অপচয় করতে সামর্থ্য, সেই পরিমাণ বিকিরণকে 'রেম' বলা হয় (প্রায় 1000 আর্গ/গ্রাম এর সমান)। বস্তুতপক্ষে রোয়েন্টজেন হচ্ছে X বা গামা-রশ্মির তীব্রতা পরিমাপক একক (ইউনিট)। প্রমাণ চাপ এবং তাপমাত্রায় (N.T.P.) যে পরিমাণ X-রশ্মি বা গামা রশ্মি এক ঘন সেন্টিমিটার শুষ্ক বায়ুতে এক ইলেকট্রোস্ট্যাটিক একক বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে পারে, তাকে **রোয়েন্টজেন** বলা হয়।

• **পিকোকুরী (pCi) ঃ** পিকোকুরী (picoCurie) শব্দের সংক্ষিপ্ত আকার হচ্ছে (pCi)। প্রতি সেকেণ্ডে 3.7×10^{-2} বিভাজনের সমান তেজস্ক্রিয় বিভাজনকে (disintegration) **'পিকোকুরী'** বলা হয়।

11.7. তেজস্ক্রিয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ

মানুষের শরীরে তেজস্ক্রিয় দূষক প্রবেশ করার ফলে যে অন্তঃস্থ সংক্রমণ ঘটে তা কোন কারণেই হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করা যায় না, কারণ কোষীয় নির্বীষকরণ প্রক্রিয়ায় দূষক নির্বীষকৃত হয় না বা অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকারক পদার্থে রূপান্তরিত হয় না। কেবল পরিবেশের তেজস্ক্রিয় দূষকের বহিঃস্থ সংক্রমণকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তাই তেজস্ক্রিয় দূষণনিয়ন্ত্রণের প্রধান উদ্দেশ্য দুটি (1) পরিবেশের তেজস্ক্রিয় দূষণ যেন ক্ষতিকারক মাত্রায় না পৌঁছায় তা দেখা এবং (2) খাদ্য, পানীয় এবং প্রশ্বাস

বায়ুর মাধ্যমে মানুষের শরীরে তেজস্ক্রিয় দূষকের সংক্রমণ হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করা। মানুষের শরীরে তেজস্ক্রিয় দূষকের বহিঃস্থ এবং অন্তঃস্থ সংক্রমণকে তিন উপায়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়—

1) আইনসম্মত উপায়,

2) প্রযুক্তিগত উপায়,

এবং 3) ব্যক্তিগত উপায়।

11.7.1. **আইনসম্মত উপায়ে তেজস্ক্রিয়-দূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ** নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ করে পরিবেশের তেজস্ক্রিয় দূষণ এবং মানুষের তেজস্ক্রিয় দূষণজনিত সংক্রমণকে হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

i) পানীয় জল এবং খাদ্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের উপস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করা এবং পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ সুনিশ্চিত করা। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, পানীয় জল এবং খাদ্য-উৎসের তেজস্ক্রিয়তার মান যেন সর্বোচ্চ অনুমোদিত সীমার অধিক না হয়।

ii) সক্রিয় তেজস্ক্রিয় পদার্থ সম্পন্ন বর্জ্য পদার্থ পরিবেশে নিক্ষেপের পূর্বে প্রক্রিয়াকরণ করা বা বর্জ্যপদার্থ থেকে তেজস্ক্রিয়পদার্থকে নিক্ষেপের পূর্বে পৃথক করা।

iii) তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহারকারী শিল্প সংস্থা বা প্লান্ট স্থাপনের পূর্বে 'দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের' ছাড়পত্র নেওয়া।

এবং iv) শিল্পসংস্থা, ল্যাবরেটরি এবং হাসপাতাল প্রভৃতিতে তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সম্পর্কে সুনিশ্চিত করা।

11.7.2. **প্রযুক্তিগত উপায়ে তেজস্ক্রিয়-দূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ**

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রবিশেষে প্রযুক্তিগত উপায়ে পরিবেশের তেজস্ক্রিয়-দুষণ এবং মানুষের বহিঃস্থ এবং অন্তঃস্থ তেজস্ক্রিয় সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ঃ

i) তেজস্ক্রিয় পদার্থ সম্পন্ন শিল্পজাত বর্জ্যপদার্থের উপযুক্ত প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে তেজস্ক্রিয় দূষণ হ্রাস করা সম্ভব। বর্জ্যপদার্থে উপস্থিত তেজস্ক্রিয় পদার্থের মৃদু সক্রিয়তা থাকলে বর্জ্য পদার্থকে কিছুদিন সঞ্চিত রাখা প্রয়োজন, যাতে পরিবেশে নিক্ষেপের পূর্বে বর্জ্য পদার্থের তেজস্ক্রিয় সক্রিয়তা হ্রাস পায়। কিন্তু বর্জ্যপদার্থে তেজস্ক্রিয় সক্রিয়তা অধিক হলে উপযুক্ত প্রক্রিয়াকরণের পর সমুদ্রে বা নদীতে নিক্ষেপ করা উচিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, তঞ্চন, অধঃক্ষেপণ বা আয়ন বিনিময় পদ্ধতিতে বর্জ্য পদার্থ থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থকে কঠিন আকারে পৃথক করার পর বিশেষ সুরক্ষিত উপায়ে সঞ্চিত করা বা মৃত্তিকায় পুঁতে ফেলা প্রয়োজন। অধুনা উন্নত প্রযুক্তির সাহায্যে সঞ্চিত স্থানের মৃত্তিকায় তড়িৎ প্রবাহিত করে সক্রিয় তেজস্ক্রিয় পদার্থকে কাচ বা সিরামিক সদৃশ পদার্থে রূপান্তরিত করা যায়, ফলে কাচ বা সিরামিক পদার্থ থেকে তেজস্ক্রিয় পদার্থ মুক্ত হয়ে মৃত্তিকা বা জলকে সংক্রমিত করতে পারে না। এছাড়াও কংক্রিটের মত কঠিন পদার্থে প্রক্রিয়াকৃত তেজস্ক্রিয় পদার্থ স্টীলের

ড্রামে ভর্তি করার পর নিরোধক অবস্থায় গভীর সমুদ্রে (প্রায় 6000 ফুট বা তার বেশি গভীরে) ডিসপোজড করা যায়।

ii) তেজস্ক্রিয় আকরিকের মাইনিং, প্রক্রিয়াকরণ এবং নিউক্লিয়ার প্লান্টে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রাখা উচিত (যথা নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্লান্টের কুলান্ট এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা)। যে সব কর্মস্থলে ডিসপারসানের কারণে তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংক্রমণ হার বেশি ঐ স্থানে ভেন্টিলেসান বা উঁচু চিমনী ব্যবহার করে তেজস্ক্রিয়তার সংক্রমণ হ্রাস করা সম্ভব।

ii) তেজস্ক্রিয়তার উৎস থেকে কাজ করার দূরত্ব বৃদ্ধি করে তেজস্ক্রিয় সংক্রমণ হ্রাস করা যায়।

iii) তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে কাজ করার সময় তেজস্ক্রিয়তা প্রতিহত করার আবরণ (বা বর্ম) ব্যবহার করেও ব্যক্তিগত স্তরে সংক্রমণের মাত্রা হ্রাস করা সম্ভব।

11.7.3 ব্যক্তিগত উপায়ে তেজস্ক্রিয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ

ব্যক্তিগত বা স্বকীয় উপায় অবলম্বন করে বহিঃস্থ এবং অন্তঃস্থ তেজস্ক্রিয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

A. বহিঃস্থ তেজস্ক্রিয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ

পেশাগত প্রকটে তেজস্ক্রিয়তার সংক্রমণ খুবই বেশি। তাই নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগত উপায় অবলম্বন করে পেশাগত বহিঃস্থ তেজস্ক্রিয়-সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

i) যে সব পেশাগত কাজে বহিঃস্থ তেজস্ক্রিয়তা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, ঐ সকল ক্ষেত্রে কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য অধিক সংখ্যায় শ্রমজীবী মানুষকে লিপ্ত করে তেজস্ক্রিয়তার প্রকটের সময় কমানো যায়। প্রকটের সময় কমলে তেজস্ক্রিয়-সংক্রমণের মাত্রা হ্রাস পায়।

B. অন্তঃস্থ তেজস্ক্রিয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ

ব্যক্তিগত উদ্যোগে অন্তঃস্থ তেজস্ক্রিয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ঃ

i) কাজ করার অভ্যাস এবং গৃহের উত্তম তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে খাদ্য, পানীয় এবং বায়ুর মাধ্যমে শরীরে তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংক্রমণ হ্রাস করা যায়। যেমন সংক্রমিত ঘরে ধূমপান, খাদ্য খাওয়া বা কোন কিছু পান করা উচিত নয়। এছাড়া কাজ সমাপ্তির পর উত্তমরূপে ধৌতকরণ বা পরিস্কার করার পর কর্মস্থল ত্যাগ করা উচিত। তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে যে ঘরে কাজ করা হয় ঐ ঘরের নিয়মিত পরিস্কার এবং বায়ুনিষ্কাষণ জরুরী।

ii) অন্তঃস্থ সংক্রমণ এবং ত্বকীয় সংক্রমণ হ্রাস করার জন্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিয়ে কাজ করার সময় মুখোশ (মাস্ক), মাথা ও ঘাড়ের বস্ত্রাবরণ (হুড), দেহাবরণ, বুট, টুপি এবং দস্তানা (গ্লাভস্) ব্যবহার অতিআবশ্যক।

• **চের্ণোবিল দুর্ঘটনা ঃ** সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার চের্ণোবিল পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের দুর্ঘটনার জন্য যে ভয়াবহ তেজস্ক্রিয় দূষণের ঘটনা ঘটেছিল তা **চের্ণোবিল দুর্ঘটনা** নামে পরিচিত। চের্ণোবিল প্লান্টে চারটি নতুন রি-অ্যাকটরের কার্যক্ষমতা পরীক্ষা করার জন্য নিরাপদ ব্যবস্থার সঙ্গে সাময়িক সংযোগছিন্ন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছিল। ঐ অবসরে ইউরেনিয়াম জ্বালানি দণ্ডের অতি-উত্তাপে নিমেষেই রি-অ্যাকটর বিস্ফারিত হয় এবং উত্তপ্ত স্টীম, ধোঁয়া, দাহ্য-গ্যাস এবং তেজস্ক্রিয়রশ্মিতে দুর্ঘটনাস্থলের 30 কিমি ব্যাসার্ধ অঞ্চলের আকাশ ঢেকে যায়। সঙ্গে সঙ্গেই 31 জন মানুষ মারা যায় এবং এক মিলিয়নেরও বেশি মানুষ আক্রান্ত হয়।

11.8. সারাংশ ঃ

• তেজস্ক্রিয় পদার্থের অসতর্ক উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং ব্যবহারে পরিবেশের যে অনভিপ্রেত পরিবর্তন ঘটে তাকে '**তেজস্ক্রিয় দূষণ**' বলা হয়। প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট উভয় উপায়েই তেজস্ক্রিয় দূষণের ঘটনা ঘটে।

• তেজস্ক্রিয় আকরিকের প্রক্রিয়াকরণ, ফিশান এবং ফিউশান নিউক্লিয়ার প্রযুক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্রিয়ায় উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থের অসতর্ক এবং অরক্ষিত ডিসপোজালের কারণে পরিবেশের জল, মৃত্তিকা এবং বায়ু সংক্রমিত হয়। তেজস্ক্রিয় পদার্থ যথা—প্লুটোনিয়াম, সিজিয়াম, স্ট্রনসিয়াম, ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম, ট্রাইটিয়াম, রেডন এবং থোরণ প্রভৃতি পরিবেশকে দূষিত করে।

• পরিবেশে সংক্রমিত তেজস্ক্রিয় পদার্থ খাদ্য, পানীয় এবং বায়ুর মাধ্যমে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে (অন্তঃস্থ সংক্রমণ) বা পরিবেশে থেকে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের দ্বারা দেহের বাইরে সংক্রমণ ঘটায় (বহিঃস্থ সংক্রমণ)।

• তেজস্ক্রিয় পদার্থের অন্তঃস্থ এবং বহিঃস্থ সংক্রমণে কোষের ক্রোমোসোমের অসংশোধনযোগ্য পরিবর্তনের ফলে ত্বকের অ্যাট্রফি, ইরাইথিমা ; অস্থির নেক্রোসিস, সারকোমা ; রক্তের লিউকেমিয়া ; জন্মত্রুটি এবং ফুসফুসের ফাইব্রোসিস ও আলসার প্রভৃতি প্রভাব সৃষ্টি হয়। তেজস্ক্রিয়তায় জননকোষের ক্রোমোসোমের মিউটেশান ঘটিত যে প্রভাব সৃষ্টি হয়, তা বংশপরম্পরায় বাহিত হয়।

• মানুষের স্বাস্থ্যের উপর তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব সংক্রমণকারী মাধ্যমে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা বা সীমার উপর নির্ভর করে। এই প্রসঙ্গে তেজস্ক্রিয়তার সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য মাত্রা বা সীমা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

• আইনসম্মত, প্রযুক্তিগত এবং ব্যক্তিগত উপায়ে পরিবেশ তথা মানুষের উপর তেজস্ক্রিয় দূষণের প্রভাব হ্রাস বা নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

• অনুশীলনী •

A. রচনাভিত্তিক বা দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1) তেজস্ক্রিয় দূষণ কাকে বলে? তেজস্ক্রিয় দূষণের উৎস বর্ণনা কর।
2) তেজস্ক্রিয় দূষণের কারণ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
3) ট্রেসার হিসাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার এবং পরিবেশ দূষণ বর্ণনা কর।
4) পরিবেশ এবং মানুষের স্বাস্থ্যের উপর তেজস্ক্রিয় দূষণের প্রভাব বর্ণনা কর।
5) তেজস্ক্রিয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বর্ণনা কর।

B. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1) তেজস্ক্রিয় দূষণ কি?
2) তেজস্ক্রিয় দূষণে বিভাজন এবং সংযোজন নিউক্লিয়ার প্রযুক্তির ভূমিকা উল্লেখ কর।
3) প্লুটোনিয়ামের পরিবেশ দূষণ উল্লেখ কর।
4) তেজস্ক্রিয় বর্জ্যপদার্থ ঘটিত পরিবেশ দূষণ বিবৃত কর।
5) তেজস্ক্রিয় দূষক এবং বিকিরণের প্রকৃতি বর্ণনা কর।
6) তেজস্ক্রিয় পদার্থ কি উপায়ে মানুষের শরীরে সংক্রমিত হয়?
7) কোষীয় স্তরে তেজস্ক্রিয় বিকিরণের ক্রিয়া প্রণালী উল্লেখ কর।
8) তেজস্ক্রিয় দূষণের ক্রনিক উপসর্গ বর্ণনা কর।
9) তেজস্ক্রিয়তার সর্বোচ্চ অনুমোদনযোগ্য সীমা উল্লেখ কর।
10) চের্ণোবিল দুর্ঘটনা কি?

12 শব্দ দূষণ

12.1. ভূমিকা (Introduction) :

সকল উন্নত প্রাণী তথা মানুষের পারস্পরিক এবং ভৌতপরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর যোগাযোগ ও মিথস্ক্রিয়ার একটি প্রধান মাধ্যম হচ্ছে 'শব্দ' (Sound)। আধুনিক মানুষ (হোমোসেপিয়েনস্ সেপিয়েনস্ বা ক্রো-ম্যাগনান) 'শ্রবণ ভাষা' (Hearing Language) এবং দৃষ্টি সংক্রান্ত ভাষার (Visual or Written Language) মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করে। মানুষের স্বরযন্ত্র (ভোকাল কর্ড) থেকে উৎপন্ন 'শব্দই' শ্রবণ ভাষা সৃষ্টি করে। স্বরযন্ত্র থেকে উৎপন্ন শব্দ অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গরূপে মাধ্যমের মধ্য দিয়ে বিস্তৃত হয়ে মানুষের কর্ণে প্রবেশ করে। ফলে কর্ণের শ্রুতি-গ্রাহক অঙ্গ এবং মস্তিষ্কের সাহায্যে শ্রবণ-অনুভূতির সৃষ্টি হয়। শব্দকে প্রধানত দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—'সুরযুক্ত শব্দ' (Musical Sound) এবং 'সুরবর্জিত শব্দ' (Noise)। এই সুরবর্জিত শব্দই শব্দ-দূষণের জন্য দায়ী এবং মনুষ্যসৃষ্ট ক্রিয়াকলাপ শব্দদূষণের প্রধান কারণ। যানবাহন চলাচলের শব্দ, যানবাহনের হর্নের শব্দ, চালু-যন্ত্রাদির শব্দ, বিমান-উড়ানের শব্দ, কল থেকে জল পড়ার শব্দ ইত্যাদি সুরবর্জিত শব্দের উদাহরণ। এই অধ্যায়ে শব্দদূষণের উৎস, কারণ, প্রভাব এবং শব্দদূষণের নিয়ন্ত্রণ আলোচনা করা হয়েছে।

12.2. শব্দ এবং শব্দতরঙ্গ (Sound and Sound Waves) ঃ

12.2.1. শব্দ কি?

"শব্দ" এক প্রকার শক্তি। স্বনক বা শব্দের উৎস (Source of Sound) থেকে নিঃসৃত শক্তি পারিপার্শ্বিক মাধ্যমের মধ্য দিয়ে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গরূপে প্রবাহিত হয়। এই তরঙ্গগুলি মানুষের কানে পৌঁছে শ্রবণানুভূতি সৃষ্টি করে।

12.2.2. শব্দ-তরঙ্গ কি?

শব্দ সৃষ্টিকারী উৎসকে স্বনক বা শব্দের উৎস বলা হয়। উৎস বা উৎস বস্তু কম্পিত হলে শব্দ উৎপন্ন হয়, কিন্তু শব্দ-উৎসের কম্পন থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শব্দও থেমে যায়। যেমন সুরশলাকাকে আঘাত করলে শব্দসৃষ্টি হয়, কিন্তু কম্পিত সুরশলাকার বাহু স্পর্শ করলে কম্পন থেমে যায়। ফলে শব্দও থেমে যায়। উৎস বস্তুর কম্পনের ফলে পারিপার্শ্বিক মাধ্যমে (সাধারণত বায়ু মাধ্যমে) আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ফলে উৎপন্ন তরঙ্গ উৎস বস্তুর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই তরঙ্গকে **শব্দ-তরঙ্গ** বলা হয়।

12.2.3. শব্দের উৎস এবং শ্রুতিসীমা ঃ

যে কোন কম্পমান বস্তু শব্দের উৎস (বা স্বনক) রূপে কাজ করতে পারে। উপযুক্তভাবে উদ্দীপিত করলে সকল স্থিতিস্থাপক বস্তুই শব্দ-উৎস হিসেবে কম্পিত হয়। শব্দ-উৎসের কম্পাঙ্ক 20-20,00 cps এর মধ্যে থাকলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় সেই শব্দই কেবল আমাদের কানে শব্দানুভূতি সৃষ্টি করতে পারে।

শব্দানুভূতি সৃষ্টিকারী শব্দের উৎস-বস্তুর সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ কম্পাঙ্ককে **'শ্রুতিসীমা'** (limits of audibility) বলা হয়। 20 cps হচ্ছে সর্বনিম্ন শ্রুতিসীমা এবং 20,000 cps হচ্ছে সর্বোচ্চ শ্রুতিসীমা। যদিও ব্যক্তিভেদে এই কম্পাঙ্কসীমা কিছুটা পরিবর্তিত হয় এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উর্ধ্ব-কম্পাঙ্ক সীমা হ্রাস পায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বরের গড় কম্পাঙ্ক যথাক্রমে 120 cps এবং 250 cps (বা Hz)।

12.2.4. সুরযুক্ত এবং সুরবর্জিত শব্দ ঃ

অনুভূতি এবং ভৌতধর্মের ভিত্তিতে শব্দকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

i) সুরযুক্ত শব্দ (Musical sound)

এবং ii) সুরবর্জিত শব্দ (Noise)

i) সুরযুক্ত শব্দ ঃ যে সব শব্দ শ্রুতি সুখকর তাদের **সুরযুক্ত** বা **সুর-সমৃদ্ধ** শব্দ বলা হয়। উৎস বস্তুর নিয়মিত (regular) বা পর্যাবৃত্ত (periodic) কম্পনে সুরযুক্ত শব্দের সৃষ্টি হয়। সুরশলাকা, বায়ুস্তম্ভ বা তার প্রভৃতি থেকে সুরযুক্ত শব্দের সৃষ্টি হয়।

ii) সুরবর্জিত শব্দ ঃ যে সব শব্দ শ্রুতিকটু তাদের **'সুরবর্জিত শব্দ'** বা 'নয়েজ' বলা হয়।

শব্দ-উৎসের কম্পন অনিয়মিত বা অপর্যাবৃত্ত হলে সুরবর্জিত শব্দের সৃষ্টি হয়। উদাহরণ ঃ যান চলাচলের শব্দ, গাড়ি এবং ট্রেনের হর্নের শব্দ, চালু যন্ত্রাদির শব্দ, বিমান উড়বার সময় সৃষ্ট শব্দ, কল থেকে জল পড়ার শব্দ প্রভৃতি। বিভিন্ন ক্ষণস্থায়ী শব্দও সুরবর্জিত শব্দের অন্তর্ভুক্ত। যেমন হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠুকবার শব্দ, বন্দুকের গুলির শব্দ ইত্যাদি।

12.2.5. সুরযুক্ত শব্দের বৈশিষ্ট্য ঃ

সুরযুক্ত শব্দের প্রধানত তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—

i) তীক্ষ্ণতা

ii) প্রাবল্য বা তীব্রতা

এবং iii) গুণ বা জাতি।

i) **তীক্ষ্ণতা (Pitch) ঃ** সুরযুক্ত শব্দের যে বৈশিষ্ট্যের দ্বারা একই তীব্রতার খাদের শব্দ এবং চড়া শব্দের মধ্যে পার্থক্য করা যায় তাকে '**তীক্ষ্ণতা** ' বলে। শব্দের তীক্ষ্ণতা উৎসের কম্পাঙ্কের উপর নির্ভরশীল। কারণ কম্পাঙ্ক কম হলে তীক্ষ্ণতা কম হয় এবং কম্পাঙ্ক বেশি হলে তীক্ষ্ণতা বেশি হয়। আবার, শব্দের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে কম্পাঙ্কের সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক হওয়ায় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বেশি হলে শব্দের তীক্ষ্ণতা কম হয় এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম হলে তীক্ষ্ণতা বেশি হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সুরবর্জিত .ব্দের কোন নির্দিষ্ট তীক্ষ্ণতা নেই।

ii) **প্রাবল্য বা তীব্রতা (Intensity) ঃ**

শব্দ সঞ্চালনের অভিমুখের সঙ্গে লম্বভাবে রক্ষিত একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে যে হারে শব্দশক্তি প্রবাহিত হয়, তাকে '**প্রাবল্য**' বা '**তীব্রতা**' বলে। প্রাবল্য বলতে শব্দ কতটা জোরে হচ্ছে তা বোঝায়। শব্দের প্রাবল্য শব্দের তীব্রতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রকৃত অর্থে প্রাবল্য এবং তীব্রতা সমার্থক নয়। শব্দের তীব্রতা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে।

(a) **উৎসের আকার ঃ** উৎসের আকার যত বড় হয় শব্দের তীব্রতা বা প্রাবল্য তত বাড়ে। কারণ উৎসের আকার যত বড় হয় তত বেশি আয়তনের মাধ্যম আলোড়িত হয়, ফলে মাধ্যমে বেশি পরিমাণ শক্তি সঞ্চালিত হয়।

(b) **উৎসের কম্পনের বিস্তার ঃ** শব্দের তীব্রতা উৎসের কম্পন বিস্তারের বর্গের সমানুপাতিক। অর্থাৎ উৎসের কম্পন বিস্তার বেশি হলে তীব্রতা বৃদ্ধি পায় এবং কম্পন বিস্তার কম হলে তীব্রতা হ্রাস পায়।

(c) **উৎস থেকে শ্রোতার দূরত্ব ঃ** উৎস থেকে শ্রোতার দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতে শব্দের তীব্রতা হ্রাস পায়।

(d) **মাধ্যমের ঘনত্ব ঃ** মাধ্যমের ঘনত্বের দ্বারা শব্দের তীব্রতা প্রভাবিত হয়। মাধ্যমের ঘনত্ব বাড়লে বা কমলে শব্দের তীব্রতা বাড়ে বা কমে।

iii) **গুণ বা জাতি ঃ** বিভিন্ন উৎস থেকে নিঃসৃত একই তীব্রতা এবং তীক্ষ্ণতা বিশিষ্ট

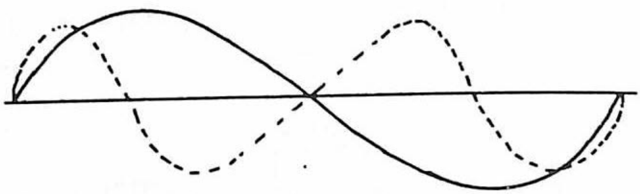
স্বরগুলিকে যে বৈশিষ্ট্যের দ্বারা পৃথক করা হয়, সেই বৈশিষ্ট্যকে সুরযুক্ত শব্দের জাতি বলা হয়। উল্লেখ্য যে, সুর (tone) হচ্ছে একটিমাত্র কম্পাঙ্ক বিশিষ্ট শব্দ এবং স্বর (note) হচ্ছে বিভিন্ন কম্পাঙ্কের একাধিক শব্দের মিশ্রণ (অর্থাৎ কতকগুলি সুরের সমষ্টিই হল স্বর)।

শব্দের তীক্ষ্ণতা, প্রাবল্য এবং জাতি—এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের যে কোন একটি পরিবর্তিত হলে সংশিষ্ট স্বর-দ্বয় পৃথক হয়। যেমন—

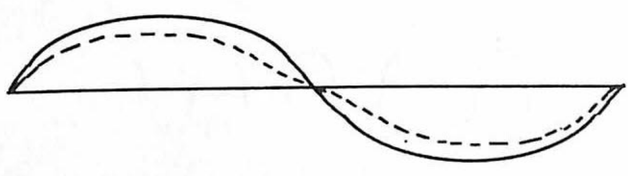
(a) দুটি তরঙ্গের তরঙ্গরূপ এবং বিস্তার (amplitude) অভিন্ন, কিন্তু কম্পাঙ্ক ভিন্ন হলে সংশ্লিষ্ট স্বরদ্বয়ের তীক্ষ্ণতা (pitch) পৃথক হয় (চিত্র 12.1a)।

(b) দুটি তরঙ্গের তরঙ্গরূপ এবং কম্পাঙ্ক অভিন্ন, কিন্তু বিস্তার পৃথক হলে সংশ্লিষ্ট স্বরদ্বয়ের প্রাবল্য (বা তীব্রতা) পৃথক হয় (চিত্র 12.1b)।

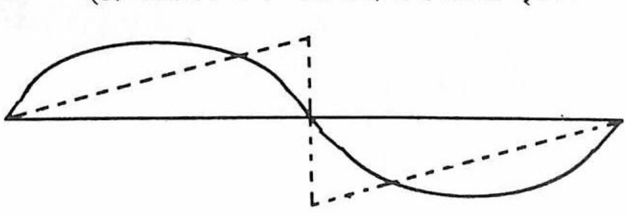
এবং (c) তরঙ্গ দুটির বিস্তার এবং কম্পাঙ্ক একই, কিন্তু তরঙ্গরূপ পৃথক হলে সংশ্লিষ্ট স্বর-দ্বয়ের জাতি পৃথক হয় (চিত্র 12.1c)।



(a) তরঙ্গরূপ ও বিস্তার এক, কিন্তু কম্পাঙ্ক পৃথক।



(b) তরঙ্গরূপ ও কম্পাঙ্ক এক, কিন্তু বিস্তার পৃথক।



(b) তরঙ্গরূপ পৃথক, কিন্তু বিস্তার এবং কম্পাঙ্ক অভিন্ন।

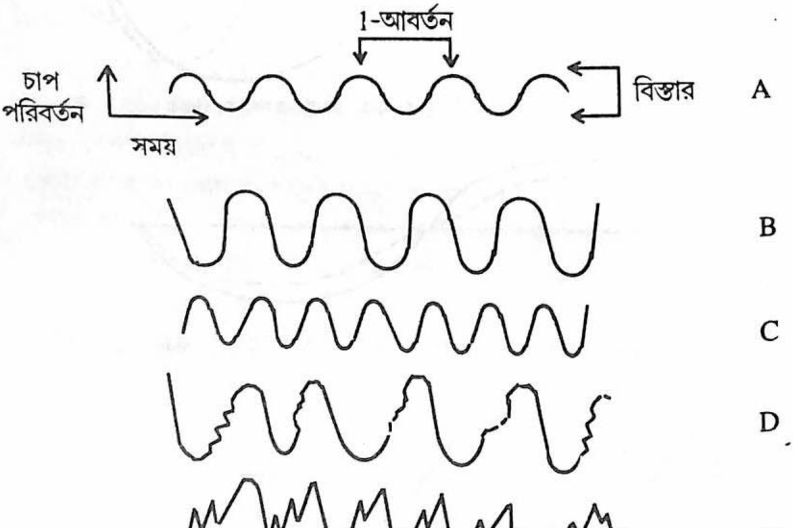
চিত্র 12.1 ঃ শব্দের কম্পাঙ্ক, বিস্তার এবং তরঙ্গরূপ পরিবর্তনে স্বরের পার্থক্য দেখানো হয়েছে (a), (b) এবং (c) চিত্রে।

12.2.6. 'সুরযুক্ত' এবং 'সুরবর্জিত' শব্দ-তরঙ্গের প্রকৃতি ঃ

উৎস বস্তুর কম্পনে বাহ্য-পরিবেশের (সাধারণত বায়ু এবং জল মাধ্যম) অণুর অনুদৈর্ঘ্য কম্পনে সৃষ্ট তরঙ্গ কর্ণপটহে (tympanic membrane) আঘাত করলে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয় তাকেই **'শব্দ'** বলা হয়। পারিপার্শ্বিক মাধ্যমে সৃষ্ট শব্দ তরঙ্গ একটি নির্দিষ্ট গতিবেগে উৎস থেকে দূরবর্তী স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। স্বাভাবিক চাপে (76 সেমি পারদ স্তম্ভ) ও $20^{\circ}C$ তাপমাত্রায় বায়ু মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গের গতিবেগ প্রায় 344 মিটার/সে. (770 মাইল/ঘণ্টা) এবং জলে শব্দ তরঙ্গের গতিবেগ প্রায় 1450 মিটার/সে.। দেখা গেছে যে তাপমাত্রা এবং উচ্চতাভেদে শব্দ তরঙ্গের গতিবেগ বৃদ্ধি পায়। শব্দ তরঙ্গের প্রকৃতি অর্থাৎ বিস্তার, কম্পাঙ্ক এবং পর্যাবৃত্ত বা অপর্যাবৃত্তের উপর শব্দের প্রকৃতি নির্ভর করে। উদাহরণ হিসেবে চিত্রে (12.2) চারটি সুরযুক্ত (A, B, C, এবং D) এবং একটি সুরবর্জিত (noise) শব্দ-তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য এবং রেখাঙ্কন উল্লেখ করা হল।

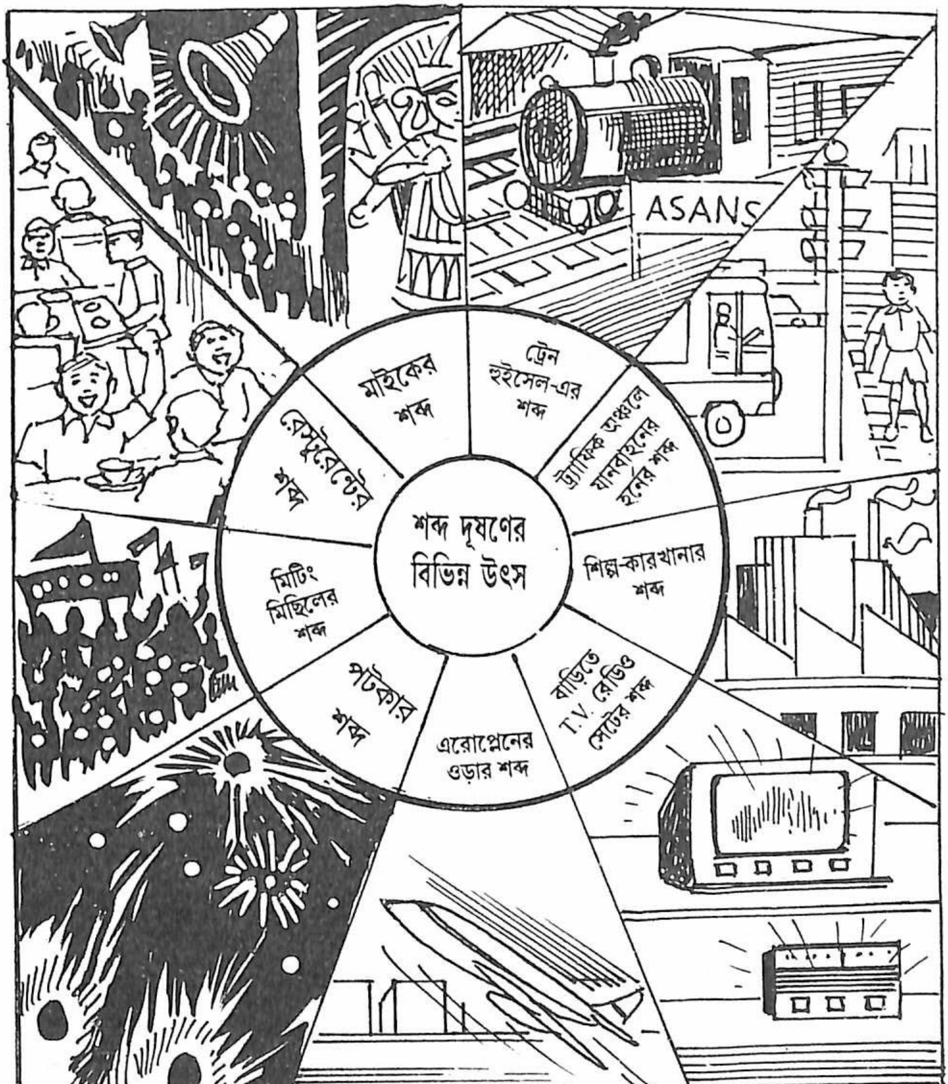
A.— একটি বিশুদ্ধ সুরের রেখাঙ্কন।

B.— এই তরঙ্গের বিস্তার 'A' তরঙ্গের চেয়ে বেশি, কিন্তু কম্পাঙ্ক 'A' তরঙ্গের সমান। তাই 'B' তরঙ্গ 'A' তরঙ্গের চেয়ে অধিক তীব্রতা (বা প্রাবল্য) সম্পন্ন।



চিত্র 12.2 ঃ সুরযুক্ত এবং সুরবর্জিত শব্দ-তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়েছে।

C.— এই তরঙ্গের বিস্তার 'A' তরঙ্গের সমান, কিন্তু তরঙ্গের কম্পাঙ্ক 'A' তরঙ্গের চেয়ে বেশি। সেইহেতু 'C' তরঙ্গের তীক্ষ্ণতা 'A' তরঙ্গের চেয়ে বেশি।



চিত্র 12.3 ঃ শব্দ-দূষণের বিভিন্ন উৎস দেখানো হয়েছে।

12.8. মানুষের স্বাস্থ্যের উপর শব্দ-দূষণের প্রভাব ঃ

12.8. 1 ক্ষণস্থায়ী (অ্যাকিউট) এবং দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) প্রকট ঃ

মানুষের স্বাস্থ্যের উপর শব্দ-দূষণের প্রভাব মানুষ কিভাবে শব্দ-দূষণে প্রকট বা এক্সপোজড় হচ্ছে তার উপর নির্ভর করে। নিউজপেপার প্রেস, চাবি-পাঞ্চিং কারখানা, গাড়ি সারাই ও প্রস্তুতির কারখানা, বস্ত্রকারখানা এবং অন্যান্য শব্দ-দূষিত কারখানা ও শিল্পসংস্থার শ্রমজীবী মানুষ; শহরের (বা নগরের) ট্র্যাফিক অঞ্চলে ডিউটিরত ট্র্যাফিক পুলিস ; ডিসকোথেকের কর্মী; বিমানবন্দরের রানওয়েতে বা শব্দ অবোধক স্থানে ডিউটিরত কর্মী ; এবং সিনেমা হলের কর্মী পেশাগত কারণে দীর্ঘস্থায়ী শব্দ-দূষণের শিকার হয়। অপরপক্ষে মানুষ ক্ষণস্থায়ী শব্দ-দূষণেও প্রকট হতে পারে, যেমন—উৎসবে ও অনুষ্ঠানে মাইক এবং আতশবাজির শব্দে ; প্লাটফর্মে উপস্থিত মানুষ ট্রেনের হুইসল এর শব্দে ; ট্র্যাফিক অঞ্চল, হাসপাতাল, অফিস বা শিক্ষায়তন সংলগ্ন রাস্তায় চলাচলকারী বাস, লরি, মোটর বাইসাইকেল-এর ইঞ্জিন এবং হর্নের শব্দে মানুষ অল্পসময় এক্সপোজড় হতে পারে। ক্ষণস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রকটভেদে মানুষের স্বাস্থ্যের উপর শব্দ-দূষণের প্রভাব পৃথক হয়।

12.8 2. মানুষের স্বাস্থ্যের উপর শব্দ-দূষণের প্রভাব সম্পর্কীয় ক্রিয়াপ্রণালী ঃ

উচ্চ তীব্রতা এবং তীক্ষ্ণতাযুক্ত সুরবর্জিত শব্দ (noise) প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ—উভয় উপায়েই মানুষের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে।

a) প্রত্যক্ষ উপায়ে হানিক্রিয়া সংঘটিত হয় মূলত শ্রবণ সহায়ক অঙ্গ (যথা—বহিঃকর্ণের কর্ণপটহ, মধ্যকর্ণের ম্যালিয়াস, ইনকাস এবং স্টেপিস অস্থি) এবং শ্রুতি-গ্রাহক অঙ্গের (অন্তঃকর্ণের ককলিয়াস্থিত অর্গ্যান অব কর্টি) স্থায়ী বা অস্থায়ী কার্যক্ষমতার হ্রাস বা অসংশোধনযোগ্য গঠন পরিবর্তনের মাধ্যমে। এক্ষেত্রে শ্রবণ ক্ষমতার অস্থায়ী বা স্থায়ী হ্রাস বা বধিরত্ব (deafness or impaired hairing) সৃষ্টি হতে পারে।

b) পরোক্ষ উপায়ে শব্দ-দূষণ জনিত হানিক্রিয়া সংঘটিত হয় স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের (Autonomic Nervous System) দ্বারা। সুরবর্জিত শব্দের প্রভাবে স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের ক্রিয়ার পরিবর্তনের মাধ্যমে হৃদ্‌ক্রিয়া, রক্তচাপ, শ্বসনক্রিয়া, দৃষ্টি, মস্তিষ্কের ক্রিয়া, রক্তের উৎপাদন এবং কাজ প্রভৃতি স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে প্রভাবিত হতে পারে।

শ্রবণে কর্ণের ভূমিকা ঃ

বহিঃকর্ণের কর্ণপটহ, মধ্যকর্ণের অস্থিত্রয় এবং অন্তঃকর্ণের কক্‌লিয়া শ্রবণ পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করে।

1] শ্রুতি সহায়ক এবং শ্রুতি অঙ্গের গঠন ও সজ্জাবিন্যাস ঃ

i) **কর্ণপটহ (Tympanic membrane) ঃ** বহিঃকর্ণ এবং মধ্যকর্ণের সংযোগস্থলে কর্নপটহ্ অবস্থিত। এটি একটি পাতলা ঝিল্লি পর্দা যার বাইরের দিক অবতল এবং মধ্যকর্ণের দিক উত্তল।

ii) অস্থিত্রয় : বায়ুপূর্ণ মধ্যকর্ণে শ্রবণ সহায়ক অস্থিত্রয়—'ম্যালিয়াস', 'ইনকাস' এবং 'স্টেপিস' অবস্থিত। ম্যালিয়াস অস্থির বাহু কর্ণপটহের পশ্চাৎ অংশের সঙ্গে এবং মস্তক মধ্যকর্ণের প্রাচীরের সঙ্গে সংযুক্ত। ম্যালিয়াসের একটি ছোট প্রবর্ধকের সঙ্গে ইনকাস অস্থিসংযুক্ত এবং ইনকাস আবার স্টেপিসের মস্তকের সঙ্গে যুক্ত। এই স্টেপিসের ফুটপ্লেট ককলিয়ার 'ওভাল-উইনডো' (Oval Window) এর প্রাচীরের সঙ্গে সংযুক্ত।

iii) ককলিয়া (Cochlea) ঃ এটি একটি প্যাঁচালো লম্বা (35 মিমি. দীর্ঘ) নালী বিশেষ। দৈর্ঘ্যচ্ছেদে দেখা যায় যে—সমগ্র দৈর্ঘ্য বরাবর ককলিয়ার অভ্যন্তর অংশ '**বেসিলার ঝিল্লি** (Basilar membrame) এবং 'রেজনার ঝিল্লি' (Reissner's membrame) দ্বারা তিনটি আনুভূমিক কক্ষে বিভক্ত। উপরের কক্ষ—স্ক্যালা ভেস্টিবিউলি (Scala Vestibuli) এবং নিম্নকক্ষ—স্ক্যালা টিম্পানী (Scala Tympani) 'পেরিলিম্ফ' নামক তরল দ্বারা পূর্ণ। এই দুটি কক্ষ ককলিয়ার অগ্রস্থ ছিদ্র হেলিকোট্রেমা (helicotrema) দ্বারা আন্তঃ-সংযুক্ত। ককলিয়ার মধ্যভাগের আনুভূমিক বদ্ধ কক্ষকে 'স্ক্যালামিডিয়া' (Scala Media) বলা হয়। এই কক্ষটি উপরে রেজনার ঝিল্লি এবং নীচে বেসিলার ঝিল্লির দ্বারা আবদ্ধ এবং 'এন্ডোলিম্ফ' (endolymph) দ্বারা পূর্ণ। বেসিলার ঝিল্লির উপরেই পর্যায়ক্রমে অংসংখ্য শ্রুতি-গ্রাহক অঙ্গ '**অর্গ্যান অব কর্টি**' অবস্থিত।

• **অর্গ্যান অব কর্টি** (Organ of Corti) ঃ ককলিয়াস্থ অর্গ্যান অব কর্টিকে শ্রুতি-গ্রাহক অঙ্গ বলা হয়। এই অঙ্গ অসংখ্য কৈশ-কোষ (hair cells) দ্বারা গঠিত, যারা **শ্রুতি-গ্রাহক কোষ** (hair receptor cell) নামে পরিচিত। শ্রুতি-গ্রাহক কোষ চারটি সারিতে সজ্জিত। অন্তঃস্থ কৈশ-কোষ একসারিতে এবং বহিঃস্থ কৈশ-কোষ তিন সারিতে সজ্জিত। কৈশ-কোষগুলির রোম বা কেশ 'রেটিকুলার ল্যামিনা' নামক ঝিল্লিতে প্রোথিত এবং 'কর্টির-রড্' দ্বারা অবলম্বিত। অর্গ্যান অব কর্টির সকল কৈশ-কোষ পাতলা, প্রসারণশীল '**টেকটোরিয়াল ঝিল্লি**' দ্বারা আবৃত। মানুষের প্রতিটি ককলিয়ায় প্রায় 20,000 বহিঃস্থ কৈশ-কোষ এবং 3500 অন্তঃস্থ কৈশ-কোষ থাকে।

2] **শ্রবণ-পদ্ধতি ঃ**

(i) শব্দতরঙ্গ বায়ুমাধ্যম থেকে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গরূপে বহিঃকর্ণ নালিকায় প্রবেশ করে এবং অবশেষে কর্ণপটহে আঘাত করে। শব্দ-তরঙ্গের আঘাতে কর্ণপটহ সম্মুখে এবং পশ্চাতে আন্দোলিত হতে থাকে।

(ii) কর্ণপটহের সম্মুখ-পশ্চাৎ আন্দোলনে শব্দ-শক্তি ম্যালিয়াস অস্থিতে সঞ্চারিত হয়। ম্যালিয়াস থেকে ইনকাস এবং ইনকাস থেকে স্টেপিসে শক্তি সঞ্চারিত হয়। ফলে স্টেপিসের ফুট প্লেট সম্মুখ এবং পশ্চাতে আন্দোলিত হতে শুরু করে। ওভালউইনডো সংলগ্ন ফুট প্লেটের এরূপ আন্দোলনে স্ক্যালা ভেস্টিবিউলের পেরিলিম্ফে চাপ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।

(iii) চাপ তরঙ্গের শীর্ষ অংশ দ্বারা রেজনার ঝিল্লির যে কোন নির্দিষ্ট অংশ অবদমিত

D.— এই তরঙ্গের গঠন প্রকৃতি জটিল, কিন্তু তরঙ্গের পুনরাবৃত্তি নিয়মিত। 'সুরযুক্ত' শব্দের এরূপ তরঙ্গরূপ দেখা যায়।

E.— এই শব্দ তরঙ্গের পুনরাবৃত্তি অনিয়মিত। 'সুরবর্জিত' শব্দের এরূপ তরঙ্গরূপ দেখা যায়।

12.3. শব্দ-দূষণ কি?

মানুষ এবং অন্যান্য উন্নত প্রাণীর শ্রবণ ক্রিয়ায় শব্দের তীব্রতা (প্রাবল্য) এবং তীক্ষ্ণতার পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। উল্লেখ করা যেতে পারে যে—সুস্থ বা স্বাভাবিক শ্রবণ ক্রিয়ায় তীব্রতা এবং তীক্ষ্ণতা পরিবর্তনের মান শ্রুতি-সীমার মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। সুরযুক্ত বা সুরবর্জিত শব্দের উচ্চ-শ্রুতিসীমার অধিক তীব্রতা এবং তীক্ষ্ণতায় স্বাভাবিক শ্রবণ ক্রিয়ায় বাধা, বা শ্রবণ ক্ষমতার হ্রাস, বা কর্ণের শ্রুতি-গ্রাহক কোষের অস্থায়ী বা স্থায়ী অনভিপ্রেত পরিবর্তন বা ক্ষতি হতে পারে। এছাড়া শব্দের অসহনীয় অধিক তীব্রতা এবং তীক্ষ্ণতায় অন্যান্য শারীরবৃত্তিয় ক্ষতি হয়। **ভৌত পরিবেশে (বিশেষত বায়ু মাধ্যমে) শ্রুতিসীমা বা সহনক্ষমতা বহির্ভূত অপেক্ষাকৃত উচ্চ-তীব্রতা বা তীক্ষ্ণতা সম্পন্ন শব্দের (বিশেষ করে সুরবর্জিত শব্দ বা নয়েজ) উপস্থিতিতে জীব-পরিবেশ তথা মানুষের উপর যে অসংশোধনযোগ্য ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি হয়, সেই পরিবেশ-সংক্রান্ত ঘটনাকে শব্দ দূষণ বলা হয়।** আতশবাজি পোড়ানোর ফলে সৃষ্ট অনিয়মিত ও তীব্রতা যুক্ত শব্দ; বাস, লরি, কার এবং ট্রেনের হর্নের শব্দ; চালু মেশিনের শব্দ; বিমান উড়বার সময় উৎপন্ন শব্দ; মাইক ও অন্যান্য বিবর্ধকের শব্দ ইত্যাদি সুরবর্জিত শব্দ শব্দ-দূষণের জন্য প্রধানত দায়ী।

12.4. শব্দ-দূষণের উৎস ঃ

শব্দ দূষণের জন্য মনুষ্যসৃষ্ট কারণই প্রধানত দায়ী। যদিও দু-একটি ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক কারণে শব্দদূষণ সৃষ্টি হয়। শব্দদূষণের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট উৎস তালিকায় (12.1) দেওয়া হল ঃ

শ্রেণী	প্রকৃতি
1. প্রাকৃতিক উৎস ঃ	বজ্র বা বাজপড়ার শব্দ, মেঘের গর্জন
2. মনুষ্য সৃষ্ট উৎস ঃ	মানুষের উচ্চস্বরে কথা বলার শব্দ, গাড়ির হর্ন, ট্রেনের হুইসল্, পপমিউজিক বা মাইকের শব্দ, বিমান উড়বার সময় সৃষ্ট শব্দ, কংকর্ডের শব্দ, সাইরেন, অক্সিজেন টর্চ, জেনারেটার চলার শব্দ, কারখানার মেশিন চলার শব্দ, নিউজ পেপার প্রেসের শব্দ, আতশবাজির শব্দ প্রভৃতি।

তালিকা 12.1 ঃ শব্দদূষণের প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট উৎস উল্লেখ করা হয়েছে।

12.5 সুরবর্জিত শব্দ (নয়েজ) ঃ প্রধান শব্দদূষক

শব্দ-দূষণে সুরযুক্ত এবং সুরবর্জিত উভয় শব্দ দায়ী হলেও সুরবর্জিত শব্দই প্রধানত দায়ী, অর্থাৎ সুরবর্জিত শব্দই হল প্রধান শব্দ-দূষক। সুরবর্জিত শব্দের কোন নিয়মিত তীব্রতা ও কম্পাঙ্ক না থাকায় মানুষের শ্রবণ-সম্পর্কীয় প্রতিরক্ষামূলক কোন প্রতিবর্ত সঠিকভাবে অভিযোজিত হতে পারে না, ফলে ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি হয়।

12.6. শব্দ-দূষণের কারণ ঃ

মানুষের অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপই শব্দদূষণের প্রধান কারণ। অরণ্যধ্বংস ও নগরায়ন, শিল্পের প্রসার, প্রযুক্তির প্রগতি, পরিবহনের প্রসার এবং মানুষের জীবন প্রণালীতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট পরিবর্তনই সুরবর্জিত শব্দ দূষণের কারণ। আধুনিক মানব সভ্যতার উপজাত হিসেবে শব্দ-দূষণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বর্তমানে প্রধান পরিবেশ দূষক হিসেবে দেখা দিয়েছে। বর্তমান বিশ্ব তথা ভারতের বিভিন্ন কর্মব্যস্ত নগর, শহর এবং কারখানা ব্যতিরেকে গ্রামে, মফঃস্বল শহরে, নির্মাণ স্থলে, হাসপাতালে, অফিস ও আদালতে এবং শিক্ষায়তনে শব্দ-দূষণ লাগামহীনভাবে বেড়ে চলেছে। শব্দ-দূষণের বিভিন্ন কারণ অতি-সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

i) **পরিবহন ঃ** শব্দ-দূষণের প্রধান উৎস পরিবহন। পরিবহনজনিত শব্দ-দূষণের কারণ যানবাহনের অত্যধিক সংখ্যা বৃদ্ধি, বিশেষ করে ডিজেল ইঞ্জিনযুক্ত যানবাহনের। বাস, লরি, কার, মোটরসাইকেল প্রভৃতির চলাচলের শব্দ এবং অনিয়ন্ত্রিত ভাবে উচ্চ-তীব্রতাযুক্ত বৈদ্যুতিক হর্নের ব্যবহারের ফলে রাস্তায়, শহরের ট্র্যাফিক অঞ্চলে, হাসপাতাল সংলগ্ন রাস্তায়, শিক্ষায়তন এবং অন্যান্য নীরব কর্মব্যস্ত স্থানে শব্দ-দূষণ সৃষ্টি হয়। এছাড়া ট্রেনের বৈদ্যুতিক হুইসল্ প্লাটফর্ম এবং সন্নিহিত স্থানের মানুষের উপর শব্দ-দূষণজনিত প্রভাব সৃষ্টি করে। এই-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ট্রেনের হুইসল্ এর তীব্রতা প্রায় 90 dB (ডেসিবেল), যা শ্রুতিসীমার সাপেক্ষে অতিশয় তীব্র।

ii) **শিল্প-প্রক্রিয়া ঃ** বিভিন্ন শিল্পসংস্থায় প্রক্রিয়াকরণের সময় যান্ত্রিক ক্রিয়ায় উৎপন্ন শব্দ শিল্পসংস্থায় কর্মরত শ্রমিক ও অন্যান্য কর্মী এবং পার্শ্বস্থ অঞ্চলের জনবসতির উপর শব্দ-দূষণজনিত প্রভাব সৃষ্টি করে। যেমন নিউজপেপার প্রেস (100 dB), টেক্সটাইল লুম এবং চাবি পাঞ্চিং মেশিন (80 dB) এর প্রক্রিয়াকরণের ফলে শব্দ-দূষণ সৃষ্টি হয়। এছাড়া বিভিন্ন শিল্প সংস্থায় সিফটিং এর কাজে ব্যবহৃত সাইরেন (140 dB) যন্ত্রণাদায়ক তীব্র শব্দের সৃষ্টি করে।

iii) **যান্ত্রিক ক্রিয়া ঃ** অফিস, দোকান, স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য সামাজিক কাজে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য যে ডিজেল চালিত জেনারেটর ব্যবহৃত হয় সেইসব জেনারেটরের ক্রিয়ায় শব্দ (একঝসট্ গ্যাসের বেগযুক্ত নির্গমনের ফলে শব্দ উৎপন্ন হয়) এবং বায়ুদূষণ সৃষ্টি হয়।

iv) **আকাশ পরিবহন ঃ** স্থল-পরিবহন ব্যতীত আকাশ পরিবহন জনিত কারণেও শব্দ-দূষণ ঘটে। বিমান বন্দরে রানওয়েতে বিমান চালু করার সময় এবং আকাশপথে উড়বার সময় ভয়ানক শব্দ দূষণ সৃষ্টি হয় (110 dB)। অপেক্ষাকৃত বড় এবং গতিশীল জেট বিমান সৃষ্ট শব্দ দূষণের মাত্রা অনেক বেশি। অধুনা প্রচলিত পাশ্চাত্যের সুপারসোনিক এয়্যারক্র্যাফ্‌ট (যথা অতিশয় দ্রুতগতিসম্পন্ন 'কংকর্ড) যন্ত্রণাদায়ক শব্দ দূষণের সৃষ্টি করে।

v) **কথোপকথন ঃ** মানুষের উচ্চ-স্বরে কথা বলার সময়ও শব্দ দূষণ সৃষ্টি হয়। স্বাভাবিক স্বরে মানুষের কথোপকথনের সময় শব্দ দূষণ উৎপন্ন হয় না (60 dB), কিন্তু কোন জমায়েত স্থলে, অফিসে, বার-রেস্টুরেন্টে, শিক্ষায়তনে উচ্চস্বরে কথা বলার ফলে যন্ত্রণাদায়ক শব্দ দূষণের সৃষ্টি হতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর পুরুষ-স্বরের তুলনায় অধিক যন্ত্রণাদায়ক বা শব্দ-দূষক। কারণ পুরুষ-স্বরের গড় কম্পাঙ্ক 120 Hz, সেক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের স্বরের গড় কম্পাঙ্ক 250 Hz। তাই স্ত্রীলোকের স্বর পুরুষের স্বরের তুলনায় অধিক তীক্ষ্ণ। রক মিউজিকের ক্ষেত্রে ভীষণ শব্দ-দূষণ সৃষ্টি হয়।

vi) **সামাজিক কারণ ঃ**

a) মিটিং, মিছিল প্রভৃতিতে মাইকের মাধ্যমে বক্তৃতা বা পুজো-পার্বণে বিবাহাদিতে এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত মাইকের উচ্চ-তীব্র শব্দে মানুষের ক্ষতি হয়।

b) পুজোপার্বণে, প্রতিমা বিসর্জনের সময় বা কোন আনন্দ সংবাদে এবং দেওয়ালির সময় আতশবাজি পোড়ানোর রীতি এখনও অব্যাহত এবং ক্রমবর্ধমান। কিন্তু আতশবাজি পোড়ানোর ফলে ভয়াবহ বায়ুদূষণের সঙ্গে সঙ্গে আতশবাজির অনিয়মিত এবং তীব্র শব্দে অবর্ণনীয় শব্দ-দূষণ ঘটে, যা মানুষের অসংশোধনযোগ্য ক্ষতি করে।

c) রেডিও, টেলিভিশান, খেলাধূলা, জঞ্জাল অপসারণ এবং ধৌতকরণ ক্রিয়ায়ও শব্দ-দূষণের সৃষ্টি হয় (75—120 dB)।

12.7 সাধারণ শব্দের তীব্রতা পরিমাপক ডেসিবেল স্কেল (মানদণ্ড) এবং শব্দ-দূষণ ঃ

শ্রবণানুভূতি সৃষ্টিকারী সাধারণ শব্দের **'ন্যূনতম তীব্রতা'** (Threshold intensity) বা **'প্রমাণ তীব্রতা মাত্রা'** (Standard intensity level) **"অ্যাকাসটিক্যাল সোসাইটি অব আমেরিকা"** (Acoustical Society of America) দ্বারা নির্ধারিত হয়েছে। অ্যাকাসটিক্যাল সোসাইটি অনুসারে সাধারণ শব্দের শ্রবণানুভূতি সৃষ্টিকারী প্রমাণ তীব্রতা মাত্রা হচ্ছে '0' (শূন্য) ডেসিবেল (Zero decibel)। সোসাইটিকৃত এই ডেসিবেল-স্কেল তীব্রতা মানের একটি লগ্ স্কেল (log scale)। এই স্কেল অনুসারে শব্দের তীব্রতা মাত্রা 0-140 ডেসিবেলের যে কোন মাত্রায় কানের শ্রুতি-গ্রাহক অঙ্গ—**"অর্গ্যান অব্ কর্টির"** ক্ষতি

হতে পারে। এই ক্ষতির মাত্রা ডেসিবেল স্কেলের উচ্চতম তীব্রতা মাত্রায় (70-140 ডেসিবেল) সর্বাপেক্ষা বেশি। বিভিন্ন মনুষ্যসৃষ্ট শব্দের উৎস থেকে নির্গত শব্দের তীব্রতামান এবং শব্দানুভূতির প্রকৃতি ডেসিবেল-স্কেলে পর্যায়ক্কিত করা হয়েছে।

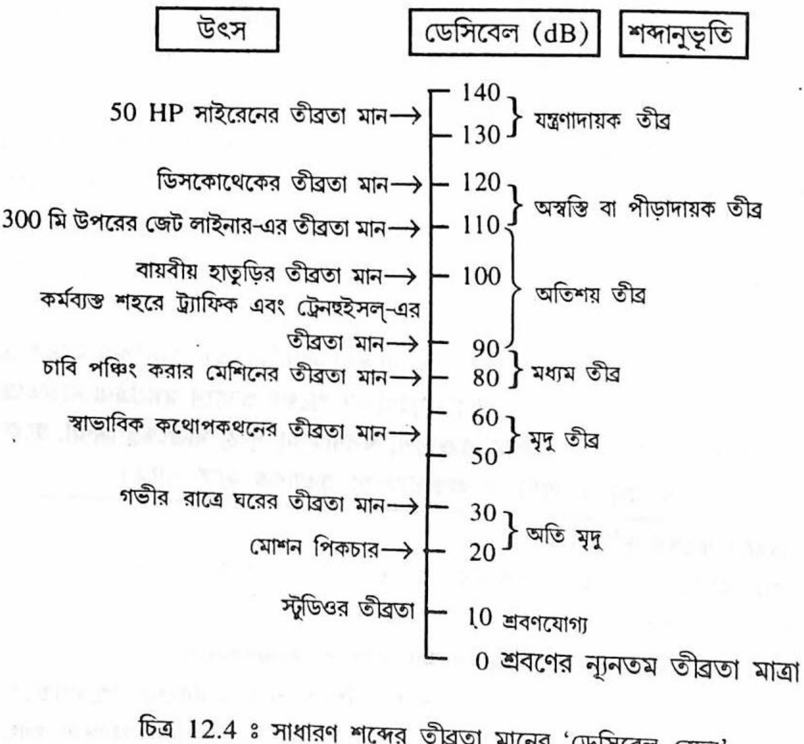
- **ডেসিবেল কি?**

'বেল' (bel) এবং **'ডেসিবেল'** হচ্ছে শব্দের তীব্রতা নির্দেশক একক। শব্দ এবং প্রমাণ শব্দের তীব্রতার অনুপাতের লগ (log) কে 'বেল' বলা হয়। যেহেতু এক **'ডেসিবেল'** (decibel) হচ্ছে 0.1**'বেল'** ; তাই শব্দের তীব্রতা এবং প্রমাণ শব্দের তীব্রতার 10 লগকে এক ডেসিবেল বলা হয়, অর্থাৎ

$$\text{ডেসিবেল (dB) সংখ্যা} = 10 \log \frac{\text{শব্দের তীব্রতা}}{\text{প্রমাণ শব্দের তীব্রতা}}$$

- **শ্রবণানুভূতি সৃষ্টিকারী ন্যূনতম তীব্রতামাত্রা ঃ**

শূন্য ডেসিবেল ('0' dB), 0.000204 ডাইন/সেমি^{2} চাপে।



চিত্র 12.4 ঃ সাধারণ শব্দের তীব্রতা মানের 'ডেসিবেল স্কেল' এবং শব্দানুভূতি দেখানো হয়েছে।

হয় (রেজনার ঝিল্লির কোন অংশ অবদমিত হবে তা নির্ভর করে শব্দের তীক্ষ্ণতা বা শব্দ-তরঙ্গের কম্পাঙ্কের উপর)। রেজনার ঝিল্লির অবদমনের ফলে স্ক্যালা মিডিয়ার এন্ডোলিম্ফে শক্তি সঞ্চারিত হয়, ফলে রেজনার ঝিল্লির অবদমন স্থানের ঠিক নীচে বেসিলার ঝিল্লিও অবদমিত হয়। অবদমিত বেসিলার ঝিল্লিস্থলে অবস্থানকারী 'অর্গ্যান অব কর্টি' তার ফলে বিকৃত হয়। অর্গ্যান অব কর্টির বিকৃতির ফলে কৈশ কোষের কেশও বিকৃত হয়। কেশের বিকৃতির ফলে কোষ ঝিল্লিতে যে ক্রিয়াবিভব (Action Potential) উৎপন্ন হয় তা কৈশ কোষ থেকে উৎপন্ন সজ্ঞাবহ নার্ভের মাধ্যমে উদ্দীপনারূপে গুরুমস্তিষ্কে (টেমপোরাল গাইরাস) প্রবাহিত হয়। গুরুমস্তিষ্কে জটিল কার্যাদির মাধ্যমে শ্রবণানুভূতি সৃষ্টি হয়।

শব্দের উৎস
↓
বায়ুমাধ্যমে বিস্তারণশীল অনুদৈর্ঘ্য শব্দ-তরঙ্গ (বায়ু-মাধ্যম)
↓
বহিঃকর্ণনালিকার মধ্য দিয়ে শব্দ তরঙ্গের বিস্তার।
↓
শব্দ তরঙ্গের আঘাতে কর্ণপটহের সম্মুখ-পশ্চাৎ আন্দোলন। (বহিঃকর্ণ)
↓
কর্ণপটহের কম্পনশক্তির ম্যালিয়াস, এবং ইনকাস-এর সাহায্যে স্টেপিসে বিস্তার
↓
ওভাল উইনডো সংলগ্ন স্টেপিস ফুট প্লেটের সম্মুখ-পশ্চাত আন্দোলন (মধ্য কর্ণ)
↓
স্ক্যালা টিমপ্যানিতে চাপ-তরঙ্গের সৃষ্টি
↓
রেজনার ঝিল্লির অবদমন
↓
বেসিলার ঝিল্লির অবদমন
↓
অরগ্যান অব কর্টির বিকৃতি
↓
কৈশ-কোষ ঝিল্লিতে ক্রিয়া-বিভবের সৃষ্টি (অন্তঃকর্ণ)
↓
সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে শ্রবণ উদ্দীপনার বিস্তার
↓
শ্রবণানুভূতি (মস্তিষ্ক)

চিত্র 12.5 : শ্রবণ পদ্ধতিতে কর্ণের ভূমিকা প্রবাহ-চিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়েছে।

12.8.3. মানুষের স্বাস্থ্যের উপর শব্দ-দূষণের প্রভাব ঃ

মানুষের স্বাস্থ্যের উপর শব্দ-দূষণের প্রভাবকে দুটি-পর্যায়ে আলোচনা করা হল ঃ

1. অ্যাকিউট (বা ক্ষণস্থায়ী) প্রভাব
2. ক্রনিক (বা দীর্ঘস্থায়ী) প্রভাব।

1. শব্দ-দূষণের অ্যাকিউট প্রভাব ঃ

[i] হঠাৎ অতি তীব্র শব্দের প্রকটে কর্ণপটহের ক্ষতি হতে পারে বা কর্ণপটহ ছিঁড়ে যেতে পারে। এই কারণে অস্থায়ী বা স্থায়ী শ্রবণত্রুটি এবং আংশিক বা সম্পূর্ণ বধিরতা সৃষ্টি হতে পারে।

[ii] এছাড়া শব্দ দূষণের অ্যাকিউট প্রকটে শ্রবণতন্ত্রের যে কোন অংশে ক্ষতির কারণে শ্রবণ ত্রুটি বা শ্রবণ ক্ষমতার হ্রাস ঘটতে পারে।

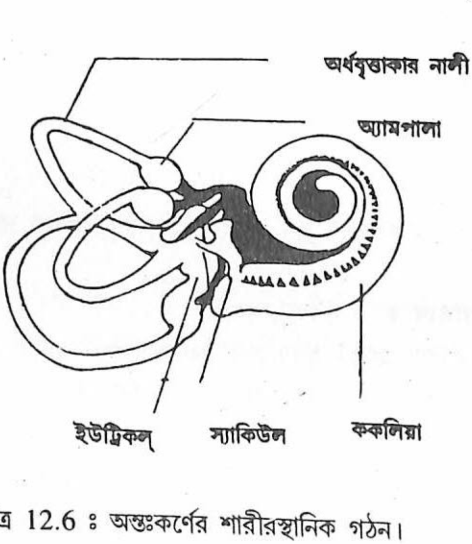
[iii] বায়ু-মাধ্যমে সুরবর্জিত শব্দের উপস্থিতিতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় শব্দের শ্রবণে বাধার সৃষ্টি হয়। এই ঘটনাকে **'মাস্কিং (Masking) প্রভাব'** বলা হয়।

2. শব্দ-দূষণের ক্রনিক প্রভাব ঃ

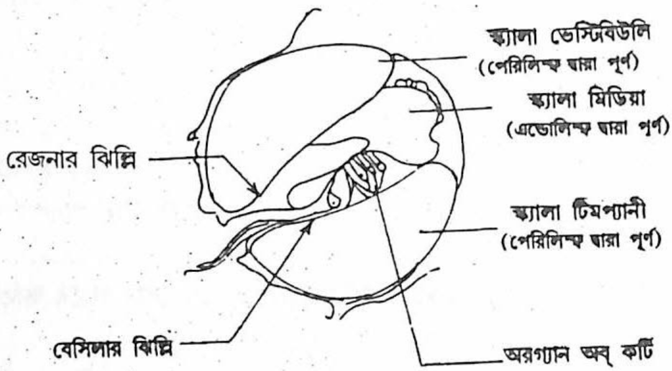
A. শ্রবণঘটিত প্রত্যক্ষ প্রভাব ঃ

[i] কতিপয় বিশেষ কম্পাঙ্ক এবং তীব্রতাযুক্ত শব্দের ক্রনিক প্রকটে অন্তঃকর্ণের শ্রবণ গ্রাহক কোষের (কৈশ কোষ) ক্ষতির কারণে অস্থায়ী বা স্থায়ী বধিরতা, বা শ্রবণ ক্ষমতার হ্রাস ঘটতে পারে।

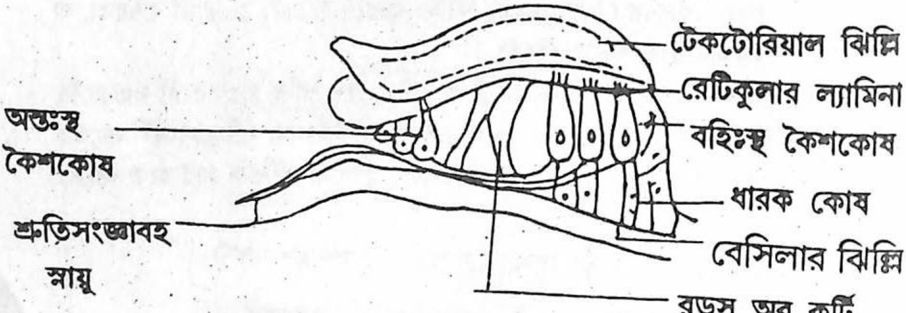
[ii] সুরবর্জিত শব্দের ক্রনিক প্রকটে কর্ণপটহ, শব্দ শক্তি প্রবাহকারী মধ্যকর্ণের অস্থিত্রয় বা অর্গ্যান অব কর্টি থেকে মস্তিষ্কে শ্রবণ উদ্দীপনা পরিবহনকারী নার্ভের কার্যক্ষমতা হ্রাস বা ক্ষতির কারণে শ্রবণক্ষমতার হ্রাস বা বধিরতা সৃষ্টি হতে পারে।



চিত্র 12.6 ঃ অন্তঃকর্ণের শারীরস্থানিক গঠন।



চিত্র 12.7 ঃ প্রস্থচ্ছেদে কক্লিয়ার গঠন।



চিত্র 12.8 ঃ অরগ্যান অব কর্টির (শ্রুতি গ্রাহক অঙ্গ) গঠন।

B. অন্যান্য পরোক্ষ প্রভাব ঃ

সুরবর্জিত শব্দের ক্রনিক প্রকটে শ্রবণ ছাড়া অন্যান্য শারীরবৃত্তিয় কার্য প্রভাবিত হয়। শ্রবণতন্ত্র ব্যতিরেকে অন্যান্য তন্ত্রের উপর সুরবর্জিত শব্দের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

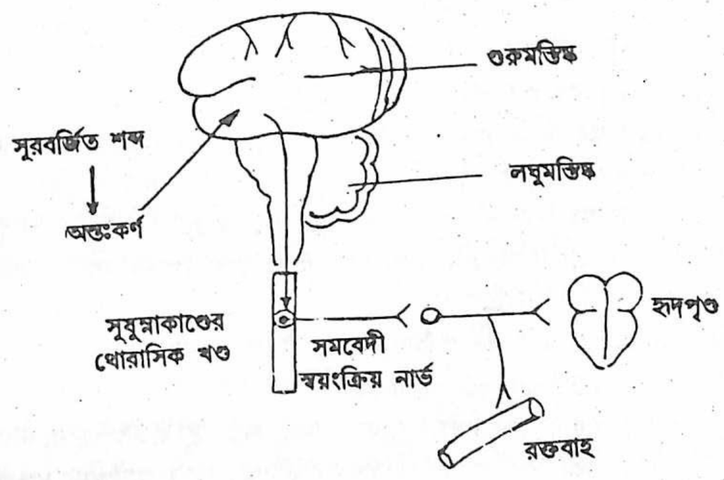
I. হৃদ-সংবহন তন্ত্রের উপর প্রভাব (Effects on Cardio-Vascular System) ঃ

[i] সুরবর্জিত শব্দের ক্রনিক প্রকটে হৃদ-স্পন্দন (heart beat) পরিবর্তিত হয়।

সুরবর্জিত শব্দের প্রকৃতি অনুসারে হৃদস্পন্দন হার বৃদ্ধি পেতে পারে বা কমে যেতে পারে।

[ii] সুরবর্জিত শব্দের প্রকটে হৃদ-উৎপাদ হ্রাস পায়।

[iii] গড় ধমনী-রক্তচাপ সুরবর্জিত শব্দের প্রভাবে বৃদ্ধি পায়। শব্দ দূষণে গড় ধমনী-রক্তচাপ বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ সমবেদী স্বয়ংক্রিয় (Sympathetic autonomic) নার্ভতন্ত্রের প্রভাবে হৃদপিণ্ডের সংকোচন তীব্রতার বৃদ্ধি এবং 'বাহ্য রক্তবাহের সংকোচন' (Peripheral Vaso-Constriction)।



চিত্র 12.9 ঃ সুরবর্জিত শব্দের প্রভাবে হৃদস্পন্দন হারের বৃদ্ধি এবং রক্তবাহের সংকোচন জনিত রক্ত-চাপ বৃদ্ধির নার্ভীয় নিয়ন্ত্রণ দেখানো হয়েছে।

II. রক্তের উপর প্রভাব (Effects on Blood)

সুরবর্জিত শব্দের প্রভাবে রক্তের উপাদান সম্পর্কীয় নিম্নলিখিত পরিবর্তন ঘটতে পারে ঃ

[i] হাইপোকেলিমিয়া (Hypokalaemia) ঃ রক্তের ক্যালসিয়ামের মাত্রা হ্রাসকে 'হাইপোকেলিমিয়া' বলা হয়।

[ii] হাইপোগ্লাইসেমিয়া (Hypoglycaemia) এবং হাইপারগ্লাইসেমিয়া (hyperglycaemia) ঃ রক্তের গ্লুকোজের স্বাভাবিক মাত্রার হ্রাসকে 'হাইপোগ্লাইসেমিয়া' এবং বৃদ্ধিকে 'হাইপারগ্লাইসেমিয়া' বলা হয়।

[iii] ইওসিনোফিলিয়া (Eosinophilia) ঃ রক্তে ইওসিনোফিল নামক দানাযুক্ত শ্বেত-রক্তকণিকার সংখ্যা বৃদ্ধিকে ইওসিনোফিলিয়া বলা হয়।

[III] **শ্বসনের উপর প্রভাব** (Effects on Respiration) :

শব্দদূষণজনিত কারণে শ্বসনের হার পরিবর্তিত হতে পারে। ফলে হৃদপিণ্ডের এবং মস্তিষ্কের কোষের উপর অক্সিজেন হ্রাসজনিত প্রভাব সৃষ্টি হয়। বিশেষ তীব্রতা এবং তীক্ষ্ণতাযুক্ত সুরবর্জিত শব্দের প্রভাবে '**শ্বসন গভীরতা**'র (breathing intensity) বৃদ্ধি ঘটে।

[IV] **দৃষ্টির উপর প্রভাব** (Effects on Vision) :

শব্দদূষণজনিত কারণে নিম্নউল্লিখিত দৃষ্টি সম্পর্কীয় প্রভাব পড়ে।

[i] রাত্রিকালীন দৃষ্টি-ত্রুটি (Impairment of Vision) দেখা যায়।

[ii] পিউপিল রন্ধ্রের প্রসারণ (Pupillary Dilation) ঘটে।

এবং [iii] বর্ণ প্রত্যক্ষকরণ (Color-Perception) হ্রাস পায়।

[v] **নার্ভতন্ত্রের উপর প্রভাব** (Effects on Nervous System) :

শব্দ দূষণজনিত কারণে

[i] স্বয়ংক্রিয় নার্ভতন্ত্রের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়।

[ii] চেষ্টীয় নার্ভের ক্রিয়া হ্রাস পায়। ফলে দৈহিক সংহতি এবং চলন-গমন মূলক ক্রিয়া বিঘ্নিত হয়।

[vi] **মস্তিষ্কের এবং মনঃচেষ্টীয় কার্যের উপর প্রভাব** (Effects on brain and Psychomotor function) :

[i] শব্দ-দূষণের প্রভাবে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। সুরবর্জিত শব্দের দীর্ঘস্থায়ী প্রকটে রাত্রে স্বাভাবিক ঘুমের পরিমাণ কমে যায়। ফলে কর্মক্ষেত্রে দক্ষতাযুক্ত কাজে (যথা ড্রাইভিং, টাইপিং, ওয়াচ রিপেয়ারিং এবং কারখানার মেসিন চালানো ইত্যাদি) একাগ্রতা বিঘ্নিত হয়। এই কারণে কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা বেশি ঘটে এবং উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়।

[ii] মাথাধরা (headache) এবং উত্তেজিতা (irritability) প্রভৃতি উপসর্গের আবির্ভাব ঘটে।

[iii] স্মৃতি-শক্তি হ্রাস ঘটতে পারে দীর্ঘস্থায়ী সুরবর্জিত শব্দের প্রকটে।

[iv] এছাড়া পেশাগত কাজে লিপ্ত শ্রমজীবী মানুষের শব্দ দূষণজনিত '**মানসিক অবসাদ**' (mental depression) এবং কাজে অনীহা (apathy) সৃষ্টি হয়।

12.9. শব্দ-দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ :

জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি, মানুষের ব্যক্তিগত অদূরদর্শী ক্রিয়াকলাপ, পরিবহন ব্যবস্থার অবাধ বিস্তার, অপরিকল্পিত শিল্পায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার ত্রুটি এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে লাউড স্পিকার বিবর্ধিত শব্দের ব্যাপকতায় শব্দদূষণ বর্তমানে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে।

শব্দ-দূষণে মানুষ তথা পরিবেশের সুস্থ অগ্রগতি ও প্রাণপ্রবাহে সঙ্কট দেখা দিচ্ছে। এই অবস্থায় শিল্প-কারখানায়, পরিবহন পদ্ধতিতে এবং সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে শব্দ-দূষণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ জরুরী। তিন উপায়ে শব্দ-দূষণ প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ করা যায় ঃ

[i] আইনসম্মত উপায়
[ii] প্রযুক্তিগত উপায় এবং
[iii] ব্যক্তিগত উপায়।

[i] আইনসম্মত উপায়ে শব্দ-দূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ

শব্দের দূষণ প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণমূলক আইন রচনা এবং প্রয়োগের মাধ্যমে শব্দ-দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে শব্দ-দূষণ নিয়ন্ত্রণমূলক আইন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

[a] উৎস থেকে নির্গত শব্দের সুনির্দিষ্ট তীব্রতা সম্পর্কীয় আইন প্রণয়ন করা উচিত। বাস, ট্রেন, এরোপ্লেন, শিল্প ও কারখানা নিঃসৃত শব্দ এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে লাউড স্পিকার নিঃসৃত শব্দের তীব্রতা নির্দেশিত মাত্রায় বা তার নীচে বজায় রাখা জরুরী। এই-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আইনভঙ্গকারীর কঠোর শাস্তির বিধান থাকা উচিত।

[b] যানবাহন নিঃসৃত শব্দের ব্যাপকতা এবং তীব্রতা হ্রাসের জন্য আইন করে উন্নত প্রযুক্তির ডিজেল-ইঞ্জিন এবং একঝসট্ গ্যাস পাইপে সাইলেন্সারের ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা উচিত।

[c] আইন প্রণয়ন এবং প্রয়োগের মাধ্যমে জনবহুল অঞ্চল থেকে দূরবর্তী স্থান বরাবর হাইওয়েগুলির রুট প্রবর্তন করা উচিত।

[d] ঘন জনবসতি পূর্ণ এলাকায় বা সংলগ্ন অঞ্চলে শব্দ উৎপন্নকারী শিল্পসংস্থা বা কারখানার স্থাপন নিষিদ্ধ করা উচিত।

[e] যানবাহনের গতি হ্রাস করে এবং 'নন-স্টপ' রীতি চালু করে যানবাহন সৃষ্ট শব্দ-দূষণ হ্রাস করা যায়। এই প্রসঙ্গে সুনির্দিষ্ট আইন থাকা বাঞ্ছনীয়।

[f] হাসপাতাল, স্কুল-কলেজ, আদালত এবং অফিস চৌহদ্দি এবং সংলগ্ন অঞ্চলে শব্দ-উৎপাদন নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। এইসব অঞ্চলে গাড়ির হর্ন বা লাউড স্পিকারের মাধ্যমে শব্দ-দূষণকারীর কঠোর শাস্তির বিধান অত্যাবশ্যক।

[g] ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে আতশবাজির ব্যবহার নিষিদ্ধ করা উচিত এবং লাউড স্পিকার ব্যবহারের জন্য সময় এবং তীব্রতার মাত্রা নির্দিষ্ট করা উচিত।

[ii] প্রযুক্তিগত উপায়ে শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ

প্রযুক্তির বিকাশের দ্বারা শব্দ-দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। প্রযুক্তিগত উপায়ে যানবাহন, মেশিন বা যন্ত্রপাতি বা অন্যান্য শব্দ-উৎপন্নকারী যন্ত্রপাতি থেকে উৎপন্ন শব্দের তীব্রতা হ্রাস করা সম্ভব। নিম্নলিখিত উপায়ে শব্দ-দূষণ প্রতিরোধ বা হ্রাস করা সম্ভব।

[A] **শিল্প-কারখানায় শব্দ-দূষণ নিয়ন্ত্রণ :**

[a] **উৎসস্থলে শব্দ-দূষণ নিয়ন্ত্রণ :** কারখানা বা শিল্প সংস্থায় সুরবর্জিত শব্দ (নয়েজ) উৎপন্নকারী মেশিন বা যন্ত্রপাতি অপেক্ষাকৃত উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন এবং কম শব্দ উৎপন্নকারী মেশিন বা যন্ত্রপাতি দ্বারা প্রতিস্থাপিত (বদলী) করে উৎসস্থলে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

[b] **শব্দ প্রতিরোধক আচ্ছাদন ব্যবহার :** কারখানা বা শিল্পসংস্থায় সুরবর্জিত শব্দ উৎপন্নকারী মেশিন বা যন্ত্রপাতি শব্দ অপরিবাহী বা '**শব্দ অভেদ্য**' বস্তুর দ্বারা আচ্ছাদিত করে শব্দ দূষণ হ্রাস করা যায়।

[c] **শব্দ প্রতিরোধক ডিভাইস ব্যবহার :** শব্দদূষণ স্থলে শব্দ-প্রতিরোধক ডিভাইস (device), যথা 'ইয়ার-মাফ' (ear muff) (দস্তানাবিশেষ) এর ব্যবহার অনুপ্রাণিত করে শব্দ-দূষণের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা যায়। শব্দ প্রতিরোধক ডিভাইস—শ্রবণ প্রতিরক্ষা কৌশল (Hearing Protection Device) বা HPD নামেও পরিচিত। প্রধানত তিনধরণের HPD পাওয়া যায়—(a) ইয়ার প্লাগ (ear plugs) (b) ক্যানাল ক্যাপ (canal caps) এবং (c) ইয়ার মাফ (ear muff)। 'ইয়ার প্লাগ' কম স্পন্দন যুক্ত এবং 'ইয়ার মাফ' অধিক স্পন্দনযুক্ত শব্দের ক্ষেত্রে অধিক উপযোগী। শব্দের তীব্রতা 90 dB এর নীচে বজায় রাখতে (8 ঘণ্টা) HPD সাহায্য করে।

[d] **অ্যাকাসটিক জোনিং :** শিল্প-কারখানায় বায়ু বা কঠিন মাধ্যমে সুরবর্জিত শব্দের সঞ্চারণ প্রতিরোধক '**অ্যাকাসটিক-জোনিং**' (acoustic zoning) এর দ্বারা শব্দ-দূষণ প্রতিরোধ বা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

[B] **সামাজিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ :** বায়ু পরিবহন, স্থল-পরিবহন এবং নির্মাণ কার্য জনিত শব্দ দূষণ সামাজিক শব্দ-দূষণের অন্তর্ভুক্ত। প্রযুক্তিগত উপায়ে এই সামাজিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

[a] বায়ুযান চলাচলে উৎপন্ন শব্দের তীব্রতা-সীমা সম্বন্ধে একটি আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সীমা থাকা উচিত। বায়ুযান চলাচলের সময় সৃষ্ট শব্দ-দূষণ হ্রাস করার জন্য উন্নত প্রযুক্তি সম্পন্ন কম শব্দ উৎপন্নকারী ইঞ্জিনের উদ্ভাবন এবং ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সম্প্রতি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের—'ফেডারেল অ্যাভিয়েশান অ্যাডমিনিস্ট্রেশান' (Federal Aviation Administration) এয়ার ক্র্যাফট ইঞ্জিনের শব্দ-সীমা নির্ধারণ করেছে এবং এই শব্দ-সীমা (তীব্রতা এবং কম্পাঙ্ক) অনুসারে অপেক্ষাকৃত কম শব্দ-দূষণ সৃষ্টিকারী এয়ার ক্র্যাফট তৈরির প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

[b] স্থল পরিবহনজনিত শব্দ দূষণ খুবই বিরক্তিকর। স্থলযান (যথা বাস, লরি, কার মোটরচালিত দ্বি-চক্রযান) সৃষ্ট শব্দ দূষণ বিবিধ কারণে হলেও অপেক্ষাকৃত

পুরনো প্রযুক্তিসম্পন্ন ডিজেল ইঞ্জিনের ব্যবহারই শব্দ-দূষণের প্রধান কারণ (একঝসট নয়েজ, ইঞ্জিন ইনটেক নয়েজ প্রভৃতি)। এক্ষেত্রে কম শব্দ উৎপন্নকারী অত্যাধুনিক এবং উন্নত প্রযুক্তিসম্পন্ন ডিজেল ইঞ্জিনযুক্ত স্থলযান ব্যবহার করে শব্দ-দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

[iii] **ব্যক্তিগত (স্বকীয়) উপায়ে শব্দ-দূষণ নিয়ন্ত্রণ ঃ**

ব্যক্তিগত উপায়ে শব্দ-দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নিম্নলিখিত উপায়ে ঃ

[a] পেশাগত কাজে উৎপন্ন শব্দ **'শব্দ প্রতিরোধক ডিভাইস'** ব্যবহারের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

[b] স্বকীয় ক্রিয়াকলাপ যথা—ক্লিনিং, ওয়াশিং, টয়লেট ফ্লাশিং, গার্বেজ ডিসপোজাল, বিনোদনে ব্যবহৃত রেডিও, টি. ভি এবং সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবে ব্যবহৃত লাউড স্পিকার সৃষ্ট শব্দ-দূষণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। উপরিউক্ত স্বকীয় ক্রিয়াকলাপে শব্দ-দূষণকারী সুরবর্জিত শব্দের তীব্রতা মাত্রা (75dB-120dB) যথেষ্ট ক্ষতিকারক।

[c] বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে শহর এবং নগর রূপায়ণ করে শব্দ-দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে উপযুক্ত প্ল্যানিং এর ফলে সুরবর্জিত শব্দের সঞ্চারণ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

12.10. সারাংশ ঃ

- শব্দ একপ্রকার শক্তি। উৎস বস্তুর কম্পনে নিঃসৃত শক্তি পারিপার্শ্বিক মাধ্যমের মধ্য দিয়ে অনুদৈর্ঘ্য তরঙ্গরূপে বিস্তৃত হয়ে কর্ণপটহে আঘাত করলে যে অনুভূতির সৃষ্টি হয় তাকে **'শব্দ'** বলা হয়। শব্দ প্রধানত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত 'সুরযুক্ত শব্দ' এবং সুরবর্জিত শব্দ। **সুরবর্জিত শব্দই (নয়েজ) শব্দ দূষণ সৃষ্টি** করে।
- পরিবেশে (ভৌত মাধ্যমে) শ্রুতিসীমা বা সহনক্ষমতা বহির্ভূত অপেক্ষাকৃত উচ্চ-তীব্রতা এবং তীক্ষ্ণতা সম্পন্ন সুরবর্জিত শব্দের উপস্থিতিতে জীবপরিবেশ তথা মানুষের স্বাস্থ্যের উপর যে অসংশোধনযোগ্য ক্ষতিকর প্রভাব সৃষ্টি হয়, সেই পরিবেশ সংক্রান্ত ঘটনাকে **'শব্দ দূষণ'** বলা হয়।
- মনুষ্যসৃষ্ট কারণই শব্দদূষণ সৃষ্টি করে। পরিবহন, শিল্পপ্রক্রিয়া, যান্ত্রিক ক্রিয়া, কথোপকথন এবং অন্যান্য সামাজিক ক্রিয়াকলাপ হচ্ছে প্রধান মনুষ্য সৃষ্ট শব্দ দূষণের উৎস।
- মানুষের স্বাস্থ্যের উপর শব্দ-দূষণের প্রভাবকে দু-ভাগে ভাগ করা যায়—
  (a) **প্রত্যক্ষ প্রভাব**—শব্দের অধিক তীব্রতা এবং তীক্ষ্ণতায় শ্রুতি সহায়ক এবং শ্রুতি অঙ্গের অস্থায়ী বা স্থায়ী পরিবর্তনজনিত প্রভাব। এক্ষেত্রে মানুষের শ্রবণ ক্ষমতার হ্রাস, মাস্কিং এবং বধিরতা দেখা দিতে পারে। (b) পরোক্ষ

প্রভাব—শ্রবণতন্ত্র ব্যতিরেকে অন্যান্য শারীবৃত্তিয় তন্ত্র যথা ঃ নার্ভতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, হৃদ্‌সংবহনতন্ত্র এবং মস্তিষ্কের উপর শব্দ-দূষণের প্রভাব পড়ে। শব্দ-দূষণের প্রভাবে হৃদ্‌স্পন্দন হারের পরিবর্তন, হৃদ্‌উৎপাদ বৃদ্ধি, উচ্চ রক্তচাপ, হাইপারভেন্টিলেশান, হাইপোগ্লাইসেমিয়া, রাত্রিকালীন দৃষ্টিবিভ্রম, বর্ণ-অপ্রত্যক্ষকরণ, মাথাধরা, উত্তেজিতা, ঘুম-হ্রাস এবং মানসিক অবসাদ প্রভৃতি অস্বাভাবিক উপসর্গের সৃষ্টি হয়।

• অনুশীলনী •

A. রচনাভিত্তিক বা দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. শব্দ কি? সুরযুক্ত এবং সুরবর্জিত শব্দ কাকে বলে? সুরযুক্ত শব্দের বৈশিষ্ট্য বিবৃত কর। সুরযুক্ত এবং সুরবর্জিত শব্দ তরঙ্গের প্রকৃতি উল্লেখ কর।
2. শব্দ দূষণ কি? শব্দ দূষণের উৎস উল্লেখ কর। শব্দ দূষণের কারণ বর্ণনা কর।
3. সাধারণ শব্দের তীব্রতা পরিমাপক ডেসিবেল-স্কেল এবং শব্দানুভূতি বর্ণনা কর।
4. মানুষের স্বাস্থ্যের উপর শব্দদূষণের প্রভাব সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
5. মানুষের শ্রবণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
6. শব্দ-দূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

A. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

1. শব্দ কাকে বলে? শব্দ তরঙ্গ কি?
2. শব্দের উৎস এবং শ্রুতিসীমা উল্লেখ কর।
3. সুরযুক্ত এবং সুরবর্জিত শব্দ বলতে কি বোঝায়?
4. শব্দ দূষণ কাকে বলে?
5. সুরবর্জিত শব্দ বা নয়েজ বলতে কি বোঝায়?
6. শব্দের তীব্রতা এবং কম্পাঙ্ক কাকে বলে?
7. ডেসিবেল কি? শ্রবণানুভূতি সৃষ্টিকারী শব্দের ন্যূনতম তীব্রতা মাত্রা কত?
8. কক্‌লিয়া কি?
9. হৃদসংবহন তন্ত্রের উপর শব্দদূষণের প্রভাব উল্লেখ কর।
10. শব্দদূষণ নার্ভতন্ত্রের উপর কি রূপ প্রভাব বিস্তার করে?
11. সামাজিক শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণ বলতে কি বোঝায়?

13 আর্সেনিক ও পরিবেশ দূষণ

13.1. ভূমিকা (Introduction) ঃ

রসায়ন সম্পর্কে মানুষের কৌতূহল সৃষ্টির সময় থেকেই ঔষধ এবং বিষ হিসেবে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অজীব পরিবেশের উপাদান হওয়ার সুবাদে সর্বদাই স্বল্প পরিমাণ আর্সেনিক পরিবেশ থেকে জীবদেহে সংগৃহীত হয় এবং প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় জীবদেহ থেকে পুনরায় পরিবেশে ফিরে যায়। যেমন, উদ্ভিদ মৃত্তিকা এবং জল থেকে আর্সেনিক সংগ্রহ করে, আবার প্রাণী খাদ্য-শৃঙ্খলজনিত সম্পর্কের মাধ্যমে উদ্ভিদ এবং পানীয় জলের মাধ্যমে আর্সেনিক সংগ্রহ করে। সংগৃহীত আর্সেনিক উদ্ভিদ এবং প্রাণীদেহ থেকে জৈবিক প্রক্রিয়ায় পরিবেশে মুক্ত হয়। অধুনা মনুষ্যসৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক—উভয় কারণেই অজীব এবং জীব পরিবেশে আর্সেনিকের প্রাকৃতিক প্রবাহ বিঘ্নিত হচ্ছে, ফলে অজীব পরিবেশের বিশেষ অংশে আর্সেনিকের ঘনত্ব বাড়ছে। অজীব পরিবেশ থেকে জীবদেহে অধিক পরিমাণ আর্সেনিক প্রবেশের ফলে জীবদেহে আর্সেনিকের সঞ্চয় ক্রমশ বাড়ছে। আর্সেনিকের সঞ্চয়জনিত বিষক্রিয়ায় জীবজগতের অনভিপ্রেত পরিবর্তন ঘটছে।

আর্সেনিক সংক্রমণে মানুষ তথা জীব পরিবেশের অনভিপ্রেত পরিবর্তনকে 'আর্সেনিক দূষণ' বলা হয়। বিশ্বের সর্বত্র কম-বেশি আর্সেনিক দূষণের ঘটনা ঘটছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ও উত্তর 24 পরগনা জেলায় আর্সেনিক দূষণের প্রকোপ সবচেয়ে বেশি। পানীয় জলে প্রমাণ মাত্রার তুলনায় অধিক মাত্রায় আর্সেনিকের উপস্থিতিই মানুষের আর্সেনিক সংক্রমণের প্রধান কারণ।

13.2. আর্সেনিক আবিষ্কারের ক্রমইতিহাস ঃ

অতি প্রাচীনকাল থেকেই আর্সেনিকের মারণক্রিয়া সম্পর্কে সকলে পরিচিত। রসায়নের জন্মলগ্ন থেকে আর্সেনিকের প্রকৃতি এবং স্বরূপ আবিষ্কারের প্রয়াস শুরু হলেও প্রথমে আর্সেনিককে সীসা, টিন এবং অ্যান্টিমনি প্রভৃতি মৌলের রূপভেদ মনে করা হত। সীসা, টিন এবং অ্যান্টিমনি মৌলের সঙ্গে আর্সেনিকের নিবিড় সম্পর্কই এই বিভ্রান্তির অন্যতম কারণ ছিল। পরবর্তী কালে জানা গেছে প্রকৃতিতে খনিজ আকরিক রূপে আর্সেনিক উপস্থিত থাকে। আরব সাহিত্যে উল্লিখিত আর্সেনিকের এইরূপ একটি বিশুদ্ধ আকরিক হচ্ছে রিয়্যালগার (Realgar) (AsS)। এই সাহিত্যে উল্লিখিত উজ্জ্বল লাল বর্ণের বিশুদ্ধ অন্য একটি আর্সেনিক আকরিকের নাম **ওরপিমেন্ট** (Orpiment)। প্রাচীন ভারতে গৌতম বুদ্ধের সময়ও আর্সেনিক ব্যবহার হত। চরক-সংহিতায় (Charaka-Samhita) বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ চিকিৎসায় **অ্যালা বা হ্যারি টেলা** (orpiment) এবং **মানসশীলা** (realgar) নামক আর্সেনিক ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় (Bagachi, 1969)। সংস্কৃত, হিন্দি এবং বাংলা ভাষায় সাদা আর্সেনিকের বিভিন্ন নাম থেকেই আর্সেনিকের বহুল ব্যবহার এবং পরিচিতি সম্পর্কে ধারণা করা যেতে পারে। সাদা আর্সেনিক **হিন্দিতে স্যানবুল-খ্যার, স্যাম্ব্যাল-খ্যার, স্যাঙখিয়া, সংস্কৃতে স্যাঙ্খ এবং স্যাব্যালা** ; এবং বাংলায় **স্যাঙ্কা বা স্যাঙ্কো** নামে পরিচিত।

জার্মান অ্যালকেমিস্ট **অ্যালবার্টাস-ম্যাগনাস**, 1250 A. D.-তে সর্বপ্রথম মৌল আর্সেনিক আবিষ্কার করেন। **বার্থলটের** (Berthelot, 1893) মতে ধাতব আর্সেনিক সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন **জোসীমাস**, তৃতীয় এবং চতুর্থ শতকে। তিনি ধাতব আর্সেনিককে **'দ্বিতীয় পারদ'** নামে অভিহিত করেন। জোসীমাসের বর্ণনা অনুযায়ী দহনের সময় ধাতব আর্সেনিক থেকে শ্বেতবর্ণের অক্সাইড উৎপন্ন হয়। অষ্টম শতকে আরব-অ্যালকেমিস্ট **'জেবার'** সালফাইড যৌগ থেকে আর্সেনিক পৃথক করতে সমর্থ হন। মেয়ার (1975) এর অনুমান অনুযায়ী পশ্চিমের কোন এক অ্যালকেমিস্ট ত্রয়োদশ শতকে সর্বপ্রথম আর্সেনিক প্রস্তুত করেন। 1651 খ্রীস্টাব্দে ভ্যালেন্টাইন আর্সেনিককে অ্যান্টিমনির অনুরূপ 'বাস্টার্ড মেটাল (bastard metal) নামে অভিহিত করেন। 1675 খ্রীস্টাব্দে লেমেরী সাবান এবং পটাস সহযোগে আর্সেনিয়াস-অক্সাইডকে উত্তপ্ত করে **'রেগুলাস'** নামক ধাতব আর্সেনিক উৎপাদন করেন। 1755 খ্রীস্টাব্দে শীলী (Scheele) আর্সেনিক অ্যাসিড এবং আর্সেনিক-ইউরেটেড হাইড্রোজেন গ্যাস আবিষ্কার করেন। বার্জেলিয়াস আর্সেনিক এবং

সালফাইড যৌগগুলির মধ্যে 'স্টইচিওমেট্রিক্যাল-রিলেশান' অনুধাবন করেন। 1775 খ্রীস্টাব্দে সুইডিশ কেমিস্ট শীলী সর্বপ্রথম 'আর্সিন' (Arsine, AsH_3) গ্যাস আবিষ্কার করেন। 1815 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আর্সিন গ্যাসের প্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায়নি। এই গ্যাসের মারণ ক্রিয়া সম্পর্কে সম্যক জানা যায় 1815 খ্রীস্টাব্দে মিউনিখের রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক গ্যালেন (Gehlen) এর মৃত্যুর পরে। তিনি অতি স্বল্প পরিমাণ আর্সিন গ্যাসের শ্বাসগ্রহণে মারা যান। অষ্টাদশ শতকে অ্যালকেমি থেকে কেমিস্ট্রি (বা রসায়ন) সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয় এবং পরবর্তী সময়ে রসায়নের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আর্সেনিক সম্পর্কীয় পৌরাণিক কাহিনী দূরীভূত হয়। আর্সেনিকের বিভিন্ন যৌগ আবিষ্কৃত হয় এবং আর্সেনিকের ব্যবহার ও প্রয়োগের ক্ষেত্র বহুগুণ বৃদ্ধি পায়।

নাম	আণবিক সঙ্কেত	আবিষ্কারের বছর
ওরপিমেন্ট	As_2S_3	315 B. C.
রিয়্যালগার	AsS	315 B. C.
নিক্কোলাইট	NiAs	1694
ডোমিকাইট	Cu_3As	1827
আর্সেনোপাইরাইট	FeAsS	1546
কোবালাইট	CoAsS	1758

তালিকা 13.1 ঃ প্রকৃতিতে প্রাপ্ত কয়েকটি সাধারণ আর্সেনিক সমৃদ্ধ খনিজ আকরিক।

13.3. আর্সেনিকের উৎপাদন

গ্রীক-রোমান পিরিয়াডে রিয়্যালগার আকরিকের প্রধান উৎস ছিল প্যাফলাগনিয়া (মিশিয়ার পন্টাস জেলায়) এবং ক্যাপ্পাডোসিয়া, এবং ওরপিমেন্ট আকরিকের উৎস ছিল কারমিয়া। মধ্যযুগে ইউরোপে রপ্তানিকৃত ওরপিমেন্ট আকরিকের প্রধান উৎস ছিল এশিয়া। 1952 খ্রীস্টাব্দে সাইলেসিয়ায় সর্বপ্রথম আর্সেনিক ট্রাই-অক্সাইড থেকে (চারকোল দ্বারা বিজারিত করে) আর্সেনিক উৎপাদিত হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে উৎপাদিত আর্সেনিকের সঙ্গে অশুদ্ধি হিসেবে আর্সেনিক-ট্রাই-অক্সাইড উপস্থিত থাকত। পরবর্তী পর্যায়ে বার্টেনডর্ফ (1870) উপরিক্তউক্ত পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটিয়ে বিশুদ্ধ আর্সেনিক উৎপাদন করেন। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের পূর্বে সমগ্র বিশ্বে শ্বেত-আর্সেনিকের উৎপাদন ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে 10,000 টনে পৌঁছায়। কীটনাশকের ক্রমবর্ধমান চাহিদার কারণে 1920 খ্রীস্টাব্দে বিশ্বের মোট আর্সেনিক উৎপাদন বছরে 20,000 টনে পৌঁছায় এবং 1931 খ্রীস্টাব্দে এই উৎপাদন বেড়ে 45,000 টনে পৌঁছায়। 1960 খ্রীস্টাব্দে বছরে সমগ্র বিশ্বে শ্বেত-আর্সেনিকের উৎপাদন ছিল 62,000 হাজার টন। ক্রমবর্ধমান আর্সেনিক উৎপাদনের মূল কারণ শুধু পেস্টিসাইড ছিল না, উচ্চমাত্রায় ধাতু নিষ্কাশন—বিশেষ করে তামার উৎপাদন

আর্সেনিকের উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। বর্তমানে মোট উৎপাদিত আর্সেনিক-এর সিংহভাগ পাওয়া যায় তামা, সীসা, কোবাল্ট এবং স্বর্ণ আকরিকের উপজাত থেকে। উল্লেখ্য স্বর্ণ আকরিকে আর্সেনিকের পরিমাণ (সর্বোচ্চ 11 শতাংশ) সীসা ও তামার আকরিকের (2-3 শতাংশ) চেয়ে বেশি।

13.4. আর্সেনিকের ব্যবহার ঃ

13.4.1 প্রাচীনযুগে আর্সেনিক-এর ব্যবহার ঃ

(a) তাম্রযুগে বিভিন্ন সংকর ধাতুর উৎপাদনে, বিশেষ করে তামার সংকর ধাতুর উৎপাদনে আর্সেনিক ব্যবহার করা হত।

(b) ওরপিমেন্ট আর্সেনিক আকরিকের উজ্জ্বল হলুদবর্ণের জন্য বিভিন্ন রং-এর উপাদান হিসেবে ওরপিমেন্ট ব্যবহার করা হত। মধ্যযুগে পেইনটিং-এর কাজে হলুদ আর্সেনিক সালফাইডকে রঞ্জক হিসেবে ব্যবহার করা হত। মধ্যযুগে প্রসাধন বা গহনার উপকরণ হিসেবে বা চোখের রঞ্জনে (eye-paint) ব্যবহার করা হত।

(c) প্রাচীনকালে ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে বিশুদ্ধ ওরপিমেন্ট (Haritalam) শ্লেষ্মা, বিষ এবং অতিরিক্ত বায়ুর নিরাময়ে এবং প্রেত-আত্মার ভয়ের প্রতিকারে ব্যবহৃত হত। এছাড়া ঋতুবন্ধে, ক্ষুধাবৃদ্ধিতে এবং কুষ্ঠরোগ নিরাময়ে ওরপিমেন্ট ব্যবহার করা হত।

(d) ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে ঔষধ হিসেবে বিভিন্ন আর্সেনিক যৌগের প্রচলন ছিল। যেমন **পটাস আর্সেনেট** প্লেগের প্রতিকারে, অ্যাজমা এবং ব্রঙ্কাইটিস নিরাময়ে ব্যবহৃত হত। বিষ হিসেবে পরিচিতি থাকা সত্ত্বেও উনবিংশ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত রোগ নিরাময়ে আর্সেনিক যৌগের ব্যবহার সর্বজন-স্বীকৃত ছিল। **ফাউলার বর্ণিত দ্রবণ** (1% পটাসিয়াম আর্সেনেট, 1786 খ্রীস্টাব্দে আবিষ্কৃত) একশো পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হত। **ডোনোভান বর্ণিত দ্রবণ** (আর্সেনিক আয়োডাইড) এবং **ডি-ভ্যালাজিন বর্ণিত দ্রবণ** (আর্সেনিক-ট্রাই-ক্লোরাইড) বাতের যন্ত্রণায়, আর্থারাইটিসে, অ্যাজমায়, ট্রিপানোসোম সংক্রমণে, টিউবারকুলোসিসে এবং ডায়াবেটিসের নিরাময়ে ব্যবহার করা হত। 1940 খ্রীস্টাব্দে অ্যান্টিবায়োটিকের আবিষ্কারের পূর্বে সিফিলিস চিকিৎসার প্রধান ঔষধ ছিল স্যালভারসন (আর্সফেনামাইন)। এই স্যালভারসন আবিষ্কৃত হয় 1909 খ্রীস্টাব্দে।

(e) উনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন জৈব এবং অজৈব রং-এর প্রধান উপকরণ হিসেবে আর্সেনিকের বহুল ব্যবহার ছিল। যথা কিংস-ইয়ালো (As_2S_3), মিনারেল ব্লু (কপার পটাসিয়াম আর্সেনেট), স্কিলস্ গ্রীণ (CuH AsO_3), প্যারিস গ্রীণ [$Cu(AsO_2)_2Cu(C_2H_3O_3$] ইত্যাদি।

প্রাচীনকালে রং-এর উপাদান হিসেবে আর্সেনিক রঞ্জকের ব্যবহারে আর্সেনিক ঘটিত বিষক্রিয়ার উল্লেখ পাওয়া যায়। কৃত্রিম ফুল, পুতুল, ওয়াল-পেপার এবং র‍্যাপিং পেপারের

রঙে আর্সেনিক রঞ্জক ব্যবহার করা হত। এইসব রঙিন উপাদানের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সংক্রমণে মানুষের আর্সেনিক বিষক্রিয়া ঘটত। **অনেকের মতে আর্সেনিক বিষক্রিয়ার ফলে নেপোলিয়নের মৃত্যু ঘটেছিল (রিচার্ডসন 1974, জোন্স 1982)। ওয়াল-পেপারের সবুজ রঞ্জকে আর্সেনিকের উপস্থিতিই নেপোলিয়নের মৃত্যুর কারণ ছিল।**

13.4.2. **আর্সেনিক যৌগের আধুনিক ব্যবহার ঃ**

রসায়নের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গেই বিভিন্ন আর্সেনিক যৌগ আবিষ্কৃত হয় এবং আর্সেনিক যৌগের বিবিধ প্রয়োগ ঘটে। বিগত 150 বছরে কৃষিক্ষেত্রে, পশুপালনে, চিকিৎসা শাস্ত্রে, ইলেকট্রনিক্স শিল্পে এবং ধাতু নিষ্কাশনে আর্সেনিক যৌগের ব্যবহারিক জনপ্রিয়করণ ঘটেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর্সেনিক যৌগের আধুনিক ব্যবহার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

(a) **কৃষিকার্যে** : মোট ব্যবহৃত আর্সেনিকের 75% কৃষিকার্যে ব্যবহৃত হয়। 1860 খ্রীস্টাব্দ থেকে 1940 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ DDT এবং অন্যান্য অজৈব পেস্টিসাইডের আবির্ভাবের পূর্বে আর্সেনিকের বিভিন্ন অজৈব যৌগ কৃষিকার্যে প্রধান ইনসেকটিসাইড হিসেবে ব্যবহৃত হত। কৃষিকার্যে ইনসেকটিসাইড হিসেবে ব্যবহৃত অজৈব 'আর্সেনিক' যৌগগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে **মনোসোডিয়াম মিথাইল আর্সোনেট (MSMA), ডাইসোডিয়াম মিথাইল আর্সোনেট (DSMA), ডাইমিথাইল আর্সিনিক অ্যাসিড** (কেকোডাইলিক অ্যাসিড) এবং **আর্সেনিক অ্যাসিড**। প্রবল মতবিরোধ সত্ত্বেও এখনও আর্সেনিক অ্যাসিড কাঠ সংরক্ষণকর লবণ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া **মৃত্তিকা নির্বীজিতকরণে এবং জলজ আগাছা নিয়ন্ত্রণে সোডিয়াম আর্সেনাইট** দ্রবণ ব্যবহার করা হয়।

(b) **প্রাণী প্রতিপালনে ঃ** প্রাণী-খাদ্যে সংযোজক উপাদান রূপে, রোগ নিয়ন্ত্রণে (সোয়াইন ডিসেন্ট্রি, হার্টওর্ন ইনফেকশান) এবং অ্যালগিসাইড হিসেবে সোডিয়াম আর্সেনাইড ব্যবহৃত হয়।

(c) **চিকিৎসাশাস্ত্রে ঃ** আর্সেনিকের বিষক্রিয়া সত্ত্বেও এখনোও কয়েকটি উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে চিকিৎসায় আর্সেনিক যৌগ ব্যবহৃত হয়। অ্যান্টিসিফিলিটিক ড্রাগ হিসেবে ; ট্রিপানোসোমিয়াসিস, অ্যামিবিয়াসিস এবং স্লিপিং সিকনেসের চিকিৎসায় আর্সেনিক ব্যবহার করা হয়।

(d) **ধাতু উৎপাদনে ঃ** সীসা এবং তামার সংকর ধাতু উৎপাদনে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়। অ্যাসিড ব্যাটারির সীসা-অ্যান্টিমনি (সংকর) ধাতব প্লেট তৈরিতেও স্বল্প পরিমাণ আর্সেনিকের প্রয়োজন হয়। অটোমোটিভ বডি সোল্ডার এবং রেডিয়েটার উৎপাদনে আর্সেনিক (0.5%) ব্যবহার করা হয়।

(e) **ইলেকট্রনিক্স শিল্পে ঃ** বিশুদ্ধ আর্সেনিক (99.999%) ধাতু ইলেকট্রনিক্স শিল্পে ব্যবহৃত হয়। সেমিকন্ডাক্টর যৌগ গ্যালিয়াম বা ইন্ডিয়াম আর্সেনাইডের উপাদান হিসেবে আর্সেনিকের ব্যবহার সর্বজনবিদিত। আলোক নিঃসরণকারী ডায়োড,

সোলার সেল, টানেল ডায়োড, ইনফ্রারেড ইমিটারস প্রভৃতি উৎপাদনে গ্যালিয়াম আর্সেনাইড এবং হল ইফেক্ট, ইনফ্রারেড ডিভাইস ও এক্সপিরিমেন্টাল লেসার উৎপাদনে ইন্ডিয়াম আর্সেনাইড ব্যবহৃত হয়।

ক্ষেত্র	ব্যবহার
কৃষি	ঃ পেস্টিসাইড, ইনসেকটিসাইড, কাঠ সংরক্ষণ, মৃত্তিকা নির্বীজিতকরণ।
চিকিৎসা	ঃ অ্যান্টিসিফিলিটিক ড্রাগ ; ট্রিপানোসোমিয়াসিস, অ্যামিবিয়াসিস এবং স্লিপিং সিকনেসের চিকিৎসা।
প্রাণী প্রতিপালনে	ঃ খাদ্যে সংযোজিত বস্তু, অ্যালগিসাইড, রোগ নিরাময়।
ইলেকট্রনিক্স	ঃ সোলার সেল, সেমিকন্ডাক্টর, অপ্টোইলেকট্রনিক ডিভাইস।
শিল্প	ঃ ফার্মাসিউটিক্যাল উপাদান, সিরামিক্স, সাবান, রঞ্জক, ক্যাটালিস্ট, গ্লাসওয়্যার, ইলেকট্রোফটোগ্রাফী।
মেটালার্জি	ঃ অ্যালয় (অটোমোটিভ বডি সোল্ডার এবং রেডিয়েটার), ব্যাটারির প্লেট।

তালিকা 13.2 ঃ আর্সেনিক যৌগের মুখ্য আধুনিক ব্যবহার উল্লেখ করা হয়েছে।

13.5. মৃত্তিকায় আর্সেনিকের বন্টন এবং বাস্তুতন্ত্রের উপর আর্সেনিকের প্রভাব ঃ

স্বল্প পরিমাণে আর্সেনিক প্রকৃতিতে সর্বদা উপস্থিত থাকে। মৃত্তিকায় বন্টিত স্বল্প পরিমাণ আর্সেনিকের অধিকাংশই লৌহ বা নিকেল এবং সালফারের যৌগ হিসেবে উপস্থিত থাকে। মৃত্তিকায় উপস্থিত আর্সেনিকের প্রধান উৎস মৃত্তিকা সৃষ্টিকারী জনিতৃ শিলা। এছাড়া মনুষ্য সৃষ্ট উৎস যথা শিল্পের বর্জ্য পদার্থ বা কৃষিকার্যে ব্যবহৃত আর্সেনিক্যাল পেস্টিসাইড মৃত্তিকার আর্সেনিকের মাত্রা বৃদ্ধি করে। মৃত্তিকায় আর্সেনিকের স্বাভাবিক সংযুতি মাত্রা হচ্ছে 5ppm বা 6ppm। মনুষ্য ক্রিয়ার দ্বারা সংক্রমিত মৃত্তিকায় আর্সেনিকের মাত্রা উপরিউক্ত মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি। মৃত্তিকা মানুষের একটি অতীব উপকারী প্রাকৃতিক সম্পদ হলেও আর্সেনিক এবং অন্যান্য টক্সিক পদার্থের সঞ্চয়, রূপান্তর এবং বিস্তারে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। পেস্টিসাইড, হার্বিসাইড এবং ফাংগিসাইড হিসেবে আর্সেনিক যৌগের অধিক ব্যবহারে মৃত্তিকায় আর্সেনিকের স্বাভাবিক মাত্রা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। মৃত্তিকাস্থ আর্সেনিক উদ্ভিদের উপর বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে বা উদ্ভিদের পাতা, ফল, মূল প্রভৃতিতে সঞ্চিত থাকে। ফলে উদ্ভিদে সঞ্চিত আর্সেনিক প্রাণী এবং মানুষের খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করে। এইভাবে সমগ্র বাস্তুতন্ত্র আর্সেনিক দ্বারা সংক্রমিত হয় এবং ফলস্বরূপ বাস্তুতন্ত্রের অনভিপ্রেত পরিবর্তন ঘটে।

13.5.1. **মৃত্তিকাস্থ আর্সেনিকের উৎস ঃ**

(a) **প্রাকৃতিক উৎস ঃ** পাললিক শিলা, গ্রানাইট শিলা, ব্যেসল্ট শিলা এবং অন্যান্য জনিতৃ শিলার জলবায়ুকরণ এবং জৈব পদার্থের সংমিশ্রণে মৃত্তিকার সৃষ্টি হয়। শিলার ম্যাগমাটিক সালফাইডে এবং লৌহ আকরিকে আর্সেনিক সঞ্চিত থাকার ফলে মৃত্তিকা সৃষ্টির সময় আর্সেনিক মৃত্তিকায় সংক্রমিত হতে পারে। সালফাইড আকরিকের উল্লেখযোগ্য আর্সেনিক আকরিকগুলি হচ্ছে **আর্সেনিকের পাইরাইট, রিয়্যালগার** এবং **ওরপিমেন্ট**। আর্সেনিক সমৃদ্ধ মৃত্তিকায় আর্সেনিকের মাত্রা স্বাভাবিক মৃত্তিকার তুলনায় বহুগুণ বেশি থাকে। মৃত্তিকায় আর্সেনিকের মাত্রা মৃত্তিকা সৃষ্টিকারী জনিতৃ শিলার প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। যথা—গ্রানাইট শিলা থেকে উৎপন্ন মৃত্তিকার আর্সেনিকের মাত্রা ব্যেসল্ট শিলা থেকে উৎপন্ন মৃত্তিকার তুলনায় কম থাকে।

(b) **মনুষ্য সৃষ্ট উৎস ঃ** মনুষ্য ক্রিয়াকলাপও মৃত্তিকাস্থ আর্সেনিকের একটি উৎস। আর্সেনিক্যাল পেস্টিসাইডের ব্যবহার, আর্সেনিকঘটিত রাসায়নিক সারের প্রয়োগ, সেচ, জীবাশ্ম জ্বালানির দহনের ফলে সৃষ্ট ধূলিকণার অধঃক্ষেপণ এবং শিল্প ও প্রাণীজ বর্জ্যপদার্থের নিক্ষেপ জনিত কারণে মৃত্তিকায় আর্সেনিক সঞ্চিত হয় এবং কালক্রমে মৃত্তিকায় আর্সেনিকের প্রচলন বিস্তার ঘটে। মনুষ্য সৃষ্ট উপায়ে মৃত্তিকায় বন্টিত আর্সেনিকের মাত্রা মনুষ্য ক্রিয়াকলাপের তীব্রতা, দূষণের উৎস থেকে মৃত্তিকার দূরত্ব এবং পলিউট্যান্ট বিস্তারণের পদ্ধতির উপর নির্ভর করে।

13.5.2 **মৃত্তিকায় আর্সেনিকের গড় সংযুতি মাত্রা ঃ**

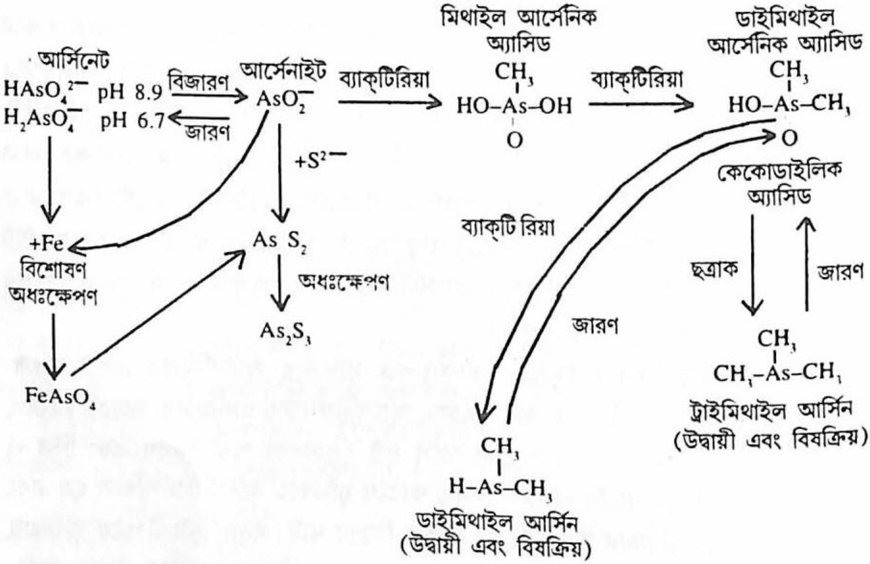
মৃত্তিকায় আর্সেনিকের গড় ঘনত্ব 7.2ppm। মৃত্তিকায় আর্সেনিকের গড় মাত্রা উপরিউক্ত মাত্রার বেশি হলেই আর্সেনিক দ্বারা মৃত্তিকা দূষিত হয়। মৃত্তিকার গুণমান নির্ধারণে আর্সেনিকের মাত্রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

13.5.3. **মৃত্তিকাস্থ আর্সেনিক-এর প্রকারভেদ ঃ**

আর্সেনিক অজৈব এবং জৈব উভয় আকারেই মৃত্তিকায় উপস্থিত থাকে। মৃত্তিকাস্থ আর্সেনিক মূলত অজৈব আকারে থাকলেও কিছু পরিমাণ আর্সেনিক জৈব পদার্থের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকে। এছাড়া কিছু অজৈব আর্সেনিক মৃত্তিকাস্থ জীবাণু দ্বারাও জৈব আর্সেনিকে রূপান্তরিত হতে পারে। যে সমস্ত খনিজ আর্সেনিক মৃত্তিকায় পাওয়া যায় সেগুলি হচ্ছে **সালফাইড** (রিয়্যালগার As_4S_4, ওরপিমেন্ট As_2S_3), **অক্সাইডস** (আর্সেনোলাইট, As_2O_3) ; **আর্সেনাইটস্** (মিসপিকেল, FeAsS ; নিকেল গ্লান্স, NiAsS; নিকোলাইট NiAs) এবং **আর্সেনেটস্** (ফার্মাকোলাইট $CaHAsO_4 . 2H_2O$; ইরাইথ্রাইট, $CO_3(AsO_4)8H_2O$)।

আর্সেনিক যৌগের জলীয় দ্রাব্যতা মৃত্তিকার প্রকৃতি, pH এবং আর্সেনিকের রেডক্স-

পোটেনসিয়ালের উপর নির্ভর করে। মৃত্তিকার রেডক্স পোটেনসিয়াল এবং pH কম হলে মৃত্তিকায় দ্রবীভূত আর্সেনিকের পরিমাণ বাড়ে। আবার মৃত্তিকায় কাদামৃত্তিকা কণার পরিমাণ



চিত্র 13.1 ঃ মৃত্তিকাস্থ আর্সেনিকের রাসায়নিক গঠন এবং রূপান্তর দেখানো হয়েছে।

কম হলে মৃত্তিকায় দ্রাব্য আর্সেনিকের পরিমাণ বাড়ে এবং কাদামৃত্তিকা কণার পরিমাণ বেশি হলে দ্রবীভূত আর্সেনিকের পরিমাণ কমে যায়। আর্সেনিক যৌগে অ্যালুমিনিয়াম এবং লৌহের উপস্থিতিতে আর্সেনিকের জলীয় দ্রাব্যতা হ্রাস পায়।

13.5.4. **মৃত্তিকাস্থ গ্যাসীয় আর্সেনিক ঃ**

দেখা গেছে যে, মৃত্তিকায় বসবাসকারী ছত্রাক, ঈষ্ট এবং ব্যাক্‌টিরিয়া মৃত্তিকাস্থ কিছু পরিমাণ আর্সেনিককে মিথাইলেশানের মাধ্যমে গ্যাসীয় আর্সেনিকে রূপান্তরিত করতে পারে। এই গ্যাসীয় আর্সেনিক উদ্ভিদের উপর টক্সিক প্রভাব বিস্তার করে। পেস্টিসাইড হিসেবে ব্যবহৃত এবং মৃত্তিকায় সঞ্চিত একাধিক আর্সেনিক যৌগ জীবাণু দ্বারা বিজারিত হয়ে টক্সিক এবং উদ্বায়ী গ্যাসে রূপান্তরিত হয়। যেমন—হার্বিসাইড হিসেবে ব্যবহৃত মনোমিথাইল আর্সেনিক অ্যাসিড (MMAA) এবং ডাইমিথাইল আর্সেনিক অ্যাসিড (DMAA) আণুবীক্ষণিক জীবের দ্বারা বিজারিত হয়ে টক্সিক এবং উদ্বায়ী আর্সিন গ্যাস উৎপন্ন করে। মৃত্তিকাস্থ আর্সিন গ্যাস বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মৃত্তিকায় ব্যাপিত হয় এবং উদ্ভিদের উপর টক্সিক প্রভাব বিস্তার করে।

13.5.5. **মৃত্তিকাস্থ আর্সেনিক এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্ক ঃ**

উদ্ভিদের বৃদ্ধি মৃত্তিকাস্থ আর্সেনিকের উপস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হয়। কারণ আর্সেনিক

উদ্ভিদের উপর টক্সিক প্রভাব বিস্তার করে। আর্সেনিক যৌগের প্রকৃতি, প্রকার এবং সহজলভ্যতার উপর আর্সেনিক টক্সিসিটি নির্ভর করে। আর্সেনিকের টক্সিসিটি আর্সেনিক যৌগের যোজ্যতার উপরও নির্ভর করে। টক্সিসিটির উচ্চ ক্রমানুসারে যৌগগুলি হচ্ছে AsH_3 >As (III) > As (V)> জৈব As। মৃত্তিকাস্থ আর্সেনিকের চরম ঘনত্বের উপরও টক্সিসিটি নির্ভর করে। যেমন 1ppm আর্সেনিক মটর গাছের ক্ষতি করে, 7ppm আর্সেনিক ধান গাছের ক্ষতি করে, এবং 2ppm বার্লির ক্ষতি করে। তুলা এবং সয়াবিনের কোষীয় আর্সেনিকের ঘনত্ব জীব-পুঞ্জীভবনের ফলে 44 এবং 1ppm পৌঁছালে তুলা এবং সয়াবিনের উৎপাদন হ্রাস পায়।

13.5.6. প্রাকৃতিক মৃত্তিকায় আর্সেনিকের ঘনত্ব ঃ

মৃত্তিকার বিজারক পরিবেশে অধিকাংশ আর্সেনিক আর্সেনাইটরূপে এবং খুব কম পরিমাণ আর্সেনিক আর্সিন এবং মৌল আর্সেনিকরূপে উপস্থিত থাকে। উত্তম জল নিষ্কাশনযুক্ত আম্লিক মৃত্তিকায় আর্সেনিক $H_2AsO^{1-}_4$রূপে এবং ক্ষারীয় মৃত্তিকায় $HAs_2O^{2-}_4$ রূপে উপস্থিত থাকে। অসংক্রমিত প্রাকৃতিক মৃত্তিকায় আর্সেনিকের ঘনত্বের মধ্যে তারতম্য দেখা যায়। প্রাকৃতিক মৃত্তিকায় আর্সেনিকের ঘনত্ব মৃত্তিকা উৎপাদনকারী জনিতৃ শিলার প্রকৃতি এবং ভূ-তাপীয় ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। আবার বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক মৃত্তিকায় আর্সেনিকের ঘনত্ব ভিন্ন হয়, যথা—অস্ট্রিয়ায় প্রতিকেজি প্রাকৃতিক মৃত্তিকায় 5-6mg, নেদারল্যান্ডে এবং কানাডায় প্রতিকেজি মৃত্তিকায় সর্বোচ্চ 11mg আর্সেনিক থাকে। চুনাপাথর সমৃদ্ধ মৃত্তিকায় আর্সেনিকের পরিমাণ চুনাপাথরবিহীন মৃত্তিকার তুলনায় বেশি থাকে। কারণ ক্যালসিয়াম আর্সেনিক সমৃদ্ধ মৃত্তিকার জলে সহজেই দ্রবীভূত হয়ে মৃত্তিকায় আর্সেনিকের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে। মৃত্তিকাস্থ বায়ুর পরিমাণ এবং মৃত্তিকার গভীরতার উপরেও আর্সেনিকের ঘনত্ব নির্ভর করে। অবায়বীয় মৃত্তিকায় As(III)-র ঘনত্ব বেশি থাকে, কিন্তু বায়বীয় মৃত্তিকায় As(V)-র ঘনত্ব বেশি থাকে। কারণ বায়ুর উপস্থিতিতে As(III), As(V)-এ জারিত হয়। অধিক ভূ-তাপীয় অঞ্চলের মৃত্তিকায় আর্সেনিকের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে।

13.5.7. মৃত্তিকাস্থ আর্সেনিকের প্রজাতি ঃ

মৃত্তিকাস্থ অজৈব এবং জৈব আর্সেনিকের তিন ধরনের প্রজাতি দেখা যায়।

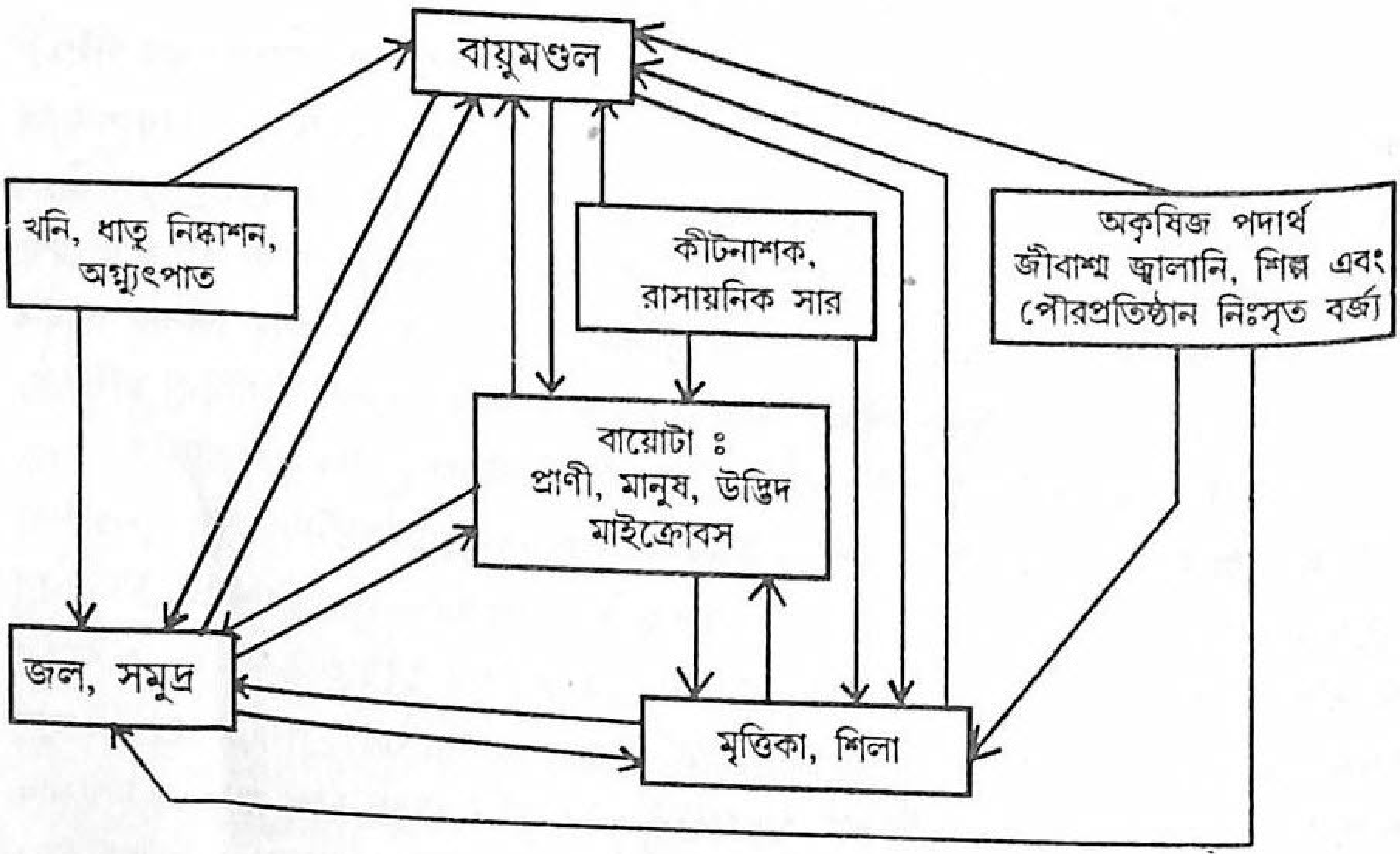
a) **আর্সেনিক (III)** ঃ অজৈব আর্সেনিকের বিজারিত অবস্থাকে আর্সেনাইট [As(III)] বলা হয়। এই আর্সেনাইট অতি-বিষক্রিয়, দ্রাব্য এবং প্রচরণ ক্ষমতা সম্পন্ন। আর্সেনাইট প্রাকৃতিক পরিবেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর একটি দূষক।

b) **আর্সেনিক (V)** ঃ অজৈব আর্সেনিকের জারিত অবস্থা আর্সেনেট [As(V)] নামে পরিচিত। এই আর্সেনেট কাদাকণা, বিশেষ করে কেওলাইনাইট এবং **মন্টমরিলোনাইট** কণার গাত্রে বিশোষিত হয়। আর্সেনেটের বিষক্রিয়া আর্সিনাইট অপেক্ষা অনেক কম।

c) **জৈব আর্সেনিক ঃ** প্রায় সব ধরনের মৃত্তিকায় জৈব আর্সেনিক উপস্থিত থাকে। উদ্বায়ী আর্সেনিক যৌগ, **ডাইমিথাইল আর্সেনিক অ্যাসিড** (কেকোডাইলিক অ্যাসিড) প্রধান জৈব আর্সেনিকরূপে সর্বদা মৃত্তিকায় উপস্থিত থাকে।

13.6. আর্সেনিক চক্র (Arsenic Cycle) ঃ

1967-1979 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বিভিন্ন বিজ্ঞানী আর্সেনিক চক্রকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত করেছেন (Frost, Ferguson and Gavis, 1972; Wood, 1974; Levander, 1977; Mackinzie, 1979)। এইসকল আর্সেনিক চক্রের বিভিন্ন অংশকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি বোধগম্য আর্সেনিক চক্র চিত্রিত করা হল। এই চক্রের প্রধান উপাদানগুলি হচ্ছে বায়ু



চিত্র 13.2 ঃ আর্সেনিক চক্র দেখানো হয়েছে।

(উদ্বায়ী), খনি পদ্ধতি এবং ধাতু নিষ্কাশন, বায়োটা (প্রাণী, উদ্ভিদ, মানুষ, মাইক্রোবস); কীটনাশক এবং রাসায়নিক সার; জল এবং সমুদ্র ; মৃত্তিকা ; শিলা এবং অকৃষিজ পদার্থ (জীবাশ্ম জ্বালানি, শিল্প এবং পৌর প্রতিষ্ঠান নিঃসৃত বর্জ্য)।

13.7. পরিবেশে আর্সেনিকের উৎস ঃ

আর্সেনিক হচ্ছে পৃথিবীর ভূত্বকের সর্বত্র বিদ্যমান একটি মৌল। 1250 A. D.-তে অ্যালবারটাস ম্যাগনাস কর্তৃক আবিষ্কারের পর থেকেই আর্সেনিক মানব ইতিহাসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কৃষিতে কীটনাশক ও আগাছানাশক হিসেবে ; চিকিৎসায়, ইলেকট্রনিক্স ও অন্যান্য শিল্পে এবং মেটালার্জিতে আর্সেনিকের ব্যবহার সর্বজনবিদিত। অধুনা প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট কারণে পরিবেশে আর্সেনিকের ঘনত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মানব খাদ্য-শৃঙ্খলে আর্সেনিকের অনুপ্রবেশ ঘটছে। এই ঘটনা মানুষকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে।

খাদ্য-শৃঙ্খলজনিত জীব-বিবর্ধন, আর্সেনিক সংক্রমিত মৃত্তিকায় জাত উদ্ভিদ এবং আর্সেনিক সংক্রমিত বহির্ভাগপৃষ্ঠীয় ও ভূগর্ভ জলের মাধ্যমে আর্সেনিক মানুষের শরীরে প্রবেশ করছে। এইভাবে মানুষের শরীরে আর্সেনিকের ক্রমসঞ্চয়ে আর্সেনিকের বিষক্রিয়া সৃষ্টি হচ্ছে। এই অংশে আর্সেনিকের বিভিন্ন পরিবেশগত উৎস সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

13.7.1. **প্রাকৃতিক উৎস** (Natural Sources) ঃ

a) **শিলা ঃ** পরিবেশে প্রাপ্ত মোট আর্সেনিকের 99%-এর বেশি মৃত্তিকা উৎপাদনকারী শিলায় উপস্থিত থাকে। জনিতৃ শিলায় কত পরিমাণে আর্সেনিক থাকবে তা নির্ভর করে শিলার প্রকৃতির উপর। ইগ্নিয়াস বা রূপান্তরিত শিলার তুলনায় পাললিক শিলায় (Sedimentary rocks) আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি থাকে। ইগ্নিয়াস, লাইম স্টোন এবং স্যান্ড স্টোনে আর্সেনিকের গড় ঘনত্ব থাকে যথাক্রমে—1.5, 2.6 এবং 4.4 ppm।

b) **মৃত্তিকা, বায়োটা এবং বায়ুমণ্ডল ঃ** শিলা ব্যতীত আর্সেনিকের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক ভাণ্ডার হচ্ছে মৃত্তিকা, সমুদ্র, বায়োটা (উদ্ভিদ, প্রাণী, মানুষ এবং মাইক্রোবস) এবং বায়ুমণ্ডল। মৃত্তিকা এবং সমুদ্রে সঞ্চিত আর্সেনিকের পরিমাণ বায়োটা এবং বায়ুমণ্ডলের তুলনায় অনেক বেশি। সমগ্র বিশ্বে মৃত্তিকার গড় আর্সেনিক ঘনত্ব হচ্ছে 7.2 ppm। আর্সেনিক অসংক্রমিত মৃত্তিকায়, অর্থাৎ প্রাকৃতিক মৃত্তিকার স্বাভাবিক আর্সেনিক ঘনত্ব 5.6 mg/kg। কিন্তু এই ঘনত্ব ভৌগোলিক অঞ্চল ভেদে ভিন্ন হতে পারে। সালফাইড আকরিক সমৃদ্ধ মৃত্তিকায় আর্সেনিকের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি (8000 mg, As/kg)। সালফারের সঙ্গে আর্সেনিকের সংস্রব থাকার জন্য কাদা, গ্যাস, ভূগর্ভ জল এবং মৃত্তিকায় আর্সেনিকের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত বেশি।

ভাণ্ডার	মৃত্তিকার সাপেক্ষে অনুপাত
শিলা	25,000
সমুদ্র	4
মৃত্তিকা	1
বায়োটা (উদ্ভিদ, মানুষ, মাইক্রোবস)	0.0005
বায়ুমণ্ডল	0.000001

তালিকা 13.3 ঃ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ভাণ্ডারে মৃত্তিকার সাপেক্ষে আর্সেনিকের ঘনত্ব দেখানো হয়েছে।

13.7.2. **মনুষ্য সৃষ্ট উৎস** (Anthropogenic Sources) ঃ

a) **খনি প্রক্রিয়া এবং ধাতু নিষ্কাশন ঃ** তামা, সোনা, সীসা এবং দস্তার আকরিকের সঙ্গে প্রাকৃতিক সংক্রামক হিসেবে আর্সেনিক উপস্থিত থাকে। এইসব ধাতুর

আকরিকের খনি উত্তোলন ক্রিয়ায় এবং ধাতব আকরিক থেকে ধাতু নিষ্কাশনের সময় আর্সেনিক পরিবেশে মুক্ত হয়। ধাতু নিষ্কাশন কারখানায় স্ট্যাগডাস্ট এবং অধঃক্ষেপণ প্রক্রিয়ায় নির্গত ফ্লু-গ্যাসের দ্বারা মৃত্তিকায় আর্সেনিক সংক্রমিত হয়।

b) **পেস্টিসাইডের ব্যবহার ঃ** অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ফল চাষের কাজে বিভিন্ন অজৈব আর্সেনিক্যালস্ যথা—লেড (সীসা), ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং জিঙ্ক (দস্তা) আর্সেনেট, জিঙ্ক আর্সেনাইট বা প্যারিস গ্রীণ (অ্যাসিটো আর্সেনাইট) ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হত। হার্বিসাইড এবং মৃত্তিকার নির্বীজিত কারক হিসেবেও **সোডিয়াম আর্সেনাইট** ব্যবহৃত হত। এছাড়া সিলভিসাইড, হার্বিসাইড এবং ডেসিক্যান্ট হিসেবে **জৈব আর্সেনিক্যালস্** দীর্ঘদিন ব্যবহার করা হত। ইতোমধ্যেই বহু আর্সেনিক ঘটিত যৌগের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে। বর্তমানে **ডাইসোডিয়াম মিথেন আর্সেনিক অ্যাসিড** (DSMA), **মনোসোডিয়াম মিথেন আর্সোনেট** (MSMA), **আর্সেনিক অ্যাসিড** এবং **কেকোডাইলিক অ্যাসিড** (CA)-এর ব্যবহার নিষিদ্ধ হতে চলেছে। কারণ এইসব আর্সেনিক ঘটিত পেস্টিসাইড যৌগের উদ্বৃত্ত অংশ মৃত্তিকাকে সংক্রামিত করে। মৃত্তিকায় উপস্থিত কতিপয় পেস্টিসাইড-যৌগ জীবাণু দ্বারা জৈব আর্সেনিকে রূপান্তরিত হয়। উদ্ভিদ মৃত্তিকার জৈব এবং অজৈব আর্সেনিক সংগ্রহ করে। ফলে উদ্ভিদ দেহে জীবপুঞ্জীভূত আর্সেনিক উদ্ভিদের প্রাণ-প্রক্রিয়ায় বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে। উদ্ভিদের মাধ্যমে আর্সেনিক মানব খাদ্যশৃঙ্খলে প্রবেশ করে।

c) **কয়লা ঃ** আর্সেনিক আর্সেনো-পাইরাইট রূপে কয়লায় উপস্থিত থাকে। কয়লায় উপস্থিত আর্সেনিকের পরিমাণ 1mg/kg-র কম থেকে 90mg/kg-র বেশি হতে পারে। প্রকাশিত তথ্য অনুসারে চেকোশ্লোভাকিয়ায় বাদামি কয়লায় আর্সেনিকের পরিমাণ থাকে সর্বোচ্চ 1500 mg/kg। খনি থেকে কয়লা উত্তোলনের সময় বা থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং রেলগাড়ির ইঞ্জিনে কয়লার দহনের ফলে আর্সেনিক পরিবেশে মুক্ত হয়।

d) **কয়লা দহনের উপজাত ঃ** থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্টে কয়লার দহনের ফলে যে ফ্লাই-অ্যাশ (Fly-ash) নির্গত হয় তাতে আর্সেনিক সংযুক্ত থাকে এবং ফ্লাই-অ্যাশের মাধ্যমে আর্সেনিক মৃত্তিকায় সংক্রমিত হয়। দেখা গেছে, প্রতি কিলোগ্রাম ফ্লাই-অ্যাশে আর্সেনিক উপস্থিত থাকে সর্বোচ্চ 6300mg। কয়লায় উপস্থিত +3 এবং +5 যোজ্যতা সম্পন্ন আর্সেনিকের দহনের সময় আর্সেনিক সরাসরি গ্যাসীয় আকারে বায়ুমণ্ডলে মুক্ত হয়। দহনের পরবর্তী পর্যায়ে শীতলিকরণের সময় গ্যাসীয় আর্সেনিক ঘনীভূত হয়ে ফ্লাই-অ্যাশ কণার গায়ে সঞ্চিত হয়। আর্সেনিক সম্পন্ন ফ্লাই-অ্যাশ কণার ভূপৃষ্ঠে অধঃক্ষেপণের ফলে আর্সেনিক মৃত্তিকা এবং জলে সংক্রমিত হয়।

e) **নর্দমার আবর্জনা বা ড্রেনের ময়লা ঃ** রাস্তার নর্দমায় নিষ্কাশিত আবর্জনা বা ড্রেনের ময়লায় অনেক সময় আর্সেনিক উপস্থিত থাকে।

13.8. আর্সেনিকের দ্বারা ভূগর্ভ জলের সংক্রমণ ঃ

মৃত্তিকাস্থ আর্সেনিক অধিকতর প্রচরণ ক্ষমতা সম্পন্ন। আর্সেনিকের প্রচরণ ক্ষমতা হ্রাস পায় মৃত্তিকার আর্সেনিক ধারণ ক্ষমতার বৃদ্ধি এবং বায়োটা কর্তৃক আর্সেনিকের সঞ্চয়ের ফলে। মৃত্তিকা কণার গায়ে আর্সেনিকের বিশোষণের ফলে মৃত্তিকায় আর্সেনিক সঞ্চিত থাকতে পারে। কিন্তু আর্সেনিকের এই বিশোষণ মৃত্তিকার লৌহ বা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের উপস্থিতির উপর নির্ভর করে। লৌহ বা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড আদৌ না থাকলে বা কম থাকলে এবং বায়োটার সংখ্যা কম হলে মৃত্তিকা যথেষ্ট পরিমাণে আর্সেনিক ধরে রাখতে পারে না, ফলে আর্সেনিক মৃত্তিকা স্তরের মধ্য দিয়ে ভূ-গর্ভে প্রচরিত হয়। অবশেষে আর্সেনিক ভূগর্ভ জলের সংস্পর্শে আসে। এইভাবে মৃত্তিকাস্থ আর্সেনিক ভূগর্ভ জলে সংক্রমিত হতে পারে। এছাড়া প্রাকৃতিক কারণেও ভূগর্ভের জল আর্সেনিকের দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। আর্সেনিক সমৃদ্ধ পাললিক, ব্যেসল্ট এবং গ্রানাইট শিলাস্তরের সংস্পর্শে বা আর্সেনিকের খনিজ আকরিকের সংস্পর্শে ভূগর্ভ জল আর্সেনিক দ্বারা সংক্রমিত হয়।

13.8.1. **আর্সেনিক এবং উদ্ভিদ ঃ** মৃত্তিকায় আর্সেনিক সঞ্চয়ে উদ্ভিদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। আর্সেনিকের রাসায়নিক প্রকৃতি উদ্ভিদের অত্যাবশ্যকীয় পরিপোষক ফসফরাসের অনুরূপ। এই কারণে আর্সেনিক সংক্রমিত মৃত্তিকা থেকে আর্সেনিক সহজেই উদ্ভিদে শোষিত হয়। শোষিত আর্সেনিক উদ্ভিদ কোষে ফসফরাস সংঘটিত বিপাক ক্রিয়াকে বাধা দেয়। ফলে উদ্ভিদদেহে আর্সেনিক সংশ্লিষ্ট অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। এই ঘটনা **আর্সেনিক বিষক্রিয়া** নামে পরিচিত।

13.8.2. আর্সেনিক সংশ্লিষ্ট পানীয় জলের গুণমান ঃ

a) **পানীয় জলের আর্সেনিক সংক্রমণ ঃ** অধুনা সংঘটিত আর্সেনিক দূষণ সমস্যার প্রধান কারণ আর্সেনিক দ্বারা পানীয় জলের সংক্রমণ। উল্লেখ্য, পানীয় জলের প্রধান উৎস হচ্ছে ভূগর্ভ জল (Ground Water), কিন্তু ভূগর্ভ পানীয় জলের ভাণ্ডার বর্তমানে নিরাপদ নয়, বিভিন্ন কারণে দূষিত। ভূ-গর্ভের পানীয় জল দূষণের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে আর্সেনিক সংক্রমণ জনিত দূষণ। ভূ-গর্ভের জল দুটি উপায়ে আর্সেনিক দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে—প্রাকৃতিক কারণ এবং মনুষ্য সৃষ্ট কারণ।

i) **প্রাকৃতিক কারণ ঃ** ভূ-তাত্ত্বিক কারণে আর্সেনিক দ্বারা ভূ-গর্ভ জলের সংক্রমিত হওয়ার ঘটনাকে **প্রাকৃতিক** বা **জিওজেনিক** কারণ বলা হয়। জিওজেনিক কারণই ভূ-গর্ভস্থ জলের আর্সেনিক দূষণের প্রধান কারণ। আর্সেনিক সম্পন্ন জনিতৃ শিলা যথা—পাললিক, গ্রানাইট এবং ব্যেসল্ট-স্তরের সংস্পর্শে ভূ-গর্ভ জলের অবস্থানের

ফলে প্রাকৃতিক কারণে ধীরে ধীরে ভূ-গর্ভ জলে আর্সেনিক মুক্ত হয়। এছাড়া আর্সেনিক আকরিক যথা আর্সেনো-পাইরাইট, রিয়্যাল-গার এবং ওরপিমেন্ট প্রভৃতির সংস্পর্শেও ভূগর্ভ জল আর্সেনিক দ্বারা সংক্রমিত হতে পারে। ভূ-গর্ভ জলে সবসময়ই কিছু পরিমাণ আর্সেনিক উপস্থিত থাকে। কিন্তু বর্তমানে বিপুল পরিমাণ পানীয় জলের চাহিদা মেটোনোর তাগিদে ভূগর্ভ থেকে যথেচ্ছভাবে জল উত্তোলিত হচ্ছে। ফলে ভূ-গর্ভ জলের উপরিতল ক্রমশ নীচে নেমে যাচ্ছে। ভূ-গর্ভ জলের পরিমাণ কমে যাওয়ায় আর্সেনিকের ঘনত্ব ক্রমশ বাড়ছে। এইভাবে চলতে থাকায় এক সময় ভূ-গর্ভ জল আর্সেনিক দ্বারা সম্পৃক্ত হচ্ছে। এই সংম্পৃক্ত ভূ-গর্ভ জলে প্রাকৃতিক কারণে অর্থাৎ আর্সেনিকযুক্ত শিলা স্তর বা আর্সেনিক আকরিক থেকে আর্সেনিক সংক্রমিত হলে ভূ-গর্ভ জলে আর্সেনিকের পরিমাণ সম্পৃক্ত মাত্রার বেশি হয়। আর্সেনিক দ্বারা অতি-সম্পৃক্ত ভূ-গর্ভ জল অনেক সময় গভীর কূপের সাহায্যে পানীয় জল হিসেবে সংগৃহীত হয়। এই সংগৃহীত জলকে প্রক্রিয়াকরণ না করলে বা জল থেকে আর্সেনিক অপসারণ না করলে পানীয় জলের মাধ্যমে আর্সেনিক মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। পানীয় জলের মাধ্যমে ক্রম-সঞ্চিত আর্সেনিকের সহনশীল মাত্রা বেশি হলেই আর্সেনিক বিষক্রিয়ার সৃষ্টি হয়।

ii) মনুষ্য সৃষ্ট কারণ ঃ মানুষের ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমেও ভূ-গর্ভ জল দূষিত হতে পারে। কীটনাশক এবং পৌরসংস্থা নিঃসৃত বর্জ্য পদার্থের মাধ্যমে মৃত্তিকা আর্সেনিক দ্বারা সংক্রমিত হয়। মৃত্তিকার আর্সেনিক ধরে রাখার ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট আর্সেনিক মাত্রার উপর নির্ভর করে। মৃত্তিকায় সঞ্চিত আর্সেনিকের মাত্রা অধিকতর হলেই অতিরিক্ত আর্সেনিক মৃত্তিকা স্তরের মধ্য দিয়ে ক্রমশ ভূগর্ভে প্রচরিত হয়। মৃত্তিকা থেকে প্রচরিত আর্সেনিক অনেক সময় আর্সেনিক সম্পৃক্ত ভূ-গর্ভ জলে সংক্রমিত হয়। আর্সেনিক সম্পৃক্ত ভূ-গর্ভ জলে অতিরিক্ত আর্সেনিকের উপস্থিতিতে জলের আর্সেনিক দূষণ ঘটে। আর্সেনিক দূষিত ভূ-গর্ভ জল পানীয় জল হিসেবে সংগৃহীত হলে এবং পানের পূর্বে জল থেকে আর্সেনিক অপসারণ না করলে মানুষের শরীরে আর্সেনিক সংক্রমিত হতে পারে।

b) **আর্সেনিক সংশ্লিষ্ট পানীয় জলের গুণমান ঃ** পানীয় জলে আর্সেনিকের মাত্রা একটি নির্দিষ্ট মানে বজায় থাকলে জলকে পানের উপযোগী বলে ধরা হয়। পানীয় জলে আর্সেনিকের **বর্তমান আন্তর্দেশীয় সর্বোচ্চ মাত্রা বিস্তার হচ্ছে** 0.04—0.05 ppm। জার্মানিতে আর্সেনিক দূষণের প্রবণতা বেশি হওয়ায় অধুনা জার্মান সরকার পানীয় জলে আর্সেনিকের সর্বোচ্চ মাত্রা আন্তর্দেশীয় মাত্রার তুলনায় হ্রাস করেছে। 1996 খ্রীস্টাব্দের পর থেকেই জার্মানিতে পানীয় জলে আর্সেনিকের সর্বোচ্চ মাত্রা নির্ধারিত হয়েছে 0.01ppm। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

1992 খ্রীস্টাব্দে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পানীয় জলে আর্সেনিকের সর্বোচ্চ মাত্রা 0.002 ppm নির্ধারিত করেছে। বর্তমানে তাইওয়ান এবং চিলিতে আর্সেনিক দূষণের ভয়াবহতা দেখা দিয়েছে। ইতোমধ্যেই তাইওয়ানের বহু মানুষ আর্সেনিক সংক্রমিত কলের জল খেয়ে **'ব্ল্যাক-ফুট'** রোগে আক্রান্ত (Hsia, 1989) হয়েছে। ভারতেও কম-বেশি আর্সেনিক দূষণের ঘটনা ঘটছে। পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলায় আর্সেনিক দূষণের প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। এই দুই জেলার অনেকাংশে গভীর এবং অগভীর কূপের জলে আর্সেনিকের সর্বোচ্চ মাত্রা আন্তর্দেশীয় মাত্রার তুলনায় বহুগুণ বেশি। ইতোমধ্যেই আর্সেনিক দূষণের কবলে বহু মানুষ আক্রান্ত হয়েছে এবং কয়েকজন মারা গিয়েছে।

13.9 মানব স্বাস্থ্যের উপর আর্সেনিকের প্রভাব ঃ

13.9.1. **আর্সেনিকের প্রভাব নিয়ন্ত্রক শর্তসমূহ ঃ** মানব স্বাস্থ্যের উপর আর্সেনিকের পরিবেশগত প্রভাব আর্সেনিক প্রজাতির প্রকৃতি, সময়মাত্রা সম্পর্ক এবং প্রকট বা এক্সপোজারের প্রকারভেদ প্রভৃতি শর্তের উপর নির্ভর করে। এই শর্তগুলি অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

a) **আর্সেনিকের প্রজাতি ঃ** আর্সেনিক হচ্ছে একটি ট্রানজিশান মৌল (transition element) বা ধাতুকল্প (metalloid)। এই কারণে আর্সেনিক সহজেই ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে ধাতব যৌগ উৎপন্ন করতে পারে এবং কার্বন, হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সঙ্গে সমযোজী বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে। আর্সেনিক-বিষক্রিয়া আর্সেনিকের জারণ বা যোজ্যতা মানের উপর নির্ভর করে। প্রকৃতিতে তিন প্রকার যোজ্যতাসম্পন্ন অবস্থায় আর্সেনিক পাওয়া যায়। যথা—**মেটালয়েড** বা **ধাতুকল্প** (শূন্য জারণ অবস্থা), **আর্সেনাইট** (ত্রিযোজী বা +3 জারণ অবস্থা) এবং **আর্সিনেট** (পঞ্চমযোজী বা +5 জারণ অবস্থা)। **আর্সেনিকের ত্রিযোজী অবস্থাই জীবজগতের উপর সর্বাধিক বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে।** ভৌত অবস্থা যথা—গ্যাস, দ্রবণ বা কণার আয়তন আর্সেনিকের বিষক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। গ্যাসীয় আর্সেনিক যথা আর্সিন গ্যাস (AsH_3) সর্বাধিক বিষক্রিয়। মানব স্বাস্থ্যের উপর বিষক্রিয়ার সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন মান অনুযায়ী আর্সেনিক যৌগগুলি হচ্ছে যথাক্রমে **আর্সিন গ্যাস** > **আর্সিনাইটস** (অজৈব, ত্রিযোজী) > **আর্সেন অক্সাইডস** (জৈব, ত্রিযোজী) > **আর্সিনেটস** (অজৈব, পঞ্চম যোজী) > **আর্সোনিয়াম যৌগ**> **ধাতব আর্সেনিক**।

b) **প্রকট প্রকৃতি ঃ** প্রকট বা এক্সপোজারের প্রকৃতি বা ধরন আর্সেনিকের বিষক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। প্রধানত শ্বসন এবং খাদ্যগ্রহণের মাধ্যমে আর্সেনিক মানব শরীরে প্রবেশ করে। শ্বসনের মাধ্যমে গ্যাসীয় আর্সেনিক ফুসফুসে প্রবেশ করার পর অতিদ্রুত রক্তের মাধ্যমে শরীরের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে আর্সেনিক ঘটিত বিষক্রিয়ার তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি। খাদ্যের মাধ্যমে আর্সেনিক শরীরে প্রবেশ

করলে মূলত পাকস্থলী এবং অন্ত্র আক্রান্ত হয়। খাদ্যজনিত আর্সেনিক বিষক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হয় না কারণ, **যকৃত বিষক্রিয় আর্সেনিক যৌগকে দ্রুত অবিষক্রিয় আর্সেনিক যৌগে রূপান্তরিত করতে পারে।** খাদ্যগ্রহণ এবং শ্বসন ব্যতীত ত্বকীয়-শোষণের মাধ্যমেও আর্সেনিক শরীরে প্রবেশ করতে পারে। ত্রিযোজী এবং পঞ্চমযোজী আর্সেনিক যৌগ লিপিড দ্রাব্য হওয়ায় সহজেই ত্বকের মাধ্যমে শরীরের ভিতর প্রবেশ করতে পারে। ত্রিযোজী আর্সেনিক অক্সাইড এর লিপিড দ্রাব্যতা সবচেয়ে বেশি হওয়ায় অন্যান্য আর্সেনিক যৌগের চেয়ে আর্সেনিক অক্সাইডের ত্বকীয় শোষণ অপেক্ষাকৃত বেশি।

c) **প্রকটের সময়-মাত্রা সম্পর্ক** : আর্সেনিক বিষক্রিয়ার তীব্রতা কি পরিমাণ আর্সেনিক এবং কতটা সময় ধরে মানুষের শরীরে প্রবেশ করেছে তার উপর নির্ভর করে। যে পরিমাণ আর্সেনিক প্রতিবার প্রকটে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে তাকে **'আর্সেনিকের মাত্রা'** (dose) বলা হয়। এবং যতটা সময় ধরে মানুষের শরীরে আর্সেনিকের প্রকট ঘটে সেই সময়কে **'প্রকট-কাল'** বলা হয়। খুব বেশি বা বেশিমাত্রায় স্বল্পকালীন আর্সেনিকের প্রকটে **অ্যাকিউট বিষক্রিয়া** (acute toxicity) এবং কমমাত্রায় দীর্ঘকালীন আর্সেনিকের প্রকটে **ক্রনিক বিষক্রিয়া** (chronic toxicity) সৃষ্টি হয়। অ্যাকিউট বিষক্রিয়ায় 30 মিনিট থেকে 24 ঘণ্টার মধ্যে মানুষের মৃত্যু ঘটতে পারে। যথা, 200—300 mg আর্সেনিক ট্রাইঅক্সাইডের প্রকটে মানুষের মৃত্যু অবধারিত। প্রাণীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন আর্সেনিক যৌগের LD_{50} (ন্যূনতম যে মাত্রার আর্সেনিক যৌগ অর্ধেক সংখ্যক পরীক্ষা প্রাণীর মৃত্যু ঘটাতে সক্ষম তাকে লিথাল ডোজ$_{50}$ বা LD_{50} বলে) তালিকায় উল্লেখ করা হল।

আর্সেনিক যৌগ	**LD_{50}(mg/kg)**	**প্রাণী/প্রকট প্রকৃতি**
আর্সেনিক ট্রাইঅক্সাইড	34.5	মাউস/ওরাল
সোডিয়াম আর্সেনাইট	4.5	ইঁদুর/ইন্ট্রাপেরিটোনিয়াল
মনোমিথাইল আর্সেনিক অ্যাসিড (MMA)	1,800	মাউস/ওরাল
ডাইমিথাইল আর্সিনিক অ্যাসিড (DMA)	1200	মাউস/ওরাল

তালিকা 13.4 ঃ প্রাণীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন আর্সেনিক যৌগের LD_{50} দেখানো হয়েছে।

13.9.2. আর্সেনিক বিষক্রিয়ার সনাক্তকরণ ঃ

মানবদেহে আর্সেনিকের উপস্থিতি বা প্রকাশিত উপসর্গ আর্সেনিক বিষক্রিয়াজনিত

কিনা তা আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত, মূত্র, চুল বা নখ-এর নমুনায় আর্সেনিকের পরিমাণ নির্ণয় করে সনাক্ত করা যেতে পারে।

a) প্রতি লিটার রক্তে আর্সেনিকের স্বাভাবিক মাত্রা 1—40 মাইক্রোগ্রাম। কিন্তু প্রতিলিটার রক্তে 40 মাইক্রোগ্রামের বেশি আর্সেনিক উপস্থিত থাকলে রক্তদাতা স্ত্রী/পুরুষ আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে ধরা হয়। অধুনা আর্সেনিক আক্রান্তের রক্তে স্বাভাবিক আর্সেনিক মাত্রার দশগুণ বেশি আর্সেনিক পাওয়া গেছে।

b) মূত্রের নমুনায় আর্সেনিকের পরিমাণ নির্ণয় করে আর্সেনিক বিষক্রিয়তা সনাক্ত করা যেতে পারে। 24 ঘন্টায় গৃহীত মোট মূত্রের নমুনায় 20 মাইক্রোগ্রাম অজৈব আর্সেনিক বা মোট আর্সেনিক 50 মাইক্রোগ্রামের (জৈব + অজৈব) বেশি হলে ব্যক্তি (স্ত্রী/পুং) আর্সেনিক দ্বারা আক্রান্ত ধরা হয়।

c) নখ বা চুলের নমুনায় সঞ্চিত আর্সেনিকের পরিমাণ থেকে আর্সেনিকের উপস্থিতি সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যেতে পারে। প্রতি গ্রাম চুলের নমুনায় 1 (এক) মিলিগ্রামের কম আর্সেনিক থাকলে স্বাভাবিক এবং এর বেশি থাকলে আর্সেনিক আক্রান্ত ধরা হয়। রক্ত, মূত্র, নখ বা চুলের নমুনায় আর্সেনিকের পরিমাণ নির্ণয়ে বহু আধুনিক পদ্ধতি প্রচলিত। তবে **'অ্যাটমিক অ্যাবসর্পসান স্পেক্টোমেট্রি'**ই সর্বাধিক জনপ্রিয়। এই পদ্ধতিটি অতিসাধারণ এবং সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এছাড়া **'নিউট্রন অ্যাকটিভেশান অ্যানালাইসিস'** নামক সর্বোচ্চ বিশ্লেষক পদ্ধতির সাহায্যেও অতি স্বল্প পরিমাণ আর্সেনিক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নির্ণয় করা যেতে পারে। কিন্তু এই পদ্ধতিটি ক্ষেত্রে বিশেষে প্রযোজ্য।

13.9.3. মানব স্বাস্থ্যের উপর আর্সেনিকের বিষক্রিয়াজনিত প্রভাব ঃ

অ্যাকিউট বা ক্রনিক আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় মানবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-তন্ত্রের গঠনগত এবং কার্যগত অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে। এই কারণে বিভিন্ন বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঘটনাক্রমে বা আত্মহত্যাজনিত কারণে মানব শরীরে আর্সেনিকের অ্যাকিউট প্রকট ঘটে। বেশি মাত্রার অ্যাকিউট বিষক্রিয়ায় শ্বসন বা খাদ্যজনিত প্রকটের 30 মিনিটের মধ্যেই বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পায়, যদিও খাদ্যজনিত প্রকটের ক্ষেত্রে বিষক্রিয়াজনিত লক্ষণ কিছুটা বিলম্বে দেখা যায়। অপরপক্ষে বছরের পর বছর আর্সেনিক সংক্রমিত পানীয়জল বা খাদ্যের মাধ্যমে মানবদেহে আর্সেনিকের ক্রমসঞ্চয়ে ক্রনিক লক্ষণ প্রকাশ পায়। এইক্ষেত্রে পুঞ্জীভূত আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় মানবশরীরে গঠনগত এবং কার্যগত স্থায়ী অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে। এই অস্বাভাবিক এবং স্থায়ী পরিবর্তনের ফলে মানুষ ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।

বিভিন্ন অঙ্গ-তন্ত্রের উপর আর্সেনিক এর অ্যাকিউট এবং ক্রনিক বিষক্রিয়াজনিত প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

i) পাক-অন্ত্রীয় প্রভাব (Gastrointestinal Effects) **ঃ**

A) অ্যাকিউট প্রভাব ঃ আত্মহত্যার ঘটনায় আর্সেনিক যৌগ ভক্ষণের 30 মিনিটের মধ্যেই আর্সেনিকের বিষক্রিয়া শুরু হয়। খাদ্যের সংযোজিত বস্তু হিসেবে আর্সেনিক শরীরে প্রবেশ করলে বিষক্রিয়া শুরু হতে কিছুটা বিলম্ব হয়। অধিক মাত্রায় আর্সেনিক গ্রহণের ফলে সৃষ্ট পাক-অন্ত্রীয় বিষক্রিয়া অ্যাকিউট প্রভাব নামে পরিচিত। আর্সেনিক বিষক্রিয়াজনিত পাক-অন্ত্রীয় অ্যাকিউট প্রভাব নিম্নরূপ ঃ

a) আর্সেনিকের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে পাকস্থলীতে প্রদাহের সৃষ্টি হয়।
b) মুখগহ্বর শুকিয়ে যায় এবং গলাধঃকরণে অসুবিধার সৃষ্টি হয়।
c) বমি বমি ভাব অনুভূত হয় এবং বারে বারে বমি হয়।
d) ঔদরিক (abdominal) যন্ত্রণা অনুভূত হয়।
e) চাল ধোয়া জলের মত মলসহ অত্যধিক ডায়েরিয়ার প্রকোপ দেখা দেয়।
f) নিঃশ্বাস বায়ু এবং মলে রসুনের গন্ধ নির্গত হয়।
g) আর্সেনিকের করোসান-ক্রিয়ার ফলে আন্ত্রিক সাবমিউকোসাস্থিত রক্তনালীর প্রাচীর বিনষ্ট হয়। ফলে রক্তনালী প্রসারিত হয় এবং রক্তনালী থেকে প্লাজমা আন্তরকোষীয় স্থানে ব্যাপীত হয়।
h) অপেক্ষাকৃত স্বল্প মাত্রার আর্সেনিকের সংক্রমণে উৎপন্ন সাব-অ্যাকিউট আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় গলা ও মুখগহ্বর শুকিয়ে যায়, বমি বমি ভাব এবং ঔদরিক যন্ত্রণা অনুভূত হয়, পাকস্থলী এবং আন্ত্রিক সরল পেশীর যন্ত্রণাদায়ক আক্ষেপ এবং মধ্য তীব্রতাযুক্ত ডায়েরিয়ার প্রকোপ ঘটে। এছাড়া যকৃৎ কোষে লিপিডের সঞ্চয় ঘটে। এই লিপিড সঞ্চিত যকৃৎকে **'ফ্যাটি-লিভার'** বলা হয়।

B) ক্রনিক প্রভাব ঃ কম মাত্রার ক্রনিক আর্সেনিকের প্রকটে অ্যাকিউট প্রকটজনিত লক্ষণ (যথা—পাকস্থলীর প্রদাহ) অনুভূত হয় না, কিন্তু অন্যান্য লক্ষণসমূহ যথারীতি প্রকাশিত হয়। ক্রনিক প্রকটে প্রকাশিত পাকঅন্ত্রীয় লক্ষণসমূহ নিম্নরূপ ঃ

a) বমি বমি ভাব অনুভূত হয় এবং বমির আধিক্য ঘটে।
b) ডায়েরিয়ার প্রকোপ দেখা যায়।
c) ক্ষুদা-স্পৃহা এবং দৈহিক ওজন হ্রাস পায়। ক্ষুদা-স্পৃহা হ্রাসের ঘটনা অ্যানোরেক্সিয়া নামে পরিচিত।
d) এসোফ্যাগাইটিস, গ্যাসট্রাইটিস এবং কোলাইটিস দেখা যায়। এছাড়া ঊর্ধ্ব ও নিম্ন উদরে অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভূত হয়।
e) যকৃতের অস্বাভাবিকতা যথা—হেপাটোমেগালি এবং সিরোসিস সংঘটিত হয়। এছাড়া কখনো কখনো 'জনডিস'-এর আক্রমণ ঘটে।

ii) শ্বসন-সংক্রান্ত প্রভাব (Respiratory Effects) **ঃ**

A) অ্যাকিউট প্রভাব ঃ আর্সেনিকের অ্যাকিউট প্রকটে আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাসক্রিয়া

ব্যাহত হয়। গ্যাসীয় আর্সেনিক, আর্সেনিকযুক্ত ধূলিকণা এবং আর্সেনিক বাষ্পের শ্বাসগ্রহণে ফুসফুসীয় ক্রিয়া ব্যাহত হয়। ফুসফুসীয় শ্বাসক্রিয়ার উপর আর্সেনিকের অ্যাকিউট প্রভাবসমূহ উল্লেখ করা হল।

a) আর্সেনিকের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে ফুসফুসীয় রক্তজালিকার প্রাচীর ক্ষয়ে যায়। ফলে রক্তরস ফুসফুসে সঞ্চিত হয়ে **'পালমোনারী ইডিমা'** (Pulmonary edema) সৃষ্টি করে।

b) আক্রান্ত ব্যক্তি ব্রঙ্কিয়াল **নিউমোনিয়া** এবং **ট্রাকিওব্রঙ্কাইটিসে** আক্রান্ত হয়।

c) আর্সিন গ্যাসের প্রভাবে রক্তের মাধ্যমে কলাকোষে অক্সিজেন পরিবহন বিঘ্নিত হয়। কারণ আর্সিন গ্যাস লোহিত রক্তকণিকাস্থিত উৎসেচক এবং অন্যান্য প্রোটিনের –SH গ্রুপের সঙ্গে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত হয়ে লোহিতকণিকাকে ভেঙ্গে দেয়। এই ঘটনা **'হিমোলাইসিস'** নামে পরিচিত। হিমোলাইসিসের ফলে হিমোগ্লোবিন প্রথমে রক্তরসে এবং পরে রক্তরস থেকে বৃক্কের সাহায্যে দেহের বাইরে নির্গত হয়। এই কারণে লোহিত কণিকার অক্সিজেন পরিবাহিতা হ্রাস পায়।

B) **ক্রনিক প্রভাব ঃ** খনি এবং ধাতু নিষ্কাশনের কারখানায় আর্সেনিক গ্যাস, আর্সেনিক বাষ্প এবং আর্সেনিক যুক্ত ধূলিকণা প্রভৃতির শ্বাসগ্রহণজনিত প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে শ্বসন সংক্রান্ত ক্রনিক প্রভাবসমূহের উৎপত্তি ঘটে। পেশাগত কাজে লিপ্ত শ্রমিক ক্রনিক আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় মূলত আক্রান্ত হয়।

আর্সেনিকের শ্বসন-সংক্রান্ত ক্রনিক প্রভাবসমূহ নিম্নরূপ ঃ

a) আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি **রাইনাইটিস, ফ্যারিনজাইটিস, ল্যারিনজাইটিস** এবং **ট্রাকিওব্রঙ্কাইটিস** রোগে আক্রান্ত হয়। এই সমস্ত রোগের প্রভাবে নাসিকার গতিপথের অবরুদ্ধতা, গলদাহ, কর্কশ-ফেঁসফেঁসে কণ্ঠস্বর (গলাভাঙ্গা স্বর) এবং দীর্ঘস্থায়ী কাশি প্রভৃতি বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পায়।

b) ফুসফুসীয় প্রদাহ এবং অ্যাজমার উৎপত্তি ঘটে।

c) অসংরক্ষিত শ্রমিকের ক্ষেত্রে 1-3 সপ্তাহের আর্সেনিক প্রকটে ন্যাসাল সেপটামে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রের সৃষ্টি হয়।

d) আর্সেনিক ট্রাইঅক্সাইডের শ্বাসগ্রহণে ট্রাকিয়া এবং ব্রঙ্কাই-এর **মিউকোসা** ও **সাবমিউকোসা স্তরে** এবং **অ্যালভিওলাসে** রক্তক্ষরণ ঘটে। এছাড়া পালমোনারী ইডিমার উৎপত্তি ঘটে।

iii) **ত্বকসংক্রান্ত প্রভাব** (Dermatologic Effects) ঃ

মানবদেহে ত্বক, নখ এবং চুলে মুখ্যত আর্সেনিক সঞ্চিত থাকে। এই কারণে আর্সেনিক প্রকটে ত্বক সংক্রান্ত প্রভাব বা মিথোষ্ক্রিয়া অন্যান্য অঙ্গ-তন্ত্রের মিথোষ্ক্রিয়ার তুলনায় কিছুটা পৃথক। আর্সেনিকের ত্বক সংক্রান্ত ক্রনিক এবং অ্যাকিউট প্রভাব সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

A) **অ্যাকিউট প্রভাব ঃ**

a) আর্সেনিক কণা এবং বাষ্পের সংস্পর্শে দেহত্বকের সর্বত্র ফুসকুড়ি বা চুলকণার (rash) উদ্ভব ঘটে। আর্সেনিকের দ্বারা স্থানীয় স্ফীতি প্রতিরোধকারী উৎসেচকের **বিনষ্টের কারণে ফুসকুড়ির সৃষ্টি হয়।**

b) মুখ এবং চোখের পাতার ত্বকে আর্সেনিক পাউডার বা কণার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে জ্বালাযুক্ত **'ইরাইথীমা'** সৃষ্টি হয়।

B) **ক্রনিক প্রভাব ঃ** শ্বাসগ্রহণ বা খাদ্যগ্রহণজনিত কারণে ক্রনিক আর্সেনিক প্রকটে বিভিন্ন ধরনের ত্বকীয় প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। এইসব ত্বকীয় প্রতিক্রিয়া বাহ্যিক লক্ষণ রূপে প্রকাশ পায়।

a) প্রাথমিকভাবে ত্বকীয় রক্তোচ্ছ্বাসজনিত ইরাইথীমেটাস পরবর্তী পর্যায়ে **কেরাটোসিসে** রূপান্তরিত হয়।

b) পায়ের পাতা এবং করতলের ত্বকে **অতিরঞ্জন বা হাইপারপিগমেন্টেশান ঘটে।** অতিরঞ্জনের ফলে দেহের যে সব অংশ অপেক্ষাকৃত কালো ঐ সব অংশ অধিকতর কালো বর্ণে রঞ্জিত হয়। ত্বকের এই অতিরঞ্জন সর্বত্র একইরূপে বা অসামঞ্জস্য রূপে হতে পারে। ফলে আপাত দৃষ্টিতে ত্বক **বহুবর্ণে চিত্রবিচিত্র** মনে হয়। কখনো কখনো ত্বকে **কালশিটে** দাগের সৃষ্টি হয়।

c) হাত, পা, বুক এবং মাথার চুল বিচ্ছিন্নভাবে বা সামঞ্জস্যহীনভাবে পড়ে যায়।

d) আর্সেনিক হাত ও পায়ের নখের বৃদ্ধিতে বাধার সৃষ্টি করে।

e) হাত এবং পায়ের নখে অসংখ্য আনুভূমিক সাদা খাঁজের সৃষ্টি হয়, এই আনুভূমিক সাদা খাঁজগুলি **'মিইজ রেখা'** বা **'অল্ডরিচ মিইজ রেখা'** (Mees Lines or Aldrich Mees Lines) নামে পরিচিত।

f) মুখবিবর এবং কাঁধের ত্বকে নীলাভ লাল রক্তোচ্ছ্বাস ঘটে। এই লক্ষণ **'সায়ানোসিস'** নামে পরিচিত। জানা গেছে, এক্ষেত্রে হাইপোক্সিয়ার জন্য সায়ানোসিস ঘটে না, ত্বকের রক্তনলীর বিনষ্টের কারণে সায়ানোসিস ঘটে।

g) দেহের যে সব অংশ সূর্যের আলোকে উন্মুক্ত থাকে, ঐ অংশের ত্বক আর্সেনিকের সংস্পর্শে ক্যানসারে (**বেসাল-সেল কারসিনোমা বা স্কোয়ামাস-সেল কারসিনোমা**) আক্রান্ত হয়।

iv) **রক্তসংক্রান্ত প্রভাব** (Hematologic Effects) ঃ

A) **অ্যাকিউট প্রভাব ঃ**

a) গ্যাসীয় আর্সেনিকের প্রকটে লোহিত রক্তকণিকার অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা হ্রাস পায়। আর্সিন গ্যাস হিমোগ্লোবিনের **সঙ্গে বিক্রিয়া করে লোহিতকণিকার হিমোলাইসিস** ঘটায়।

b) অ্যানিমিয়া এবং থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া সংঘটিত হয়।

B) **ক্রনিক প্রভাব :**

a) ক্রনিক আর্সেনিক সংক্রমণে অস্থিমজ্জার জনিতৃ কোষ থেকে রক্তকোষ উৎপাদন ব্যাহত হয়।

b) অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর্সেনিকের ক্রনিক বিষক্রিয়ায় **নরমোসাইটিক অ্যানিমিয়া, থ্রম্বোসাইটোপিনিয়া, অ্যাপ্লাসটিক অ্যানিমিয়া** এবং **প্যানসাইটোপিনিয়া** পরিলক্ষিত হয়।

c) আর্সেনিক হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষণে বাধা দেয়।

d) আর্সেনিকের প্রভাবে হিমোলাইসিস ত্বরান্বিত হয়। ফলে রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা হ্রাস পায় এবং রক্তের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা কমে যায়।

V) **যকৃত-সংক্রান্ত প্রভাব** (Hepatic Effects) **:**

A) **অ্যাকিউট প্রভাব :** আর্সেনিকের অ্যাকিউট প্রকটে যকৃতের অ্যাট্রফি ঘটে। কোলেসিসটাইসিস, কোলানজাইটিস এবং **কনজেসশান** অ্যাকিউট আর্সেনিক প্রকটের অন্যতম উপসর্গ।

B) **ক্রনিক প্রভাব :**

a) আর্সেনিকের ক্রনিক প্রকটে যকৃতের অসংশোধনযোগ্য অস্বাভাবিক পরিবর্তন যথা **সিরোসিস, পোর্টাল হাইপারটেনশান, ফ্যাটিডিজেনারেশান** এবং **প্রাথমিক হেপাটিকনিওপ্লাসিয়া** দেখা যায়।

b) চূড়ান্ত অবস্থায় লিভারের আকৃতি বেড়ে যায়, ইসোফেগাস থেকে রক্ত ক্ষরিত হয় এবং জনডিস রোগের সৃষ্টি হয়। অ্যালকোহল আর্সেনিক প্রভাবিত লিভার সিরোসিসকে ত্বরান্বিত করে।

c) আর্সেনিক যকৃত কোষের মাইটোকনড্রিয়াকে বিনষ্ট করে এবং মাইটোকনড্রিয়ার কাজে বাধা প্রদান করে।

vi) **বৃক্ক-সংক্রান্ত প্রভাব** (Renal Effects) **:**

A) **অ্যাকিউট প্রভাব :**

a) অ্যাকিউট আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় নিরুদনের (dehydration) কারণে বৃক্কে **অভিঘাত** (Shock) সৃষ্টি হয়। এছাড়া রক্তের আয়তন এবং বৃক্কের রক্তচাপ হ্রাস পায়। ফলে বৃক্কের মূত্র উৎপাদন ক্রিয়া ব্যাহত হয়। এই ঘটনা **'রেনাল ফেলিওর'** নামে পরিচিতি।

b) বৃক্কের কর্টেক্স অঞ্চল অ্যাকিউট আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় বিনষ্ট হয়।

B) **ক্রনিক প্রভাব :** বৃক্ক আর্সেনিকের সঞ্চয় এবং জীব-রূপান্তরে সাহায্যে করে, যথা পঞ্চমযোজী আর্সেনিক বৃক্কের দ্বারা অপেক্ষাকৃত অধিক টক্সিক এবং কম দ্রাব্য ত্রিযোজী আর্সেনিকে রূপান্তরিত হয়। বিভিন্ন আর্সেনিক যৌগের রেচনেও আর্সেনিক

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। বৃক্কের উপর আর্সেনিকের ক্রনিক প্রভাব নিম্নরূপ ঃ

a) রেনাল ক্যাপিলারী, রেনাল টিবিউল এবং গ্লমেরুলাস আর্সেনিকের করোসান ক্রিয়ার দ্বারা বিনষ্ট হয়।

b) গ্লমেরুলাসের আর্টেরিওল প্রসারিত হয়, ফলে মূত্রের মাধ্যমে রক্তকণিকা নির্গত হয় (হিমাচুরিয়া)।

c) প্রক্সিমাল কনভোলিউটেড টিবিউলের বিনষ্টের কারণে প্রোটিনিউরিয়া (Proteinuria) সৃষ্টি হয়। মূত্রের মাধ্যমে প্রোটিন নির্গমনই প্রোটিনিউরিয়া রোগের প্রধান উপসর্গ।

d) আর্সেনিকের ক্রনিক সংক্রমণে মূত্রে অলিগোস্যাকারাইডের নির্গমন ঘটে। এই উপসর্গকে 'অলিগোইউরিয়া' বলা হয়।

(vii) **হৃদ-সংবহন তন্ত্র সংক্রান্ত প্রভাব** (Cardiovascular Effects) ঃ

A) **অ্যাকিউট প্রভাব ঃ**

a) আর্সেনিকের অ্যাকিউট প্রকটে রক্তসংবাহী ক্যাপিলারী প্রসারিত হয় এবং ক্যাপিলারীর ভেদ্যতা বৃদ্ধি পায়। এই কারণে রক্তের আয়তন এবং প্রোটিনের পরিমাণ কমে যায়।

b) **ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া** (ভেন্ট্রিকল্-এর স্পন্দন হার বৃদ্ধির ঘটনাকে ভেন্ট্রিকুলার ট্যাকিকার্ডিয়া বলা হয়।) এবং **ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশান** অ্যাকিউট আর্সেনিক বিষক্রিয়ার অন্যতম উপসর্গ।

c) করোনারী এবং বাহ্যিক রক্তনালীর লুমেন লিপিড ডিপোজিশানের কারণে সংকীর্ণ হয়। ফলে হৃদপিণ্ডে এবং কলাকোষে অক্সিজেন সরবরাহ হ্রাস পায়।

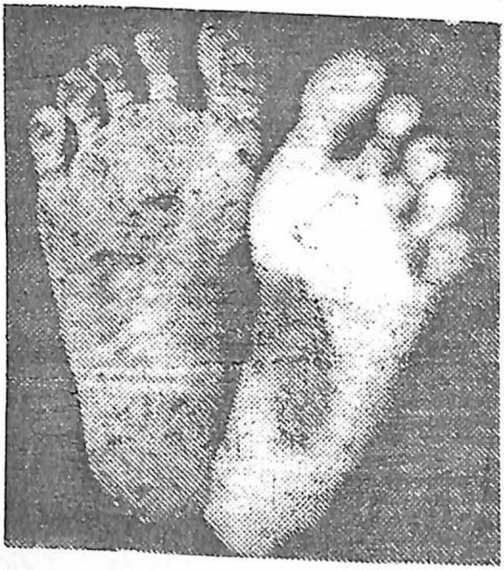
B) **ক্রনিক প্রভাব ঃ** হৃদ-সংবহন নালিকা সংক্রান্ত অস্বাভাবিকতার প্রকৃতি দেখে আর্সেনিক বিষক্রিয়া সনাক্ত করা যেতে পারে। ক্রনিক আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় হৃদপিণ্ড এবং সংবহন নালিকার যে বৈশিষ্ট্যসূচক পরিবর্তন ঘটে সেগুলি উল্লেখ করা হল।

a) আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় হৃদ-পেশীর গঠনগত অস্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে। এক্ষেত্রে প্রতিটি হৃদ-পেশীতন্তুর গঠনের কোন পরিবর্তন হয় না, কিন্তু পেশীতন্তুগুলি আন্তরপেশীতন্তু স্থানে ব্যাপীত **ইওসিনোফিল** এবং **লিম্ফোসাইট** দ্বারা পৃথকিকৃত হয়। হৃদ-পেশীর এই গঠনগত পরিবর্তনকে 'মায়োকার্ডাইটিস' (Myocarditis) বলা হয়। **সিফিলিস** রোগের চিকিৎসায় আর্সেনিক দীর্ঘসময় ব্যবহারের ফলে মানুষের হৃদপিণ্ডের এইরূপ পরিবর্তন ঘটে (নেলসন, 1934)।

b) ECG-তরঙ্গের বিশেষ পরিবর্তন থেকেও আর্সেনিক বিষক্রিয়া সম্বন্ধে আভাস পাওয়া যায়। ক্রনিক আর্সেনিক বিষক্রিয়ায় ECG-তরঙ্গক্রমে ওলটানো **T-তরঙ্গ (inverted T-wave)** পাওয়া যায়। এছাড়া **QT-বিরামকাল (QT-interval)** প্রসারিত হয়।

c) **ভেন্ট্রিকুলার অ্যারিদ্‌মিয়াস** পরিলক্ষিত হয়।

d) আর্সেনিকের ক্রনিক বিষক্রিয়ায় হাত ও পায়ের কলাকোষে অক্সিজেন সরবরাহকারী রক্তসংবহন নালীর ল্যুমেন-ব্যাস (Lumen diameter) কমে যায়। ফলে হাতের চেটো এবং পায়ের তলদেশে কালো, পিণ্ডাকৃতি ক্ষত বা গ্যাংগ্রীন সৃষ্টি হয়। এই উপসর্গ **'ব্ল্যাকফুট ডিজিজ'** নামে পরিচিত।



চিত্র 13.3 ঃ ক্রনিক আর্সেনিক সংক্রমণে (পানীয় জলের মাধ্যমে) পায়ের তলদেশে উৎপন্ন ব্ল্যাকফুট ডিজিজ দেখানো হয়েছে।

- **'ব্ল্যাকফুট ডিজিজ' কি?**

নালী প্রাচীরের সাবএন্ডোথেলিয়াল স্তরের স্ফীতি এবং ল্যুমেনের অভ্যন্তর গাত্রে লিপিড সঞ্চয়ের কারণে ল্যুমেনের ব্যাস হ্রাস পায়। রক্তসংবহন নালীর ল্যুমেন-ব্যাস কমে যাওয়ায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দূরবর্তী কলাকোষে প্রবাহিত রক্তের পরিমাণ কমে যায়। এই কারণে কলাকোষের চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহকৃত অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়। অক্সিজেনের অভাবে কলাকোষের এই বিশেষ পরিবর্তিত অবস্থাকে **'ইসচিমিয়া'** বলা হয়। ইসচিমিয়ায় আক্রান্ত কলাকে **'ইসচিমিক'** টিসু বলা হয়। এইরূপ ইসচিমিক অবস্থা হাত এবং পায়ের কলাকোষে দীর্ঘস্থায়ী হলে ইসচিমিক কলা কালো বর্ণের পিণ্ডাকৃতি পচনশীল ক্ষতে বা গ্যাংগ্রীনে রূপান্তরিত হয়। এইরূপ কালো পচনশীল ক্ষত সাধারণত পায়ে দেখা যায়। এই উপসর্গকে **'ব্ল্যাকফুট ডিজিজ'** (Black foot disease) বলা হয়। চিলি এবং তাইওয়ানে ব্ল্যাকফুট ডিজিজে মৃতের সংখ্যা সর্বাধিক।

(viii) **নার্ভসংক্রান্ত প্রভাব** (Neurological Effects) **ঃ**

A) **অ্যাকিউট প্রভাব ঃ**

a) কেন্দ্রীয় এবং প্রান্তীয় নার্ভতন্ত্রের অন্তর্গত নিউরোনের অ্যাক্সন বিনষ্ট হয়। এই কারণে সৃষ্ট উপসর্গকে **নিউরোপ্যাথী** বলা হয়।

b) স্পর্শ এবং যন্ত্রণা অনুভূতি লোপ পায়।

c) এক্সটেনসর পেশীর **প্যারালাইসিস** ঘটে।

d) হাতের আঙ্গুলে কম্পন পরিলক্ষিত হয়।

B) **ক্রনিক প্রভাব** : আর্সেনিকের ক্রনিক বিষক্রিয়ায়—

a) যন্ত্রণা, স্পর্শ, চাপ প্রভৃতি সংজ্ঞাবহ অনুভূতি লোপ পায়।

b) **সুষুম্নাকাণ্ডের** অঙ্কীয় শৃঙ্গের চেষ্টীয় নিউরোন বিনষ্ট হয়। এই কারণে ফ্লেক্সর ও এক্সটেনসর পেশীর **অ্যাট্রফি** ঘটে এবং **সংকোচী ক্রিয়া হ্রাস** পায়।

c) EEG-তরঙ্গের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে।

d) মাথাধরা, স্মৃতিশক্তি বিলোপ, অস্বাভাবিক উত্তেজনা, অস্থির নিদ্রা, এবং অনিয়ন্ত্রিত মূত্র ক্ষরণ কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের উপর ক্রনিক আর্সেনিক বিষক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য উপসর্গ।

(ix) **মিউটাজেনিক প্রভাব** (Mutagenic Effects) **ঃ** আর্সেনিকের ক্রনিক বিষক্রিয়ায় DNA-র মিউটেশান ঘটে। এই মিউট্যান্ট জিন বংশ পরম্পরায় বাহিত হয়। জিনের মিউটেশানের ফলে অস্বাভাবিক শারীরবৃত্তিয় বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে।

(x) **জননসংক্রান্ত প্রভাব** (Reproductive Effects) **ঃ** আর্সেনিকের অ্যাকিউট এবং ক্রনিক বিষক্রিয়ায় ভ্রূণের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, জন্মত্রুটি ঘটে, এবং অপরিণত ভ্রূণের গর্ভপতন ঘটে। আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত মাতার জাত সন্তানের ওজন অপেক্ষাকৃত কম হয়।

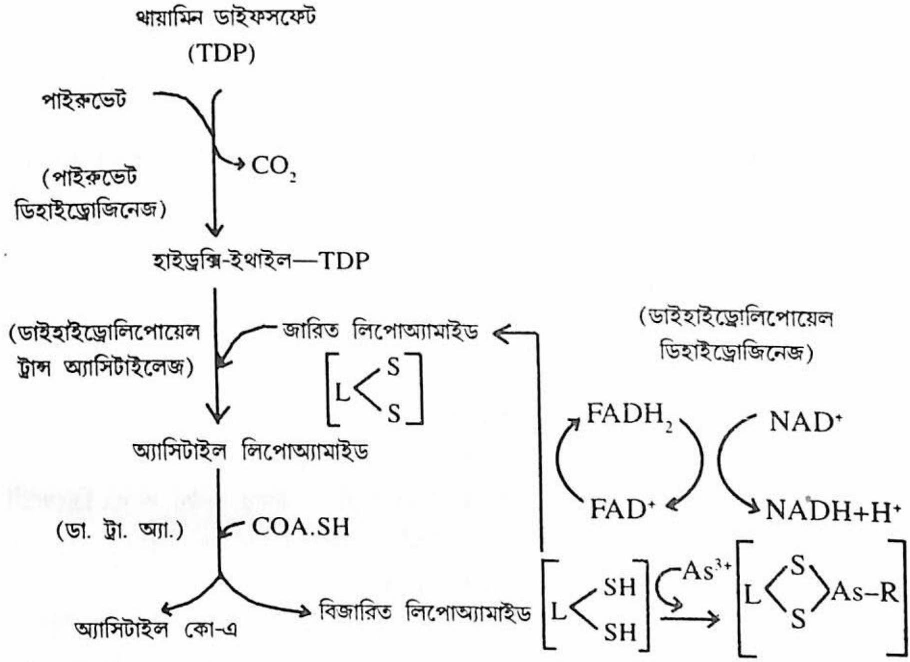
(xi) **কারসিনোজেনিক প্রভাব** (Carcinogenic Effects) **ঃ** আর্সেনিক একটি উল্লেখযোগ্য কারসিনোজেন। আর্সেনিক ক্যানসার সংঘটন ত্বরান্বিত করে। আর্সেনিকে আক্রান্তদের মধ্যে ক্যানসারে মৃতের সংখ্যা অনেক বেশি।

13.9.4 আর্সেনিক বিষক্রিয়ার আণবিক পদ্ধতি ঃ

আর্সেনিক কোষীয় উৎসেচক এবং অন্যান্য প্রোটিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

1. ত্রিযোজী আর্সেনিক **সালফ্‌হাইড্রিল গ্রুপ (-SH)** যুক্ত উৎসেচক-প্রোটিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে উৎসেচকের ক্রিয়াকে বাধা দেয়। ফলে বিপাকীয় ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়। প্রমাণিত তথ্যানুসারে ত্রিযোজী আর্সেনিক **পাইরুভেট থেকে অ্যাসিটাইল কো-এর** উৎপাদনে বাধা দেয়। কারণ আর্সেনিক পাইরুভিক অ্যাসিডের অক্সিডেটিভ ডি-কার্বোক্সিলেশানে সাহায্যকারী উৎসেচক **'ডাইহাইড্রোলিপোয়েল**

ডিহাইড্রোজিনেজ'-এর ক্রিয়াকে বাধা দেয়। এই উৎসেচকের ক্রিয়ায় বিজারিত লিপোঅ্যামাইড জারিত লিপোঅ্যামাইডে রূপান্তরিত হয়। এই জারিত লিপোঅ্যামাইড পুনরায় পাইরুভেটের জারণে সাহায্য করে। কিন্তু আর্সেনিকের উপস্থিতিতে বিজারিত লিপোঅ্যামাইড জারিত হতে পারে না। এই ক্ষেত্রে আর্সেনিক বিজারিত লিপোঅ্যামাইডের দুটি SH-গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে স্থায়ী যৌগ গঠন করে। ফলে ডাইহাইড্রোলিপোয়েল ডিহাইড্রোজিনেজ উৎসেচকের ক্রিয়া ব্যাহত হয়।



চিত্র 13.4 ঃ পাইরুভেট (পাইরুভিক অ্যাসিড) এর জারণে আর্সেনিকের বাধাদান প্রক্রিয়া (আণবিক) দেখানো হয়েছে।

2. পঞ্চমযোজী আর্সেনিক মাইটোকনড্রিয়ায় ATP-র উৎপাদনে বাধা দেয়। আর্সেনিকের ধর্ম ফসফরাসের অনুরূপ হওয়ায় ATP-র প্রান্তীয় ফসফেট গ্রুপ আর্সেনিক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। ফলে ATP-র পরিবর্তে ADP-আর্সেনেট উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন ADP-আর্সেনেট দ্রুত আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয়। এই ঘটনাকে আর্সেনোলাইসিস বলা হয়। এই কারণে কোষে ATP সঞ্চিত থাকতে পারে না।

3. ত্রিযোজী আর্সেনিক TCA-চক্রের বিশেষ উৎসেচকের ক্রিয়াকে বাধা দিয়ে NAD^+ র বিজারণকে বাধা দেয়।

4. খাদ্য বা শ্বাসজনিত প্রকটে রক্তে সংক্রমিত আর্সেনিক হিমোগ্লোবিনের প্রোটিন (গ্লোবিন) অংশের সাথে যুক্ত হয় এবং সংক্রমণের 24 ঘন্টার মধ্যে **'আর্সেনিক গ্লোবিন জটিল'** রক্তবাহ থেকে আন্তরকোষীয় স্থানে ব্যাপীত হয়। অবশেষে, আর্সেনিক গ্লোবিন জটিল যকৃত, বৃক্ক, ফুসফুস, প্লীহা, পাকস্থলী এবং অন্ত্রে সঞ্চিত হয়। সংক্রমণের 2—4 সপ্তাহের পরে শরীরে সঞ্চিত সমস্ত আর্সেনিক চুল, নখ এবং ত্বকে জমা হয়। চুল, নখ এবং ত্বকে SH-গ্রুপযুক্ত কেরাটিন নামক প্রোটিনের আধিক্যের কারণে আর্সেনিক এই সমস্ত অংশে সঞ্চিত থাকতে পারে।
5. আর্সিন গ্যাসের সংক্রমণে রক্তনালীর অভ্যন্তরে লোহিত রক্তকণিকার **হিমোলাইসিস** ঘটে। আর্সিন গ্যাস লোহিত কণিকার হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে অনুদ্বায়ী যৌগ উৎপন্ন করে। অক্সিজেনের উপস্থিতিতে আর্সেনিকযুক্ত লোহিত কণিকার হিমোলাইসিস ঘটে। আর্সেনিক প্রভাবিত হিমোলাইসিসের সঠিক কারণ এখনোও অজ্ঞাত।

13.10. সারাংশ (Summary) ঃ

- আর্সেনিক একটি ট্রানজিশান মৌল। অতিপ্রাচীনকাল থেকে বিষ হিসেবে আর্সেনিকের সামাজিক পরিচিতি। বর্তমানে মানুষ পরিবেশ সংক্রান্ত আর্সেনিক দূষণের শিকার।
- কৃষিতে পেস্টিসাইড হিসেবে, চিকিৎসায়, প্রাণী প্রতিপালনে, ইলেকট্রনিক্স শিল্পে সেমিকন্ডাক্টার হিসেবে এবং মেটালার্জিতে আর্সেনিক ব্যবহৃত হয়।
- আর্সেনিকের বিষক্রিয়া আর্সেনিক প্রজাতির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। ত্রিযোজী আর্সেনিক পঞ্চমযোজী এবং জৈব আর্সেনিক অপেক্ষা অধিক বিষক্রিয়। গ্যাসীয় আর্সেনিক যথা ঃ আর্সিন গ্যাস সর্বাপেক্ষা বিষক্রিয়।
- প্রধানত পানীয় জলের মাধ্যমে আর্সেনিক মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। বিভিন্ন কারণে ভূ-গর্ভের পানীয় জলের ভাণ্ডার আর্সেনিক সংক্রমিত হওয়ায় মানুষের স্বাস্থ্যের অনভিপ্রেত পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। পানীয় জলের গুণমান জলে উপস্থিত আর্সেনিকের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। পানীয় জলে আর্সেনিকের আন্তর্দেশীয় সর্বোচ্চ মান হচ্ছে 0.04–0.05 ppm।
- মানুষের স্বাস্থ্যের উপর আর্সেনিকের ক্ষতিকারক প্রভাবগুলির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে **'ব্ল্যাকফুট ডিজিজ'**। চিলি এবং তাইওয়ানে ব্ল্যাকফুট ডিজিজে মৃতের সংখ্যা সর্বাধিক।

• অনুশীলনী •

A. **রচনাভিত্তিক বা দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

1. আর্সেনিক কি? আর্সেনিকের প্রাচীন এবং আধুনিক ব্যবহার বর্ণনা কর।
2. মৃত্তিকায় আর্সেনিকের প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট উৎস বর্ণনা কর।
3. আর্সেনিক দ্বারা ভূগর্ভ জলের সংক্রমণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
4. আর্সেনিকের প্রকট প্রকৃতি এবং আর্সেনিক বিষক্রিয়ার সনাক্তকরণ পদ্ধতি বর্ণনা কর।
5. মানব স্বাস্থ্যের উপর আর্সেনিকের পাকঅস্ত্রীয় প্রভাব, ত্বকসংক্রান্ত প্রভাব এবং হৃদ্-সংবহনতন্ত্র সংক্রান্ত প্রভাব বর্ণনা কর।
6. সংক্ষেপে মানব স্বাস্থ্যের উপর আর্সেনিকের বিষক্রিয়াজনিত প্রভাব বর্ণনা কর।
7. আর্সেনিক কি উপায়ে কলাকোষে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে?

B. **সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :**

1. প্রকৃতিতে পাওয়া যায় এমন কয়েকটি সাধারণ আর্সেনিক আকরিকের নাম উল্লেখ কর।
2. দুটি উল্লেখযোগ্য আর্সেনিক পেস্টিসাইডের নাম এবং কার্য উল্লেখ কর।
3. মৃত্তিকাস্থ আর্সেনিকের রাসায়নিক গঠন ও রূপান্তর সংক্ষেপে আলোচনা কর।
4. আর্সেনিক-দূষিত মৃত্তিকায় আর্সেনিকের গড় ঘনত্ব উল্লেখ কর।
5. আর্সিন গ্যাস কি? আর্সিন গ্যাসের উৎপাদন এবং জীব-বিষক্রিয়া উল্লেখ কর।
6. আর্সেনিক চক্র কি?
7. আর্সেনিকের প্রাকৃতিক উৎস কি কি? বিভিন্ন প্রাকৃতিক ভাণ্ডারে আর্সেনিকের ঘনত্ব উল্লেখ কর।
8. কৃষিক্ষেত্রে আর্সেনিক পেস্টিসাইডের ব্যবহার কি উপায়ে মৃত্তিকাকে দূষিত করে?
9. আর্সেনিক সংশ্লিষ্ট পানীয় জলের গুণমান বলতে কি বোঝ?
10. রক্ত এবং চুল বা নখের নমুনা থেকে কিভাবে আর্সেনিক বিষক্রিয়া সনাক্ত করা যায়?
11. আর্সেনিক সংক্রমণে লোহিত রক্তকণিকার হিমোলাইসিসের কারণ কি?
12. 'অল্ড-রিচ-মিইজ রেখা' কি এবং কেন হয়?
13. আর্সেনিকের বিষক্রিয়ায় ECG তরঙ্গের কি পরিবর্তন হয়?
14. মায়োকারডাইটিস কি?
15. 'ব্ল্যাকফুট ডিজিজ' বলতে কি বোঝ?
16. ত্রিযোজী আর্সেনিক কি ভাবে পাইরুভিক অ্যাসিডের জারণে বাধার সৃষ্টি করে?
17. আর্সেনোলাইসিস কি?
18. চুল, নখ এবং ত্বকে আর্সেনিক সঞ্চিত থাকে কেন?

নির্দেশিকা

বিষয়-সম্পর্কিত গ্রন্থ ও রচনাপঞ্জি

A. প্রাথমিক পর্যায়ের ঃ

Air Pollution, Monograph Series, No. 46, WHO Pubn ; 1961.

Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981, Government of India, New Delhi.

N. Manivasakam, **Environmental Pollution,** National Book Trust ; India, 1994.

A. K. Saha, Energy Strategies for India (Presidential address for 67th session of the Indian Science Congress), 1980.

W. Burrs ; Noise and Men, J. B. Lippincott Co., Philadelphia, 1969.

অমিতাভ রায় ; শক্তি ঃ বিভিন্ন উৎস, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, 1995।

গৌরীপ্রসাদ ঘোষ ; মহাবিশ্বে মহাকাশে, লেখনী প্রকাশন, 1994।

শঙ্কর মুখোপাধ্যায় ; কৃষিতে রাসায়নিক দূষণ ও বিকল্প, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, 1993।

Indian Council of Medical Research ; Mannual of Methods for the Examination of water Sewage and Industrial Wastes, Special Report Series No.-47 ICMR, 1963.

Central Food Laboratory, Calcutta ; Adulterants in Food, Simple tests for consumers.

Industrial Toxicology Research Centre, Lucknow, India and Department of Environment (Govt. of U. P.), Lucknow, India ; Pesticides, Environment and Safety, June 5, 1984.

N. C. Dutta ; Biodiversity from Ecologic and Economic Viewpoint : Analysis and Synthesis, Dynamics of Ecosystem, 1995.

D. Banerjee ; Environmental Pollution and Effects of Environmental Pollutants and Toxic Chemicals on Human Health, Behaviour and Mentation, Science and Culture, 1988.

A. B. Banerjee ; Application of Biotechnology in Environmental Problems, Ist Refresher Course on Environmental Education of ASC, Calcutta University, 1995.

S. K. Benerjee ; Bio-degradation of Xenobiotics, Ist Refresher Course on Environmental Education, ASC, Calcutta University, 1995.

P. Lahiri, Ecological Effects of Organochlorines with Particular Reference to Aquatic Ecosystem, Ist Refresher Course on Environmental Education, ASC, Calcutta University, 1995.

A. K. Duttagupta ; Genetics, Population and Environment, Ist Refresher Course on Environmental Education, ASC, Calcutta University, 1995.

D. Chakroborty ; Arsenic Contamination in Groundwater in Six Districts of West Bengal, India : The Biggest Arsenic calamity in the world, Dynamics of Ecosystem, 1995.

R. K. Chakravorty ; Plants and Environment, Dynamics of Ecosystem, 1995.

A. K. Ghosh ; Conservation of Biodiversity for Sustainable Development In India, Dynamics of Ecosystem, 1995

A. Chatterjee ; Dynamics of Ecosystem, Seminar on Dynamics of Ecosystem, 1995.

P. K. Saha ; The Changing Climates of the World : Related Environmental Issues, Ist Refresher course on Environmental Education, ASC, Calcutta University, 1995.

Report of ILO on Asbestos, Geneva, 1995.

M. N. Rao ; Status of Air Pollution in India, National Productivity Council, Bangalore, 1982.

News Items from News Paper, The Asian Age, Calcutta, 1997 & 1998.

T. Shivaji Rao ; Report on TajMahal, Andhra Univesity, Waltair, 1981.

State of the Environment, Report UNEP, 1980.

L. Futehally ; **Our Environment,** Third edn., National Book Trust, India, 1994.

A. Agarwal and S. Narain ; Global Warming in an Unequal World, A case of Environmental colonialism, Centre for Science And Environment, New Delhi, 1991.

B. বৈজ্ঞানিক ধারণাসম্পন্ন পাঠকের জন্য ঃ

Andrew R. W. Jackson and Julie M. Jackson., **Environmental Science,** Longman, 1996.

M. N. Rao and H. V. N. Rao ; **Air Pollution,** Tata McGraw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi, 1995.

Samir K. Banerji ; **Environmental Chemistry,** Prentice-Hall of India Pvt. Ltd., 1994.

T. W. Sadler ; **Longman's Medical Embryology,** Williams & Wilkins, 1994.

Colin Baird ; **Environmental Chemistry,** W. H. Freeman and Company, 1995.

T. M. Das ; Air Pollution, M. Phil Programme in Environmental Science, Calcutta University, 1989.

N. C. Dutta ; Problem of Population Growth and Sustainable Development in the Developing Countries–An Appraisal, Ist Refresher Course on Environmental Education, ASC, Calcutta University, 1995.

J. J. Ghosh ; Biochemical Toxicity of the Environmental Pollutants, M. Phil Programme in Environmental Science, Calcutta University, 1989.

Eugene P. Odum ; **Basic Ecology,** Saunders College Publishers, 1983.

P. S. Verma and V. K. Agarwal ; **Principles of Ecology,** S. Chand & Company Ltd. New Delhi, 1997.

R. S. Ambasht ; **A Text Book of Plant Ecology,** Friends & Co, Lanka, Varanasi, 1990.

J. K. Gregory (Ed.) ; **Energetics of Physical Environment,** John Wiley and Sons, 1987

A. C. Stern (Ed.) ; **Air Pollution, Vol. 1-5,** 2nd edn., Academic Press, New York, 1968.

W. Strauss (Ed.) ; **Air Pollution–Part II & III,** Wiley-Interscience, New York, 1972 & 1978.

M. N. Rao ; Lead Pollution Control–A Case Study, Proc. Int. Cong. Env. Pollution Control, Tirupati, 1986.

J. K. Sinha ; Dust Hazards at Cement Works, J. Institution of Engineers, 1978.

Jerome O. Nriagu (Ed.) ; **Arsenic in the Environment, Part I & II,** John Wiley & Sons, Inc, 1994.

R. Soper (Ed.) ; **Biological Science,** Green, Stout and Taylor, Cambridge University Press, 1995.

A. Gupta ; Ecology And Development In the Third World, 2nd edn., Routledge, London, 1998.

পরিবেশ ও দূষণ

জনবিস্ফোরণ, অপুনর্নবীকরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমসংকোচন, প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্রমবিনাশ এবং পরিবেশ দূষণের কারণে পৃথিবীর জীবমণ্ডলে জীবনের অস্তিত্ব আজ বিপন্ন। ইতোমধ্যেই অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি বিলুপ্ত হয়ে গেছে, বর্তমানে অসংখ্য উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। জীববৈচিত্র্যের এরূপ সরলীকরণ ঘটতে থাকলে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়বে। সময় এসেছে আগামী প্রজন্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার। সেজন্যে সামাজিক সচেতনতা প্রয়োজন। **'পরিবেশ ও দূষণ'** বইটি সামাজিক 'সচেতনতা আন্দোলনে' সাহায্য করবে। এছাড়া বইটি স্নাতক পাঠক্রমে **পরিবেশ বিজ্ঞান, পরিবেশ শিক্ষা, পরিবেশ জীববিজ্ঞান, পরিবেশ রসায়ন** এবং **পরিবেশ ব্যবস্থাপনে** পাঠ্যবই হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। বইটিতে আলোচিত পরিবেশ সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি হল—

- **পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য**, প্রাকৃতিক পরিবেশ, মনুষ্যসৃষ্ট পরিবেশ ও সামাজিক পরিবেশ
- বাস্তুসংস্থান, বাস্তুতন্ত্র, জীবমণ্ডল, খাদ্যশৃঙ্খল, খাদ্যজালিকা, খাদ্য পিরামিড, বায়ুমণ্ডল, অশ্মমণ্ডল, বারিমণ্ডল ও জীবভূরাসায়নিক চক্র
- অপুনর্নবীকরণযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ—শীর্ষমৃত্তিকা, ভূ-গর্ভের পানীয় জল, জীবাশ্ম জ্বালানি (কয়লা, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস), জীব-বৈচিত্র্য, ধাতব ও অধাতব খনিজ সম্পদ
- অপ্রচলিত ও প্রচলিত শক্তি উৎস—সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, ওটেক, উদ্ভিদ তেল, পারমাণবিক শক্তি, তাপবিদ্যুৎ ও জলবিদ্যুৎ
- আধুনিক মানুষ, জনসংখ্যা, জনবিস্ফোরণ, জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ
- বিষবিজ্ঞান—কারসিনোজেন, টেরাটোজেন, LD_{50} ; পেশাগত রোগ—অ্যাজবেস্টোসিস, সিলিকোসিস ; খাদ্যে ভেজাল—ভেজাল সনাক্তকরণের উপায় ; পেস্টিসাইড—সংক্রমণ ও প্রভাব, ডি. ডি. টি'র জীব-কেন্দ্রীভবন ও জীববিবর্ধন
- বায়ুদূষণ—কারণ, প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ ; স্ট্র্যাটোস্ফেরিক ওজোন স্তর, ওজোন স্তরের ক্ষয়, অ্যান্টার্কটিক ওজোন হোল ; গ্রীণহাউস প্রভাব ঃ গ্লোবাল ওয়ার্মিং ; অ্যাসিড বৃষ্টি
- জলদূষণ—কারণ, প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ ; সীসা, পারদ, মলিবডেনাম ও আর্সেনিক দূষণ ; সামুদ্রিক দূষণ ; জীবরাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা (BOD)
- মৃত্তিকা দূষণ, তেজস্ক্রিয় দূষণ, শব্দদূষণ—কারণ, প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ
- আর্সেনিক ও পরিবেশ দূষণ।